বাংলার পল্লীগীতি

চিত্তরঞ্জন দেব

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম মুদ্রণ

১৯৬০

প্রকাশক

সলিলকুমার গাঙ্গুলি

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক

সমীর দাশগুপ্ত

গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০১৬

প্রচ্ছদ

শ্রীগণেশ বসু

উৎসর্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত এম. এ. পি. এইচ. ডি. মহোদয়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

লৌকিক ধর্ম-উৎসব ও অনুষ্ঠান

দ্বিতীয় খণ্ড

বহিঃ প্রাকৃতিক

তৃতীয় খণ্ড

আন্তর ধর্ম

চতুর্থ খণ্ড

সাময়িক গীতি

পঞ্চম খণ্ড

ছড়া ও প্রবচন

প্রথম খণ্ড

ধাঁধা-হেঁয়ালি আউড়ে যাচ্ছেন—তাদের সৃষ্টি-কর্মের ভাণ্ডার অফুরন্ত। আগেও যে-কথা বলেছি, আজও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে, তাদের রচিত গীতি গাথার সম্পূর্ণ সংগ্রহ একান্তই অসম্ভব। আমরা এ পর্যন্ত যেটুকু আপনাদের কাছে উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছি সে হলো তাদের সৃষ্টি কর্মের ভগ্নাংশ মাত্র।

আশাকরি লোক-সাহিত্য প্রেমিক সাধারণ ও তত্ত্বানুসন্ধানী বিদগ্ধজনের কাছে পূর্ব সংস্করণের মতোই এই সংস্করণও তাদের কাছে একেবারে অনাদরনীয় হবে না।

চিত্তরঞ্জন দেব

নিবেদন

প্রায় বার বছর আগে আমার "পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ" প্রকাশিত হবার পর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহৃদয় সুধী ও রসিক সজ্জনদের কাছ থেকে যে বিপুল সাড়া পেয়েছিলাম এই গ্রন্থ রচনার মূল উৎস সেখানেই। এরপর সেইসব সুধী সজ্জনদের সহায়তা ও বদান্যতায় আমার পক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণের সুযোগ ঘটে। এই পরিভ্রমণের সময় আমায় পরিচিত হতে হয় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও তাদের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের সংগে। এই সব আচার-অনুষ্ঠানের অনেকগুলিই আজ বিলুপ্তির পথে। হয়তো আর কিছুকালের ভিতর এর অনেকগুলিরই আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনাও করেছি।

অপূর্ব দেশ এই বাংলা। এর এক অঞ্চলের সংস্কৃতির সংগে অন্য অঞ্চলের সংস্কৃতির পার্থক্য অনেক। এর এক অঞ্চলের গানের সংগে অপর অঞ্চলের গানের সুরগত বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। পূর্ববংগের গীতি সংগ্রহের সময় যে-সব গীতি ও গাথা সংগ্রহ করি তার অধিকাংশ গানেই যেমনি ভাটিয়ালী সুরের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছি, তেমনি পশ্চিমবংগের অধিকাংশ গানেই বাউল ও ঝুমুরের সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই প্রসংগে উল্লেখ-যোগ্য যে উত্তরবংগের গানের সুর কিন্তু এই দুই অঞ্চলের গানের সুর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একমাত্র মালদহ জেলা বাদে এ অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশ গানেই ভাওয়াইয়া সুরের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। তথাপি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চার বাংলার গানের আদর্শগত মিল রয়েছে অতি আশ্চর্যভাবে। আর সেই মিলই হলো বাংলার পল্লীগীতির প্রাণ।

সর্বত্রই একটি জিনিস বরাবরই নজরে এসেছে, বাংলার লোক-কবির দল একদিকে যেমনি দেব-দেবীর বন্দনা গেয়েছে, তেমনি আবার এইসব দেব-দেবীর কাহিনীর অন্তরালেই তাদের মনের কথা, অভাব-অভিযোগের কথাও ব্যক্ত করেছে কখনও সুকৌশলে, কখনও বা স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে। তারা এই গানের মাধ্যমেই প্রতিকার চেয়েছে দেশের অভাব-অভিযোগের। এই লোক-কবির দল কোথাও স্বর্গের দেবতাকে তাঁদের আসনচ্যুত করে মর্ত্যের বাসিন্দারূপে দেখায়নি বা

মর্ত্যের মানুষকেও স্বর্গের দেবতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে নি। তারা তাদের কাব্য গাথায় যে দেব-দেবীর কথা গেয়েছে তাঁরা হলো এদেরই ঘরের লোক—তাঁদের কথাই বর্ণনা করেছে। ফলতঃ এইসব দেব-দেবীই হউক বা যে-কোনো গানেই হউক প্রত্যেকটির ভিতরই প্রচ্ছন্নভাবে উঁকি মারছে এই কৃষাণ ঘরের ছবি। প্রসংগতঃ উত্তরবংগের গম্ভীরা এবং গম্ভীরার শিব, পশ্চিমবংগের টুসু, ভাদু এবং পূর্ববংগের নীলঠাকুর (পাট গোসাঁই)—এঁরা সবাই একদিকে যেমনি লৌকিক দেব-দেবী অপরদিকে সত্যিকারের গণদেবতা বা গণদেবী।

অফুরন্ত গানের ভাণ্ডার এই বাংলা। কোনো মানুষ সারা জীবন ধরে সংগ্রহ করলেও তার গানের সংগ্রহ কার্য শেষ হবে কিনা সন্দেহ। আমাদের এই গীতি সংগ্রহ তো সেই অনুসারে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা মাত্র। তবে আশার কথা, বাংলার লোক-সাহিত্য, লোক-সংগীত, শিক্ষা ও সংস্কৃতি আজ আর উপেক্ষিত নয়। বহু বিদগ্ধ জনও আজ এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন—যার ফলে আজ এইসব সংগ্রহ কার্য অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুসৃত ও তাদের উপযুক্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সংগ্রহের ব্যাপারে অনেকের অনেক রকম মত থাকতে পারে কিন্তু আমরা সংগ্রহের ব্যাপারে ভালমন্দ উভয়কেই সংগ্রহ করেছি। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্য অপেক্ষা তত্ত্বের দিকটাই ভারী হয়েছে এ-কথাও ঠিক,—সংগ্রাহকের কাজ সংগ্রহ করা—বিশ্লেষণ করবার দায়িত্ব ভাবী কালের গবেষকদের। সুধীবৃন্দ অবশ্যই সেকাজে যোগ্যতা দেখাবেন।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব বা পশ্চিম বলে কিছু থাকতে পারে না। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সবটা মিলেই বাংলা-সংস্কৃতির পূর্ণরূপ। কাজেই এই সংগ্রহের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিমবংগের মতো পূর্ববংগের প্রতিনিধিত্বমূলক গানও স্থান পেয়েছে—বৃক্ষের বৃহত্তম অংশকে বাদ দিয়ে ক্ষুদ্রতম অংশকে ধরলে গাছের পূর্ণাংগ রূপ কল্পনা করা যায় না।

স্থানাভাবে আমাদের সংগৃহীত গীতি ও গাথার অতি অল্প অংশই এখানে উপস্থিত করতে পেরেছি। যদি কোনো দিন সুযোগ ঘটে তখন আশা করি এ-বিষয়ে আরও নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে পারব।

আজ এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করতে বসে সর্বাগ্রে যাঁর কথা মনে আসছে তিনি হলেন "সাহিত্য-সেবক সমিতি" (কলিকাতা)-র প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যাচার্য ৺ রমেশচন্দ্র সেন—যাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং প্রেরণা না থাকলে আমার এ-কাজে

অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠত। আজ সংকলন প্রকাশের এই শুভমুহূর্তে প্রতিক্ষণেই মনে পড়ে তাঁর কথা।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের গীতি ও গাথা সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য নিতে হয়েছে অগণিত নরনারীর। তাঁদের ভিতর সর্বাগ্রে নাম করতে হয় দীর্ঘদিনের সুপরিচিত পল্লীগীতি গায়ক "গম্ভীরা পরিষদ" (কলিকাতা)-এর প্রতিষ্ঠাতা মালদহ নিবাসী শ্রীতারাপদ লাহিড়ীর—যাঁর সাহায্য, প্রেরণা ও উৎসাহ না পেলে শুধু যে গম্ভীরা গানের সংগ্রহই বাকী থেকে যেত তা নয়,—এক কথায় সমগ্র উত্তরবঙ্গের গীতি সংগ্রহের কাজই ব্যাহত হতো। আমার এই গীতি সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে তাঁর নিজের বহু ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। এজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষ ভাবেই ঋণী। এই প্রসঙ্গে বীরভূমের ৺নবনী দাস বাউল, জলপাইগুড়ির শ্রীসত্যেন রায়, রংপুরের শ্রীহরলাল রায়, কুচবিহারের ৺সুধন্য বাসুনিয়া, পুরুলিয়ার শ্রীতপন সেনশর্মা, বরিশালের ৺শশী নট্ট, খুলনার শ্রীলম্বোদর ঢালী, ঢাকার ৺জ্ঞানদা বৈষ্ণবী, ময়মনসিংহের জনাব নিজামুদ্দিন শেখ, ত্রিপুরার ৺নিবারণ দাস বৈরাগী, ফরিদপুরের ৺কেনাই ঠাকুর, ৺বঙ্কিম দেব ও শ্রীকালিদাস রায় চৌধুরীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—যাঁদের সহায়তা ভিন্ন এই সংগ্রহ কার্যের অনেকখানিই বাকী থেকে যেত।

এই সংগ্রহ প্রকাশের কাজে যাঁরা আমায় নানাভাবে সাহায্য, পরামর্শ ও উপদেশ দান করে চিরদিনের মতো কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের ভিতর ৺অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৺উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, পি-এইচ. ডি., অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী ও শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত, সংগীত শাস্ত্রী ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, সাংবাদিক শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীশান্তিকুমার মিত্র, শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়, 'চতুষ্কোণ' সম্পাদক শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, সঙ্গীতবিদ্ শ্রীহরিভূষণ বসু ও শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস, 'কত-কথা'র শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত, শ্রীভাস্কর রায়, শ্রীসত্যেন্দ্রলাল রায়, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সাহা ও শ্রীদেবীপ্রতাপ বিশ্বাস মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে বন্ধুবর শ্রীঅরুণ রায়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। শুধুমাত্র মামুলী ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

এ-কথা বলাই বাহুল্য মহামান্য ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

শিক্ষা-মন্ত্রকের আর্থিক সাহায্য না পেলে এই গ্রন্থ প্রকাশনার কাজ সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হতো—তজ্জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি এঁদের ঋণ।

এই প্রসঙ্গে "নবশক্তি প্রেসের" ডিরেক্টর শ্রীরণজিৎ কুমার দত্তের সহযোগিতা ও বদান্যতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমার ঋণ তাঁর কাছেও নেহাৎ কম নয়।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখলে আজ যিনি সব চাইতে বেশী খুশী হতেন সেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর ৺শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পি-এইচ. ডি., মহোদয় আর আমাদের মধ্যে নেই। আজ এই শুভলগ্নে সংকলনটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে সমর্পণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কলিকাতা
পৌষপার্বণ

চিত্তরঞ্জন দেব

লৌকিক ধর্ম-উৎসব ও অনুষ্ঠান

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

[গম্ভীরা, গমীরা, গাজন ও নীল]

গম্ভীরা

অতীত পুরাকীর্তির দেশ হলো মালদহ। বিস্মৃত প্রায় বহু রাজত্বের উত্থান পতন, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের লুপ্তপ্রায় সোনালী দিনগুলির স্বপ্ন-মধুর বহুশত কাহিনী ভীড় করে রয়েছে এর প্রতি ধূলিকণায়। অতীতের ফেলে আসা দিনগুলির ধ্বংসস্তূপ খুঁজে সন্ধানীরা হয়তো ইতিহাসের অনেক উপাদানই পাবেন। শুনবেন হিন্দু রাজন্যবর্গের প্রতাপের কাহিনী, মোগল যুগের ভাস্কর্যের কথা, বৌদ্ধ যুগের দর্শনের বারতা।

এই বৌদ্ধ শাসনের ভিতরই এক সময় অংকুরিত হয় বর্তমানের গম্ভীরা উৎসব—যা হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান কালে রূপ নিল উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় গম্ভীরা, জলপাইগুড়িতে গমীরা, পশ্চিমবঙ্গে গাজন ও পূর্ববঙ্গে নীল পুজা রূপে। উড়িষ্যার কোনো কোনো অঞ্চলে একেই বলে সাঁই যাত্রা।

অনেকে বলেন গম্ভীর কথা থেকেই গম্ভীরা শব্দের উৎপত্তি। গম্ভীর হলো মহাদেবের নাম। গম্ভীর অর্থে, শান্ত, ধীর, স্থির—এ সব কটি বিশেষণই শিবের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। কারও কারও মতে গম্ভীর অর্থ পদ্ম। কেউ কেউ বলেন এ হলো গাম্ভীর নামক এক প্রকারের গাছের নাম। বিহারে এ গাছকেই বলা হয়েছে গাওহার। মাণিক দত্ত বা কবিকংকণের চণ্ডীতে ও কোনো কোনো বৈষ্ণব গ্রন্থে গম্ভীর শব্দের অর্থ ধরা হয়েছে দেবগৃহ বা দেব-মণ্ডপ বলে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও কোনো স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু শিব যে মূর্তিরই সুসংস্কৃত রূপ এ বিষয়ে খুব বেশি আলোচনার প্রয়োজন নেই। হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান কালে বুদ্ধ মূর্তি শিব মূর্তিতে এবং আদ্যামূর্তি ভগবতী রূপে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও পাল পার্বণের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে শৈব ধর্মে রূপ নিতে শুরু করল। পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এদেশে ধর্ম বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামীর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের অবসান কালে শৈব ধর্ম ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় সংঘাত শুরু হয় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা ও শৈব তান্ত্রিকতার ভিতর। কালক্রমে মুসলমানদের হিন্দু

দেবালয় ধ্বংস ও হিন্দুদের ধর্মান্তর গ্রহণের মধ্যে হিন্দু ধর্ম আচরিত ধর্মরূপে নীচজনভোগ্য হয়ে পড়ল। এই সময়কার প্রতিষ্ঠিত সমাজে যে শিবের পূজা ও উৎসব হতো তা-ই আজকের দিনের শিবের গাজন, নীল, গমীরা ও গম্ভীরা নামে খ্যাত।

বল্লাল সেনের সময় যখন হিন্দু সমাজ নবভাবে গঠিত হলো তখন থেকেই শিবের গাজন, গম্ভীরা, গমীরা ও নীল পূজা হিন্দুগণের আচরিত ও অনুষ্ঠিত উৎসবের মধ্যে পরিগণিত হতে আরম্ভ করল। তবে এই উৎসবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিরই উৎসাহের আধিক্য দেখা যেত। কিন্তু কালক্রমে এই উৎসব বিশেষ করে মালদহের গম্ভীরা জনপ্রিয়তা অর্জন করে সভ্য সমাজের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছে।

মালদহের গম্ভীরা উৎসব চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ হয় এবং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি চলে। এই উপলক্ষ্যে একটি মণ্ডপ তৈরী করে তাতে শিব পূজার ব্যবস্থা করা হয়। মণ্ডপটিকে প্রাচীন কালে সাজানো হতো পদ্মফুল দিয়ে। পরবর্তীকালে পদ্মফুলের অভাবে কাগজের ফুল দিয়ে সাজাবার ব্যবস্থা হয়। মণ্ডপের সুমুখে শোভা পেতে থাকে ঝাড়-লণ্ঠন এবং নানা রকমের ছবি। এই সব ছবি সবই দেশীয় পটুয়াদের আঁকা এবং এর ভিতর পটুয়া-শিল্পের চরম উৎকর্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মালদহের গম্ভীরা, জলপাইগুড়ির গমীরা, পশ্চিমবঙ্গের গাজন ও পূর্ববঙ্গের নীল পূজা যে প্রকৃত পক্ষে একই জিনিষের বিভিন্ন নাম এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই জাতীয় উৎসব তিব্বতের লামাদের ভিতরও অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়; তা ছাড়া য়ুরোপ, আফ্রিকা, ব্যাবিলন, গ্রীস ও মিশর দেশেও পুরাকালে এই রকমের উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। গ্রীস দেশে এই উৎসবকে 'ফেলি ফোরিয়া' উৎসব বলা হতো এবং বেকস দেবের পুত্র প্রায়েপস দেবের সময় ঐ প্রকার উৎসবে পথের পাশে শিব লিঙ্গ শোভা পেত এমন খবরও পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমান ধর্মে 'তেশাব' দেবতাকে এশিয়া মাইনরের হিটটাইটগণ পূজা করতেন। এই দেবতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের রুদ্র ও শিবের সাদৃশ্য আছে। এই দেবতার বাহনও বৃষ। ফ্রাংকফুর্ট অঞ্চলে এইরূপ একটি বৃষ মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। মিশর দেশেও 'আসীরিস' দেবতা ও বৃষ বাহনের যে-উৎসব হতো তাও গম্ভীরা প্রভৃতির অনুরূপ। মহাভারতে শিব পূজা ও উৎসবে বর্তমানে প্রচলিত গম্ভীরা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্য মেলে। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউ-এন-সাঙ এর লিখিত বিবরণেও এর উল্লেখ আছে। তারা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা

মূলক যে-সব উৎসব ও শোভাযাত্রা দর্শন করেন তা থেকেও গম্ভীরা প্রভৃতি উৎসবের ক্রমবিকাশের যথেষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায়।

মালদহের গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠান প্রধানতঃ চারদিন ধরে চলতে থাকে এবং প্রত্যেক দিন শিবাদি দেবতার পূজার ব্যবস্থা থাকে। প্রথম দিনকে বলা হয় 'ঘটভরা' কারণ এই দিনে ঘটস্থাপন করে গম্ভীরা মণ্ডপে শিব পূজা করা হয়।

দ্বিতীয় দিন হলো 'ছোট তামাশা'। এই দিনে ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাজনা সহ রাত্রে গম্ভীরা মণ্ডপের সম্মুখে নানা রকমের নৃত্যাদি দেখাবার ব্যবস্থা হয়।

তৃতীয় দিন অর্থাৎ 'বড় তামাশার' দিনে অতি শুদ্ধ চিত্তে ও শুদ্ধাচারে শিবভক্তগণ কর্তৃক কাঁটাভাঙ্গা ও ফুলভাঙ্গা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে শিব ভক্ত বালাগণ উপোসী ও সংযমী হয়ে গম্ভীরা মণ্ডপে রক্ষিত কাঁটা গাছ বুকে ধারণ করে শিবস্তবাদি পাঠ করে। পরে তারা এই কাঁটার বিছানায় দেহ লুটিয়ে দেয়। ঐ দিন বিকেলে বাণফোঁড়া পর্ব অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ শিবভক্তগণ লোহার তৈরী ত্রিশূলের সূক্ষ্মভাগ কোমরে বিদ্ধ করে এবং তাতে তেলে ভেজান কাপড় জড়ায়। পরে এতে দেয় আগুন ধরিয়ে এবং এর মধ্যে ধুনো ছিটিয়ে দিয়ে আগুন দ্বিগুন প্রজ্বলিত করে এবং বাদ্যাদি সহ এক গম্ভীরা থেকে অন্য গম্ভীরায় নাচ গান দেখিয়ে বেড়ায়। এর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নীল সন্ন্যাসীদের বঁটিঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ, ফুলভাঙ্গা প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করা চলে। পূর্ববঙ্গের নীল সন্ন্যাসীরাও অনেক সময় নীলের মণ্ডপের সম্মুখে জ্বলন্ত কাঠ-কয়লা সাজিয়ে দিয়ে তার উপর গড়াগড়ি করে। একেই বলে ফুলভাঙ্গা, 'ফুল' অর্থে আগুনের টুকরো—'ফুলকী'র অপভ্রংশ।* তিব্বতী সাহিত্যেও গম্ভীরা প্রভৃতি উৎসবের অনুরূপ নৃত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। এই দিন মালদহ অঞ্চলে এই উপলক্ষ্যে যে নানা রকমের সঙ বের হয় তার সঙ্গে কলিকাতার জেলেপাড়ার সঙ এবং ঢাকার কালীকাচের তুলনা করা চলে। এর উপকারিতা এই যে সামাজিক দুর্নীতির বিষয় লোক সমক্ষে প্রচারিত হওয়ায় লোকে দুর্নীতি হতে দূরে থাকে। এই রকমের সঙ সমাজ সংস্কারের দিন থেকেও হিত বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। যাগ-যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই রকম সঙ ও শোভাযাত্রার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই দেখতে পাই। এই সঙ দেখার ব্যাপারে সকল সমাজের লোকেরই উৎসাহ দেখা যায়।

---

* নীল পূজা ও উৎসব সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য এই গ্রন্থকারের "পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ", গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এইদিন রাত্রে গম্ভীরা মণ্ডপের সম্মুখে মুখোস পরে চামুণ্ডা, কালী, নরসিংহ এবং নানা সাজে সেজে শিব দুর্গা, রাম লক্ষ্মণ, ঘোড়া, পৈরী (পরী) প্রভৃতির নাচ দেখান হয়। ঢাকার এই ধরনের নাচকে বলে কালীকাচ; কাচ অর্থে সঙ। এই নাচের ব্যাপারে সর্বত্রই ঢাক, কাঁসি ও ঢোলের বাজনাই প্রধান স্থান অধিকার করে এবং উৎসাহ দানের জন্য সর্বত্রই পুরস্কার বিতরণ করে নৃত্য শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা উচিত মালদহের কালী, নরসিংহ প্রভৃতি গম্ভীর প্রকৃতির নৃত্যাদি দেখাবার কালে অপর ব্যক্তিগণ নৃত্যরত ব্যক্তির সম্মুখে ধুনুচির ধোঁয়া মুখোসের ছিদ্র পথে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত করে। এই রকম নাচ ও বাজনা চলে সারারাত ধরে।

চতুর্থ দিনে গম্ভীরা মণ্ডপে শিবপূজা ছাড়াও নীল ও আহারা পূজার ব্যবস্থা থাকে এবং রাত্রে গম্ভীরা গান অর্থাৎ 'বোলবাহি' বা 'বোলাই' আরম্ভ হয়। এই গানে মালদহের নিজস্ব ভাষা ও স্থানীয় লোক-সঙ্গীতের বিশিষ্ট সুর ব্যবহৃত হয়। গানের বিষয় বস্তুকে 'মুন্দা' বলে। নাটকীয় ভঙ্গীতে অতি সাধারণ সাজে সেজে প্রথমে শিব বন্দনা গায়, পরে অভিনয় আরম্ভ করে এবং পালা গান শেষে বাৎসরিক বিবরণী গেয়ে থাকে।

গম্ভীরা গানে সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি বর্তমান। এ উৎসবে 'আলকাপ' নামে নানা প্রকার কাহিনী ও রঙ্গরস সহযোগে উপদেশ মূলক পালাগান ও গীত হয়ে থাকে।

নিজস্ব গম্ভীরা ছাড়া 'ছত্রিশী' বা বারোয়ারী গম্ভীরাও আছে। গ্রাম্য মাতব্বরগণ গ্রাম্য সালিশীর সাহায্যে যে-অর্থ সংগ্রহ করে এবং রাজা জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত নিস্কর ভূমি থেকে যে-অর্থ পাওয়া যেত তাই দিয়েই ছত্রিশী বা বারোয়ারী গম্ভীরার ব্যয় সংকুলান হতো। এই ছত্রিশী বা বারোয়ারী গম্ভীরার দ্বারা পল্লীবাসীরা একতাবদ্ধ, কর্তব্যপরায়ণ এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয়। গম্ভীরার বার্ষিক বিবরণী গানে সামাজিক দুর্নীতির নিন্দা করা হয় বলে সমাজ সংস্কৃতির দিক থেকেও এর মূল্য বড় অল্প নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও গম্ভীরা গান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে ছিল। বহু লোক-কবি ও শিল্পীকে এই গানের জন্য সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে আদালতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে গম্ভীরা গান বন্ধ হয়নি। মালদহের লোক-কবিরা আজও বছরে বছরে নতুন গান বাঁধছে, নব নব সমস্যা নিয়ে এবং বিভিন্ন কণ্ঠেই গেয়ে চলেছে জনসাধারণের মাঝে দাঁড়িয়ে।

গম্ভীরা পর্বের চতুর্থ দিন রাত্রে লোক জমায়েত হয় গম্ভীরা মণ্ডপের সম্মুখে। এসে জড়ো হয় গম্ভীরা গায়ক এবং বালার দল। সঙ্গে আসে ঢাকি, ঢুলি ও কাঁসি। মূল বালা প্রথমে শুরু করে দিল দিগ্ বন্দনা :

জল বন্দ, থল বন্দ, বন্দ শিবের কুড়্যা
হাট (আট) হাত মৃত্তিকা বন্দ চন্দ্র সূর্য জুড়্যা,
লাউ সেন দত্তের ব্যাটা, কাউ সেন দত্ত,
যে জন আনিল ধরায় মহেশ্বর ব্রত
তাঁর চরণে করি দণ্ডবত।
(শিবনাথ কী ?)

উপস্থিত জনমণ্ডলী বালার প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিধ্বনি করে ওঠে—মহেশ।

এই ভাবে তিনবার প্রশ্ন করে—শিবনাথ কি ? উত্তর শুনতে পায়—মহেশ।

এরপর মূল গায়ক শুরু করে গান। প্রথমেই বর্ণনা করে শিবের চেহারার, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির :

ভোলা বেশ ভালত মজা
এ কেমন তোমার পূজা,
করলি ভ্যাকম একি রকম
ঠিক যেন ভ্যাক ভ্যাকুম বাজা
এ কেমন তোমার পূজা।
মূলদ্কাসানে আছ আসানে
শ্মশানে হয়্যা মশানের রাজা
এ কেমন তোমার পূজা।
(ভোলাহে) আবার পর‍্যা কপ্‌নি
আছ আপ্‌নি
ঢুল্যা ঢুল্যা খাচ্ছ গাঁজা
এ কেমন তোমার পূজা।
(আবার) কুচনি পাড়ায় বেড়াও ঘুর‍্যা
কখনও বা দামড়ায় চড়্যা (শিব)
টানে টানে পর‍্যা দো-টানে
চটানে পর‍্যা চুলকাই জুজা।

বসন বাঘছাল মড়ার খাপটা
ভূষণ আলাদ, গহমা, ভ্যাপটা (শিব)।
দেখ্ দেখ্ বাইদ্যার ব্যাটা
গণশার বাপটা
ঠিক যেন কোন্ গুণী রোঝা
এ কেমন তোমার পূজা।

এইখানে উল্লেখ করা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে গম্ভীরার এই শিব ঠাকুর পুরাণোক্ত শিব নন। তিনি গণদেবতা। চাষ বাস করেন, মাছ মারেন, কাপড় বোনেন, হাল চাষ করেন, কাজেই বছর শেষে তাঁর পূজারও যেমন ব্যবস্থা রেখেছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়েছে এই শিব ঠাকুরই তাদের পূর্বপুরুষ। কাজেই তাদের অভাব অভিযোগ সবই নিবেদন করে তাঁর কাছে। অভাবে পড়লে অভিমান করে দুটো স্পষ্ট কথাও তাঁকে শুনিয়ে দিতে কসুর করে না। প্রকৃতপক্ষে গম্ভীরার এই শিব পূজার পদ্ধতির মধ্যে শাস্ত্রীয় কিছু থাকলেও এর গানের ভিতর তেমন কিছু নেই। এখানে লোক-কবিরা একটি লোককে শিব সাজিয়ে আসরে দাঁড় করায় ঠিকই, সে যেন উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁকে উপলক্ষ্য করেই এই সব সমাজ সচেতন লোক-কবিরা একের পর এক বর্ণনা করে যায় তাদের দুঃখদুর্দশা।

লোক-কবিরা বলছে, 'হে মহাদেব তুমি তো বেশ আরামে বাস করছ, আর সিদ্ধি-ভাঙ খেয়ে বেড়াচ্ছ, এদিকে আমরা যে কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছি তা তুমি মোটেই চেয়ে দেখছ না। সুতরাং তুমি এবার তোমার লীলা খেলা বন্ধ কর':

শিব তোমার লীলা খেলা কর অবসান
বুঝি বাঁচেনা আর জান।
অনাবৃষ্টি কর্যা সৃষ্টি
মাটি করলা নষ্ট হে
দৃষ্টি থাকতে কষ্ট কর্যা
দেখছনা কি কষ্ট হে
মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর্যা
শিষ্ট লোকের ইষ্ট মার্যা
করিলা মোদের গুষ্টি ছাড়া
শুন বলি পষ্ট কর্যা।

তার পরে ম্যালেরিয়ায়

হইলাম হালা কাণ

বুঝি বাঁচেনা আর জান।

অন্নদা মা ভিক্ষা তোমায়

করবে না কি দান হে

সময় কালে না হয়্যা জল

অসময়ে ফলল কুফল

(ও সব) মুশুরী কলাই গেল ডুব্যা

ক্ষেতের ফসল ম'ল,

আম গ্যাল আম ছালা গ্যাল

ক্যামনে করি গান

বুঝি বাঁচেনা আর জান।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি গম্ভীরার শিব উপলক্ষ্য মাত্র, প্রকৃত পক্ষে মালদহের লোক-কবিদের আবেদন সম্পূর্ণ ভাবে দেশবাসী তথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দরবারে। তাই তাদের গানে সাময়িক কথা ও সমস্যার কথাও থাকে খুবই বেশি পরিমাণে। একবার মালদহের বন্যায় প্রভূত পরিমাণে শস্যের ক্ষতি হয়, সেই বছরের গম্ভীরা গায়কদল শিবকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করল :

এবার কি খাবা হে বাবা

পুয়াল চাবাও বস্যা।

কোন্ মুলুকের বন্যা এলো

মোর বাবা হে—।

মোর বাজী হে।

কোন্ দখ্না বাতাস আস্যা হে

পুয়াল চাবাও বস্যা।

আমের গাছের ডান্টা খাড়ু

ভাদই ধানের আশা ছাড়ু

ভাতিয়ার বিল হাতিয়ায় নিলে

মোর বাবা হে

মোর বাজী হে

কোন্ দখ্না বাতাস আস্যা হে

পুয়াল চাবাও বস্যা।

বন্যায় শস্যের ক্ষতি হওয়ায় কৃষকরা যেমনি শিবের কাছে আবেদন পেশ করেছিল, তেমনি অন্য একবার অনাবৃষ্টির জন্য যখন মোটেই শস্য হলো না, দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষ লাগার উপক্রম হলো, তখনও মালদহের লোক-কবিরা শিবকে উপলক্ষ্য করে বলতে শুরু করল :

শিব কি করিব হে এবার
বাঁচবে না প্রাণ
টাকা স্যারের চাউল হয়্যা
লাইগ্যা গ্যাল টান।
বাঁচবে না আর প্রাণ॥
আমাদের দ্যাশের আম্র ফলটি
সেও হল মাটি
পল্-পৃশা পাছি দিসা
দর হল খাঁটি হে,
দর হল কুড়ি প'চিশ
পল্-পৃশা লাগ্ছে-যে দিস্।
এ ক্যামন হল দ্যাশের ধারা
বল বাঁচব ক্যাম্নে মোরা।
কৃষকেরা ভাবছে বস্যা
উপায় কিবা করিহে
ধান কলাই হোলনা ভাই
হোলনা জল ঝরিহে।
আর ক্যামনে রোপন করি
জল বিনা সব মইল গরু বক্রী
এ কি হোল বিষম জ্বালা
ক্যামনে বাঁচবে ছেইলা পিলা।
গরীবেরা ভাবছে বস্যা
উপায় কিবা করি হে।
এক সের দর চাউল হয়্যা
না খাইয়া সব মরি হে,
ভুট মটর ঘোড়ার খানা
দর হোল যে মাখন ছানা

এ কষ্টে পরদা গেল মরে
রাজ্য চলবে ক্যামন করে
দিনে দিনে হল কঠিন
ক্যামনে পাব ত্রাণ
শিব কি করিব হে এবার
বাঁচবে না আর প্রাণ।

লোক-কবিদের একজন ব্যঙ্গ করে বলছে, 'দেখ ভাই আমাদের এইসব দুঃখ-কষ্টের মূলই হচ্ছে ওই বুড়োটা অর্থাৎ শিব। সুতরাং এসো আমরা আচ্ছা করে ওকে চেপে ধরি, বলি আমাদের দুঃখের কথা':

ধর্ ধর্ ধর্ দিসনা ছাড়্যা
লিয়া চলেক সঙ্গে কর‍্যা
ওই বুড়হাটা দিলে বড়ই দুখ (হে)
(দিলে বড়ই দুখ)
ধান বুনিলে দেয়না পানী
ওই বুড়হাটা বড়ই শনি
সদাই রাখে মোদের প্যাটে ভুখ হে।
দামড়ার উপর চড়্যা বুড়হা
কুচনী পাড়ায় বেড়ায় ঘুর‍্যা
ঠাট্ কুহারা জানেই কত তুক্ হে
(জানেই কত তুক্)

স্বাধীনতা আন্দোলনেও গম্ভীরার দান যে অনেকখানি এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যুগে যুগে স্বাধীনতার যখন যে-ঢেউ উঠেছে মালদহের লোক-কবিরা সাগ্রহে তাতে সাড়া দিয়েছে। এই তো মাত্র সেদিনের কথা। ১৯৪৭ সালে ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরেজের শয়তানী চক্রান্তে পড়ে ভারত যখন ভাগ হলো তখনও মালদহের লোক-কবিরা চুপ করে বসে নেই। স্বাধীনতা লাভের পরও ভারতবাসীর অবস্থা নিয়ে নির্ভিক কণ্ঠে গেয়ে উঠল মালদহের লোক-কবিরা:

বাপরে বাপ্ জান বাচান হল দায়
শেয়াণে শেয়াণে কোলাকুলি
নলখাগড়ার প্রাণ যায়
জান বাঁচান হল দায়।

ধন্য বৃটিশ রাজের চাল
ও যে করলে নাজেহাল,
শ্যাষে মাথার ঘায়ে
পাগল হয়্যা
উড়া জাহাজে হাওয়া খায়
বাপ্‌রে বাপ জান বাঁচান হল দায়।
চার্চিল ছদ্মেরই বেশে
(ও সে) অট্টালিকাতে বসে
চপ কাটলেট চুষে
এটলিকে ফের কেটলী বানায়্যা
সেই জলেতে চাহা খায়, বাপরে।

গম্ভীরা গায়কদল এই পর্যন্ত বলেই ক্ষ্যান্ত হতে চায়নি। ছত্রিশী বা বারোয়ারী গম্ভীরার মারফৎ তারা সামাজিক দুর্নীতির কাহিনী আরও স্পষ্ট, আরও জোরাল ভাবে প্রকাশ করেছে :

দ্যাশের কত যে নেতা
তাদের বড় বড় কথা,
পায়্যা স্বাধীনতা লাড্ডু
কুন্‌ঠে হয়্যা গেনু গাড্ডু।
দেখ্যা তাদের স্বার্থপরতা
খালো হামাদের মাথা
শ্যাষে ঘরে আগুন লাগায়্যা দিয়া
সোনার ভারত করলো খান
হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান।

রাজনৈতিক গানের জন্য কত গম্ভীরা গায়ক ও গীতিকারকে যে আদালতের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাই বলে তাদের কণ্ঠ এখনও স্তব্ধ হয় নি একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই তারা এখনও স্পষ্ট অথচ নির্ভিক কণ্ঠেই গেয়ে চলে দেশের অনাচার, অবিচারের প্রতি শ্লেষ বিদ্রূপ করে। কারণ, তাদের গান তো আর ছাপার হরফে প্রকাশিত হয় না, গান থাকে মনের মাঝে লুকিয়ে। সেখানে সরকারী আইনের এক্তিয়ারের বাইরে, সুতরাং শিবকে উপলক্ষ্য করে তাদের আর গাইতে বাধা কি দেশের শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে ?

আজ ভাল মানুষির দিন গিয়াছে
ওহে পশুপতি।
তিন চোখে কি দ্যাখতে পাওনা
মোদের কি দুর্গতি।
জাল জালিয়াতি বিশ্ব জুর‍্যা
ব্লাক মার্কেট বাজার ভর‍্যা
গাড়ী চালায় বাড়ী হাঁকায়
জ্বালায় বিজলী বাতি।
বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম সেবা
রসাতলে গেল ডুব্যা
হিংসা বিবাদ দলাদলি
হায়রে কি দুর্মতি,
ন্যাংটা হয়্যা প্যাংটো মুখে
মরলো যে সব গরীব লোক
তাইতো মোরা ন্যাংটা ভোলার
কাছে জানাই নতি॥

অনেক সময় ছদ্মবেশের আড়ালেও তারা তাদের মনের কথা শুধু মাত্র ইঙ্গিতে প্রকাশ করে থাকে। কোনো এক সময় ঐ অঞ্চলের স্থানীয় থানার বড় দারোগার অত্যাচারে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল গাঁয়ের লোক, অথচ মুখ ফুটে তার প্রতিবাদও করতে পারছে না, তখন এইসব অসহায় জনসাধারণের এই অব্যক্ত মনোবেদনা প্রকাশ করবার ভার নিল নিরক্ষর লোক-কবির দল। তারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সুকৌশলে বর্ণনা করে যেতে লাগল, 'তুমি যদি তোমার এই অত্যাচারী বড় দারোগাকে না সামলাও তা হলে আমরা মেরে তার হাড় ভেংগে দেব, তখন আর বাড়ি বাড়ি ঘুরে খোঁজ করলেও তার কোনো সন্ধান পাবে না।'

এখানে শিব অর্থে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, বুড়ো এঁড়ে অর্থাৎ বড় দারোগা ইত্যাদি :

শিব সামলারে তোর বুড়ো এঁড়ে
তাড়িয়ে মারে ঢিঁসরে!
তোর কাঁধে ঝোলে ভিক্ষের ঝুলি,
গলায় ভরা বিষ রে !!

কোঁচেরা সব সল্লা করে,
(তোর) এঁড়ে দিবে খোঁয়াড়ে ভরে,
তখন বাড়ি বাড়ি মাগুন করে,
জরিমানা দিস রে !!

অনেক সময় স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবেও শিবকে উপলক্ষ্য করে বলে থাকে :

শুনরে ভোলা নানা, প্যাটে নাইক দানা
ক্যানে দিলি এমন সাজারে
তোর ভূতের বেগার খ্যাট্যা
ভাত খাই আধ পেটা,
হামার খাঁচা হয়্যাছে বুকের পাঁজারে।
এবারকার আকাশ হতে
কালা আগুন ঝরে হে ভোলা
গাঁয়ের মানুষ উজাড় হল ইনফ্লুয়েঞ্জার জ্বরে
ভোলা, বাঁচি ক্যামুন করে্য
আইলো ম্যাঘ শাঁসিয়া—
গ্যাল ধান ফাঁসিয়া
মহাজনের চোরা বাজারে—
ভোলা তুই তাদের করলি রাজারে—
সকলি দেখ্যা তবু নাক ডাক্যা
ঘুমাও পর্য়া খায়্যা গাঁজারে !

কিংবা সোজাসুজি ভাবেও বলে থাকে :

স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা
খাত্যে দিমু মাণিকের কলা,
নইলে আইঠ্যার কলা
বিচি আলা।

বোলান গানের পর শুরু হলো আলকাপ। আলকাপ গানের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে একটু আগেই উল্লেখ করেছি। ছোট ছোট নীতি কথা মূলক গল্প, কিংবা লঘুরসের পরিবেশন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। একঘেয়ে এই সব কড়া গানের পর সকলেই একটু হাল্কা ধরনের গানের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে, লোকশিল্পীরা সে খবর জানে। তাই তারা একটি ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে আসরে এনে হাজির করে। মনে করুন ঐ মেয়েটিকে যেন বিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি

কালা স্বামীর সঙ্গে। বেচারী বৌটি তার স্বামীকে হাট থেকে একগাদা জিনিষ আনবার জন্য ফর্দ বলে দিয়েছে। কিন্তু বেচারীর কালা স্বামীটি নিয়ে এল সব উল্টাপাল্টা জিনিষ ; তখন বউটির মনের অবস্থা কি রকম হয় সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই মনের দুঃখে সে বলতে পারে কিনা :

শ্বশুর বাড়ি আস্যা হামার
জান হইলো ঝালা পালা
কি করব ভালা।
স্বামীর গুণ আর বুলব কত
সহবে কে আর হামার মত টে
দুই কানেতে বহেরা এত
শুনতে পায় কাঁচ কলা॥
বিষুদ বারের গঞ্জের হাটে
কহনু ক্যাঁথার সুতা লিতে টে
(আবার) তরল আলতা পায় দিতে
আর্শী কাঁকই কাঁটা টে
পাছা পাইড়্যা গোদাবরী
লাল না হয় ভাল শাড়ী
আর একটা ত্যাল মাখাবার বাটি
না হয়ত অ্যালম্যালামের ঘটি।
সুতার বদল লিয়া আইল্যা
পায়ে দিবার জুতা টে
(আবার) আলতা ছাড়্যা লিলে মড়া
লণ্ঠনের এক পইলতাটে।
(আবার) আর্শী ছাড়্যা বড়শী কিনলে
কাঁকই ছাড়্যা মাকই লিলে ;
না লিয়া মাথায় দিবার কাঁটা
লিলে লারিয়লের এক ঝাঁটা।
গোদাবরী শাড়ী হইলো
সজিনার দাঁড়িটে
(আবার) পাছা পাইড়্যা শুনলে মড়া
বাইছা বাইছা ক্ষিরাটে,

না লিয়া সে ত্যালের বাটি
লিলে মরা তালের পাটি,
না লিয়া অ্যালম্যালামের ঘটি
লিলে মাছ কুটার এক বঁটি,
মরার কান্ড দেখ্যা ধন্দ লাগে
হাঁড়ি ফেল্যা মারনু রাগে টৈ
বাঁ চোখেতে লাগ্যা মরা
এক চোখেতে দেখে টৈ
তাও কি মরার দিশা হইলো
রথের মেলা দেখতে গেলো
মরাকে আনতে কহনু মুলা
মরা লিয়া আইলো কুলা,
রাগেতে লাকড়ি ফেল্যা, মার্যা মরাক
ল্যাংরা কর্যা দিনু ফেলা
দ্যাখত ঠ্যালা।

স্বাধীনতা তথা বঙ্গ বিভাগের (১৯৪৭) পরই উদ্বাস্তুতে ছেয়ে ফেলল পশ্চিমবঙ্গের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। তখন সব জায়গাতেই প্রচুর পরিমাণে ভুয়া সেবা সমিতির দেখা মিলতে লাগল। মালদহের লোক-কবিদের সে দিকেও নজর পড়ল, তাই তারা মালদহ শহরেরই কোনো একটা ফাঁকিবাজ সেবা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়ল না। মনে করুন যেন কোনো কেতাদুরস্ত হালফ্যাসানের ভ্যানিটি ব্যাগধারী মেয়ে এসেছে চাঁদা চাইতে। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে সে যেন নিজের স্বরূপ নিজেই প্রকাশ করে বলে দিচ্ছে:

আইলাম দুপহরের রোদে
তাত্যা পুড়্যা
দ্যাওনা চাঁদা জলদি কর্যা।

* * *

সুবিধাবাদীর দলে
আমার মত মেয়ে-ছেলে
দল পাকায়্যা হচ্ছে দেশের সেরা।

যারা শুধু কাজ করে
দিবা রাত্র খেটে মরে
আমি তাদের বলি আস্ত ভেড়া
এ দুনিয়ায় কেবা আছে স্বার্থ ছাড়া।

আলকাপ গানের ভিতর অনেক সময় এই ধরনের লঘু রসের পরিবর্তে অন্য ধরনের গানও শোনা যায়। এই সব গান প্রায়ই দ্বৈতভাবে গীত হয়। একজন গানের মাধ্যমেই প্রশ্ন করে, অপরজন সেইভাবেই উত্তর দেয়। দুজনের গান মিলেই এক একটি গান সম্পূর্ণ হয়। অনেক সময় পরকীয়া প্রেমের কাহিনীও শোনা যায়। মনে করুন একটি বউ নদীর ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরে এলে তার অবিন্যস্ত বেশবাস দেখে তার ননদিনী প্রশ্ন করছে এবং সেও যেন তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে :

ননদ—ফুল কোথায় পেলিলো ছোট বউ
সাঁঝের বেলায়,
চুল কেন তোর এলো-মেলো
পিঠে কেন তোর ধুলো
এমন সুন্দর রূপ দেখি
চোখ দুটো কেন ফুলো
(লো ছোট বউ সাঁঝের বেলায়)
বউদি—ভাসুর হামার খাবে বলে
পাত কাটিতে গেলাম
বগা ধরে টান মারিতে
আছাড় খেয়ে পড়লাম।
জল আনিতে গেলাম হামি
সাহান বান্ধার ঘাটে
যাইতে ছিল চাঁপার ফুল
তুল্যা নিলাম হাতে
(লো ননদী সাঁঝের বেলায়)

একবার শহরে এক ডোমনী (ডোমের মেয়ে) এল পাখা বিক্রি করতে; এক বণিক সেই ডোম কন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। শেষটায় তার কাছে করল প্রেম নিবেদন। এই হলো গানের বিষয়-বস্তু :

ডোমনী—আমি শহরের ডোমিন, কে আছে সৌখীন
লও গো পাখা খান,
গরমে বাতাস করিলে,
ঠাণ্ডা হবে প্রাণ
(বাবুজি ঠাণ্ডা হবে প্রাণ)।

বণিক—দেখি আনত পাখা দেখতে কেমন বাঁকা
কোথাকার ডোমনী,
পাখা পছন্দ হলে নিতে পারি
দাম কত শুনি,

ডোমনী—আমি ডোম ছাড়্যা কোনখানে যাব না
পাখা লিবা লাও,
না হয় চল্যা যাও
ভাবের কথা আমি শুনব না
ও সব ঠাটের কথা
আমি শুনব না।

বণিক—আমি তোমায় ছাড়্যা থাকতে পারব না
ছাড় ডোমের আশা
পাখা বেচা পেশা
হেঁসে হেঁসে কথা বল ভাসাইও না।

ডোমনী—ওরে শুনরে সাধু
সুখের সুখী আমি যে কেমন,
কুটিনা ছাটিনা আমি এ জনমে ধান,
হাটের চাউল আর ঘাটের পানি
উঠায় খায় আর পান।
মাথায় দিয়ে গোলাপী তৈল
নিত্য করি স্নান।
ডোম রাজা মনের সুখে
বাঁশীতে গায় গান।
ক্যামন কর্যা আমি তোমায়
যৈবন করি দান।
(রে সাধু যৈবন করি দান)।

ডোমের কত্তগুণ, আমার কাছে শুন,
কারও ধার ধারে না
মহাজনের দেনা,
জমিদারে দেইনা খাজনা।
বণিক—ওরে তোর চেয়ে আমি বড়
ভেবে দেখ মনে,
হাজার টাকা দিয়া
মাল কিনি থুই লানে,
জুতাপরি বাবুগিরি করি দোকানে
গাড়ী ভাড়া কর‍্যা মাল ফেলি দোকানে,
সাহান হামাম বিক্রি করি বস্যা দোকানে।
ছাড় ডোমের আশা পাখা বেচা পেশা
হেসে কথা বল ভাসাইও না ডোমাইন,
তবে আয় সুন্দরী তাড়াতাড়ি কোর না দেরী
হাতে পরতে চুড়ি দিব ষাইট টাকার শাড়ী
নাকে সোনার লোলক দিব লেপে এক ভরি,
তুই যে হামার ছোড়ান চাবি,
তুই যে আমার টাকার আলমারী।

গম্ভীরার পালাগানগুলির অধিকাংশই রাজনীতি অথবা সমাজনীতি ঘেঁষা, লোক-কবিরা প্রতি বছরই নতুন নতুন পালাগান বাঁধে, এর মধ্যে একজন সাজে শিব, বাদ বাকী সব নানা সাজে সজ্জিত। কেউ বা হয় গান্ধীজি, কেউ বা নেতাজী, জহরলাল, চার্চিল বা জিন্না। কখনও বা নতুন কোনো ঘটনার প্রয়োজনীয় পাত্র পাত্রী। আগেই বলেছি এদের সমস্ত বক্তব্যই প্রকাশ করে শিবকে উপলক্ষ্য করে, পালা গানেও তার ব্যতিক্রম নেই। চারণ কবি মুকুন্দ-দাসের স্বদেশী যাত্রার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন তাঁরা অনায়াসে গম্ভীরার এই ধরনের পালা গানের কল্পনা করে নিতে পারবেন। এই গম্ভীরা গায়ক দল শিবকে আসরে নিয়ে এসে তার কাছে সমালোচনা করতে থাকে "সরকারী পরিকল্পনা", "হিন্দু কোড বিল", "অস্পৃশ্যতা", "ভূদান যজ্ঞ", ইত্যাদি।

অনেক সময় গ্রাম্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও এই ধরনের ছোট-খাট পালা বানিয়ে নিয়ে তারা গীত ও অভিনয়ও করে থাকে। মালদহের কোনো কোনো অঞ্চলে এমন ব্যবস্থা প্রচলন ছিল (হয়তো বা এখনও আছে), কোনো গ্রামে

যখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিত, তখন গাঁয়ের নিরক্ষর লোকেরা ছুটত শীতলা ঠাকুরের কাছে। তিনি স্বপ্নাদেশ পেতেন (সবই তৈরী এবং মনগড়া) 'অমুক' বসন্ত রোগীর উপর মায়ের ভর হয়েছে, সুতরাং সব লোক ছুটল সেই বসন্ত রোগীর বাড়ি। ঠাকুর মশাইও চললেন তাদের সংগে সংগে। সেই রোগীকে তখন শুরু করা গেল দেবতার মতো করে পূজা করতে। শুধু তাই নয় সেই বসন্ত রোগীর যখন বসন্তের গুটি শুকিয়ে মামড়ী ঝরবার সময় হয় তখন একদিন ঘটা করে তার পূজা করা হয়। তিনি (রোগী) কিছু খেয়ে তার উচ্ছিষ্ট দর্শনার্থীদের মাঝে বিলিয়ে দেন। ভক্তগণ মহা শ্রদ্ধা সহকারে সেই প্রসাদ উদরস্থ করেন এবং সংগে করে বাড়ি বয়ে নিয়ে এসে বসন্ত রুগীকে খাইয়ে দেন।

এটা যে কত বড় অশাস্ত্রীয় এবং অসামাজিক ব্যাপার তা বোধ হয় আর বলবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ যে-সময় বসন্ত রোগীর কাছ থেকে মারাত্মক সংক্রমণ (মামড়ী ঝরবার সময়) আশংকা করা হচ্ছে, সেই সময়ই সেধে রোগ বীজাণুকে বয়ে নিয়ে আনা হচ্ছে। মালদহের লোক-কবিরা গাঁয়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন শীতলা ঠাকুরদের নোংরামির বিরুদ্ধেও এই ধরনের ছোট-খাট পালা রচনা করেছে:

শীতলা দেবীর দয়ায় আধমরা হলাম সবাই
তাও কি মোদের ঘুম ভাংগে না
দেবীর নামে দিস দোহাই।
যত দেশের চাষা ভন্ড
(করে) সর্বনাশের কান্ড
তারা দেবীর নামে পয়সা চায়।
(আবার) ইট পাথরে সিন্দুর লেপ্যা
বাড়ি বাড়ি লোক ঠকায়।
কারো মায়ের দয়া হলে
তার পূজা দেয় সকলে
তারা এমনি কর‍্যা রোগ ছড়ায়।
আবার রোগী হয় বসন্ত দেবী,
তার হাতে সব প্রসাদ খায়।

মালদহে কোচপলিয়া নামে একটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের বাস আছে। চলতি কথায় তাদের বলে বাঙাল। তাদের কাপড় চোপড় সবই প্রায় আদিম

সমাজেরই মতো। কিন্তু গম্ভীরা গান এদের ভিতরও প্রসার লাভ করেছে। এখানে জলপাইগুড়ির গম্ভীরার মতো শিবের উপস্থিতিটা সব সময় খুব প্রয়োজনীয় নয়। গানটাই প্রধান। পূর্বোল্লিখিত গানগুলি সবই শিবের সামনে গাওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোচপলিয়া সমাজে গম্ভীরা (শিব) ঠাকুরের পূজাপদ্ধতি পূর্বোল্লিখিত মতো হলেও যখন তারা গান গায় তখন সে গান যে শিবের সুমুখেই গাইতে হবে এমন কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম সে সমাজে নেই। তারা তাদের গান সোজাসুজিই বলে থাকে। এদের একটি গানে জানা যায়, এই শ্রেণীর মেয়েরা এক সময় ধোকরা ও মেকলী (ধোকরা=বক্ষ-বন্ধনী, মেকলী=ঘাঘরা) নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। মোটা ভাত, মোটা কাপড় পরতেই তারা ছিল অভ্যস্থ। এখন সেই ঘরের বউরাও আর ওসবে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না, তারাও আজ শহরের মেয়েদের মতো ভালো শাড়ী, রং বেরং-এর চুড়ি, সুন্দর ব্লাউজ পরতে চাইছে। এখন আর তারা চিড়া কোটা, মুড়ি ভাজার কাজ করতে চায় না। একটি বৌ তার স্বামীকে বলছে তাকে এখন থেকে আর 'বৌ' বলতে পারবে না, শহরের মেয়েদের মতো তাকেও 'ওগো' বলে সম্বোধন করতে হবে :

মোকে আনি দেবো গুল-বাহার
ধোকরা মেকলী গরমুনা মুই আর।
(মুই) অংবি অংযের চুড়ি হাতত
দিয়া বোমার নু বাহার
বিবিয়ানা পেইকি গায় দিযা
সাধ হয়্যাছে সাজিব মুই
শহর্যা মায়্যা।
কুটমুনা মুই মিহিচিড়া
দিমুনা ঢেকিৎ পাহাড়
ভদ্দর নোগে বোগে কহেন গো
মোকে আর তা নি কহ
বেন কুঠি যাহেন বো।
ঘরে বস্যা থাকমুনা মুই
বেড়াৎ যামু তিন পাহাড়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি গম্ভীরার ভিতর বহু সুরের মিলন ঘটেছে, এবং এটটেই হলো গম্ভীরা গানের বৈশিষ্ট্য। তাই আধ্যাত্মিক গম্ভীরারও সন্ধান মেলে। আষাঢ়ের আগমনে ধরণী সিক্ত হয়, গম্ভীরা উৎসবের পরিসমাপ্তি

ঘটে সে বছরের মতো। কিন্তু বাতাসের বুকে ভর করে আধ্যাত্মিক গম্ভীরা গানের দু চার কলি, কখনও বা পুরো গানটিই ধ্বনিত হতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে :

নানা দিসনা আইড়্যাক ছাড়্যা হে
(নানা দিসনা আইড়্যাক ছাড়্যা)
কাম নামের তোর দুষ্টু আড়্যা
ঢোকে ব্যারা ফার‍্যা ফার‍্যা হে
এমন মানব জমিনটা দিল
পয়মাল কর‍্যা
(হে নানা দিসনা আইড়্যাক ছাড়্যা)।
ঠাকুর বাবার দেওয়া
চৌদ্দ পোয়া ভূমি
তাতে রসালের বীজ
বুন্যা ছিলাম আমি।
(ও তার) অংকুর হতে না হতে ঢুক্যা মদ্দি ক্ষ্যাতেতে
(ও দ্যাখ) মূল ডগাটা লিছে ছিড়্যা হে
নানা দিস্‌না আইড়্যাক ছাড়্যা।
(আমার) ধর্মের ব্যাটা খুটা শক্ত ছিল
অতি বৃষ্টি পাপে তা নরম হল
(নানা হে—)
(এক) মনাই মালী আছে (জল) বিন্দু নাহি ছাচে
দিন রাত মোহ ঘুমে থাকে পড়্যা হে
নানা দিস্‌না আইড়্যাক ছাড়্যা।

গমীরা

এক কথায় মালদহের গম্ভীরা, জলপাইগুড়ির গমীরা, পশ্চিমবঙ্গের গাজন, আর পূর্ববঙ্গের নীল সবই চৈত্র উৎসবের আঞ্চলিক নামমাত্র। গম্ভীরা আর গমীরার পূজাপদ্ধতি এক হলেও আরম্ভের একটু ব্যতিক্রম আছে। গম্ভীরা শুরু হয় চৈত্র সংক্রান্তির দিন এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এর জের চলে। কিন্তু জলপাইগুড়ির গমীরা চৈত্র সংক্রান্তির মাত্র চার পাঁচ দিন আগে শুরু হয় এবং

সংক্রান্তির দিনই এর শেষ। তাই জলপাইগ্ুড়ির পল্লী অঞ্চলে দেখা যায় চৈত্র সংক্রান্তির চার পাঁচ দিন আগে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষতঃ চাষীবাসী মানুষেরা মাঠে এসে উপস্থিত হয়। তাদের সঙ্গে আসে শিব মূর্তি, পুরোহিত, ঢাকি, ঢুলি, কাঁসি ইত্যাদি। এই শিব মূর্তি তারা স্থাপন করে কোনো এক শুভ দিন দেখে এবং এই উৎসব ও অনুষ্ঠানকেই এ অঞ্চলে বলে গমীরা উৎসব ও গমীরা ঠাকুর।

গমীরা শব্দ যে গম্ভীরা শব্দেরই অপভ্রংশ একথা আগেই উল্লেখ করেছি। অনেকে বলেন যেহেতু জলপাইগুড়ির পল্লীবাসীরা যুক্তাক্ষর বড় একটা উচ্চারণ করে না তাই গম্ভীরা শব্দই গমীরা নামে প্রচলিত। কারও কারও মতে, গমীরা গম্ভীরার চাইতেও পুরাতন। এ-সব অবশ্য গবেষণার বিষয়। আপাততঃ আমাদের উৎসবের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক।

গমীরা মূর্তি (শিব) প্রতিষ্ঠার পর একদল লোক থাকে যারা প্রতি বছরই এই উৎসবকে অবলম্বন করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নৃত্য সহযোগে গান-বাজনা করে থাকে। এই গানকেই এ অঞ্চলে বলে গমীরা গান।

এই শিব মূর্তি প্রতিষ্ঠার সময় এই গায়কদলও উপস্থিত থাকে, পুরোহিত ঠাকুর তো পুজো শেষ করে ঘট থেকে জল ছিটিয়ে দেন এই সব গায়কদের মাথায়। তারাও দেবমূর্তি ও পুরোহিতকে প্রণাম করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গাইবার জন্য বের হয়ে পড়ে, সঙ্গে বাজনদাররাও থাকে।

এই গান শিব প্রতিষ্ঠার পর যে-দিন থেকে খুসী গাইতে পারে। তাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু চৈত্র সংক্রান্তির দিনই এই সম্পর্কিত গানের শেষ। এরপর আর নতুন বছর না আসা পর্যন্ত কেউ এ গান গাইতে পারবে না। তাতে নাকি গমীরা ঠাকুর দোষ ধরেন—এই রকমই চলিত প্রবাদ।

মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর সংক্রান্তি পর্যন্ত যারা ঘুরে ঘুরে এ গান গেয়ে থাকে তাদের এই সময় স্নান অথবা পোষাক বদলান নিষেধ। মাছ, মাংস, পিঁয়াজ ও রসুন সকল রকম আমিষ ও উত্তেজক বস্তু খাওয়া বন্ধ। শুধু মাত্র দুধ, কলা ও গাঁজা, সিদ্ধি খাওয়ার বিধান আছে। এই গায়ক দলের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নীল সন্ন্যাসী, পশ্চিমবঙ্গের গাজন সন্ন্যাসীদের মিল খুঁজে পাবেন একথা বলাই বাহুল্য।

গমীরা গানে শুধু যে শিব বিষয়ক গানই হয় তা নয়। এ সম্পর্কে কোনো বাঁধা-ধরা নিয়মও কিছু নেই। এক কথায় সব রকম গানই চলে। তবে এই সব গানের মধ্যে আদিরসের আধিক্য বড় বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

মনে করা যাক একটি অবিবাহিতা যুবতী যেন আক্ষেপ করে বলছে তার দিদিমাকে, 'দিদিমা আমার সাধ-আহ্লাদের দিন চলে যাচ্ছে। আমার জন্য দই চিড়ে রেখোনা (দই ও চিড়ে এ অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধ খাদ্য)। আমাকে চালের গুড়ো (কারণ, বুড়ো বুড়িরা চিড়ের মত শক্ত জিনিষ খেতে পারে না, তাই তারা চালের গুড়ো খায়) দিয়ো; আমি তাই খাওয়া আরম্ভ করব, কারণ আমার সাধ-আহ্লাদের দিন আর থাকছে না। আর তা ছাড়া দিদিমা, এই বাসায় (বাড়ি) বয়স্ক অবিবাহিত এক যুবক রয়েছে, সে ঠিক একদিন আমায় নিয়ে পালিয়ে যাবে। কারণ, সে যখনই আমাকে দেখছে, তখনই শুধু হাসছে':

ও মোর আবোগে,
হাউসের দিন মোর যাছে গো বয়া।
না খাও আবো দহি চুড়া
করেক আবো চাউলের গুড়া।
আবো বাড়িতে চেংগেরা আছে
যে লায় দেখে সে লায় হাসে
কুন দিন বা মোক ধরিয়া যাবে॥

কখনও বা শোনা যায় টাকার লোভে পড়ে কোনো একটি অল্পবয়সী মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এক বৃদ্ধের সঙ্গে (জলপাইগুড়ির অধিকাংশ অঞ্চলে বিয়ের সময় মেয়েরাই পণ পেয়ে থাকে)। নব বিবাহিত বালিকা বধূটি তাই আক্ষেপের সঙ্গে বলতে শুরু করেছে তার মার কাছে, 'মা, তুমি যে-টাকা পণ নিয়ে আমাকে বিয়ে দিলে, ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে এখন ঝাঁটার বারি মারি। তুমি পৃথিবীতে কি এই বুড়ো ছাড়া আর লোক পেলে না যাকে জামাই করতে পারতে? মাগো, তুমি শেষটায় আমায় কিনা একটা বুড়োর সাথে বিয়ে দিলে। তুমি কি আমায় এমনই বুড়ি মনে করেছ নাকি? যেখানে বিয়ে দিয়েছ, সেখানে আমাকে কনে বউ বা নতুন বউ বলে ডাকবার কেউ নেই। সবাই আমায় ডাকে জ্যেঠি মা, খুড়ি মা বলে। তুমিই বল মাগো, আমাকে কি খুব বৃদ্ধা বলে মনে করেছ? আমাকে সব সময়ই বৃদ্ধাদের মত পান সুপারী ছেঁচতে হচ্ছে, কারণ, ওই বুড়ো মিনসে সব সময়ই সেই ছেঁচা পান মুখে দিয়ে চিবুতে থাকে। এই করতেই তো আমার সারাটা জীবন চলে যাবে, তাই বলছি মাগো, তোমার আক্কেলের কপালেও ঝাঁটা মারি':

তোর টাকা খাইয়া তোর মুখত বাধিনি ডাংগাও
তোর গে আই॥

এমন বেসালেন জায়োই
আর মুলকত বরগে পালেন নাই ॥
ও আই টাকার লোভে বুড়াক দিলেন
আর মুলুকত বর নাই পালেন
মোক কি সবাই সে গে বুড়ি আই ॥
সগায় কছে জেঠাই খুড়াই
কাহো কছে বুড়ি আই, বুড়ি আই
নদারি কবার গে মানষি নাই ॥
ও আই সাজি বুড়ি গুয়া পান
বুড়া বরের ফেদেলান
গুয়া ডুমাইতে যাবে জান ॥

এ গানের উল্টোটিও শোনা যায়। বাপ মা টাকার লোভে পড়ে কোনো একটি বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে একটি অল্প বয়সী ছেলের সাথে। এই নব-বিবাহিতা মেয়েটি তাই আক্ষেপের সংগে বলছে, 'আমার মন দুঃখে ভেংগে পড়ছে, চোখের সামনে আমার সবই খাঁ-খাঁ করছে। আমার বাবা ও মা শেষটায় কিনা আমার বিয়ে দিল এক নাবালকের সংগে'!! রাগে মেয়েটি বলতে শুরু করে, 'আমার বাবা, মা ও পাড়ার লোক সব মরুক। আর যে-ঘটক এই বিয়ে দিয়েছে তাকে জংগলে বাঘে ধরে খাউক। আমার বাবা মাকে খবর দেও, তারা যেন একটা গরু কিনে পাঠিয়ে দেয়। সেই গরুর দুধ খেয়ে তাদের নাবালক জামাই যেন তাড়াতাড়ি যুবক হয়ে উঠতে পারে':

ও মন মোর কান্দেরে দেখিয়া পাথারে ॥
বাপ মায়ে মোক বেচেয়া খালেক
না-বালক ভাতারে ॥
বাপ মরুক মাও মরুক রে
মরুক পাড়ার লোক,
কাড়োয়া মরাক বাঘে খাউক,
নিধুয়া পাথারে ॥
বাপ মাওক জানাও খবর রে
কিনিয়া পেঠাউক গাই
তাহার দুগ্ধ খায়া মানুষ হউক
না-বালক জামাই ॥

মনে করুন একটি যুবকের স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। কাজেই তার হাব ভাবে সব সময়ই একটা উদাস উদাস ভাব। বৌদি এসে ডাকছে, 'খেতে এসো ঠাকুর পো'। যুবকটি উত্তর দিচ্ছে, 'বৌদি, তোমায় কি আর বলব বল, কে আর আমায় আদর করে ডেকে খাওয়াবে, বৌটা মরে গিয়ে আমায় প্রায় পাগল করে রেখে গেছে। যখনই তার মুখখানি মনে করছি তখন আর কিছুতেই মন বাধা মানছে না' :

ও ভদি কি বা কহিম তোকে থাকিয়া
কে বা খায়ায়া দিবে আসিয়া।
ও লো ভদি শুন আসি
শুন গে মোর কাথা আজি
নদারিটা মরিয়া কর‍্যাছে বাউরা
কিবা থাকিবক মুই চায়্যা
মনত আর বান্ধন মানে না।

এক সময় ছিল যখন এই গমীরার প্রায় সব গানই ছিল শিব বিষয়ক। কিন্তু কালক্রমে এর ভিতর প্রেম-বিরহ সংগীতও স্থান পেতে পেতে শিব বিষয়ক গান প্রায় গৌনই হয়ে পড়ে। সভ্যতা ও শিক্ষার প্রসারের ফলে স্থানীয় নিরক্ষর পল্লী-বাসীরাও সভ্যতার আলোর সংস্পর্শে এসে পড়ে। তাই আধুনিক গমীরা গানেও মালদহের গম্ভীরা গানের মতো বাৎসরিক বিবরণী গানে শুনতে পাওয়া যায় তাদের সুখ দুঃখের, অভাব অভিযোগের খবর। তারাও আজ স্পষ্ট এবং নির্ভিক কণ্ঠেই নিবেদন করে তাদের মনের কথা, তাদের বক্তব্য জনসাধারণের দরবারে। পার্থক্য শুধু এখানে গম্ভীরার মতো শিবকে উপলক্ষ হিসেবে দাঁড় না করিয়ে সোজাসুজিই তাদের বক্তব্য বলে যায়। তাই অত্যাধুনিক গমীরা গায়কের কণ্ঠে শোনা যায় ভণ্ড দেশ নেতাদের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী :

হামার কাথা শুনহে তমরা
চাষী মানষী ল্যাখাপড়া নাই শিখি
অমরা হল্যা শহর কলকাত্তা বাসী
অঁ হঁ ... ...

* * *

আমরা হলাম চাষী মানসী
যেই বুলাইছ সেই বুলাছি
অইস্যাছে ভোটের পালা
খায়ায়া দিমু কাচা কলা।

গাজন

চৈত্র মাস পড়তে না পড়তেই কলিকাতা এবং শহরতলীর উপকণ্ঠে শোনা যায় গাজন সন্ন্যাসীদের কণ্ঠস্বর, 'বাবা তারকনাথের চরণের সেবা লাগে।'

প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই শুরু হয় গাজন সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস ব্রত একেবারে সংক্রান্তি পর্যন্ত। এই সময় মধ্যে এই সন্ন্যাসী বা শিবভক্তদের মাথায় বা গায়ে তেল দেওয়া নিষেধ; গৈরিক বসন পরতে হয়, সংগে থাকে উত্তরীয়, তার রঙও ঐ রংয়েরই। তা ছাড়া গলায় থাকে এক গোছা মোটা সুতো অনেকটা পৈতার মতো। আর হাতে থাকে তামার বালা। সারা মাসভর তারা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, বাবা তারকনাথের বা শিবনাথের নামে। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলই এই গাজনের আওতায় পড়ে। অবশ্য শিবের গাজন বলতে বাংলার সর্বত্রই এর প্রচলন আছে, তম্মধ্যে পশ্চিমবংগেই এর সমধিক উৎকর্ষতা লাভ করেছে। সংক্রান্তির কয়দিন আগে এরা সংযম অবলম্বন করে, ফলমূল ও হবিষ্যান্ন খায়। সংক্রান্তির দিন একেবারে নির্জলা উপবাস থেকে গাজনতলায় গিয়ে পূজা দিয়ে তাদের সে বছরের মতো অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে।

যেহেতু মালদহের গম্ভীরা, জলপাইগুড়ির গমীরা, পূর্ববংগের নীল ও পশ্চিমবংগের গাজন একই জিনিসের বিভিন্ন নাম, সেইহেতু এর পূজাপদ্ধতি ও অনুষ্ঠান সবই প্রায় একই রকমের; এ জন্য আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে পূর্বোক্ত উৎসবের সংগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববংগের নীল পূজার নীল সন্ন্যাসীর সংগে থাকে নীলের পাট, চলতি কথায় বলে পাট গোসাঁই, পাট অর্থে সিংহাসন। অর্থাৎ মহাদেবের বসবার আসন। পশ্চিমবংগের গাজন সন্ন্যাসীদের সংগে থাকে ত্রিশূল অথবা চিমটে, আর সেই সংগে থাকে এক গোছা বেত। বেত অবশ্য নীল সন্ন্যাসীদের সংগেও থাকে। কিন্তু গম্ভীরা বা গমীরা গায়ক-দলের সংগে এসব কিছুই থাকে না। নীল ও গাজন গানের বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ শিব-দুর্গা বা হর-পার্বতী সংক্রান্ত। কিন্তু গম্ভীরা বা গমীরায় তা নয়। বিশেষ করে গমীরা তো নয়ই। তাই মালদহের গম্ভীরার শিবকে যেমনি গণ-দেবতা আখ্যা দেওয়া চলে, নীল বা গাজনের মহাদেবকে তেমনি বলা চলে না। এর ভিতর জন-জীবনের সুখ-দুঃখের কথা থাকে খুবই কম। আধুনিক কালে অবশ্য নীল এবং গাজনের ছড়া গানের ভিতরও কিছু কিছু আধুনিক সমস্যার বিষয় আলোচনা চলছে, তবে তাও হর-পার্বতীর কাহিনীর মাধ্যমেই।

এদিক থেকে বিচার করলে গম্ভীরার স্থান অনেক উচে। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জায়গায় ধর্মঠাকুরের পূজা ও গাজন হয়ে থাকে। ধর্মঠাকুরের গাজন ও শিবের গাজন অভিন্ন। যদিও ধর্মঠাকুরের গাজনের উৎপত্তি সূর্য পূজা থেকে, তা হলেও ঐ একই দিনে দুটি অনুষ্ঠানই সংঘটিত হওয়ায় বর্তমানে ধর্মঠাকুরের গাজন আর শিবের গাজন একরূপেই পরিচিত হয়ে আসছে।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় গাজনের ছড়া ও গানে নীলের গানের মতোই কোনো পালা গান নেই; খন্ড খন্ড বিভিন্ন গান বিভিন্ন অঞ্চলে শুনতে পাওয়া যায়। এই সব গান একত্রিত ভাবে মিছিল করে সাজালে একটা পুরো ঘটনার সম্মুখীন হওয়া চলে।

মনে করা যাক মহাদেব যোগ নিদ্রায় আসীন, ভক্তগণ তাঁর কাছে যোগ নিদ্রা ভঙ্গের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন :

প্রভু, যোগ নিদ্রা কর ভঙ্গ সেবকের দেখ রঙ্গ
পরিহার তোমার চরণে।
কার্ত্তিক গণেশ কোলে শয়নে আছে নিদ্রা ভোলে
আমরা তোমায় প্রণাম করিব কেমনে ॥
নিদ্রা ত্যজ দেবরাজ বসহ খট্টার মাঝ
নিরন্তর গৌরী রাখ বাম ভাগে।
প্রভু, তুমি দেব অধিপতি হরি ব্রহ্মা করে স্তুতি
অন্য দেব কোন খানে লাগে ॥

উপরোক্ত গীতটি ধর্মের গাজন এবং শিবের গাজন উভয় ক্ষেত্রেই গাইতে শোনা যায়। মুর্শিদাবাদের পল্লীঅঞ্চলে শিবের গাজন উপলক্ষে যে-সব গীত প্রচলিত আছে তার মধ্যে অনেক সময় নিরক্ষর দরিদ্র পল্লীবাসীদের মনের বাসনাও শোনা যায়। এক গায়ক শিবের বিয়ের বর্ণনাচ্ছলে বলছে, 'শিবের বিয়ে হতে চলেছে, তার শ্বশুর তো রাজা লোক, সেখানে খাবার-দাবারের প্রচুর আয়োজন, সুতরাং সেখানে যদি পৌঁছান যায় তাহলে বেশ মোটা রকমের ফলারটাই হবে। কিন্তু সে যে দেবতাদের ব্যাপার, তাছাড়া ওটা রাজবাড়ি, কাজেই ওখানে ঢোকা যাবে কি করে?' লোক-কবি নিজেই তার সমস্যার সমাধান করেছে :

ভূতের পেছু ধরি
যাব আমি কৈলাস পুরী।

পান্তুয়া রসগোল্লা
রয়েছে গামলার গামলা
যত চাবি ততই খাবি
চলনা ক্যানে।

চব্বিশ পরগণার টাকী প্রভৃতি অঞ্চলে শিবের গাজন উপলক্ষে একটি গীতে দেখা যায় মহাদেব বিবাহ করতে চলেছেন একেবারে নতুন বরের বেশে। সেখানে দেখা যাচ্ছে মহাদেব ইতিপূর্বেই গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেছেন। লোক-কবিরা তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন সতীনে সতীনে বিবাদ যখন অবশ্যম্ভাবী তখন দু'জনাকে দু'জায়গায় রাখাই সমীচীন এবং এজন্য কার কোথায় স্থান তাতো তারা নির্দেশ দিয়েছেন :

ভাঙ্গর ভোলা শিব তোমার
একি মোহন বেশ
মাথাতে পরেছ মুকুট
নেইকো জটার লেশ।
বাঘছাল কোথায় গেল
কোথায় গেল হাড়ের মালা।
মাথার সাপ কি বনে গেল
হইয়ে ঝালা পালা।
রাজার মেয়ে করলে বিয়ে
হলে রাজার জামাই,
ঘরে আছে গঙ্গামাই
তুলনা তার নাই।
কিন্তু বাবা বলি তোমা
করি প্রণিপাত,
এই দুই সতীনে বিবাদ হলে
না হয় বিসম্বাদ।
শুন বলি ওগো ঠাকুর
পেন্নাম ছিচরণে
গঙ্গামাই মাথায় রেখো
গৌরী গো হৃদয়ে।

বাংলার কোচ-সম্প্রদায়ের ভিতর যে-গাজন উৎসব হয় তার ভিতর অনেক সময় শিবের গার্হস্থ্য জীবনের খবরা-খবরও শুনতে পাওয়া যায় :

শিব বলে, শুন ভাইগ্না নারদ তপোধন,
তোমার মামীরে আনো দেখিব নাচন।
এ্যাকেতো কুতুলে নারদ
আরো আজ্ঞা পাইলো,
কোন্দলের ঝুলিখানি
কান্দে তুল্যা নিল।
এমত শুনিয়া নারদ গমন করিল
চণ্ডিকার কাছে গিয়া দরশন দিল।
নারদ বলে, শুন মামী হেমন্ত নন্দিনী,
বাড়ির আগে আনছে মামা
কোথাকার রমণী।
চণ্ডী বলে ভাঙ্গুরা শিব তোর লজ্জা নাই।
তোরে যে দেবতা বলে তার মুখে ছাই।
শিব বলে শুন চণ্ডী গোঁসা ক্যান কর
নিজের মনে নিজে তুমি বিচারিয়া দেখ।
নলের ছোবায় কভু নাহি জন্মে বাঁশ,
স্ত্রী হইয়্যা সতন্তর লোকে করে উপহাস।

কিংবা : ধান লাড় ধান লাড় গৌরী
আউলাইয়্যা মাথার ক্যাশ
জল চাইলে না দ্যাও জল
এই বা কোন দ্যাশ।
নেও ঝাড়ি, নেও পানি, দ্যাশ ক্যান নিন্দ
এ ভব আলিয়ায় মাঝে ঠমক ক্যান মার।

অথবা : ভাঙ খাও ধতুরা খাও বুইড়া শিব গো
ভাঙের মর্ম জান,
গাং পাইড়্যা যত ভাঙ বুড় বাইন্ধ্যা আন।
বুড় বাইন্ধ্যা আইন্যা ভাঙ
তুইল্যা থুইলো চালে,

বৈকালে নামাইয়া ভাঙ

ঢেঁকি দিয়া কুটে।

বারোখানা ঢেঁকি শিবের

তেরখানা কুলা,

রেতে দিনে কুইট্যা মরে

জউট্যা ভাঙের গুড়া।

গাজনের সঙ্গে তারকেশ্বরের একটা মস্ত বড় সম্পর্ক রয়েছে; পশ্চিমবঙ্গের গাজন সন্ন্যাসীদের তাই বলতে শোনা যায়:

"বাবা তারকনাথের চরনের সেবা লাগে

মহাদেব—"।

মনে হয় গাজন উপলক্ষে তারকেশ্বরেই বোধহয় সব চাইতে বড় মেলা ও উৎসব হয়ে থাকে। বহু ধর্ম-প্রাণ নরনারী এই সময় আসে তাদের মানসিক শোধ দিতে। দণ্ডী খাটে, এই সময় গাজন সন্ন্যাসী ছাড়াও তারকেশ্বরের ভিখারী ও বৈরাগীরাও যাত্রীসাধারণের কাছে যে-তারকেশ্বরের পাঁচালী শুনিয়ে থাকে, তার ভিতরই তারকেশ্বরের উৎপত্তির কথা বেশ সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তারা 'খঞ্জনী' বা 'একতারা' সহযোগে অগণিত নরনারীর সমক্ষে গাইতে থাকে—

শুন শুন ভক্তগণ হয়ে এক মন।

অপূর্ব বাবার কথা করহ শ্রবণ ॥

বন্দিব জলার মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।

চারিদিকে উলু খাগড়া বেনার বসতি ॥

কৃষক কাটয়ে ধান্য, রাখালে কুড়ায়।

আনন্দে শম্ভুর শিরে ধান্য ভেনে খায় ॥

এইরূপে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর।

মহাগর্ত হৈল হরের মস্তক উপর ॥

মাথার ব্যাথায় শম্ভু হইয়ে কাতর।

কহিলেন মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর ॥

তারকনাথ শিব আমি কাননে বসতি।

অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপত্তি ॥

তারকেশ্বরে শিবরূপে কানন নিবাসী।

মোর পূজা কর ভক্ত হইয়া সন্ন্যাসী ॥

কপিলা দিতেছে দুগ্ধ এক চিত্ত হয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে ॥

কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দেখে অপূর্ব পাথর ॥

কেহ খোঁড়ে হস্তে, কেহ খোঁড়ে দিয়া বাড়ি।
পাথর দেখিয়া বলে হৈল ছেয়া গাড়ী ॥

জটাধারী-ত্রিপুরারী দেখিয়া নিজ রড়ে।
রাজা বলে রাখি রামনগরের গড়ে ॥

শত কোড়া নিয়োজিল কাটিবারে মাটি।
যত খোঁড়ে শম্ভু বাড়েন যেন পুষ্কর্ণীর জাটি ॥

খুঁড়িতে খুঁড়িতে শম্ভুর অন্ত নাই পায়।
যত খোঁড়ে শম্ভু তত পাতাল দিকে ধায় ॥

ভক্ত দুঃখ পায়, শম্ভু জানিয়ে অন্তরে।
বসিলেন নিশি শেষে রাজার শিয়রে ॥

সন্ন্যাসী হইয়া মূর্তি কহেন তখন।
শুন রাজা ভারামল্ল আমার বচন ॥

অকারণে দুঃখ পেয়ে মোরে কেন খোঁড়।
গয়া গঙ্গা বারানসী আদি মোড় জাড় ॥

শুনিয়া নৃপতি হইল আনন্দে অস্থির।
জঙ্গল কাটায়ে দিল এক অপূর্ব মন্দির ॥

আম, জাম, রুহিলেন, গোয়া নারিকেল।
ডান ভাগে সরোবর সিদ্ধিমাখা জল ॥

পাথরে বান্ধিয়া দিলেন মরীচির গড়া।
জলেতে কুম্ভীর ভাসে, ডাকে কড়া কড়া ॥

নীল দিনে সরোবরে, গঙ্গার জোয়ার।
পাতকী তরিতে ভবে হইল অবতার ॥

মধ্যিখানে তারকনাথ চারিদিকে জলা।
ভক্তগণ দিবে পূজা, কালা ফুলের মালা ॥

বালি গড়ি পশ্চিমেতে বিরাজে বিশ্রাম;
পাতকী তরাতে প্রভু তারকেশ্বর নাম ॥

মনে হয় মৃত্যুঞ্জয়, একচল্লিশ সালে।
বৃষধ্বজে পূজিলেন, শ্রীফলের মূলে ॥

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে অপরাপর গাজন তলার মতো এখানে চড়ক গাছ ঘোরান প্রভৃতি ব্যাপার নেই। তবে ফুল-ঝাঁপ, বঁটি-ঝাঁপ, কাঁটা-ঝাঁপ, শেষে দুধ-পুকুরে-ঝাঁপ প্রভৃতির প্রচলন আছে। সংক্রান্তির আগের দিন লীলাবতীর সঙ্গে শিবের 'বিবাহ উৎসব' প্রভৃতি প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে অনেক কাহিনীও শোনা যায়। সে অন্য প্রসঙ্গ।

মুর্শিদাবাদের গাজনের ছড়ায় অনেক সময় শিববিষয়ক গান ছাড়া সাধারণ ঘর-গৃহস্থালীর কথাও থাকে। তবে এসব নেহাৎ গৌণ ব্যাপার। প্রসঙ্গতঃ মুর্শিদাবাদের গাজন উপলক্ষে যে-সব গান হয় তার ভিতর শিব-বিষয়ক গান ছাড়াও যে-সব গান হয় তার একটি নমুনা শুনুন :

মনে করুন কোনো একটি বউ শুশ্‌নী শাক তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছে, কাছেই তার ভাসুর ক্ষেতে কাজ করছিল, কিন্তু সে তাকে ধরে তুলল না দেখে বউটির মনে আক্ষেপের অন্ত নেই :

শুশ্‌নী শাক তুলতে গেনু
পা পিছলে পড়ে গেনু
দেখলে ভাসুর তুলালে নাকো
তোর ভেয়ের ঘর করনু নাকো
পিছ্যাক দোম্‌, পিছ্যাক দোম্‌
ক্যাঁথা পেতে দে মারি ঘুম।

নীল, গাজন, গম্ভীরা মূলতঃ একই জিনিষ হলেও নীলের গানের উৎসবের সঙ্গে অপর তিনটি উৎসবের একটা মোটা পার্থক্য রয়েছে। সেটা হলো, নীলের গানের শেষে অনেক জায়গায়ই শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার স্তোত্র আবৃত্তি করে শোনান হয়। কিন্তু গম্ভীরা, গমীরা বা গাজনে এরূপ কোনো ব্যাপার নেই। এগুলি সম্পূর্ণভাবেই শৈবানুষ্ঠান; এর মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাব-ধারা অনুপ্রবেশের কোনোই রাস্তা পায়নি। নীলপূজা ও অনুষ্ঠানও শৈবানুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও

এখানে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের মূল কারণ সম্ভবত পূর্ববঙ্গে ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ও প্রসার। কিন্তু এ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের গাজনে গুরুবাদী বাউলের মতো 'গুরুবন্দনা' ও গাইতে শোনা যায়। বাউলদের মতো এদেরও বক্তব্য হলো গুরুই সংসারের সার; তিনিই ভব-নদী পার করে দেবেন, সুতরাং দেবাদিদেব মহাদেবেরই পূজা কর, কিংবা অন্য যাঁরই আরাধনা কর না কেন, সকল কাজে গুরু-ই অগ্রবন্দনীয়। তাই নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলের গাজনের গানের ভিতর গুরুবন্দনাও গাইতে শোনা যায়:

প্রণাম গুরুদেব অখিল ভুবনে সেব্য
গুরু চতুর্ভুজ সিংহ অপরূপ।
যাঁহার চরণ ধরি এ ভব সংসার তরি
গুরু হন ব্রহ্মার স্বরূপ॥
(আহা) অন্ধের লোচন গুরু ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু
ভক্তজনার প্রতি গুরুর দয়া।
শিবের সেবক নন্দী শিবের চরণ বন্দি
আর বন্দি মা মহামায়া॥
গুরুগোসাঁই কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
ও রাঙা চরণ বিনে গতি নাই।
অন্তিম কালে যমদূত লয়ে যায়
সেবক বলিয়া প্রভু রেখো রাঙা পায়॥

নীল

নীল বা নীলকণ্ঠের অর্থাৎ মহাদেবের বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যেই হয় এই উৎসবের সূচনা। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে একে বলে পাটগোসাঁই। এর পূজা উপলক্ষ্যে যে-উৎসব হয় পূর্ববঙ্গের গ্রামীন উৎসবগুলির মধ্যে একে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া চলে। একখণ্ড সরল নিম অথবা বেল গাছ থেকে তৈরী হয় এই মূর্তি। কোনো কোনোটির দৈর্ঘ্য দেড় হাত থেকে সাড়ে চার হাত এবং প্রস্থ বারো ইঞ্চি থেকে এক হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে।

নীলের মাথা অর্থাৎ অগ্রভাগ থাকে খুব মসৃণ ও ছুঁচালো এবং সমগ্র কাষ্ঠ খণ্ডটির উপর থাকে লোহার তৈরী চক্র এবং ত্রিশূল। গোটা দেহটা (অগ্রভাগ অর্থাৎ ছুঁচালো মসৃণ জায়গাটি বাদে) থাকে লাল শালু দিয়ে ঢাকা। মাথা সব সময়ই সিঁদুর ও তেলে মিলে চক্‌চক্‌ করতে থাকে।

পূজা হয় উনত্রিশে চৈত্র। এর অন্ততঃ তিনদিন আগে থেকে তিন সপ্তাহ পূর্বে পর্যন্ত নীল নামান হয়। গোটা বছর নীল থাকে গৃহস্থের মণ্ডপে। কারও কারও একে রাখবার জন্য পৃথক ঘরও থাকে। যেদিন নীলকে সেই মণ্ডপ থেকে বাইরে বের করা হয়, সেদিন তাকে কোনো স্রোতস্বতী নদী বিকল্পে দীঘির পারে নিয়ে, গঙ্গাপূজা দিয়ে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় (লাল শালু) পরিয়ে দেওয়া হয়। সেইদিনই বিকেলে অন্ততঃপক্ষে সাতটি বাড়িতে নীলকে ঘোরান হয়।

নীল যে-বাড়িতেই যাক, সেই বাড়ির বধূ এবং গৃহকর্তাগণ পরম ভক্তি সহকারে পরিষ্কার আসন পেতে দেয়—দেয় আলপনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের উঠানের মাঝখানে নীলকে বসাবার জন্য। ঘর থেকে এনে হাজির করে তেল ও সিঁদুর নীলের মাথায় পরিয়ে দেবার জন্য। গান শেষ হলে দেয় চাল ও টাকা পয়সা। হয় সেখানে গান বাজনা ও সঙ। বাজে ঢাক ঢোল, কাঁশী ও বাঁশী এই গানগুলিকে চলতি ভাষায় বলে 'অষ্টক গান'। এ গানের সঙ্গে প্রধান যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় ঢাক ও কাঁশী।

নীলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে যে-সব লোক তাদের বলে নীল-সন্ন্যাসী। পরনে তাদের লাল কাপড়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় থাকে পাগড়ী। এদের দলপতিকে বলে বালা। গানগুলি সাধারণতঃ সে-ই প্রথমটায় গেয়ে থাকে। নীল বিষয়ক গানে এরা ওস্তাদ।

এই বালাদের অনেক কাজ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গাওয়া ছাড়া ধূপ পোড়াতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করতে হয় শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতারের স্তোত্র। দিনের শেষে নীলকে আবার স্নান করাবার ভারও থাকে তাদেরই উপর। এই স্নান করাবারও অনেক মন্ত্র ও ছড়া রয়েছে। তারা নিরক্ষর হলেও এই সব প্রাকৃত মন্ত্রতন্ত্র সব সময়েই তাদের মুখস্থ থাকে।

যেহেতু শিবের বিবাহ উপলক্ষ্যেই এই পূজার সৃষ্টি, সেইহেতু এই উৎসবের যাবতীয় গানগুলিই প্রায় শিবের বিবাহ বিষয়ক এবং হর-গৌরীর গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনেই রচিত। শ্রোতৃবৃন্দ বছরের শেষে নতুন আনন্দে উপভোগ করে এই গান।

যারা পেশাদার গাইয়ে তারা গোটা বছর ধরে তালিম দিতে থাকে নতুন নতুন গানের। অনেক সময় দুখানা নীল পাশাপাশি হলে কাদের দলের গান ভাল এবং কাদের বালা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন এই নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা।

নীলপূজার আগের দিন হয় 'হাজরা পূজা'। যেহেতু পরদিন শিবের বিবাহ, সেইহেতু পূর্বদিন হাজার দেবতাকে পূর্বাহ্নে বিবাহসভায় উপস্থিত থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়।

পূজার দিন সন্ধ্যাবেলা নীলকে পুনরায় ঘটা করে স্নান করান হয় বাজনা বাদ্য সহকারে । পূজার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয় গৃহস্থের বাড়ি ছাড়িয়ে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে কোনো এক ক্ষণস্থায়ী মণ্ডপের ভিতর।

পূজা হয় সাধারণতঃ মাঝরাতে। আরতি ও ঢাকের বাজনা চলে প্রায় সারা রাত ধরেই। যারা বৈষ্ণবপন্থী, তাদের পূজায় বিশেষ কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু শক্তিপন্থীদের পুনরায় একখানা গৌরমূর্তি আনিয়ে নীল-মণ্ডপের পাশেই বসিয়ে পূজা করতে হয়। সে জায়গায় শক্তি পূজার উপকরণ স্বরূপ হয় পাঁঠা বলি। চলে সিদ্ধি, ভাঙ, গাঁজা ও কারণের মহোৎসব। কোনো কোনো অঞ্চলে এই নীল-মণ্ডপের পাশেই মাটির তৈরী এক বিশালাকার কুমীর তৈরী করতে দেখা যায়। পূজার পূর্বে কুলবধূদের প্রদীপ ও পূজার যৎসামান্য উপাচারে কুমীরের পূজা করতে দেখা যায় তাদের সন্তান-সন্ততিদের মঙ্গল কামনার্থে।

নীল পূজা শেষ হলে বালার একটি অবশ্যকরণীয় কাজ হলো শ্মশানে গিয়ে ভোগ পেঁৗছে দেওয়া। গভীর নিশীথে বালা মশাই কলার পাতায় করে পূজার ভোগাদি নিয়ে একাকীই চলে শ্মশানের দিকে। শ্মশানে গিয়ে ঐ খাবার রেখে একটু দূরে বসে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে কতক্ষণে শৃগাল এসে ঐ আহার্য বস্তু গ্রহণ করে। যতক্ষণ না শৃগাল ঐ আহার্য স্পর্শ করে ততক্ষণ তারও ছুটি নেই। শক্তিপন্থীরা এই ভোগের সঙ্গে বলিদানের পাঁঠার মাথাও নিবেদন করে থাকে, ফলে তাদের বালার আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।

সাধারণতঃ কোনো বাড়িতে নীল গেলে নীলকে পাট-পিঁড়ির উপর বসিয়ে রেখে মূল বালাই গান শুরু করে। এই বালারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর। কিন্তু তাদের কবিত্ব শক্তি অসাধারণ। অসংখ্য গান তারা রচনা করে এবং মনেও রাখে। কারণ, মনই তাদের একমাত্র খাতা, এর সাহায্যেই তারা বছরের পর বছর একই ভাবে নীলের গান গায়। আবৃত্তি করে প্রাকৃত ভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার স্তোত্র। পরে চৈত্র সংক্রান্তির দিন, চড়কের মেলার শেষে নীলকে পুনরায় তেল-হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে এক বছরের মতো তাকে রেখে দেয় তার স্থায়ী মণ্ডপে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় একবার করে তার কাছে ধূপ-ধুনা দেওয়া হয়, এই পর্যন্তই থাকে তার সঙ্গে গৃহস্থের সম্বন্ধ।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে (নীল পূজার পরের দিন) হলো চড়ক পূজা এবং উৎসব। সাধারণতঃ নীল পূজা যেখানে (মাঠে) হয়, চড়ক গাছ ঘোরার

ব্যাপার এবং এই উপলক্ষ্যে যে-মেলা বসে, সাধারণ লোকের ধারণা এই চড়ক গাছ ঘোরাবার ব্যাপার বুঝি নীল পূজারই একটা অংগ। কিন্তু তা নয়। চড়ক পূজা মূলতঃ সূর্য পূজা ছাড়া আর কিছু নয়। চড়ক হলো সূর্যের প্রতীক। পৃথিবীর বর্ষ পরিক্রমার সংকেত। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত 'ইন্দ পরব' বা 'ছাতা পরবের' সংগে এর বেশ মিল পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ নীলের মিছিল কোনো বাড়ি গিয়ে পিঁড়ির উপর নীলকে বসিয়ে দিয়েই গান শুরু করে:

শোন সবে মন দিয়া, অইবে শিবের বিয়া

কৈলাসেতে অবে অধিবাস।

(ও) তাতে নারদ করে আনাগোনা, কৈলাসে বিয়ার ঘটনা,

বাজে কাঁশী বাঁশী মোহন বাঁশরী।

মূল বালা এই পর্যন্ত বলেই একটু থামে। এই সুযোগে বেজে ওঠে ঢাক ও কাঁশী, তান ধরে বাঁশী অল্পক্ষণের জন্য। বাজনার বিরতির পরই সহকারী বালা বলে উঠে (ভাবটা অনেকটা যেন সে-ই শিব):

ভাইগ্না আমি ভাংগা ঘরে শুইয়া থাহি

চাইয়া দেহি দুটি আঁখি,

উশি পুশি কইর‍্যা রাইত কাটাই।

(ও) আমি দুই ধারে দুই বালিশ দিয়া

মইধ্যখানে থাহি শুইয়া

চৌক্ষের জলে বক্ষ ভাইস্যা যায়।

(তাই) ভাইগ্না যদি উপকারী হও

তবে বিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।

গীতের বিরতিতে আবার বেজে ওঠে ঢাক ও মৃদু কাঁশী। এর পরেই মূল বালা সুর ধরে:

তখন নারদ মুনি হেঁকে কয়

শুন মামা মহাশয়,

(ও) আমি নারদ অইলাম ঘটক

তোমার বিয়ার কিসের আটক

(ও) তোমায় দিনের মধ্যে দিব বিয়া

নয়ত, নারদ মুনি নহেক আমার নাম।

এই পর্যন্ত বলেই গান শেষ হয়। এ গানটিকে সাধারণতঃ বলা হয়

প্রস্তাবনা অর্থাৎ বিবাহের পূর্বেকার ঘটনা। এরপর অন্য কোনো বাড়িতে বা সেই বাড়িতে বসেই শ্রোতৃবৃন্দের অভিলাষক্রমে বালা আবার গান ধরে:

শিব চইল্যাছে বিয়া করতে
বাজেরে ঢোল ডগর কাড়া,
(ও) তার সংগে চলে দৈত্য সেনা
আরও আছে দেব সেনা।
(ও) তাদের হাতে কইলকা, নেংটি পরা,
গলায় দিছে সাপের মালা
দ্যাখলে ডরায় লোক।
এমন জামাই দেইখ্যা সবে কানাকানি করে,
(ও) সে শ্মশানে মশানে ঘোরে,
আইছে এটা দামড়ায় চইড়ে
হাইটা আইলে যাইত বুড়া মইরে,
(ও) তাতে আমরা লজ্জায় মইর‍্যা যাই
বুইড়ার দেহি দন্ত নাই।
(আবার) গলায় দেহি সাপের মালা
পরনে তার বাঘের ছালা
পিঁড়ির উপর দেহি এক সাপুইড়ারে।
(তখন) নারদ মুনি রাইগ্যা কয়, এ যে দেবের দেব মৃত্যুঞ্জয়
শমনকে করে পরাজয়,
আবোল তাবোল বল কাকে তোমরা?
তোমরা নারী শীঘ্র কর, কন্যা দেও যোগ্য বর
শুভক্ষণের সময় বয়ে যায়।
(তখন) শুনিয়া নারদের বাণী আসিলেক যতেক নারী
জামাই বরতে যায় গিরিরাণী।

শিবের বিবাহ শুনবার পর শ্রোতারা যখন আরও কিছু শুনতে চায় তখন বালাকে বাধ্য হয়েই মহাদেবের গার্হস্থ্য জীবনের একটি ছবি এঁকে দেখাতে হয়। এই শিবাষ্টকের প্রত্যেকটি গানের প্রতি নজর দিলেই দেখা যাবে এই নিরক্ষর কবিকুল তাদের গীতে শিব-মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেও তারা আমাদের কাছে যে-শিবের কথা বলছে, সে শিব পৌরাণিক শিব নন, এ শিব যেন আমাদেরই

ঘরের লোক। এ শিব বা গৌরীকে তারা তাদেরই মনের মতো করে গড়ে নিয়েছে। কাজেই পৌরাণিক চিত্রের সঙ্গে এই লোক-কবিদের রচনার তুলনা করলে অসামঞ্জস্য ঠেকবেই। কিন্তু সেটা আমাদের কাছে এক্ষেত্রে বড় কথা নয়। আমরা দেখতে পাব এই সব নিরক্ষর কবিকুলের ভাষায় হর-পার্বতীকে তারা কতখানি আপনার করে নিতে পেরেছে।

শিবের বিয়ের পাট চুকে গেলে তিনি যখন আর দশজন লোকের মতো পার্বতীকে নিয়ে ঘর-সংসার শুরু করে দিলেন, এই সময় একদিন তাঁরও ইচ্ছে গেল মর্ত্যবাসীদের মতো উচ্ছে ভাজা খেতে:

উচ্ছে ভাজা খাইতে মজা
ঘীর্তেরও সোম্ভার,
ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া তারে
কয়গো বাহার।

এবং আরেক দিন:

আমি তাই ভালোবাসি
ও প্রেয়সী,
শুন গো সুন্দরী—
মুগের ডাইলের মইধ্যে দিও
রুই মাছের মুড়ি।

শুধু মহাদেবই নন পার্বতীও আর দশজনের ঘরের বৌর মতোই একদিন সামান্য শাঁখা পরবার বায়না ধরলেন মহাদেবের কাছে। কিন্তু মহাদেব তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল সেখানে:

একদিনে শিবানী হরেকে কহেন ডাকি
শংখ পরিতে বড় সাধ যায় মনে,
(ও) সে শংখচুড়ি হীরার বালা
বিয়ার বয়সে কতই খেলা
শুনিয়া পড়শীরা সব হাসে।
(তখন) কহিলা শূলপাণি,
খাদ্য আমার ভাঙের লাড়ু
বাহন আমার বুড়া গরু
টাকা পয়সা কোথায় বল পাই!
(আবার) চুল পাকা দাঁত নড়া

তার মাগীর ক্যান হেত ঘটা ?

(আবার) শংখ যদি পরতে চাও

বাপের বাড়ি চইল্যা যাও,

(আমি) শ্মশানে মশানে ঘুরি

ভাঙ ধুতুরা গিলি

শংখ দেওয়া আমার সাইধ্য নয়।

(তখন) শুনিয়া হরের বাণী

ক্রুদ্ধ হইলেন মা ভবানী

এক লম্ফে চড়িলা সিংহের পর।

দেবী তখন কাউকে কিছু না বলিয়া

সিংহের পৃষ্ঠে আরোহিয়া

কোলে লইয়া পুত্র গজানন

দেবী চইল্যা গিরিপুর।

(তখন) নারদ মুনি যুক্তি করে,

(বলে) মামা শংখ রাখ তোমার ঘরে

শাঁখারী সাজিয়া শীঘ্র দেহ দরশন।

তখন শাঁখারী কয়,

আমার কাছে ভাল চুড়ি

আর শাঁখা আছে,

পরতে পারেন যতেক নারীগণ।

শুনিয়া শাঁখারীর কথা

দেবী দিলেন হাত বাড়াইয়া

হরের শংখ বজ্জর হইয়া

উঠলো ভবানীর গায়

এইরূপেতে শংখ পরান হয়।

আমরা এই মাত্র শিবের বিবাহ এবং তাঁর দাম্পত্য জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত দু-একটি গানের নমুনা উপহার দিয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিব বিষয়ক বা নীল বিষয়ক গানে কোথাও কোনো পালা গানের প্রচলন নেই। সব জায়গায়ই এই রকম খণ্ড খণ্ড গীতি বা গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে যতটা সম্ভব মিছিল করে গানগুলিকে আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

যদিও এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড গীতিকে সুসংবদ্ধ অবস্থায় নাটকের আকারে দেখান

খুবই কষ্টকর, তবুও আমরা গানগুলিকে এইভাবে ভাগ করে নিচ্ছি: দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী মারা গেছেন। তারপর অনেকদিন চলে গেছে শিব একাকীই বাস করেন। কিন্তু একাকী বাস করা শিবের পক্ষে খুব বেশি দিনের জন্য সম্ভব হলো না। তাই তিনিও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বিয়ের জন্য। এমন সময় শিবের এই সংকট দূর করবার জন্য সেখানে এসে হাজির হলেন দেবদূত নারদ। নারদের ঘটকালীতেই সম্পন্ন হলো শিবের বিবাহ। শিবও সংসার পাতলেন। কিন্তু এদিকে শিবঠাকুর যে সকলের অজ্ঞাতে গঙ্গাকে বিয়ে করেছেন সে খবর তাঁর শ্বশুরবাড়ি বা পার্বতীর কাছেও বলেননি। কাজেই এ বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই গঙ্গা যখন কৈলাসে ফিরে এলেন তখনই শুরু হলো দুই সতীনে বিবাদ।

বিবাদও অবশ্য একদিন মিটল। গঙ্গাও পার্বতীর প্রতাপে বিদায় নিলেন। হর-গৌরী মনের সুখে বাস করতে থাকেন, এই সময় আসে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার। পার্বতী বিনা নিমন্ত্রণে (লোক-কবির দল এখানে দক্ষরাজ কন্যা সতী এবং গিরিরাজ কন্যা পার্বতীকে এক করে গুলিয়ে ফেলেছে একথা বলাই বাহুল্য। আমরা তাদের রচিত গীতি-গাথার উপর ভিত্তি করেই গানগুলিকে সাজালাম) এসে হাজির হন বাপের বাড়ি এবং পতিনিন্দা শুনে করেন দেহত্যাগ,—এইখানেই পালা শেষ।

তাহলে আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে গানগুলিকে এইভাবে সাজাই। প্রথমে মনে করুন শিব সতী-বিহনে বড়ই কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন দেবর্ষি নারদ:

শিব হইয়্যাছে গৌরী-হারা, দক্ষ যজ্ঞে গ্যাছে মারা
শিব ঠেইক্যাছে গৃহশূন্যের দায়।
এ ভবে যার গৃহশূন্য, তারে কেবা করে মান্য
গৃহশূন্য সন্ধ্যাকাল উদয়॥
যার গুণবতী নারী মরে, ক্যামনে সে ধৈর্য ধরে
মনের দুঃখে কাঁদিয়া বেড়ায়।
ভাবে, এই ছিল আমার কপালে, ঘুম আসে না শয়ন কালে
চৌক্ষের জলে বক্ষ ভাইস্যা যায়॥
পত্নীর শোকে জরা জরা, রাগ হইয়া যায় অনেক চড়া
পুত্র কইন্যা কথা কয়না ডরে।
চিন্তা করে দিবানিশি, ছাইড়্যা গ্যাছে প্রাণ-প্রেয়সী
ক্যামন কইর‍্যা রব এই ঘরে॥

পুত্র কইন্যা থাকলে পরে, যদি পুত্রবধূ রান্না করে
তবে মনে মনে করে আনাগোনা।
যদি সুধা সম রান্না করে, লবণ পোড়া কয় তাহারে
মুখে কিছুই ভাল লাগে না ॥

ছাইড়্যা গ্যাছে ভগবতী, গৃহশূন্য পশুপতি
নারদেরে করিলে স্মরণ।
জানতে পাইল নারদ মুনি, ডাকিয়াছেন শূলপাণি
সত্বরেতে আইল তপোধন।
শুন নারদ কই তোমারে তল্লাস কর ঘরে ঘরে
কার কইন্যা রূপসী ক্যামন।
আমি ভাইগ্না করব বিয়ব, যাও হে তুমি ঘটক হইয়্যা
বিলম্ব না করিও কখন ॥

আমি কী করিতে কী না করি, মোনের দুঃখে ঘুরিফিরি
মন বলে করব আমি বিয়া।
চুল আমার সব পাইক্যাছে, দন্তগুলি লইড়া গ্যাছে
বুড়া বরে কেউ কী দিবে মাইয়্যা ॥

তখন নারদ বলে হইলাম ঘটক, মামা তোমার বিয়ার কিসের আটক
কৌশলে করিয়া দিব কাম।
মামা তোমারে সাজাইয়া নিয়া, দিনের মইধ্যে দিব গো বিয়া
তয় নারদ মুনি আমার নাম ॥

নারদ বলে যাব কাইল, নিরূপিত বিয়ার ফল
গিরিপুরে যাইব সত্বর।
সেই গিরিরাজার আছে কইন্যা, ত্রি-জগৎ আর মহী ধইন্যা
সেই মাইয়্যার সঙ্গে বিবাহ তোমার ॥

ভাইগ্না মুখে মুখে দিলা বিয়া, আমারে প্রবোধিলা
চেষ্টায় তুমি কররনাক কসুর।
আমি দ্যাশ বিদ্যাশে বেড়াই ঘুইর‍্যা, মনের মত পাইনা মাইয়্যা
ক্যাবল মাত্র যাই নাই গিরিপুর ॥

যদি গিরিরাজার থাকে কইন্যা, রূপে গুণে অধিক ধইন্যা
তাইলে মাইয়্যার খিকা হবে সুন্দর মাইয়্যার মায়!

ভাইগ্না গৌরীরে আমারে দিয়া,   তুমি কর তার মায়েরে বিয়া
তাতে আমার কিবা আছে কাম ॥
বিয়ার কথা মোনে পইলে,   প্রাণ আমার রয়না ঘরে
একে পাগল আরও পাগল হই।
আমি দুই ধারে দুই বালিশ দিয়া,   মইধ্যখানে থাকি শুইয়া
উশি পুশি কইর‍্যা রাইত কাটাই ॥
ভাইগ্না বিয়ার আছে কত ঝুক্,   ক্যামন মাইয়্যার নাক মুখ
আমি রাজার মাইয়া দেখি নাই।
শুনিয়া শিবের বাণী   ঢেঁকি হস্তে নারদ মুনি
কৈলাসপুরে চলিল গোসাঁই ॥

আমরা বিপত্নীক মহাদেবের অবস্থা শুনলুম। চলুন এইবার আমরা দেবদূত নারদের ঘটকালি দেখে আসি। পল্লী-কবির গানে স্বর্গের দেবদূ মর্তের ঘটক বানাতে খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি:

শোন সবে মোন দিয়া,   অইবে শিবের বিয়া
কৈলাসেতে অবে অধিবাস।
না রদ করে আনাগোনা,   কৈলাসে বিয়ার ঘটনা
শোন শিবের বিয়ার ইতিহাস ॥
দক্ষযজ্ঞে মৈলা সতী,   কাইন্দা আকুল পশুপতি
নয়ন জলে বক্ষ ভাইস্যা যায়।
সতী জন্মিল পুনরায়,   গিরিরাজার কইন্যা হয়
ধ্যান যোগে তাই নারদ জানতে পায় ॥
দেবগণ সব সঙ্গে নিয়া,   করিতে সম্বন্ধ বিয়ার
নারদকে পাঠাইলে গিরিপুরে।
চলিল ব্রহ্মার পুত্র,   করিবারে লগ্ন-পত্র
মগ্ন হইয়্যা হরিগুণ সুরে ॥
করি ইন্ট আলাপন,   বিবাহের উত্থাপন
করেন মুনি গিরিরাজার কাছে।
রাজা তোমার নাকি আছে কইন্যা,   রূপে গুণে অতি ধইন্যা
তারে দিবা নাকি বিয়া শিবের কাছে ॥
তোমার কইন্যা যোগ্য তার,   তিনি যোগ্য জামাতার
শুনিয়া কহেন হিমগিরি।

পঞ্চানন বিবাহের ছেলে,　　　　রাণীর অনুমতি হলে
তবেই আমি পত্র* করতে পারি ॥
অন্তঃপুরে গিয়ে গিরি,　　　　রাণীকে জিজ্ঞাসা করি
বলে শোন মেনকা সুন্দরী।
নারদ মুনি আইল দ্বারে,　　　　গৌরীর বিবাহের তরে
জামাই হবে সেই ত্রিপুরারি ॥
রাণী কাইন্দা বলে উচ্চৈঃস্বরে,　　　　শোন রাজা কই তোমারে
কী কথা বলিলে তুমি আমায়।
আমার কাঁচা মাইয়্যা উমাশশী,　　　　সে হয় শ্মশানবাসী
এ কি আমার প্রাণে সহ্য হয় ॥
এ কথা শুনিয়া গিরি,　　　　চক্ষে বহে দুঃখের বারি
মেনকারে বুঝায়ে বলে।
দেবের দেব সে পঞ্চানন,　　　　তারে কর গৌরী দান
নইলে পুরী ছারেখারে যাবে ॥
মনেতে ভাবনা করি,　　　　সাজাইয়্যা আনিল গৌরী
দ্যাখাইতে লাগিল মুনির ঠাঁই।
নারদ বলে দ্যাখলাম ভাল,　　　　রূপে-গুণে ভুবন আলো
(আমার) জ্ঞান হয় মাইয়্যার চক্ষু দুটি নাই ॥
আমার বিশ্বাস যেন বোবা মাইয়্যা,　　　　চক্ষু থাকলে দ্যাখত চাইয়া
জিজ্ঞাসা করিত নাম ধাম।
তোমার মাইয়্যা যদি করত দৃষ্টি,　　　　রক্ষা অইত ধরার সৃষ্টি
প্রাপ্তি আমার অইত গোলক ধাম ॥
মেনকা কয় ঘটকের পো,　　　　মাইয়্যা মন্দ বলিস না লো
তুই পইড়্যাছিস বিয়া ঘুন্সার পাকে।
আমাগো সব ঝি-বউ কালে,　　　　কেউ মাইয়্যা দ্যাখতে আইলে
নয়ন মুদিয়া রইতাম লাজে ॥
শুনিয়া রাণীর বাণী,　　　　হরষিত নারদ মুনি
শিবের কাছে চলিল তখন।

* পূর্ববঙ্গে বিবাহের পাকা-কথা দেওয়াকে বলে 'পত্র' করা। অনুষ্ঠানটা অনেকটা দলিল রেজেস্টারী করার মতো। যদিও কোর্টে যেতে হয় না।

গিয়া মহাদেবের সাক্ষাৎ, হেট মুণ্ডে করে প্রণিপাত
ধীরে ধীরে বলিছে বচন ॥
শুন দেব শূলপাণি, তোমার হৃদয়-মণি
জন্মিয়াছে গিরি রাজালয়ে।
গিয়াছিলাম আমি অত্র, কইর‍্যা আইলাম লগ্ন-পত্র
এখন বিয়ার সাজে সাজ মহাশয় ॥

শিবের বিয়ের সম্বন্ধ তো স্থির হয়ে গেল। এইবার চলুন একবার শিবের বিয়ের আসরটা দেখে আসা যাক। শিবঠাকুর সাধারণ মানুষের মতোই এসে দাঁড়িয়েছেন পাটপিঁড়ির উপর, কনেপক্ষরা একে একে এগিয়ে আসছে বরকে বরণ করতে :

ভোলা সিঙ্গা ডম্বুর লইয়্যা হাতে, ভূতগণ সব সঙ্গে তাতে
বিয়া করতে চলে হিমালয়।
গ্যালে গিরিরাজার অন্তঃপুরে, গিরিরাণী চৌক্ষে হেরে
কাইন্দা রাণী ধুলাতে লোটায় ॥
রাণী কাইন্দা বলে উচ্চৈঃস্বরে, শোন রাজা কই তোমারে
কী কার্য করিলা নৃপবর।
চারি চৌক্ষের মাথা খাইয়া, বুড়ার কাছে দেব বিয়া
এও কি আমার প্রাণে সহ্য হয় ॥
একথা শুনিয়া গিরি চৌক্ষে বহে ব্যাথার বারি
কাইন্দা কাইন্দা ছাড়িতেছে হাই।
বলে দ্বন্দঘটা নারদ মুনি, মিথ্যা কথার শিরোমণি
ঢেকী-গোসাঁই ঘটাইল বালাই ॥
সাজিয়া সব নারীগণে, চলে গিরিরাজার ভবনে
দ্যাখতে রাজার জামাই সুন্দর।
কোন কোন রসবতী, পইর‍্যাছে জামদানী ধুতি
কাপড় আর বুটশালের চাদর ॥
এক রমণী রূপের ডালা, স্বামী দিয়াছে মটর মালা
নাকে দিছে সার্কেল নাকছাবী।
তারা দেইখ্যা ওই বিয়ার বরে, বলে দিদি এমন বরে
তুই এক জন্মের ভাগ্যে কী পাবি ?

বর নয় সে কী অদ্ভুত, সংগে শতাবধি ভূত
দেইখ্যা আমার ভয়ে আইল জ্বর।
বয়স অবে তার আশী-নব্বই, রূপ যেন ঠিক বনেরই বানর
চল্‌লো দিদি আমরা সবাই ঘর ॥

শুনিয়া এ সব ভাষা, দেইখ্যা নারীগণের রঙ-তামাসা
নারদ মুনি ভাবে মনে মন।
নারদ দেয় ইসারা কইর‍্যা, শিব মদনমোহন রূপ ধইর‍্যা
অপূর্ব রূপ ভুবন মোহন ॥

দেইখ্যা এসব কান্ড, পঞ্চানন রসেরই ভান্ড
রাজনন্দিনীর হরিষ অন্তর।
পান সুপারী হাতে দিয়া, সখীগণ সব সংগে নিয়া
বরণ করতে চলে মহেশ্বর ॥

মহাদেবের পঞ্চমাথায়, বরণ-মালা পরাইতে
দুই হাতে বাধল বিষম জ্বালা।
তখন অন্তরে ভাবিয়া শিবে, গিরিপুরে নব্যভাবে
দশভুজা হল গিরিবালা ॥

হর-পার্বতীর মিলন হইল, আনন্দে পুরী ভরিল
মহানন্দে শালা শালীগণ।
করে কত স্ত্রী-আচার পাশা খেলা দেশাচার
আগামী দিন হইবে বরণ ॥

এই পর্যন্ত বলেই বালারা সাধারণতঃ গানের বিরতি টানে। এই সময় তারা খায় পান তামাক, মধ্যে মধ্যে বাজে ঢাক, ঢোল এবং তার সংগে তাল মিলিয়ে নাচতে থাকে পায়ে ঘুঙুর বাঁধা ছোকরার দল। অধীর আগ্রহে শিবের বরণ শুনবার বাসনায় দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির বৌ-ঝিরা। শিবের বরণ না শুনে তারা কেউ ছাড়বেই না। তাই বালাকেও আবার গান ধরতে হয়ঃ

পড়ল কৈলাসেতে বিয়ার সাড়া, বাজিছে ঢোল ডগর কাড়া
সাঁনাই শংখ বাজে শত শত।
সেতারা চৌতারা বাজে, জগঝম্প মাঝে মাঝে
মৃদংগ তানপুরা শত শত ॥

সঙ্গে চলে যত জনা, ঠিক যেন সব যুদ্ধের সেনা
ঢাল তলোয়ার ঘোরে উল্টাপাকে।
করে চলে তলোয়ারে কাটাকাটি, কেহ কারে মারে লাঠি
কেহ জোর করিয়া পুরীর মধ্যে ঢোকে ॥

লাগল কত বিয়ার গন্ডগোল, মহাযুদ্ধে মহারোল
ঘটক দৌড়ায় ছিঁড়ে মশারী।
বসল সব শান্ত হইয়া, বিয়ার লগ্ন যায় বইয়া
ঐ যে বরণডালা নিয়া যায় রাণী ॥

পূর্ববঙ্গে বিয়ের চাইতে বাসী-বিয়ের গুরুত্ব বড় কম নয়। বিয়ের পর দিনই বর কনের কপালে সিন্দুর পরিয়ে দেয়। আঞ্চলিক প্রথানুসারে বাসী-বিয়ে (কুশণ্ডিকা) না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয় না। পূর্ববঙ্গের লোক-কবির দল পূর্ববঙ্গীয় সমাজের কথা স্মরণ রেখেই গান রচনা করেছে। বাসী-বিয়ের সময় আসন্ন। তাই গিরিপুরের নারীরা সব বরণডালা নিয়ে চলেছে শিবকে বরণ করতে :

শোন সবে মন দিয়া হইয়া গ্যাল শিবের বিয়া
বাসী-বিয়ার করল আয়োজন।
তখন ধাইয়া যায় ম্যানকা রাণী আইয়োগণ ডাকিয়া আনি
বলে কর গৌরীর বিবাহের বরণ ॥

তখন আসিয়া সকল রমণী করে সবে উলুধ্বনি
রাজার জামাই বরবে মনের সুখে।
নিয়ে ধান্যদূর্বা বরণ ডালা পুরবাসী কুলবালা
দাঁড়াইল শিবের সম্মুখে ॥

তখন দেখিয়া শিবের মূর্তি হাস্য করে সব যুবতী
বসন দিয়া ঢাকলো সবাই মুখ।
বলে এই নাকি ম্যানকার জামাই অ্যামন জামাই আরত দেহি নাই
তোরা দ্যাখলো দিদি জামাইর পাঁচখানা মুখ ॥
দ্যাখ্ ঐ পাঁচ মুখেতে পাকা দাড়ি এই জামাইর তো আদর ভারী
আবার দন্তগুলা যান মুলার মত হয়।
ঐ দ্যাখ তাও বাতাসেতে হেলে পড়ে দাড়ি যেন তুলা ধরে
আবার চক্ষের জলে গাল ঢাকিয়া যায় ॥

জামাইর মাথায় দেখি সাপের হেড়ে জামাই বুঝি হয় সাপুড়ে
সাপ খেলায়ে বেড়ায় দ্যাশে দ্যাশে।
পরা দেখি বাঘাম্বরী প্যাটে হইয়াছে আমউদরী
বুকটা ধড়ফড় করে হাঁপী কাসে॥
ঐ দ্যাখ ঘন নিশ্বাস ছাড়ে জামাই বুঝি রাত্রেই মরে
এই ছিল কী গৌরীর কপালে।
গৌরী অ্যামন সোনার মাইয়্যা বুড়ার কাছে দিল বিয়া
(রাজা) সোনার পুতুল ফ্যালাইল জলে॥

বরতে প্রথম এলো স্বর্ণ রেখা গৌরীর হাতে দিল শাঁখা
হেলাইয়া বুক মাজা দোলাইয়া।
আবার নথনী নাকে মাজন দাঁতে গোঁদানী লয়েছে তাতে
যেন ঘোমটার তলে খ্যামটা নাচিয়া॥

চলিল শতাবধি যুবতী আসিল জামাইকে বরি
উর্বশী অপ্সরা রম্ভাবতী
এলো সাবর্ী কৃতী অনুরাধা আদ্রা ভদ্রা আর যশোদা
(মধ্যে) রোহিনী ভরণী হৈমাবতী॥

এলো চুলী বালী চিত্ররেখা, ধনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা বিশাখা
অশ্বিনী ভরণী তিলোত্তমা।
এলো শ্রবণা পুষ্যা রেবতী, বরতে শিব আর ভগবতী
(এলো) ঘন্টাকালী আর সত্যভামা॥

এলো হ্যালাণি প্যালানি গেদী, মালঞ্চী ছেদী আহলাদী
যোগি লাবি ইলা পুত্তনা।
এলো মঞ্জুরাণী নিস্তারিনী, দিনতারিণী অলকমণি
এলো ধুনি মুনি কুড়ি খেন্তির মা॥

হল সব রমণীর বরণ সারা, গিরিরাণী এলো ত্বরা
জামাই বরতে করিলা মনন।
তখন নারদ মুনি ডেকে বলে, শুন মামী কই তোমারে
(আমার) মামার বিয়ার আছে এক নিয়ম॥

জানি শ্বাশুড়ী বরতে গেলে, ঈশার মুল লাগিবে কাজে
তবে মামার করিবে বরণ।

তখন শুনিয়া নারদের বাণী, ঈশার মূল লইয়া আনি
রাণী বরতে গেল জামাই পঞ্চানন ॥
রাণী বরণডালা নিয়া কাঁখে, দাঁড়াইয়া শিবের সম্মুখে
বরতে লাগিল তালে তাল।
অমনি ঈশার মূলের গন্ধ পেয়ে, শিব ছেড়ে সাপ যায় পালায়ে
তখন খসিয়া গেল পরা বাঘের ছাল ॥
তখন শিব ঠাকুর হইল নেংটা, নারীগণে দিয়া ঘোমটা
সরমে কেউর নাহি সরে বাক।
নারদ বলে নারীগণ, শুনত আমার বচন
সকাল সকাল আন একখান কাঁথা
ঘরে নিয়া জামাইরে ধরিয়া ঢাক ॥

শিবের বিয়ে এতক্ষণে শেষ হলো। শিবও গৌরীকে নিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন। কিন্তু পল্লীর শ্রোতৃবৃন্দ এরপর শিবের পারিবারিক ঘটনাও দু' একটা না শুনে বালাকে বিদায় দিতে রাজী নয়। তাঁর পারিবারিক ঘটনার মধ্যে গৌরীর শাঁখা পরার ব্যাপারটা আগেই বলে নিয়েছি, এইবার গঙ্গা-দুর্গার বিবাদ বিষয়ে একটু খবর দেওয়া আবশ্যক মনে করছি।

শিবঠাকুর যে পার্বতীকে বিয়ে করবার আগে গঙ্গাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন এখবর এতদিন গোপনই ছিল, কিন্তু পার্বতী কৈলাসে যেতে না যেতেই গঙ্গাও এসে সেখানে যোগ দিলেন, ফলে শুরু হলো দুই সতীনে তুমুল ঝগড়া। এর পরিণাম কী হলো এ বিষয়ে আমরা নীলের বালার মুখ দিয়ে শোনাচ্ছি :

শোন সবে মন দিয়া এ ভবে যার দুই বিয়া
তার শান্তি হয়না কোন দিন।
আছে শিবের ঘরে দুই রমণী গঙ্গা আর সেই কাত্যায়নী
তারা ঝগড়া করে রাত্র দিন ॥
একদিন হরের অগ্রে বিদায় হইয়া কার্তিক গণেশ সঙ্গে নিয়া
নায়রে চলিলা ভগবতী।
তখন শিবের জটায় থেকে, গঙ্গা বলিছে ডেকে
একি কর্ম কর পশুপতি ॥
পুরুষশূন্য একা নারী ক্যামনে যায় বাপের বাড়ি
তুমি শঙ্কর যাও পিছে পিছে।

এ নব যৌবন কালে, একা যাবে দূর দেশে
পথে কত ভাল মন্দ আছে ॥
শুনিয়া গঙ্গার বাণী ক্রোধান্বিতা ত্রিনয়নী
রক্তচক্ষে কহে জাহ্নবীরে।
তুইলো সতীন কইসনা কথা যথা ইচ্ছা যাব তথা
তুই ক্যান তায় মরিস্ জ্বলে পুড়ে ॥
শোন লো সতীন তোর যে রঙ্গ উথলিলে তোর তরঙ্গ
শিবের পক্ষে থামান বড় দায়।
শিব কথা কয় না তোর ডরে থাকে কোচ নারীর ঘরে
তোর মত ছেদার আর কোথায় ॥
তুই লো সতীন ক্যামন নারী শিবের সঙ্গে সদাই আড়ী
শিব যখন কোচ-পাড়াতে যায়।
আড়ি দিয়া তার সাথে, রঙ্গ করিস ডোমের সাথে
কেউ কি কোথাও ডোমের অন্ন খায় ॥
পূর্বে শান্তনু রাজা গিয়া তোরে করিল বিয়া
তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর ছেলে।
শান্তনু রাজারে ছাড়ি, হলি আবার শিবের নারী
তোর মতন আর পূর্ণ সতী কে?
শোনলো সতীন তোর যে ঘটা ব্রহ্মলোকে আছে খোঁটা
যখন ছিলি ব্রহ্মার সভায়।
হেথা মহাভীষ্ম রাজা ছিল তারে দেইখ্যা মন মজিল
উলঙ্গিনী হইলি রাজসভায়।
সতীন তুই বলিস অসতী তবু আমি পুত্রবতী
আমার বশে থাকে পঞ্চানন।
নলিনী কয় ও মাতঙ্গে শীতল বারি দান রঙ্গে
তোমরা মাগো মোদের দুই সমান ॥

সাধারণতঃ দেখা যায় মেয়েরা স্বামীর উপর রাগ করে বাপের বাড়ি রওনা দেয় তাদের রাগের বহর দেখাবার জন্য। এ জায়গায়ও আমরা ঠিক সেই জিনিষটিই দেখতে পাই। পার্বতীও গঙ্গার সঙ্গে বিবাদ করে মহাদেবের উপর অভিমানভরে বাপের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। কিন্তু এতো দূরের পথ একাকী যাওয়াতো খুব ভাল কথা নয়, তাই পার্বতী ডোমনীর ছদ্মবেশ ধারণ

নৌকা সৃষ্টি করে নিজেই নৌকা বাইতে বাইতে চললেন। মহাদেব প্রমাদ গুণলেন। তিনিও চট্ করে ডোমের ছদ্মবেশে এসে সেই নৌকায় আরোহী হয়ে বসেন :

মায়া লৌকায় উইঠ্যা দেবী,
বইলেন লৌকার পরেতে
(আর) হর বইল্যাছে ডুমানী সই
পার কইর‍্যা দ্যাও আমাকে।
(তখন) সিদ্ধির কইলকা ভাঙের লাড়ু
থুইলো লৌকার পরেতে
(আর) হর বইল্যাছে ডুমানী সই
পার কইর‍্যা দ্যাও আমাকে।

দেবীর ইচ্ছাতে লৌকা চলে,
পবন গতিতে,
(আবার) হরের কৌশলে লৌকা
ঠেকিল চড়াতে।

এত বলি ক্ষান্ত দিল মদন গোসাঁই
হর-পার্বতীর বিবাদ কথা শুন শুন ভাই।

'রতনে রতন চেনে'। মহাদেব শুরু করলেন অনুনয়-বিনয় পার্বতীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু পার্বতীও তো কমতি নন, তিনিও ঠিক ঠিক প্রত্যুত্তর দিয়ে যেতে থাকেন, এককথা, দুকথায় শুরু হলো তুমুল ঝগড়া। মহাদেব বলতে থাকেন :

দুর্গে আমি জানি, জানি তোমার গুণের কথা
আমি খাই ভাঙ ধুতুরা
তুমি খাও দুর্গে রুধি।
(ঐ) অসুর বধিতে যোগিণী সংগেতে
যখন গেলে দুর্গে তুমি,
তখন তোমারে হেরিয়ে দেবকুল যত
ভয়েতে অস্থির হইল,
(তখন) তোমারে রুখিতে এ বক্ষ পাতিয়ে
শয়ন করলাম আমি।

তখন আমারে হেরিয়া লজ্জা পাইয়া
রণে ক্ষান্ত দিলা তুমি
দুর্গে আমি জানি, জানি তোমার গুণের কথা।

দুর্গা উত্তর দিচ্ছেন :

দশ হস্তে খাই আমি তাহার দেও খোঁটা
পঞ্চমুখে খাও প্রভু তাহা পাও কোথা ?

মোক্ষম জবাব। তবে স্বামী-স্ত্রীর ভিতর যদি অন্তরের মিল থাকে তা হলে বিবাদ মিটতে খুব বেশী দেরী হয় কি ? হয় না। শিবঠাকুরও পার্বতীকে নিয়ে ফিরে গেলেন ঘরে। কিন্তু অন্য একটি উপাখ্যানে বর্ণনা করা হয়েছে শিবঠাকুর দক্ষ-রাজ-কন্যা সতীকে বিবাহ করে সুখে ঘরকন্না করছেন, কিন্তু রাজা দক্ষ প্রথম থেকেই জামাই (শিব)-এর উপর ভীষণ চটা। ভাঙ্গর, ভূত প্রেত নিয়ে থাকে—সেকি আর রাজ-জামাতার যোগ্য ? কাজেই তিনি জামাইকে জব্দ করবার জন্য করলেন এক যজ্ঞের আয়োজন। এ যজ্ঞে ত্রিলোকের সকল দেবতারই স্থান হলো, হলোনা শুধু শিবের। শিব হয়তো এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথাও ঘামাতেন না। কিন্তু দেবদূত নারদ কৈলাসে এসে সতীর কাছে বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন, তাঁর বাপের বাড়ির বিরাট যজ্ঞের কথা। বললেন মহারাজ তাঁকে (সতীকে) যেতে বলেছেন কিন্তু মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন নি। সতী একে অনেক দিন বাপ, মা, ভাই, বোন ছাড়া, তাই বাপের বাড়ির অতবড় যজ্ঞের কথা শুনে শিবের বিনা অনুমতিতেই গিয়ে হাজির হলেন পিত্রালয়ে। কিন্তু সেখানে এসে পতিনিন্দা শুনে করলেন দেহত্যাগ। শিবায়ণ গীতি-নাট্যের (কল্পিত) এইখানেই পরিসমাপ্তি :

একদিন বলে দক্ষ নৃপ মণি, শুন শুন নারদ মুনি
(আমি) করেছি এক যজ্ঞের আয়োজন।
তুমি যাও চলি অতি সত্বরে, শিবহীন যজ্ঞ করব বলে
ধরায় সব দেবেরে করবে নিমন্ত্রণ ॥
তখন শুনিয়া দক্ষের বাণী, দ্রুত চলে নারদ মুনি
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে যায়।
ত্রিলোক নিমন্ত্রণ করে, উদয় হল কৈলাস পুরে
যথায় আছেন মাতুল মহাশয় ॥

শুন মামা পঞ্চানন, দক্ষরাজার করণ কারণ
করেছে এক যজ্ঞের আয়োজন।
মামা যজ্ঞ হবে মহা যজ্ঞ, একটি কাজ বড় অযোগ্য
(এই যে) মামা নিমন্ত্রণ ভিন্ন ত্রিলোচন ॥
নারদ তথা হতে চলে ধেয়ে, পার্বতীর কাছে গিয়ে
বলে শুন অপূর্ব ঘটন।
স্বামী তোমার পিতা রাজা দক্ষ, করিতেছে শিবহীন যজ্ঞ
তোমাকে করেছে নিমন্ত্রণ ॥
এ কথা শুনিয়া সতী, মনে ভাবে ইতি উতি
উপনীত যথা মৃত্যুঞ্জয়।
বলে শুন প্রভু শ্মশানবাসী, আমার পিতার যজ্ঞ দেখে আসি
প্রভু অনুমতি করহ আমায় ॥
তখন শুনিয়া সতীর বচন, ধীরে ধীরে কয় ত্রিলোচন
বারণ করি যেওনা ত্বরা।
ওগো তুমি বাপের বাড়ি গেলে, ক্যামন করে শূন্য ঘরে
(বল) কে বাটিবে আমার ভাঙ ধুতুরা ॥
তখন শিবের বাক্য লংঘন করে, চলে সতী দক্ষপুরে
উপনীত দক্ষের ভবন।
দেখে দক্ষ বলে ও পাগলী, কার কথায় তুই হেথায় এলি
তোরে কে গিয়ে করল নিমন্ত্রণ ॥
জামাই পাগলা ভোলা শ্মশানবাসী, গায়ে মাখিয়া ভস্মরাশি
ভূতের সংগে নাচে নিরন্তর।
ওগো তুই নাচিস ভূতের সংগে, কৈলাসপুরে পরম রংগে
তাইতে এলি বুঝি না পেয়ে খবর ॥
ইত্যাদি নিন্দাবাদ, শুনে দক্ষ প্রমুখাৎ
সতী বলে শুন পাপিষ্ঠ রাজন্।
তুমি নিন্দা করলে যে-মুখে, পাঁঠার মুণ্ড হবে তাতে
এইত আমি ত্যাজিছি জীবন ॥
এদিকেতে নারদ মুনি, চেয়ে দেখে দাক্ষায়ণি
শিব নিন্দাতে ত্যাজিল অংগ।

তখন সভা হতে শীঘ্র উঠি, বাজাইয়ে দুটি কাঠি
কৈলাসে যায় বাধাতে রঙ্গ ॥
বলে শুন মামা শূলপাণি তোমার নিন্দা শুনে শিবাণী
দক্ষপুরে ত্যাজিল জীবন।
তখন শুনিয়া নারদের কথা, রাগে শিবের কাঁপে মাথা
গেল পাগলের প্রায় সে দক্ষভবন ॥
তখন উদয় হৈল দক্ষপুরে, দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে
যুদ্ধে হল দক্ষরাজ নিধন।
হয়ে দক্ষরাণী উন্মাদিনী, পদে পড়ে শূলপাণি
কেঁদে বলে প্রভু দাও পতির জীবন ॥
তখন সতীর বাক্য রাখতে বজায়, পাঁঠার মুণ্ড এনে ত্বরায়
শিব দান করিল দক্ষের জীবন।
দেবের নিন্দা-চর্চা করে যেই, সমুচিত ফল পায় সেই
মোদের বাঞ্ছা যেন না হেরি বদন ॥

সব শেষ।

শিবের বিয়ে থেকে শুরু করেছিলাম আমাদের প্রবন্ধ, আর সতীর মৃত্যুতেই ঘটল তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু শিবের বিবাহ নয়—নীলপূজা সম্বন্ধীয় গীতি ও গাথা। নীলপূজার যাবতীয় গীতি বা গাথা সম্বন্ধে বলতে গেলে এখনও কিছু বাকী আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি নীলের গান শেষ হলে বালাদের অন্যতম কাজ থাকে শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার-রূপ বর্ণনা করা। ধুনুচিতে ধূপ পোড়াতে পোড়াতে বালারা আবৃত্তি করতে থাকে নিজেদেরই তৈরী প্রাকৃতে রচিত শ্রীকৃষ্ণের দশ অবতার স্তোত্র, জয়দেব বিরচিত শ্লোকের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই :

প্রথম কালেতে গোসাঁঞী এরূপ শরীর।
কোমল শরীরে গোসাঁঞী কত পেয়েছে দুঃখ ॥
ক্ষীর নদী সাগরের জল ক্যামনে হল পার।
কোন অবতারে গোসাঁঞী উদ্ধারিলা নর ॥
সেই সব বৃত্তান্ত কথা কহ এই স্থানে।
দেব হয়ে দশবিধ রূপ ধরিলা ক্যামনে ॥

বেদ উদ্ধারিতে প্রভু মন করিলা সার।
অগাধ জলেতে প্রভু ধরিলা অবতার॥
চারিবেদে বানাইয়্যা জীব করিলা স্থির।
ত্বং প্রণমামি দেব মীন শরীর॥

মমথ কবাট পৃষ্ঠ ত-পট ধর ফণী।
যাহার উপরে ভার রেখেছে মেদিনী॥
মেদিনীতে রেখে ভার জীব করিলা স্থির।
ত্বং প্রণমামি দেব কূর্ম শরীর॥

শক্তিতে সমান দন্ত বিদারিলা ক্ষিতি।
দৈর্ঘ্য প্রস্থ চতুঃস্পার্শ্ব হেট মুণ্ডে গাটি॥
কোটি ব্রহ্মাণ্ড যার এক লম্ফ ফুট।
ত্বং প্রণমামি দেব বরাহ রূপ॥

কুঠার লইয়া হাতে দুর্জয় অপার।
ক্ষত্রিয় নিঃক্ষত্রিয় করে তিনশত বার॥
পিতার আজ্ঞা পেয়ে বীর মার কাটিলা শির।
ত্বং প্রণমামি দেব পরশুরাম বীর॥

জন্মিল কশ্যপের ঘরে অপূর্ব মূরতি।
বলির লইল যজ্ঞ পিতার সংহতি॥
ত্রিপাদ ভূমি দানে রাখিলা পাতাল।
ত্বং প্রণমামি দেব বামন গোপাল॥

হিরণ্যকশিপু দৈত্য মহা বলবান।
ত্রিভুবনে নাহি বীর তাহার সমান॥
নখে চিরি বিদারিল উরু পরে ধরি।
ত্বং প্রণমামি দেব নরসিংহ হরি॥

গোকুলে জন্মিল হরি রোহিনী উদরে।
করিলা গোকুলে অদভুত কাণ্ড বাসরে॥
মহাকাল প্রাণ পেল সুমার গম্ভীর।
ত্বং প্রণমামি দেব হলধর বীর।

নাহি মানে বেদ শাস্ত্র ধর্ম অনুরীতি।
জীব হিংসা করে তারা দুর্জয় আকৃতি।।
হয়ে বুদ্ধি হইল বচন প্রচার।
ত্বং প্রণমামি দেব বুদ্ধ অবতার।।

অবতার অবনীতে মোক্ষ মহীতে।
জগৎ মোহিনী ধনী মূর্তি বিপরীতে।।
ভক্ষণে নাহি বিচার দুরাচার মতি।
ত্বং প্রণমামি দেব কল্কি কেশমতি।।

সূর্য কুলে জন্ম নিলে দশরথের ঘরে।
চরণ বাড়াইয়া দিলে পাষাণ উদ্ধারে।।
সবংশে বধিলা প্রভু রাবণাদি অরি।
ত্বং প্রণমামি দেব রাম রাজীব লোচন হরি।।

নীলের গান এখানেই শেষ। নীল পূজা হয় চৈত্র মাসে। কিন্তু ঠিক নীলেরই অনুরূপ আরও একটি উৎসবের প্রচলন রয়েছে পূর্ববঙ্গে। সবই এক, শুধু নাম বিভিন্ন। নীলের মতোই বৈশাখের মাঝামাঝি দেখা যায় 'কালবৈশাখী'র পাট নামাতে। কারও কারও মতে নীলেরই অপর মূর্তি। এরও পূজা হয় বৈশাখী সংক্রান্তিতে। এর সঙ্গে প্রচলিত গানগুলিও সবই এক, মাত্র যেখানে একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় সেগুলিই আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরব।

লোকশ্রুতি অনুযায়ী নীল পূজা হলো হরগৌরীর বিবাহ উৎসব, আর কাল-বৈশাখী উৎসব হলো মহাদেবের 'দ্বিতীয় বিবাহ' উৎসব। সেকালে মেয়েদের নয় বৎসর বয়সের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু এখনকার মতো বিয়ের পরই কনে শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর ঘর করতে যেত না। বিয়ের পর দ্বিরাগমনে মেয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এলে যৌবনোদয় না হওয়া পর্যন্ত পিত্রালয়েই থাকত। এরপর যৌবনোদয়ের পর কনে যখন স্বামীর ঘর করতে যেত, তার আগে পুনরায় একটা বিবাহোৎসব পালন করতে হতো অবিকল প্রথম বিবাহের মতোই। পুরুত ডেকে জ্ঞাতিকুটুম্ব ভোজন করিয়ে তবে নিস্কৃতি।

শিব তো গৌরীকে বিয়ে করে কৈলাসে নিয়ে চলে গেলেন, নীলের গানে আমরা এ পর্যন্ত শুনেছি। এরপর নিয়মানুসারে গৌরী ফিরে এসেছেন বাপের বাড়ি। সেও অনেকদিন হয়ে গেছে। ভোলানাথের এতদিনে খেয়াল হলো তাইতো অনেকদিন হয়ে গেল, গৌরী না জানি এতদিনে কত বড়টিই হয়েছে,

সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তাঁর মনে হলো, আচ্ছা অনেকদিন তো হলো, রাত্রের আগে তো আর গৌরীর দেখা পাওয়া যাবে না। যদি নদীর ঘাটের কাছে লুকিয়ে বসে থাকা যায় তা হলে তো বেশ হয়। জল ভরতে এলে তখনই দেখে নেওয়া যাবে। আর যদি পার্বতী তাকে দেখেই ফেলে, তাহলে সে তাকে চিনতে পারে কিনা সেটাও একবার পরীক্ষা হয়ে যাবে—এই বলে মহাদেব গিয়ে হাজির হলেন গিরিপুরে :

তখন কৈলাস পুরে, দেব দেব মহেশ্বরে
ভবানীর কথা পড়ে মনে।
দেখিবারে ভগবতী, চঞ্চল হইল মতি
পশুপতি উঠিলেন তখনে ॥
পূর্বে তপ ব্রহ্মচারী, হইয়্যাছে বল্কলধারী
বৃষপরি হইয়্যাছে আসন।
গিরীন্দ্রপুরেতে আসি, উদয় হইল উল্লাসী
ছল করে ছলিবার মন ॥
জটায়ে লোটায়ে পরে, বাতাসেতে দন্ত লড়ে
মুখে রাম রাম বলে কামিনীদল কুতুহলে।
(আরও) কামিনী মহলে উত্তরিলা গিয়া, সন্ন্যাসীকে নেহারিয়া
সব সখী মিলিত হইয়্যা ভয়ে।
নিকটেতে গিয়া হর, নিশ্চসেতে বাঘাম্বর
হাসিয়া হাসিয়া শুইয়্যা রয় ॥
অজানিল ভিটে ছটা, কপালে রুধির ফোঁটা
রুধির অগ্রে চন্দ্রভালে।
খুলে ফেলে বাঘাম্বর, করিল বসন রক্তাম্বর
পরিল রুদ্রাক্ষের মালা গলে ॥
কন্যা এলো শব্দ শুনি, রাণী দুঃখে ভাসেন ধনী
কেন্দে কয় সখী সনে গিয়ে।
ওগো এই বেলা অবশেষে, পেয়ে অশেষ গর্ভক্লেশে
বৃদ্ধকালে প্রসবিলাম মেয়ে ॥
গৌরী আমার সোনার মেয়ে, তার ভাগ্যে এই বিয়ে
এত আমার কপালের লিখন ॥

শিব দেখলেন এতো ব্যাপার বড় খারাপ, এরা তো জামাই বলে চিনতেই পেরেছে, শেষটায় কি রাজবাড়ির লোকজন এসে মারধোরই করে কিনা কে জানে ? তাই স্মরণাপন্ন হতে হলো নারদ মুনির। তাঁকে অনেকক্ষণ দেখিনি। নারদ সর্বকর্মে বৃহস্পতি ; কাজেই তিনি থাকতে আর ভাবনা কী ?

শিব বইল্যাছে নারদ মুনি, শোন দিয়া মোন
তোমার মতন ভাইগ্না নাই এ ত্রিভুবন।
তুমি সঙ্গে থাকলে পরে নারদ সব করতে পারে
পারে সে অসাধ্যসাধন ॥
(এত বলি) হাসিয়া বলেরে নারদ, বিয়া করবা তুমি
অবশ্য তোমার বিয়া দিয়া দিব আমি।
এত বলি নারদ মুনি করিল যে গমন
সীমান্তের পারে গিয়া দিল দরশন ॥
হাসিয়া বলেরে নারদ বেটার বড় সখ
বৃদ্ধকালে করবি বিয়া বড় তার রস।
বৃদ্ধ হয়েছিস বেটা পরনের ছাল পড়ে লোটাইয়্যা
তবু বিয়া করতে চাস ॥
এতেক বলিয়া নারদ করিলা গমন
গিরি রাজার পুরে গিয়া দিল দরশন।
নারদ বলে শোনরে গিরি তোমার কাছে এসেছি
তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র একটি পেয়েছি ॥
গিরি বলে শোন মুনি শোন দিয়া মোন
রূপে গুণে কেমন পাত্র কহ বিবরণ।
মুনি বলে শোন গিরি কোন দোষ নাই
তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র তিনিই নিশ্চয় ॥
এইরূপে ঠিক করিয়া মুনি উপনীত শিবের নিকট
শিবের নিকটে গিয়া সব করিল বর্ণন।
শোন বলি ওগো মামা বিলম্ব আর কেন
বিয়ার সাজে সাজিবে তুমি এখন ॥
(তখন) ভূত প্রেত নিয়া সঙ্গে বরযাত্রী চলে রঙ্গে
দেখে সবে লাগে চমৎকার।

শিব চইল্যাছে বিয়া করতে নারদ চলে সাথে সাথে
দ্যাখতে আসে নারীগণ সব।।
দ্যাখতে আসে গিরিরাণী আউল্যাকেশী আন্নাকালী
আরও যারা যারা রয়।
তখন দক্ষ বলে হেসে হেসে শোনরে নারদ বলি যে তোরে
দন্ত লড়া বুড়া জামাই ক্যান?
এই যদি তোর যোগ্য হয় অযোগ্য তয় কিবা রয়
যোগ্যাযোগ্য তোর কোন জ্ঞান নাই?
তুইত মুনি বেজায় ঠেটা সর্বকার্যে বাধাস ল্যাঠা
এখন ঠ্যালা সামলান দায়।
এদিকেতে দক্ষপুরে স্ত্রী-আচার করিবার কালে
নারীগণ সব বলাবলি করে।
(ও সে) কী খাইয়্যা, কী দেখিয়্যা সোনার প্রতিমা মাইয়্যা
ত্রি-লোকের এই বুইড়ার হাতে দিল।
গৌরীর হবে যখন বয়সকাল বরের আসবে দীর্ঘকাল
কালরক্ষা ক্যামনে হবে লো।।
আবার তালুক মদন উঠবে লাটে বর যাবে যে শ্মানঘাটে
লাটের খাজনা কে যোগাবে লো?
(আবার) বাকী পরা মহাল হলে কত লোকে কত বলে
(আবার) বন্দবস্তের কথা কেউ বলে লো।।
(আবার) মদন রাজা করবে তসিল, কে করবে তার খাজনা হাসিল
গৌরীর বয়স রক্ষা ক্যামনে হবে লো?
(ও তার) কফেতে বুক ঘড়ঘড় করে আইছে একটা দামড়ায় চইড়ে
হাইট্যা আইলে যাইত বুড়া মইর‍্যা।
(তখন) নারদ মুনি রাইগ্যা কয় শোন বলি মহাশয়
আবোল তাবোল বল কাকে তোমরা?
এ যে দেবের দেব মৃত্যুঞ্জয় শমনকে করে পরাজয়
কইন্যা বিধবা হইলে কহিও আমায়।

নীল, গাজন, গম্ভীরা ও গমীরা পর্বের সাথে সাথেই শেষ হলো বাংলার চৈত্র-উৎসব তথা শৈবানুষ্ঠান সে বছরের মতো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেছেনীর গান

জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলে দেখা যায় চৈত্র বৈশাখ মাসের দিনে সেখানকার মেয়েরা তিস্তাবুড়ি (তিস্তানদী) ও লক্ষ্মীর পূজা করছে। তারা তিস্তাবুড়ি বা লক্ষ্মীর নাম দিয়ে একটি মূর্তিতে সিঁদুর লেপে একটা নতুন কাপড় জড়িয়ে বেঁধে নিয়ে আসে কোনো এক গৃহস্থ বাড়িতে, গৃহস্থ বধূরাও মহাভক্তি সহকারে এই দেবীকে বসবার জন্য একটি পিঁড়ি পেতে দেয় তাদের পরিচ্ছন্ন উঠানের মাঝে। এরপর একটি ছাতা মেলে ধরে ঠাকুরের মাথায়, আর দুঘটি জল ঢেলে দেয় শুকনা উঠানের মাঝে। এইবার সেই জলকাদার মধ্যে দেবীর সম্মুখে (লক্ষ্মীর) শুরু হবে নাচের পালা, কাজেই দলের যারা যারা নাচিয়ে তারা এইবার দেবীর সম্মুখে এগিয়ে এল। বাকী মেয়েরা শুরু করে দিল গান। এ গানকেই এ অঞ্চলে নাম দিয়েছে 'মেছেনীর গান' বা 'ভেদেই খেলি'। প্রকৃতপক্ষে এই তিস্তাবুড়ির (লক্ষ্মী) পূজা শষ্যদেবীর পূজা ছাড়া আর কিছুই নয়। শষ্যের বীজ বপন থেকে শষা গোলায় তোলা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের গীতই প্রচলিত আছে। এর প্রতিটি গানের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বনস্পতির সংগে একটা সম্পর্ক আছে এর। পূর্ববংগে যেমন 'নৈলা' গান বা 'মেঘারাণী'র গানের প্রচলন আছে, জলপাইগুড়িতেও তেমনই এই 'মেছেনীর গান' (লক্ষ্মীর) ও নৃত্য-গীত সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সব চাইতে অপূর্ব হলো এই সব নাচিয়ে মেয়েদের পায়ের তাল!

উঠানটি জলে ভিজে বেশ পিছল হয়ে গেছে। আর মেয়েরা সেই ভিজে পিছল মাটির উপর থেকে পা না তুলেই বরফের উপর skating করার মতো এক এক তালে দুটি পা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই নাচের সাথে সাঁওতালী, বিশেষ করে তিব্বতীদের নাচের কিছুটা ছাপ লক্ষ্য করা যায়। মেয়েরা কাপড়ের কোঁচাটা (শাড়ির এক অংশ) ধরে কুলোয় ধান ঝাড়ার ভংগীতে নাচতে নাচতে ঘুরতে থাকে। অন্ততঃপক্ষে পনের কুড়িজন মেয়ে এ গানে অংশগ্রহণ করে অথচ আশ্চর্য সকলের গলা যেন একই সুরে বাঁধা এতটুকু বে-সুরো হবার সম্ভাবনা নেই। এ

প্রথাটি এ অঞ্চলের বহু কালের ব্যাপার, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে যে-সব গান শোনা যায় তার ভিতরও আদিরসের যথেষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়।

একটি বউ যেন আক্ষেপ করে বলছে, উচ্ছের গাছ তো অনেকই লাগালাম, সেই গাছে আমার যে-ননদিনী সে জল দিল, তবুও উচ্ছে আমার উপর প্রসন্ন হলো না। আমিও গণ্ডা চারেক তুললাম। শাশুড়ী লবণ, তেল দিয়ে রাঁধলেন। আমি ঘিয়ে ভাজলাম। শ্বশুর খেয়ে খুব ভাল বললেন। কিন্তু হায়রে উচ্ছে! আমার জীবন-সর্বস্ব যে-স্বামী, তিনি এতে কোনো স্বাদই পেলেন না। তাই ভাবছি এখনই উচ্ছে রাঁধবার হাঁড়িটাকে আছড়ে ভেংগে ফেলব। কারণ, এই উচ্ছেই আমার সংগে শত্রুতা করেছে:

করলা গড়িনু সারিগে সারি
সেও করলা মোর নন্দে ছেকে পানি
করলা না মোর কে॥
শ্বশুরে দিলেক ঝিকোর ঝাটালি
ভাশুরে দিলেক ঝাংগতে ওঠেয়া॥
শাশুড়ী তুলে ঢাকিরে চারিক
হামরা তুলি গণ্ডা চারিক॥
শাশুড়ী আন্ধে নুনেরে তেলে
হামরা ওঠাই ঘিয়েতে ভাজিয়া॥
শ্বশুরে খালেক সোয়াদ কে পালেক
শিরের সোয়ামী খালেক
সোয়াদ না পালেক॥
করলার পাইলা ডিকিয়া ভাংগি মারে॥

এ গানটি অতি সাধারণ মনের অতি সাধারণ কথা। দরিদ্র চাষীবাসী মানুষ, তাদের ঘরে পোলাও মাংসের কথা বা বিশেষ ধরনের কোনো মিষ্টান্নের কথা থাকাটা সম্ভব নয়। এর মারফৎই জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান সেই সংগে তাদের আশা আকাংখার কথাও জানা যায়। কিন্তু এই ধরনের গানই সব নয়। এইবার আপনাদের কাছে এই প্রসংগে আর একটি গান পরিবেশন করছি; এ গানটির স্বাভাবিক অর্থ হলো এক, কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাব হলো অন্য রকম।

মনে করুন, একটি বউ যেন তার বাগানের লংকা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে

বলছে, 'আমার লঙ্কার গাছগুলো খুব ঘনঘন হয়েছে, তাতে লংকাও হয়েছে প্রচুর পরিমাণে, গাছে হাত দেওয়া মাত্রই গাছ ঝুলে পড়ছে, ভাগ্নে এসে ধান ঝেড়ে দিয়ে যাক। ভাগ্নে কোথায় গেছে খবর পাচ্ছি না। কলাপাতা নিয়ে এসো তাতে লিখে খবর জানব (আগের দিনে কাগজের পরিবর্তে ভূর্জপত্র কিংবা কলাপাতায় লেখা হতো)। অন্য সকলের ভাগ্নে যেখানে খুসী ধান বুনুক; অথবা অন্য কিছু করুক, কিন্তু আমার ভাগ্নে আমার এখানে এসে ধান বুনুক ও তুলুক':

মরুচের গাছ কিনা থাগড়া থুগড়ী
ফল বিস্তর ধরে।
হাত বাড়াইতে মরুচের গাছ
হালিয়া ঢুলিয়া পড়ে ॥
(ভাগিনা ধান মারিয়া দে)
ভাগিনা গেইসে অনেক দূর
খবরে নাই পাই।
আনত পুরিস্তির পাত নেখিয়া পেঠাই।
(ভাগিনা ধান মারিয়া দে)
সগার ভাগিনা ধান মারে
আথারে পাথারে
মোর ভাগিনা ধান মারে
মোর মন্দির ঘরে ॥

কিন্তু উল্লিখিত গানটি মূলতঃই পরকীয়া প্রেমের উপর ভিত্তি করেই রচিত। একটি বউ তার ভাগ্নের প্রেমে পড়েছে, সে মুখে কিছুই বলতে পারছে না। দুঃখ করে আঁচে ইসারায় বলছে, 'লংকার গাছে যেমন অনেক লংকা হয়েছে তেমনি আমারও অনেকগুলো ছেলে মেয়ে হয়েছে। লংকা গাছগুলিতে এত বেশি লংকা হয়েছে, যার জন্য হাত বাড়াবার সাথে সাথেই গাছ আপনি ঝুলে পড়ছে, তেমনি আমারও যদিও ছেলে মেয়ে হয়েছে, তবুও ভাগ্নে এসে যদি ডাক দেয় তবে আমি তার দিকেই ঝুঁকে পড়বো। আমার প্রাণের ভাগ্নে কোথায় গেছে জানি না। কাগজ আন তাকে লিখে দেই আসবার জন্য। অন্যের ভাগ্নে যেখানে খুসী যাক তাতে আমার কিছুমাত্র যায় আসে না, কিন্তু আমার ভাগ্নে এসে আমার হৃদয় মনপ্রাণ জুড়ে বসে থাক'।

শুধু এ গানটি নয়, জলপাইগুড়ির যাবতীয় গানের পর্যালোচনা করলে এ কথাই প্রমাণিত হবে, এখানকার প্রায় সবগানই আদিবাসী সমাজের কাছ ঘেঁযা। উল্লিখিত গীতটি এখনও পশ্চিম বা পূর্ববঙ্গের শ্যামল ভূমিতে এসে পৌঁছায়নি ; তা হলে হয়তো দেখা যেত এই গানই রাধাকৃষ্ণের খোলসের আড়ালে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটু চেষ্টা করলেই বৌটিকে আয়ান ঘোষ পত্নী রাধিকা এবং ভাগ্নেকে শ্রীকৃষ্ণরূপে বর্ণনা করতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হবে না।

এসব দিক থেকে বিচার করলে এক কথায় বলা চলে, জলপাইগুড়ি বাংলারই অন্যতম অংশ হলেও এর লোকসংগীত ও সংস্কৃতি এখনও আদিবাসী সমাজের কাছ থেকে একেবারে দূরে সরে যেতে পারে নি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[হুদুমা ও মেঘারাণীর গান]

হুদুমা

জলপাইগুড়ি প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে অনাবৃষ্টির সময় মেয়েদের ভিতর বরুণ (মেঘ) দেবতার উদ্দেশ্যে এক রকম গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলে 'হুদুমা'।

'হুদুমা' হলো বরুণদেবের গ্রাম্য নাম। এ হলো নৃত্য-সম্বলিত গীত। নাচ ছাড়া এ গান হয় না। এ গানের গায়ন বিধি এবং নৃত্যের ভিতর বহু বিধি-নিষেধ আরোপিত আছে।

দেশে যখন অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তখন অমাবস্যার নিশীতে কয়েক বাড়ির বৌ-ঝিরা একটি মাঠের মাঝে এসে জড়ো হয়। তারপর তারা তাদের বেশ-বাস সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে, মাথার চুল আলুলায়িত করে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে এক বাড়িতে গিয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ির আলো সব নিভে যায় বাড়ীতে পুরুষ কেউ থাকলে দূর থেকে ঐ হুদুমা-দলের আগমন সংবাদ শুনেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। হুদুমা-দলের মেয়েরা নগ্ন অবস্থায়ই সেই বাড়িতে এসে শুরু করে নৃত্য ও গীত, পরে সে স্থান পরিত্যাগ করে গান গাইতে গাইতে গিয়ে উপস্থিত হয় অন্য বাড়িতে। এই ভাবে তারা গোটা পাড়াটা প্রদক্ষিণ করে অন্ধকার ফিকে হবার পূর্বেই ফিরে চলে যায় যেখানে রেখে এসেছিল তাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি।

এ নৃত্য-গীতের বৈশিষ্ট্য হলো কোনো পুরুষ এমন কি তিন বছরের বালকের সামনেও এ নৃত্য প্রদর্শন বা এ গানও গাওয়া চলবে না। এই হুদুমা নৃত্য ও গীতের সময় আলো জ্বালাও নিষেধ। যদি কোনো পুরুষ লুকিয়ে চুরিয়ে কোনো ভাবে এ নাচ বা গান দেখতে বা শুনতে পায়, তবেই তার পক্ষে এ নাচ বা গান দেখা ও শোনা সম্ভব।

এ গানের মূল বক্তব্য হলো হুদুমা অর্থাৎ বরুণদেব—যিনি হলেন বৃষ্টির দেবতা তাঁর কাছে মেয়েদের প্রার্থনা, 'এই তাপিত ধরিত্রীকে শীতল কর'।

কিন্তু গানের বাণী নিয়ে আলোচনা করলে হঠাৎ যে-কোনো লোকেরই এ-গান গুলিকে অশ্লীল অথবা আদিরসাত্মক বলে ভ্রম হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। কিন্তু এ-গানের মূল তত্ত্ব বিচার করলে শুধু গীতিকারদের গানেরই প্রশংসা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সূক্ষ্ম মর্মবোধেরও প্রশংসা না করে পারা যায় না।

মেয়েরা বলছে, 'আমার সমস্ত শরীর শিরশির করছে, কোমরটাও তদ্রূপ এ অবস্থায় কোথায় গেলেইবা বরুণদেবের সাক্ষাৎ পাই? আমার পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্যন্ত এই নিদারুণ গরমে খসে পড়ে যাচ্ছে, হে হুদুমা (বরুণদেব) তুমি কোথায় আছ? তোমার জন্যই তো আমি অপেক্ষা করে রয়েছি। আমার কোমরটা এখন কট্‌কট্‌ করছে, এর উপর আমার স্বামীও বাড়িতে নেই, সুতরাং বরুণদেব যদি এখন আসেন, তা হলে আমার এই তাপিত দেহটা শীতল হয়':

হিল হিলাছে কমরটা মোর
শির শিরাছে গাও।
কোণ্ঠে কেনা গেলে এলা
হুদুমা দেখা পাও॥
পাটানি খানি পড়েছে খসিয়া
(হুদুমা দেখা দেওগে আসিয়া)
আইসক রে হুদুমা দেওয়া
(রসিয়া রসিয়া)
তোর পদে মুই আছে বসিয়া॥
ডিংসালি ডিংসালি কমরটা
তাতেও নাই মোর ভাতারটা,
কর কি মুই কায়বা:কয়
কোণ্ঠে গেলে দেখা হয়
দেখা হলে দেহটা জুড়ায়॥

এখানে নারীগণ হলো পৃথিবীর প্রতীক, আর হুদুমা হলো উপপতি। গানটির হঠাৎ মানে করলে মনে হয়, কোনো নারী যেন তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার উপপতিকে আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থ হলো মানুষের শরীর যেমন শীতল হয় তার প্রাণবল্লভের আলিঙ্গনে, তেমনি হুদুমার (বরুণদেব) আবির্ভাবেও পৃথিবী শীতল হয়, বসুন্ধরা হয়ে উঠে উর্বরা।

পণ্ডিতগণ হয়তো এর ভিতর অনার্য সংস্কৃতির ছাপ দেখতে পাবেন, কিন্তু আশ্চর্য এ প্রথা জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলে এখনও প্রচলিত, স্থানীয় অধিবাসীরা একে অশ্লীল কখনও মনে করেনা। বরং একেও তাদের একটা লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই গণ্য করে থাকে।

মেঘারাণীর ব্রত ও গান

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ যায় অথচ দেশে এক ফোঁটা বৃষ্টির নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। এমন কি মেঘশূন্য নির্মল আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ পর্যন্ত দেখা যায় না। অজন্মার হাত থেকে রক্ষা পাবার বুঝি আর কোনো উপায়ই নেই। ঠিক এই বিশেষ মুহূর্তে কৃষাণ ঘরের মেয়ে ও অল্প বয়সী বৌদের দেখা যায় 'মেঘারাণীর কুলো' নামাতে।

কুলো, জলঘট প্রভৃতি নিয়ে তারা দলে দলে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায়, কখনও বা ছোটখাট নাচও দেখায়। শেষটায় একঘটি জল ঢেলে দেয় উঠানের মাঝে বা ছোনের ঘর থাকলে তার কাঙ্গিতে—এ হলো বৃষ্টির প্রতীক। গান গেয়ে তারা পায় চাল, তেল, সিঁদুর, কখনও বা দু-চারটে পয়সা এবং পান সুপারী।

কেউ সাতদিন, কেউ তিন দিনের জন্য কুলো নামায়। সাধারণতঃ এই কুলো বইবার ভার থাকে 'এক মায়ের এক ঝিয়ের' ওপর। কোথাও কোথাও বেঙ্গাবেঙ্গির বিয়ে দেওয়ারও রেওয়াজ আছে। গৃহস্থ বাড়িতে এই দল গেলেই গৃহলক্ষ্মীরা উলুধ্বনি সহকারে তাদের বরণ করে নেয়, উঠানে পেতে দেয় পরিস্কার পিঁড়ি। তারাও কুলো, জলঘট, সেই পিঁড়ির উপর বসিয়ে দিয়ে গান জুড়ে দেয় :

হ্যাদে লো বুন ম্যাঘারাণী,
হাত পাও ধুইয়া ফ্যালাও পানী।
ছোট ভুঁইতে চিন্ চিনানী
বড় ভুঁইতে হাটুপানী।
ম্যাঘারানীর ঘরখানি পাথরের মাঝে
হেই বৃষ্টি লামেলো ঝাঁকে ঝাঁকে।
কাইল্যা ম্যাঘা ধইল্যা ম্যাঘা বাড়ি আছ নি ?
গোলায় আছে বীজধান বুনাইতে পায় নি ?

এই ভাবেই তারা বছরের পর বছর ধরে মেঘারানীর গান গায়, ব্রত করে। ব্রত উদ্‌যাপনের দিন তাদের দেখা যায় কোনো এক খোলা মাঠের মাঝে বসে মেঘারানীর ব্রত করতে। এদের মধ্যে বয়সে যিনি প্রাচীনা তিনিই হন দলনেত্রী। এর জন্য পুরোহিতের দরকার হয়না। 'ক্ষেত্র ব্রতে'র মতোই দল-নেত্রীই মেঘারানীর ব্রতের গল্প করেন।

ব্রতীর দল হাতে দূর্বা নিয়ে নীরব আগ্রহে, পরম ভক্তি সহকারে শুনতে থাকে ব্রত কথা। শেষটায় সাঁঝবাতি দিয়ে করে অনুষ্ঠান সমাপন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঝুমুর

বাংলায় ঝুমুর গান সাধারণতঃ গাওয়া হয় রাধাকৃষ্ণের ঝুলন-যাত্রা উপলক্ষ্যে। তাই এর গানগুলিও প্রাধানতঃ রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন কথা নিয়েই রচিত। কিন্তু পণ্ডিতগণের মতে ঝুমুরের উৎপত্তি হলো সাঁওতালী গান থেকে। ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা জেলায় আদিবাসীদের ভিতর মাদল ও বাঁশীর সঙ্গে এক প্রকারের গীত গাওয়া হয় তার নাম ঝুমুর। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে ছোটনাগপুর ও পশ্চিমে মধ্য প্রদেশের পূর্বভাগ পর্যন্ত আদিবাসী সমাজে এই ঝুমুর গান প্রচলিত। তবে সাঁওতাল জাতির একাংশের মধ্যেই এ গান সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বলে মনে হতে পারে। তবে সাঁওতালী ঝুমুর গানগুলি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু মানভূমের বাংলা ঝুমুর মোটেই সংক্ষিপ্ত তো নয়ই, বরং অনেক জায়গায় দীর্ঘ বলেও মনে হতে পারে। বীরভূমের ঝুমুর মানভূমের ঝুমুরেরই অনুরূপ। মানভূম আর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বীরভূম বা পশ্চিম বর্ধমানে যে ঝুমুর প্রচলিত তার ভিতর পার্থক্য অতি সামান্যই।

সাঁওতালী ঝুমুর সাধারণতঃ গাওয়া হয় মাদল এবং বাঁশী সহযোগে একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু মানভূমের বাংলা ঝুমুরে, বীরভূম, বাঁকুড়ার মতোই খোল, করতালও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় এতে কীর্তনের সুরও বেশ পরিমাণে পাওয়া যায়।

বাংলার ঝুমুর গান রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলন কথা নিয়ে রচিত হলেও যে কোনো লৌকিক বিষয় নিয়েই ঝুমুর গান রচিত হতে পারে। তবে প্রেম-ভালবাসার বিষয়ই এর ভিতর প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। পণ্ডিতগণের মতে সাঁওতালী ঝুমুরের প্রেম ও ভালবাসার গীতই বাংলার সীমানায় প্রবেশ করে রাধা-কৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমে পরিণতি লাভ করেছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, যে-কোনো লৌকিক বিষয় নিয়েই ঝুমুর গান রচিত হতে পারে, সুতরাং এর ভিতর শুধুমাত্র প্রেম ও ভালবাসার কথাই নয়, অনেক সময় সামাজিক, রাজনৈতিক খবরাখবরও পাওয়া যায়। ব্যঙ্গগীতিও

এর থেকে বাদ যায় না। অবশ্য এই ধরনের গান বেশির ভাগই মানভূম অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

ঝুমুর গানকে আমরা মোটামুটিভাবে ভাদরিয়া, সিঁদুরিয়া ও আধ্যাত্মিক এই তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। তাছাড়া কাজের সুবিধার জন্য আমরা আদিবাসীদের ঝুমুর ও সাঁওতালী ঝুমুরকে পৃথক ভাবেও দেখাতে পারি। কিন্তু যে-হেতু ঝুমুর গান লোক-কবিদেরই রচনা, এবং এ-গান যখন হয় তখন একত্রেই সকলে বসে রস আহরণ করে, সেইহেতু আমরা আর সে চেষ্টা না করে একত্রই উপস্থিত করছি। বাংলা ঝুমুর পদকর্তাদের ভিতর মানভূমের ভবপ্রীতানন্দ, গৌরাঙ্গী, রামচরণ ও ভরতের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু এঁরা ছাড়াও অনামী পদকর্তাদের সংখ্যা যে কত তা গুনে শেষ করা সম্ভব নয়।

মনে করা যাক শ্রীরাধিকা আজ অগুরু-চন্দন দিয়ে সেজেছেন। সোনালী পালংকের উপর রেশমী শাড়ী পরে গলায় দুলিয়ে কুসুম হার, চোখে দিয়ে মায়া-অঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ দরশন আশায় বসে আছেন। এমন মেঘলা যামিনীতে শূন্য-বিছানায় কেমন করেই বা তিনি রাত কাটাবেন :

আঁধারি ভাদর রাতি, দেখিয়া তড়পে ছাতি
পতি নাহি পালংকের উপর।
(সখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে)।।
একে তো অবলা বালা দোসরে যৌবন জ্বালা
কেমনে রহিব শূন্য ঘরে।
(সখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে) ॥
শুন শুন সহচারী তো-দিগে বিনয় করি
বাঁচাও আনিয়া সে নাগরে।
(সখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে)।।

ঠিক এই ধরনের গান আদিবাসীদের ভিতরও শোনা যায়। কোনো যুবতীর প্রাণপতি সেই ভোরে মোরগ ডাকবার সাথে সাথেই টাঙ্গি ঘাড়ে নিয়ে পাতার তৈরী বিড়ি টানতে টানতে কাজে চলে গেছে। এখন অনেক বেলা হয়েছে, ভাত খাবার সময় হয়েছে এখনও সে ফিরে আসছেনা, কে জানে কোথায় গেছে তার প্রাণবঁধু :

টাঙ্গিয়া ঝল্‌কায় লাগর যাছন্‌ গো।
বাইরলেন কুঁকড়ী (মোরগ) ডাকে

সোজা গেলেন কুলীর বাটে
চুটিয়া ফুঁকিয়া গো।

ভাত খাবার বেলা হল্য
এখনো লাগর না আইল
কোন্ বাটে কেন্দ যাছেন গো
মহুল বনে গো।

মানভূমের পল্লীর মধ্যে ঘেরিয়া, মাঝি, মাহাতো, ভুঞা প্রভৃতি যে-সব আদিবাসীদের বাস আছে, উল্লিখিত গীতটি ঐ শ্রেণীর কৃষাণ কুমারীদের গাইতে শোনা যায়। এ-সব গান প্রেম-ভালবাসার গান বলেই পরিচিত। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে দুচারজন অবিবাহিত যুবক থাকে। মাথায় তারা বাবড়ী চুল রাখে। বাঁশী বাজায়। কিশোরীদের সংগে প্রেম করে বেড়ায়। এদের বলে 'রসক্যা', 'রসিক' বা 'রসিয়া'। স্থানীয় লোকে কিশোরীদের সংগে রসিয়াদের প্রেমপ্রীতি ক্ষমার চোখে দেখে থাকে। পূর্বোক্ত গানটি যদি আর একটু সুসংস্কৃত হতো তা হলেই বাংলায় এসে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রীরাধিকার ক্ষেদোক্তি বলে বর্ণনা করা খুব বেশি অসম্ভব কাজ হতোনা।

রাত্রির তৃতীয় যাম প্রায় অতিক্রান্ত। শ্রীরাধিকা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণ 'দরশন বিনে' জগৎ সংসার সবই তাঁর কাছে নিরর্থক বলে মনে হচ্ছে। বাইরে আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে পূর্ণচন্দ্রের অকৃপণ জ্যোছনা। বন-প্রান্তর মুখর হয়ে উঠেছে সেই আলোর জোয়ারে। কুঞ্জে কুঞ্জে ডেকে উঠলো কোকিল। কিন্তু সে কী শুধু শ্রীরাধার মনে ব্যথা জাগাবার জন্যই? এমন যে চাঁদনী রাত সবই কী বিফলে যাবে? তাঁর প্রাণবঁধু কি সত্যিই আর আসবে না:

হের সহচরী যায় বিভাবরী
এলো না কপটের মূল রে!
কোকিল কুহরে, বিঁধিছে অন্তরে
মদন বিরহ শূলরে॥
এলোনা ত্রিভংগ শ্যাম পরাণ আকুল রে॥
সুমধুর স্বরে, ভ্রমর গুঞ্জরে
কুঞ্জে চুমি নব ফুল রে।

সুধাকর কর অনল প্রখর
গরল ভেল তাম্বুল রে ॥
অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক যেমন
সাপিনী নিল দুকুল রে।
কণ্টক সমান শয্যা অনুমান
দহিছে কুঞ্জ মঞ্জুল রে ॥
মরি যার তরে সে মজিল পরে
পর প্রেমে প্রেমাকুল।
ভবপ্রীতা ভণে মানস দর্পনে
হেরি সে রূপ অতুল ॥

শ্রীরাধিকার মনের অবস্থা যখন এই রকম, কুসুম শয্যা যার কাছে কণ্টক শয্যা, কোকিলের ডাক কাকের ডাকের মতোই কর্কশ রূঢ়, অঙ্গের ভূষণ বৃশ্চিক দংশন সদৃশ, সখী ললিতা তখন সহজ সরল ভাবে শ্রীরাধিকার মনের এই ভাবকে অবলম্বন করে বলতে থাকেন :

ঝিঙা ফুলে লিলেক জাতি কুল গো
পিরীতি হইল শূল।
বর্ণ ছিল চাঁপার কলি
ভাইবে ভাইবে হলাম কালি
কালার এ পিরীত আমার
ডুবাল দু কুল।
(গো পিরীতি হৈল শূল) ॥
একে আমার জীর্ণ তরী
তায় চাইপাছেন বংশীধারী
মাঝখানে লাগায় তরী
ডুবাল দুকুল
(গো পিরীতি হৈল শূল) ॥

এই ধরনের গান বীরভূমের ঝুমুরিয়াদের ভিতরও শোনা যায় :

কালার গুণের কথা
বলবো তোরে কি তা,

বলবো কি বল আর তোরে
জলকে যাই ছল করে,
যমুনার ওই তীরে
কলসী কাঁখে ধীরে ধীরে

নন্দী চোরা নামটি ধরে বেড়ায় ঘুরে—
আবার ও কদম তলায় চুপটি করে
বসে থাকে গোপিনীদের বসন হরে।

কালো শশী বাজায় বাঁশী
সকল কাজে সকাল সাঁঝে
প্রাণ আমার হায় হয় উদাসী
মন বসে না আর ঘরে।

চাঁদ পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে। রাত্রি অবসানের আর বড় বেশি বাকী নেই। এখনও সেই 'নিঠুর কালিয়া' দেখা দিল না—এ যাতনা কি প্রাণে সহ্য হয়? তারতো এখন জীবন-মরণ সবই সমান। আর একটু পরেইতো পূর্বাকাশে লোহিত-ভানুর উদয় হবে, মুখর হয়ে উঠবে বিশ্ব চরাচর। নিষ্ফল হলো শ্রীরাধিকার বাসর-সজ্জা। মনের আক্ষেপে সহচারীদের উপর কঠোর আদেশ জারি করলেন—যদি 'নিঠুর কালিয়া' আর কখনও আমার কুঞ্জদ্বারে আসে তাহলে তাকে যেন দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়:

হেরলো সজনী ভেল প্রভাতী
শীতল সমীরে শিহরে অতি
দোলে তরুপাত ডাকিছে বিহঙ্গ জানিয়া।

সুন্দর সিন্দুর রাশিলো যেমন,
শ্যামাঙ্গী বসুধা সীমন্তে শোভন
অরুণ কিরণ দিল ঢালিয়া॥

এখনও না এলো কালিয়া
লম্পট বন মালিয়া॥

সরোবরে যায় কুলবালাগণ,
নিশা জাগরণে অলস নয়ন
চঞ্চল চরণ ঘুম ঘোরে যায় টলিয়া।

ভ্রমর নিকর মধুপান তরে
নলিনী কানন অন্বেষণ করে
গুন্‌গুন্‌ স্বরে মন প্রাণ লয় কাড়িয়া ॥
অস্তাচলে যায় রজনীরঞ্জন
কুমুদিনী করে নীরবে রোদন
যায় আঁখি নীরে নিশির শিশির ভাসিয়া।
চকোর চকোরী বসি দুঃখ মনে
চক্রবাক সুখী পিয়ার মিলনে
পতি দরশনে জাগে কমলিনী হাসিয়া ॥
যাও সহচরী থাক দ্বার দেশে
যদি সে কপট আসে নিশা শেষে
বলিও সরোষে 'যাও হেথা হতে চলিয়া'।
যায় ভাল তবু থাকে কিছু মান
নহে প্রতিশোধ করো অপমান
নহে সুবিধানে কহে ভব প্রীতা ভাবিয়া ॥

এদিকেতো রাই কমলিনীর এই অবস্থা। ওদিকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাটাও একটু ভাবুন। তিনি আজ রাধার কুঞ্জে আগমন কালে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গিয়ে আটকা পড়েছেন, আজ আর তাঁর নিস্তার নেই।

চন্দ্রাতো কম যায় না। সেতো বহুদিন আড়ি পেতে পেতে আজ নিজ বাহুপাশে বন্দী করেছে 'নিঠুর কালিয়া'কে। কাজেই তারপক্ষে বলা নিশ্চয়ই আর অসম্ভব নয়:

শ্যামকে রাখিব আদরে হে
হৃদয় মাঝারে ॥ (ধুঃ)
হেরি ও মুখচন্দ
লোকে-বলে ভালোমন্দ
প্রাণনাথ বিনা আমি যাব কোথা বলরে।
(সখী) আমি যাব কোথা বলরে।
শ্যামকে রাখিব আদরে হে। (ধুঃ)
কালার এ পিরীতি জ্বালা
আমার প্রাণে দেয় জ্বালা
হৃদয়ের আলা কালারে আনিয়া দেরে।

(তোরা) কালারে আনিয়া দেরে।
(সখী) কালারে আনিয়া দেবে।
শ্যামকে রাখিব আদরে (হে) (ধ্রুঃ)॥

শ্রীকৃষ্ণ এবার বেজায় জব্দ হয়েছেন। চন্দ্রাবলীর কাছে অনুনয়-বিনয় করে কোন ফলই হলো না। নিশিযাপন তাঁকে করতেই হলো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে। নিশাবসানে অতি দ্রুত গিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীরাধিকার কুঞ্জদ্বারে:

গত বিভাবরী নেহারী শ্রীহরি
পরিহরি নব কামিনী
আসি রাধা দ্বারে সভয়ে নেহারে—
কাছে বৃন্দা দ্বার-বাসিনী॥

শ্রীকৃষ্ণ একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে চুপি চুপি এগোতে চেষ্টা করলেন রাধাকুঞ্জের দিকে। কিন্তু রাধা-সখী বৃন্দা তো কম পাত্রী নন। লোক-কবি ভবপ্রীতানন্দ এবার শুধু বাংলা কথা ছেড়ে দিয়ে বাংলা ও হিন্দির সংমিশ্রণে গীত রচনা করে শ্রীকৃষ্ণকে চোর বলে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। পাঠকবর্গ এইবার একই সঙ্গে দুটো জিনিস লক্ষ্য করুন। একটা হলো লোক-কবিদের রসবোধ; অন্যদিকে যেহেতু হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলেও (মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগ পর্যন্ত) ঝুমুর গানের প্রসার রয়েছে, সেইহেতু কবি হিন্দী ভাষাভাষীদের জন্যও কিছু কিছু ঝুমুর গান রচনা করেছেন। শোনা যায় ভবপ্রীতানন্দের প্রায় অধিকাংশ বাংলা ঝুমুর গানই হিন্দীতে অনুদিত হয়েছে।

বৃন্দা তো শ্রীকৃষ্ণকে বলে বসলেন, 'কে বাবা এই শেষ রাতে সিঁদকাঠি হাতে নিয়ে চুরির মতলবে ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছ। তোমার মতলব তো বিশেষ ভাল বলে মনে হচ্ছে না। যাও না বাবা যেখানে রাত কাটিয়ে ছিলে সেখানেই। তুমি বাপু খুব সুবিধার লোক নও কিন্তু':

কৌন্ হো তুম্ কুছ মালুম
ইধর কঁহাসে আতে হো?
দ্বার সে মানা চোর সে মানা
আধ মুখড়া দেখলাতে হো।
হট্ যাও জী বংশীওয়ালে
কাহাকে অন্দর আতে হো?

কাহে লাঠি ক্যা সিধ কাঠি
হাতমে ক্যা দেখলাতে হো !
রাই রাজাকে ধন হরণেকে
চোরি মতলবলাতে হো
রাত কিয়া রং পরনারী সংগ
ভোর হুয়া পর আতে হো ;
পাহিরণ কালা বরণ ভি কালা
নখর দাগ দেখলাতে হো ।
রাত জাগরণ তাকে কারণ
লাল আঁখ চমকাতে হো,
রাতকা ডেরা যানা তেরা
বেহতর হুকুম যহপাতে হো !
ভবপ্রীতাচিত্ হরিপদ সে প্রীত
দুসরে সে কোঁ ভুলতে হো ।

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন, 'আমি কেন চোর হতে যাব ? আমি খুব ভাল লোক গো। হাতে দেখছ এতো মোহন বাঁশী, আর এই যে কপালে সিঁদুরের দাগ দেখছ এ হলো দেবী ভগবতীর পূজা করতে গিয়েছিলুম কিনা, তাইতো সিঁদুরের দাগ লেগেছে, আর বুকে যে ক্ষত চিহ্ন দেখছ, এ হলো দেবী পূজার জন্য পদ্ম ফুল তুলতে গিয়েছিলুম সেই পদ্মের কাঁটার ঘায়ে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। আর নীল রঙের কাপড় পরেছি কেন এই কথা জিজ্ঞেস করছ তো ? তা দেখ, রাতে কাপড়ের রং বাপু ঠিক করে উঠতে পারিনি। সত্যিই ভাই আমি চোরও নই বা বদমায়েসও নই, পক্ষান্তরে তোমার সখী শ্রীরাধিকারই একান্ত অনুগত ভক্ত' :

মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।
চিনিলেনা সহচরী আমি রাধার প্রহরী
দ্বারে থাকি ধরে অসি ঢাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥
সিঁদকাটি নয় রূপসী করেতে মোহন বাঁশী
রাধা নামে সাধা সদাকাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।
করিতে দেবীর পূজন করি কমল চয়ন

(তাই) কাঁটা দাগ হৃদয়ে বিশাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥
পূজে ছিলাম ভগবতী তাহার প্রসাদে দূতী
সিঁদুর কজ্জলে মাখা ভাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল।
অভিসারে নীল বাস আঁধারে নহেকো প্রকাশ
তাই পথ ভুলে এমন বেহাল
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ॥
ভবপ্রীতানন্দ ভনে, খেলে হৃদি বৃন্দাবনে
তাই কাঁটাদাগ হৃদয়ে বিশাল ॥

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। বৃন্দাদূতী যদিবা কোনো রকমে ভিতরে যাবার অনুমতি দিল তার বাক-চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে, কিন্তু শ্রীরাধার সেই ধনুকভাঙা পণ, 'কালোবদন আর হেরবো নাগো'।

শ্রীকৃষ্ণ অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন, নিজের দোষ স্খালনের জন্য অনেক কাহিনীর অবতারণা করলেন, কিন্তু না শ্রীরাধা সেই যে মুখ ফিরিয়ে রইলেন আর এদিকে ফিরেও তাকালেন না।

বেচারী শ্রীকৃষ্ণ! মনের দুঃখে ফিরে গিয়ে সখা সুবলের কাছে প্রকাশ করতে শুরু করলেন তার মনোবেদনা :

বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়
(সখী) বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায়।
দেইখ্যেছি তায় পথে ঘাটে জল আনিতে পুকুর ঘাটে
দেইখ্যে আমার হিয়া মাঝে
জল বরিষায়।
(সখী) বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায় ॥
হেরি ও মুখ চন্দ লোকে বলে ভালোমন্দ
আমি বলি বরাত মন্দ
নাহি যদি পাই।
(সখী) বঁধুর লাগি পরাণ রাখা দায় ॥

আর এদিকে? লোক-কবি কি শুধু শ্রীকৃষ্ণেরই মনোবেদনা প্রকাশ করে ক্ষান্ত হবে? শ্রীরাধা অভিমান করতে পারেন তাঁর প্রাণ-বঁধুর উপর, কিন্তু তাই

বলেতো আর রাগ করতে পারেন না। রাগ আর অভিমান এক জিনিস নয়। তা নইলে এর পরদিনই যমুনার ঘাটে জল আনতে গিয়ে শ্রীরাধাকে বলতে শুনব কেন ? :

যাইতে যমুনার জলে শ্রীরাধা সখীরে বলে
তরুতলে কালিয়া দাঁড়ায় (গো)
একাকী সে যাব যমুনায়। (ধুঃ)
দেখিলে যুবতী নারী শ্যাম বাজায় বাঁশুরী
আঁখি ঠারি রমণী ভুলায় (গো)
সেই ভ্রমর কালিয়া নারী ফুলে জড়াইয়া
অধর চুমিয়া মধু খায় গো
একাকী সে যাব যমুনায়। (ধুঃ)

এই ধরনের একটি সাঁওতালী ও বাংলার সংমিশ্রণে রচিত ঝুমুর গানের সন্ধান পাওয়া যায়। পাহাড়ী মেয়ের দল চলেছে ঝরণায় জল আনতে। এগানটিও একটু পরিশুদ্ধ করে নিলেই একে শ্রীরাধিকার সখীসহ জল আনতে যাওয়ার কথা বলে চালিয়ে দেওয়া খুব বেশি অসম্ভব হতো না :

পাহার কেট্যো আসে জল
চল মাঝিয়ান জলকে চল
ঝরণা বহে ঝুরু ঝুরু রে—
ঝরণা বহে ঝুরু ঝুরু রে।
মহুয়া গাছের ফুল ডগাতে
চাঁদ উঠেছে পাহাড় কেট্যো
ভুল্যেছে ওই মাতাল মেয়ের
দেখ্যে কাজল ভুরুরে।
মাতাল মেয়ের কাজল আঁকা ভুরু।
ধীরে ধীরে চলে মাঝিয়ান
বনে বনে খুঁজি তাহার পুঁতি
মাঝিন বলে, মাঝিন বলে,
আগুয়ান, আগুয়ান,
জংলা মেয়ের দলে

নাচের তালে তালে

নেশায় বিভোর হয়ে

ঢলে পড়ে রে

(তারা) ঢলে পড়ে, ঢলে পড়ে,

ঢলে পড়েরে।

বাংলায় একটা চলিত প্রবাদ আছে, 'বেদে চেনে সাপের হাঁ'। শ্রীকৃষ্ণও কি বুঝতে পারেন নি যে শ্রীরাধাও ঠিক তাঁরই মতো মনে মনে জ্বলে পুড়ে মরছেন। তাঁরও অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে 'শ্রীকৃষ্ণ দরশন আশে'। হয়তো এ কারণেই তিনিও আড়ি পেতেছিলেন যমুনার ঘাটের কোনো এক নিভৃত কোণে। ঝোপের আড়াল থেকে শ্রীরাধিকাকে দেখেই তার পক্ষে বলে ওঠা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়:

কত গরবে   চলেরে ধনী

যখন শীতে সিনানে যায়,

মনে হয় বুকটা   বিছায়ে দি

ধনী পা দিয়ে যাক তায়।

মাথায় কলসী,   কলসী কাঁকে

ঐ ঘুর্যো ঘুর্যো   চাইতে থাকে

ঘটল বিষম দায়।

যাকে এক কথায় বলে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ!

শ্রীরাধা বুঝেছেন, শ্রীকৃষ্ণ সত্যই তাঁর বিহনে শোকাতুর—এদিকে তার নিজের অবস্থাও তথৈবচ। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি আর কিইবা করতে পারেন? তাই হয়তো সখী ললিতার কাছে বলতে শুনি তার মনের বেদনা। লোক-কবি ভবপ্রীতানন্দ অতি সহজেই এই অসহনীয় পরিবেশের সমাপ্তি ঘটিয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা পেলেন:

রাধা রাধা নাম ধরে   বাঁশী ডাকে প্রেমভরে

ফুল শরে হিয়া বিঁধিল মদন গো,

ফুল শরে হিয়া বিঁধিল মদন।

কি করিবে কুল লাজ   পাই যদি রসরাজ

হৃদি মাঝে তারে ধরিব যতনে গো।

কহে রাধা উৎকণ্ঠিতা চল ত্বরা ও ললিতা

ভবপ্রীতা ভাবে সে নীল রতনে গো ॥

রাধা-কৃষ্ণের বিরহ-মিলন কথা, তাঁদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়েই যে অধিকাংশ ঝুমুর, বিশেষ করে বীরভূম ও বাঁকুড়ার গানগুলি রচিত একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু মানভূম অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা ঝুমুর গানে এ ছাড়াও জনসাধারণের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের কথা, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক খবরা-খবরও পাবেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন (১৯৩৯—১৯৪৫ খৃঃ অঃ) সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে মানভূমের জনসাধারণও কম অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। কাজেই যুদ্ধের হিড়িকে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই অভাব ঘটতে লাগল, তখন মানভূমের লোক-কবির দলও ঝুমুর গানের সুরে শোনাতে শুরু করল তাদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী :

সঘনে ছাড়ে নিঃশ্বাস ঘটিল কি সর্বনাশ

উপায় হারা হইল মমিন।

কেমনে কাটিবে এবার দিন (হে) ॥

(মনে মনে ভাবিছে মমিন) ॥

যদি বলে দিব সুতা দাম শুনে ধরে মাথা

হিসাব করিলে মূলে হীন (হে)।

টুপি, লুঙ্গি, জুতা, ছাতা সে সকল গেল কোথা

সুতার 'কটা'র বন্ধ করিল সরকার।

ভরত বলে সে পাওয়ার কি থাকে চিরকাল (হে) ॥

শুধু কি সরকারী অব্যবস্থা? সুদখোর মহাজনের অত্যাচারে দেশের চাষীবাসী মানুষেরও দুর্দশার একশেষ। চালের অভাবে, ক্ষুধার তাড়নায় ধানের জন্য মহাজনের বাড়ি ঘুরে ঘুরে হন্যে হয়ে পড়ে তারা :

এ বৎসর ভাদ্র আশ্বিনে, ঋণ না দেয় মহাজনে

হেন আকাল না দেখি নয়নে।

জীবন না যায় রে ধরা, টাকায় চাল পাঁচ সেরা

ঘুরে মরি চালের কারণে ॥

দিনে যদি চাল পায়, উপাস থাকি সন্ধ্যায়

ভুখে নিদ্রা না আসে নয়নে,

কেমনে বাঁচিবে প্রাণ, টাকায় তিন সের ধান
তনু ক্ষীণ অন্নের বিহনে ॥
কিন্তু যারা ধনবান, বিষম তাদের মনগুমান
দিবসে তারা দেখে নয়নে।
দেড়ি সুদে টাকা দিব, সুদে মূলে ধান লিব
যে দরে বিকাবে অগ্রহায়ণে ॥
মহাজনের বাসায়, যদি বা খাতক যায়
বসিতে না বলে কোন জনে।
তথাপি খাতকগণ, হয়ে দুঃখিত মন
বসে থাকে মলিন বদনে ॥
কি কারণে মোর ঘরে, আসিতেছে বারে বারে
ডাকাতি করিবে লয় মনে।
সারা দিন কেটে যায়, সবে নিরানন্দ কায়
ঘরে আসে বেলা অবসানে ॥

কোনো রকমে কোনোদিন এক বেলা, কোনো দিন বা প্রায় উপোস দিয়ে অতি কষ্টে যদিও হৈমন্তিক ধানের মুখ দেখল কৃষাণকুল, কিন্তু এ দিকে শুরু হলো মড়ক। লোক খাদ্যাভাবে অখাদ্য খেয়ে রোগ বাধায়। ঘরে ঘরে উঠলো কান্নার রোল। তারা গিয়ে আবার হাত পাতল মহাজনের কাছে। কোনো কোনো মহাজন 'আজ নয় কাল' বলে ঘোরাতে লাগল। কেউ কেউ স্পষ্ট কন্ঠে বলে দিল, 'ওসব হবে না বাপু'। মানভূমের এই দুর্দশার দিনে লোক-কবি তাদের দুঃখের কাহিনী শোনাতে লাগল দেশবাসীর কাছে এই ঝুমুরের সুরেই গান বেঁধে :...

রবি শস্য সব হইল, তা' পরে বরষা কমিল (হে)
ধান্য মরে জলের বিহনে।
একে ঋণ নাহি পায়, লোকে করে হায় হায়
মারামারি হয় জলের কারণে ॥
(প্রাণ বাঁছিবে কেমনে)
দেবতা বৃষ্টি করিল, ধান্য সকল বাঁচিল (হে)
কিন্তু রোগ লেগে গেল ধানে।

না দেখি কোন উপায়,　　　　গাছি পুড়ে নেমে যায়

আনন্দ না আর আসে কারও মনে ॥

কেহ সাগসিঝা খায়,　　　　কেহ কেহ মন্ড খায় (হে)

রক্তহীন অন্নের বিহনে।

কন্দ গুঁদলী জনারি,　　　　মাড়ুয়া গড়া মুগবিরি

সকল ফুরাল উদর পুরণে ॥

কোন মহাজন কয়,　　　　কাল আসিবে এ সময় (হে)

পরদিন যায় ততক্ষণে (হে)।

তথাপি না দেয় ধান,　　　　বরং করে অপমান

ধিক্ ধিক্ ধনহীন জনে ॥

পেট ভরিলে আনন্দ,　　　　না ভরিলে নিরানন্দ (হে)

ধিক ধিক্ তাহার জীবনে।

এমন শ্যামা পূজায়　　　　সবে নিরানন্দ কায়

উৎসাহ না আসে আর কার মনে ॥

অল্প ধনে ধনী যারা,　　　　ভুলে যায় চিন্তামণি (হে)

কানা হয়ে থাকিতে নয়নে।

সন তেরশ উনপঞ্চাশ সালে　　　　এই কথা 'ভরত' বলে

নিজ দুঃখ জানায় গোবিন্দ চরণে ॥

এই গানটি লক্ষ্য করলেই আমাদের পূর্ব বক্তব্য অতি পরিষ্কার বলে মনে হবে। অর্থাৎ ঝুমুর গান পশ্চিমবঙ্গে শুধু মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পর্বদিন উপলক্ষ্যে গীত এবং তাঁর বিষয়েই রচিত হলেও, ঝুমুরের খনি মানভূমে কিন্তু তা নয়। ঝুমুর গান এবং এর সুর হলো সাঁওতালী চলতি একটি গানের সুর ও শ্রেণী মাত্র। কাজেই যে-কোনো দিন এমন কি কালীপূজার দিনেও হতে বাধা নেই। আর তা ছাড়া এই সব গান শুধু অবসর বিনোদনের জন্যই সৃষ্ট নয়। এর ভিতর বাংলার সামাজিক ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যায়। সত্য বলতে কি এই লোক-সংগীতের মধ্যেই তো লুকিয়ে রয়েছে বাংলার খাঁটি ইতিহাস—যার উপর কারো হাত নেই। তেরশ উনপঞ্চাশ ও পঞ্চাশ সালে বাংলার মহা-দুর্ভিক্ষের কথা যাঁরা এখনও ভোলেননি তাঁরা বিনা দ্বিধায় এ গীতটিকে অন্ততঃ তাঁদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপকরণ বলে ধরে নিতে পারেন।

আমরা পরিচ্ছেদের গোড়াতেই উল্লেখ করেছি মানভূমে সিঁদুরিয়া ও

ভাদরিয়া ঝুমুর ছাড়াও আধ্যাত্মিক ঝুমুরেরও কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ অধ্যাত্মবাদের বনিয়াদের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় সমাজ। তাই ভারতীয় নিরক্ষর লোক-কবির মুখেও অধ্যাত্মবাদের কথা শোনা যায়। ঝুমুর গায়করা বিশেষ করে মানভূমের ঝুমুর গায়করাও তাদের গানের মধ্যে অধ্যাত্মবাদ প্রচার করতে কসুর করেনি। তাই মানভূমের লোক-কবি অতি সহজেই বলতে সক্ষম হয়েছে, 'পৃথিবীতে এসেছ তো দুদিনের জন্য। একটু বুঝেসুঝে চলো, নইলে কালের পাকচক্রে নিস্তার পাবে না':

দহের মাছ না পড় ভাই ডাঙ্গালে
সাঁতার দিছ ভব জলে ॥
যদি হবে ইচঁলা পুঁটি
যেতে হবে গুটি গুটি,
ঘুঁরাই ঘুঁরাই মারবে ঘুন-জালে·(হে)
সাঁতার দিছ ভব জলে ॥
যদি হবে রুই কাতলা
ঘুঁচাও মনের মাতলা
অনন্ত কই রাখ পদতলে,
সাঁতার দিছ ভব জলে ॥

শুধু কি তাই? 'জীবনপ্রদীপের তেল আর কতটুকু? সে তো দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে। এখনও কি দুনিয়ার যা কিছু দেখবার তা দেখতে পারলি না?'

চিন্তাপথে আয়ু তৈল
ঝরি ঝরি শেষ হৈল
দেখবি মন ভবের ঘানি
চক্ষেতে ঢাকনি ॥

মানভূমে পূর্বোল্লিখিত ঝুমুর গান ছাড়াও কিছু কিছু ব্যঙ্গ গীতিরও সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মনে করা যাক যেন কোনো একটি লোক গেছে দোকানে। গিয়ে বলছে, 'এই সব জিনিস দাও, কিন্তু দাম দেব মাত্র নয় (দেব না) পয়সা মাত্র':

অনেক জিনিষ লিব, পয়সা পয়সা দাম দিব হে
হিসাবেতে নয় পয়সা লিবে গনি।

হয়ো তুমি সাবধান,   শুন আগে পেতো কান,
অন্য মন না কর আপনি ॥
কতগঁদেলী জনারী,   মাড়ুয়া, মুগ, মুসুরী
রাহেড়, বুট, বাটলা আর।
যাও গম, জারা বিরি,   রমা, কুরতী, খাসারী
একে একে দাও হে দোকানদার ॥
নারিকেল সাঁচি তেল,   লাল সাদা মাটি তেল
নিম ভেলা কুসুম বরড়া।
লইব ফুল্লন তেল,   ওজনে না কর ভেল
লইব বাদাম রেড়ী জারা।

*   *   *   *

অমর শংখের পাতা,   পদ্মকাষ্ঠ চাই চিরতা
হাফিং আদি দাও হে দোকানী।
কতই লইব আর,   বাড়িয়ে যাবে বিস্তর
রহিত করিল ভরত অজ্ঞানে ॥

পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আধুনিক যুবকগণ যে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভগ্নী পরিত্যাগ করে স্ত্রীর কথায় ওঠা বসা করে, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে আবাল্যের বাসভূমি পরিত্যাগ করে নিজের সুখের জন্য চলে যায় দূরে, মানভূমের লোক-কবির কণ্ঠে এই নব্যশিক্ষার প্রতিও বিদ্রূপ ধ্বনি শোনা যায় :

শুন শুন বন্ধুগণ,   মোর এই নিবেদন
কলিযুগের মাহিত্ত্ম।
যিনি হন মাতা পিতা,   তাহার না মানে কথা
মহামায়ার মাহিত্ত্ম ॥
ভাই বন্ধু পরিহারি,   যায় তারা দেশ ছাড়ি
জন্মদাতা চিনে না তখন।
যার উদরে জন্ম নিল,   তখন তারে না চিনিল
নারীর কথায় চলেন ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জারি

'জারি' কথার অর্থ হলো ক্রন্দন। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় জারি গানের খুব প্রচলন রয়েছে। তবে এ গান সাধারণতঃ মুসলমান সমাজের ভিতরই সর্বাধিক প্রচলিত। কারবালা প্রান্তরের শহীদ হাসান-হোসেনের বীরত্ব এবং সাকিনার বিলাপ নিয়েই এ গানের আখ্যায়িকা রচিত। কাশেমের শোকে সাকিনার বিলাপ বা ক্রন্দন থেকেই এই গানের উৎপত্তি বলে ধরা হয়। পশ্চিমবঙ্গে জারি গানের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলায় জারি গান বলে যে-গানের প্রচলন দেখা যায় তার ভিতর অন্যান্য প্রসঙ্গই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন পূর্ববঙ্গে 'জোলার জারি'-বলে যে-জারির প্রচলন আছে তার ভিতর শুধু রঙ্গরসের কথাই থাকে—কাশেম-সাকিনা বা কারবালা প্রান্তরের সকরুণ কাহিনী কিছুই থাকে না। বগুড়ার জারিও তাই; এর ভিতর অনেক সময় অনেক কাহিনীর মাধ্যমে চিন্তামূলক প্রশ্নও উত্থাপন করা হয়—আসরেই তার মীমাংসা হয়।

জারি গানের দলের প্রধান গায়ককে বলে 'বয়াতী'—আর সাঙ্গো-পাঙ্গোদের বলে 'দোহার'—যাদের কাজ মূল গায়কের সুরে সুর মিলিয়ে গান গাওয়া। প্রসঙ্গতঃ বগুড়ায় প্রচলিত একটি জারির কথা উল্লেখ করা চলে।

গোল হয়ে আসর বসেছে। দোহারবৃন্দ ডুগ-ডুগি, খঞ্জনী সহকারে ঐক্যতান শুরু করেছে। মূল গায়ক হাতে চামর নিয়ে এসে আসর বন্দনা, দিগ্‌বন্দনা, সভাবন্দনা, দেববন্দনা শেষ করে গান শুরু করে:

আমার গান শুনে প্রাণ বাঁচেনা ভাই
ও মোর ছাবেরউদ্দীন বলিছে তাই
কোথায় যায়ে গানের জোগাড় পাই।
আমার মনে বড় বাঞ্ছা ছিলো
গায়ান গায়ে সাধ মিটাই!
দুই হাতে দুই খঞ্জরী বাজাই॥

ওস্তাদ আমার আকবর আলী ভাই
তিনি ত ভেঙে বলে নাই (আ-আ-হা-হা)
একটা জাগার পুরুষ জলে নামিল
সে যে ডুব দিয়ে কন্যা হোলো
সদাগর এসে তারে ধরে নিল,
ওরে বারো বছরের মধ্যে নারীর
তিনটে সন্তান তার হোলো ॥
ফিরে নারী সেই ঘাটে এলো
সেই ঘাটে না এসে নারী আবার পুরুষ হইল ॥
সে যে পুরুষ হয়ে দ্যাশে চলে যায়
তাহার মনে বলে হায়রে হায়
কী না করতে আর বা কী না হয় ॥
ওরে আমি পুরুষ হয়ে নামলাম জলে
কন্যা হয়ে উঠ্‌লাম নায়,
বারো বছর করলাম বাণিজ্য সদাই
সেওত বয়াতী সৎ সমন্দ নয়
বয়াতী বলেন চাঁদ সভায় ॥

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি পূর্ববঙ্গের জারিগান কাশেম-সাকিনার খেদ তথা কারবালা প্রান্তরের মর্মস্পর্শী কাহিনী নিয়ে রচিত। মহরম উপলক্ষ্যেই এগুলি বেশি মাত্রায় শোনা যায়—বিশেষতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে। এখানেও এ গানের দলে একজন থাকে মূলগায়ক চলতি কথায় বলে বয়াতী, বাদবাকী সবাই দোহার। বয়াতী গানের প্রথমটা বলে যায়, দোহাররা তার পাদপূরণ করে। কখনও বা দ্বৈতভাবেও গীত হয়, কখনও একক ভাবেও হয়।

ঘোরতর সংগ্রাম চলেছে একদিকে বীরবর ইমাম হোসেন, অপর দিকে দামাস্কাসের অধিপতি এজিদের সঙ্গে। ধু ধু করে বিশাল মরুভূমি, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যায় হোসেনের দলের সকলের। যুদ্ধে নিহত হলো হোসেন পক্ষীয় প্রায় সকল যোদ্ধাই। এই নিদারুণ সংকট মুহূর্তেই ঘনিয়ে এল হোসেনের আদরের দুলালী ছাকিনা (সাকিনা)-র বিবাহ তার ভ্রাতুষ্পুত্র কাশেমের সাথে। কিন্তু হরিষে বিষাদ। বিয়ের দিন ভোরেই দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল সাকিনার :

নিশি প্রভাত কালে কুকিল ডাকে
ওরে ছাকিনা—
এ বেশে আর ঘুমাইও না
মাজদরিয়ায় ডুবলো সাধের লাল ডিংগাখানা ॥
আমি ঘুমের ঘোরে স্বপন দেহি
বিছানার পর নাহের সোনা,
গলার হার খসিয়া পড়ে
বিধির এ কী কারখানা ॥

(এ-আহায় আ)

আর ডাকিস না কাল কুকিল
তমালের ডালে,
ঘুমে ছিলি, ছিলি নিরলে
ডাক দিয়া ক্যান শোকের অনল
দিলি জ্বালাইয়ে।
আমার একগুণাগুণ জ্বলছে ত্রিগুণ
নিব্রাণ (নির্বাণ) অয়না জলে গ্যালে
প্রাণপতি মোর গ্যাছে ছেড়ে
বসন্তের কালে।
জানাই এই নিবেদন হে নিরঞ্জন
তোমারই দরবারে,
(তুমি) ভালবেসে দণ্ডি কর যারে,
মহালীলা প্রকাশিল এই বংশের পরে।
তুমি কেউরে হাসাও কেউরে কাঁদাও
কেউরে ভাসাও ভাব সাগরে
বিয়ার রাতে মরছে পতি, কোন্ বা বিচারে ॥
অধীন মোছলেম বলে অসীম লীলা,
বিধির এ লীলা কে বুঝতে পারে ?

কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডানো গেল না। নির্দিষ্ট দিনেই বিবাহ হয়ে গেল কাশেম সাকিনার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই ; তাদের আর বেশিক্ষণ ভোগ করতে হলো না বিবাহের সেই সুখের বাসর। বাইরে অশ্ব প্রস্তুত, কাশেম তৈরি হয়ে নিল

রণক্ষেত্রে যাবার জন্য। বিদায় চাইল সদা-বিবাহিতা যুবতী সুন্দরী স্ত্রী সাকিনার কাছে। কিন্তু সে কি পারে এ হেন মুহূর্তে তার স্বামীকে ঐ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে? জারি গায়কদল অতি অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে তাদের গানের মাধ্যমে এই সকরুণ ছবিটি:

সাকিনা (বয়াতী): বিয়ার কালে যুদ্ধে যাইতে ক্যান আকিঞ্চন
হে প্রাণনাথ, আর আমায় কান্দাইও না।
হে অনাথিনী কইর‍্যা মোরে বিবাহ বাসরে
কোন্ প্রাণে প্রাণনাথ চইল্যাছ সমরে।
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইও না)॥

কাশেম (দোহার): হো মহা কর্তব্যের তরে ওরে ছাকিনা
চইল্যাছি এ ঘোর সমরে কাইন্দোনা কাইন্দোনা।

সাকিনা: হে যাইওনা যাইওনা নাথ আমারে ছাড়িয়া
যদি যুদ্ধে যাইতে ছিল সাধ ক্যান কইরল্যা বিয়া
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইও না)॥

কাশেম: হো পানি বিনা শিশুগণে ভুইগ্যা ভুইগ্যা মরে
ক্যামনে দেখিয়া ইহা থাকিব শিবিরে হে।

সাকিনা: হে উদয় অস্ত একই সাথে কে দেইখ্যাছে কোথায়
বিয়ার ঘরে স্ত্রী রাইখ্যা সোয়ামী যুদ্ধে যায়
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইও না)॥

কাশেম: হো রণে যদি না যাই প্রিয়া হাসরের দিনে
ক্যামনে দ্যাখাব মুখ বাবাজী (আবধ্যাজন) সামনে।

সাকিনা: হে যাওহে বীরেন্দ্র কান্দে রাত্র মধ্য কালে
ডুবাও হে এজিদের নাম ছেরাদেরি জলে
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইও না)।

হাসান: হো হয়ত আর দেখা হবে হাসরের দিনে
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বালা নাহি গো যেখানে (হে)।

সাকিনা: হে তুমি যথা দাসী তথা জেন গো নিচ্চয়
আসমুদ্র সীমাময় ঘোষিবে ধরায়
(হে প্রাণনাথ আর আমায় কান্দাইও না)॥

নবপরিণীতা স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে কাশেম চলে গেল যুদ্ধে। করতে হলো ঘোরতর সংগ্রাম। কিন্তু বিধাতার অমোঘ নির্দেশে প্রাণ হারাতে হলো তাকে। কাশেমের প্রভুভক্ত শ্বেত অশ্ব ফিরে এল তার মৃতদেহ নিয়ে। শিবিরে শিবিরে উঠল মহা কান্নার রোল। ডুকরে কেঁদে উঠল সাকিনা, সদ্য বিবাহিতা রাজনন্দিনীর মর্মস্পর্শী কান্নায় বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে উঠল সমবেত জনমণ্ডলী :

হারে ও আমার প্রাণনাথ
এস এস এস প্রাণ হৃদি বাসরে।

কে রঙিলো সোনার তনু গো
হা হা খুন খারাবী আবিহিরে ॥

এস এস গো পিয়া এসেছি পান পিতিয়া
বুকে বিন্ধ্যা বিষের চিত দেখহ লজরে,
(হারে) অঘোর ঘোরে ঘুম দিল গো
সাকিনা লো তোর ঘরে,
এস এস ওগো বর,
ধন্য আমার বাসর ঘর,
আমিও লইব শয্যা তোমারি ধারে।

দাঁড়াও দাঁড়াও নাথ গো
আমি রক্ত চেলি লই পরে
(হারে ও আমার.........)
এস তবে প্রেয়সী চল বাসরে বসি
রক্ত জবার শয্যা পাতি গাঢ় তিমিরে ।

নিবিড়ে ঘুমাব দোঁহে গো
বাসী বিয়ার হাসরে,
(হারে ও আমার.........)
ওকি এত সকালে সত্য সত্য ঘুমালে
চক্ষু চাইয়্যা দেখ নাথ এই খঞ্জরে,
(আরে) হানিছে মোর সুখ নিদ্রা গো
হা হা সাকিনা লো তোর ঘরে ।

সাকিনার বিলাপধ্বনিও এক সময় স্তিমিত হয়ে আসে। জারি গানের আসরে

বিরাজ করতে থাকে নীরব গাম্ভীর্য এই সময় বয়াতী আর দোহাররা সভাভংগ করে এই বলে :

বয়াতী : সভা কইর‍্যা বইছুন যত হিন্দু মোছলমান
আমাগর লক্ষ সেলাম সভার বিদ্যমান।

দোহার : বাজে জয়ের বাজনা বাজে।

বয়াতী : সাগর আলী ডাক দিয়া কয় নাগর আলী ভাই
সাংগ অইল জারির পালা বিদায় আবার চাই।

দোহার : বাজে জয়ের বাজনা বাজে।
আসেলাম-আলেকুম ॥

জারি গান প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের গান হলেও পূর্ববংগের কোনো কোনো জেলায় 'হিন্দুর জারি' বলে এক রকম জারি গানের প্রচলন আছে। হিন্দুর জারি যে শুধুমাত্র হিন্দুরাই গায় তা নয়—এর অর্থ হলো—এই জারি গানের বিষয়বস্তু সবই হিন্দু সমাজের বিষয় নিয়ে রচিত। এর সুর কিন্তু খাঁটি জারির সুরই, তবে বিষয়বস্তুতে বাঁধা বাঁধি কিছু নেই। নমুনা স্বরূপ একটি হিন্দুর জারি গানের কথা ধরা যাক। এখানে আসরে এসে প্রথমেই 'কোরাস' বা সম্মিলিত গান ধরে দোহারবৃন্দ, তাকে বলা হয় 'ধুয়া'। এই ধুয়ার পরে দলের একজন ধরে গান, তারপর আরেকজন, মাঝে মাঝে দোহাররা ধরে ধুয়া—এই ভাবেই একটা গান শেষ হয় :

দোহার বৃন্দ : ও পিয়াল বনের পাখী
কাইল আসিবা বইল্যা গ্যালা আমায় দিয়া ফাঁকি।

১ম গায়ক : আমি পেরথমে বন্দনা করি, শিক্ষা গুরুর পায়
গুরু ভক্তিতে বিদ্যালাভ জানিবা নিশ্চয়।

২য় গায়ক : আমার গুরু কেনারাম বালা জলিরপারে ঘর
হের কাছেতে আমার ঋণ থাকবে জীবন ভর।

৩য় গায়ক : হের পরে বন্দনা করি দেবী সরস্বতী
যাঁর দৌলাতে দ্যাশ বিদ্যাশে জারি গাহেন করি।

দোহারগণ : ও পিয়াল বনের পাখী
কাইল আসিবা বইল্যা গ্যালা আমায় দিয়া ফাঁকি।

কোনো কোনো অঞ্চলে আবার অন্য ভাবেও গান গাওয়া হয়ে থাকে। সেখানে মূল গায়ক একটি একটি করে কথা বলে যায়, আর তার কথা শেষ হতে না হতেই দোহাররা ধরে ধুয়া। এইভাবেই চলতে থাকে গানখানির শেষ পর্যন্ত :

মূল গায়ক (বয়াতী) : গুণের ননদ লো
পাখী ডাকে বৌ কথা কও।

দোহারবৃন্দ : পাখী ডাকে বৌ কথা কওলো ননদী
পাখী ডাকে বৌ কথা কও।

বয়াতী : আমি পেরথমে বন্দনা করি
ব্রাহ্মণেরি পাও,
ঐ লুচিমণ্ডার গন্ধ পাইলে
পাহাড় ভাইঙ্গা ধাও।

দোহার : গুণের ননদ লো
চাউল কাঁড়াইতে দোসর পাইলাম না (২)

বয়াতী : আমি তারপরে বন্দনা করি বোষ্টমেরি পাও
(ঐ) দধি চিড়ার গন্ধ পাইলে বিল সাঁতরাইয়া ধাও

দোহার : গুণের ননদ লো
পাখী ডাকে বৌ কথা কও। (২)

বয়াতী : আমি তারপরে বন্দনা করি বড় বড় পান
অন্যায় যদি বলেন কিছু কাইট্যা দিমু কান।

দোহার : পাখী ডাকে............(২)

বয়াতী : আমি তারপরে বন্দনা করি বড় ব্যাতের শীষা
অন্যায় যদি বলিস কিছু ঐ ব্যাটা তোর পিশা।

দোহার : পাখী ডাকে............(২)

বয়াতী : আমি তার পরে বন্দনা করি মাইয়্যা মাইনষের পাও
(ঐ) যার দৌলাতে চত্তির মাসে ছাতু চিড়া খাও।

দোহার : পাখী ডাকে বৌ কথা কও (২)

বয়াতী : আমি তারপরে বন্দনা করি টিনের ঘরের কোনা
অন্যায় যদি বলিস কিছু খাবি টাট্টু ঘোড়ার চোনা।

দোহার : গুণের ননদ লো
চাউল কাঁড়াইতে দোসর পাইলাম না (২)

বয়াতী : আমি তার পর বন্দনা করি বড় বড় সুপারী
অন্যায় যদি বলিস কিছু তয় বাইদ্যানী তোর হাশুড়ী।

দোহার : গুণের ননদ লো............(২)

বয়াতী : আমি তার পরে বন্দনা করি পার্বতীর পাও
(এই) হারা রাত্তির জারি গাইয়া কালাইন্যা ভাত খাও।

দোহার আহা বেশ বেশ।

মূল আমার এ গানের তারিফ করে কেডা ?

দোহার ঐ ক্যাকাউল্লার মায়

মূল গায়ক : (ও) তাই নাস্তার থামার ঠেইল্যা থুইয়া
বাতাস দ্যায় মোর গায়।

দোহার : আহা বেশ বেশ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঝাপান

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি থেকেই পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলে, বিশেষ করে কাটোয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখা যায়, বেদে-বেদেনীরা পূর্ববঙ্গের বেদে-বেদেনীদের মতোই সাপের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাপখেলা দেখিয়ে বেড়ায় আর সঙ্গে সঙ্গে গায় গান। তাদের এই সব গানের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের বেদেদের মতো বেহুলা লক্ষীন্দরের কাহিনী নিয়ে রচিত। পার্থক্যের মধ্যে পূর্ববঙ্গ জলের দেশ তাই বেদেরা এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি, এ গাঁ ছেড়ে আরেক গাঁয়ে যাতায়াত করে নৌকার সাহায্যে, আর রাঢ় অঞ্চলের বেদে-বেদেনীরা যাতায়াত করে পায়ে হেঁটে, এক গাঁয়ে খেলা দেখিয়ে আরেক গাঁয়ের পানে ধাওয়া করে।

কোনো বাড়িতে গিয়ে তারা পূর্ববঙ্গের বেদেনীদের মতোই আস্তে আস্তে সাপের ঝাঁপির ঢাকনা খুলে দেয়, আর ফোঁস করে তার ভিতর থেকে বের হয়ে আসে এক একটা ভীষণ আকৃতির সাপ। সাপের সামনে হাত নাড়িয়ে বলতে থাকে :

"লাচ্ লাচ্ মা কাল ভোজঙ্গিনী"

তারপর দু চারটে চিত্তাকর্ষক খেলা দেখাবার পরই তুবড়ী বাঁশী অথবা বিষম ঢাকী নামক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে শুরু করে গান। এ গানও সেই সর্পদেবী মনসার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের বিবাদ নিয়েই রচিত—যা বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। এখানেও দেখুন লক্ষীন্দরকে সাপে দংশন করবার পর বেহুলার অবস্থা :

বেউলো কেঁদোনা কেঁদোনা (রে)
কাঁদলে ন'খায় পাবে না।
নোহার আঁচীর, নোহার পাঁচীর
নোহার বাসর ঘর,
বেউলো কেঁদোনা রে—।

এর সঙ্গে মানভূমে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে যে মনসার গান হয় তার বেশ তুলনা করা চলে।

মানভূমের ঘরোয়া উৎসবের মধ্যে বোধ হয় সব চাইতে বেশি ধূমধাম হয় এই মনসা পূজায়। এ-দিনেও সারা রাত জাগবার পালা আসে গৃহস্থের কাছে। তারাও মা মনসাকে তৃপ্ত রাখবার জন্য সারা রাত জেগে, প্রহরে প্রহরে তাঁর কাছে হাঁস, পায়রা ইত্যাদি বলি দেয়। কখনও বা সুর, তাল, লয় সংযোগে গান করে দেবীর সম্মুখে। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের 'ভাসান' এবং পূর্ববঙ্গের 'রয়ানী' গানের হুবহু মিল খুঁজে পাবেন। এখানেও সেই একই কথা—লক্ষীন্দরকে সাপে কামড়াবার পর বেহুলার বিলাপ :

আমি কেন এলাম লোহার বাসরে
আসিয়ে হারাইলাম বর লখিন্দরে।
খেদে কহে চিন্তামণি,
বালাখণ্ড কপালিনী,
দংশিল কাল ভুজঙ্গিনী
প্রাণ গেলরে।
আমি কেন এলাম লোহার বাসরে ॥

এই একই জিনিস পশ্চিমবঙ্গের ভাসান গানেও শোনা যায় আরও মর্মস্পর্শী ভাবে :

মা মনসার সঙ্গে বাদে চাঁদ সদাগর।
সাঁতালী পর্বতে তোলে নোহার বাসর ঘর ॥
সোনার নখিন্দর বর বেউলো সোনার কনে।
দারুণ মনসার কোপ এড়াবে কেমনে ॥
তবুও না ডরে চাঁদ হেঁতাল বাড়ি হাতে।
বিশালাকরণী বেঁিজ ময়ূর নিয়ে সাথে ॥
আর নোহার বাসর ঘরের সামনে দাঁড়াইয়ে রয়।
চোখ ঘুরিয়ে সাবধানে ইদিক উদিক চায় ॥
বিষম বিধির নেখা কেমনে খণ্ডাবে।
বিষহরির সঙ্গে বাদে কে ভবে বাঁচিবে ॥
দারুণ বিয়ের রাতি দারুণ জননী।
চারিধারে মায়া পেতে দিলেন আপুনি ॥

তবে সূর্য ডোবে, চাঁদ ডোবে, ডোবে গগন তারা।
ঝৈ-ঝংকার আকাশ ফাটে পড়ে জলের ধারা॥
বেজি পালায়, ময়ূর পালায়, পালায় দ্বারের দ্বারী।
তখন নাগের সিংহাসনে বসে হাসেন বিষহরি॥

বেহুলা মরা পতির দেহ নিয়ে ভেসে চলেছে অনির্দিষ্টের পথে। সে পথের বর্ণনা আরও করুণ আরও মর্মস্পর্শী :

উথাল পাতাল জল গাঙ্গুড়ী কল্ কল্
হাঙ্গর, ভাঙ্গর, বোয়াল সদা মারে ঘাইরে।
কলার ভেলায় বেউলো সতী
কোলে নিয়ে মরা পতি
ঢেউ-এ ঢেউ-এ ভেস্‌সে চলে
প্রাণে ডর নাই রে॥

অনেক সময় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ঝাপান গানেও ঠিক এই সুরটিই শোনা যায় :

আহা গো সোনার পদ্ম
জলে যায় ভেসে
মরি হায় রে।
কত ঘাট পার হল কত শত দেশে
মরি হায় রে।
তবে নারকেল ডাঙ্গা হাসল হাটি
মহামায়ার ঠাঁই
মরি হায় রে।
বিষহরি জগৎগৌরী মায়ের গুণ গাই
মরি হায় রে।
মরাপতি কোলে নিয়ে
হেথায় আসে সতী
মরি হায় রে।
বলে আমি তোমার চরণ দাসী
জীয়াও আমার পতি
মরি হায় রে॥

অবশ্য আধুনিক ঝাপান গায়করা শুধু মাত্র দেবী মাহাত্ম্য শুনিয়েই তাদের বক্তব্য শেষ করতে চায় না। আজ তাদের গানেও মানভূমের টুসু গানের মতোই রাজনৈতিক কথাও স্থান পেয়েছে। বর্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলের কোনো এক ঝাপান গাইয়ের মুখ থেকে শুনতে পাই দেশের বর্তমান রাষ্ট্রনেতাদের বিরুদ্ধে তাদের মনোবিক্ষোভ :

আহা যাই বলিহারী
দ্যাশেতে আইল বান্দা
মাথায় খাদির টোপী।
রাজা মোদের বড়াই ভালো
ছিল ধলো হল কালো
গরীবের রক্ত কাড়িল।
দিন দুপুরে টাকা চুরি
রাজার আমার বেয়াই কতো
পুলিস পল্টন শত শত,
দ্যাশের ধান ছিল যতো,
কাড়লে করে চাতুরী
আহা যাই বলিহারী।

এ সব গানের রচয়িতা সকলেই গাঁয়ের নিরক্ষর, চাষীবাসী মানুষ। তাই তাদের কাব্যে ব্যাকরণ দোষ থাকতে পারে, থাকতে পারে কবিত্ব শক্তির অভাব, কিন্তু তাদের বক্তব্য স্পষ্ট। তাই তাদের কথাও সত্যিকারের গণগাঁথা। নিরক্ষর মূক জনসাধারণের তারাই হলো মুখপাত্র।

জলের দেশ পূর্ববঙ্গ। বর্ষার দিনে ঘাটমাঠ সব জলে জলময়। দূরে দূরে এক একখানা বাড়ি মনে হয় সাগরের বুকে বুঝি ছোট ছোট এক একটি দ্বীপ। রাতে অন্ধকার নেমে এলে ঐ সব বাড়ির জ্বালানো আলোক রশ্মিকে দূর থেকে মনে হয় বুঝি বা এক একটি বাতিঘর (Light house)। বর্ষার দিনে যখন পুরুষেরা সব বাইরে চলে গেছে ধান কাটতে কিংবা পাট কাটতে, বাড়ির বৌ-ঝিরা ব্যস্ত পাট তোলা (পাটের আঁশ ছাড়ানো) নিয়ে, এমন সময় দূরে বেদে-বেদেনীর নৌকা থেকে হাঁক আসে,—'হাপ (সাপ) খ্যালা দ্যাখবেন নি মা-ঠাইরণরা— বড় বড় বালো (ভাল) বালো হাপের খেলা—'।

গৃহস্থরা সজাগ হয়ে ওঠে বেদেনীদের চিরপরিচিত সুরের ডাকে। তারাও

হাতের কাজ ফেলে রেখে উন্মুখ হয়ে থাকে বেদেনীদের সাপ খেলা দেখবার জন্য। বেদেনীরাও কম নয়। তারাও এক বাড়ির ঘাটে নৌকা লাগিয়েই সাপের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে নেমে আসে পাড়ে। তারপর মাথা থেকে ঝাঁপি বাড়ির উঠানের উপর নামাতে নামাতেই গান ধরে বসে :

হাপ (সাপ) খেলা দেখ্‌বি যদি
আয়লো সোনা বউ
হাপ খেলা দেখ্‌বি যদি আয়।
(আবার) হাপে যহন ফণা ধরে
আলকাত্‌রার মায় চিক্‌রাইয়্যা মরে
মোড়াইতে মোড়াইতে হাপ গদে (গর্ত) চইল্যা যায়
লো সোনা বউ—।

এর পর শুরু করে গান, সংগে সংগে চলে সাপ খেলা দেখানো। জাতি, কেউটে, চন্দ্রচূড়, দুধরাজ, লাউডগা, সিলিন্দে, কালনাগ ইত্যাদি কত রকমের সাপ যে থাকে ওদের ঝাঁপির মধ্যে! এই সাপই তাদের দোসর, এই সাপই তাদের ব্যবসায়ের পুঁজি। কাজেই একে এরা খাতিরও করে কম নয়।

এই বেদে-বেদেনীদের জীবনযাত্রা প্রণালীও বিচিত্র ধরনের। নৌকাতেই এরা কাটায় বারটা মাস। এরা জাতিতে না হিন্দু না মুসলমান। এদের দলে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান সব জাতিরই লোক থাকে; তা হলেও মা মনসার উপর ভক্তি কিন্তু অসীম। অনেক নৌকার ভিতরই (বড় গোছের নৌকা হলে) মা মনসার মূর্তি থাকে, তার কাছে দৈনিক ধূপ-ধুনা দেওয়া হয়। মানত করে ভোগ দেয়। এরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলাফেরা করে অনেকগুলি নৌকা একত্রে। কোনো গঞ্জে এসে ভিড়ে তাদের বহর, তারপর সেখান থেকে নিজেদের ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা বা কোষ নৌকায় করে তারা বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের উদ্দেশ্যে। শ্রাবণ মাস বিশেষ করে পূর্ববংগবাসীদের কাছে মা মনসার মাস, কাজেই এ সময় তাঁর কথা ও গানের খুবই মান্যি। একথা জানে বেদেনীরা, তাই তারা ধরে সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন 'বেউলা লখীন্দরের' কথা :

এইনা শাবণ মাসে ঘন বৃষ্টি পড়ে,
কামন কইর‍্যা থাকবোলো আমি
অন্ধকার ঘরে।
(বিধির কী হইল ?)

(আর) সোনার বরণ নখাইরে আমার
বরণ হইলো কালো,
কি না সাপে দংশিল তারে
তাই আমারে বলো
(বিধির কী হইলো)।
(আবার) কাইল হইয়্যাছে নখাইর বিয়া
মালীর মুকুট দিয়া,
ক্যামন কইর‍্যা যাবলো আমি
মালী পাড়া দিয়া
(বিধির কী হইলো)।
(আবার) কাইল হইয়্যাছে বেউলার বিয়া
বাইন্যার সিন্দুর দিয়া,
(হারে) ক্যামন কইর‍্যা যাবলো আমি
বাইন্যা পাড়া দিয়া
(বিধির কী হইলো)।

বেদেনীর গানে জমে উঠেছে। শুধু সেই বাড়ির লোকই নয়, আশ-পাশের বাড়ি থেকেও এসে জুটেছে গান শুনতে, সাপের খেলা দেখতে। বেদেনী খালি গলায় শুধু মাত্র বা হাত দিয়ে মাটিতে চাপড় মারছে, আর ডান হাতখানাকে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় সাপের মুখের কাছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছে, 'খা-খা-খা-বক্ষিলারে (কৃপণ) খা, গাইঠে পয়সা বাইন্ধ্যা যে না দেয় তার চক্ষু উপড়াইয়া খা—'। বলে আর হাত ঘুরিয়ে বিচিত্র সুরে গান ধরে। সাপ বাবাজীও ফণা বিস্তার করে কখনও হেলে দুলে কখনও বা যতটা সম্ভব খাড়া হয়ে কসরৎ দেখায়। বেদেনী গেয়ে চলে :

চান্দ্ রাজা তুমার অগো কেমুন তর ঘর ?
কেমুন তর কারিগরে বানাইল বাসর
তুমার মনে নাই কী রাজা বিষহরির ডর ?
(হায় বিষহরির দোয়া)।
সুজন দেখ কান্দে ঐ যে সোনার বেহুলা,
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা পদ্মের চৌক্ষু হইছে ফুলা ফুলা,
মনসার কানে কে গো দিছে সোয়া স্যার তুলা !
(হায় বিষহরির দোয়া)।

কান্দে রাজা, কান্দে পরজা, কান্দে সনকা রাণী,
আলগোছে বইস্যা পংখী, ফ্যালায় চৌক্ষের পানী,
কান্দে রাজা, চান্দ আর সনকা জননী।
(হায় বিষহরির দোয়া)।

পূর্ববঙ্গে একটা সংস্কার আছে লখীন্দরের মৃত্যু শুনলে তার পুনর্জন্মও শুনতে হয়, তা না হলে নাকি দোষ হয়। কাজেই বেদেনী ঐ পর্যন্ত গেয়ে চুপ করলেই শ্রোতৃমণ্ডলী—বিশেষ করে নারী মহল থেকে ঘন ঘন তাগিদ আসে, 'জীয়ান গাও বাইদ্যানী'। 'জীয়ান' অর্থে পুনর্জন্ম। 'বাইদ্যানী' তা জানে। তাই এবার বিদায়ের আশায় গৃহলক্ষ্মীদের কাছে হাত পাতে। পায় চাল, পয়সা। কেউ কেউ দু একটা ক্ষেতের তরকারীও দেয়। তবে চাল ও পয়সাই বেশি। বেদেনী এবার খেলা সাঙ্গ করবার জন্য লখাইর পুনর্জন্ম গাইতে থাকে:

চান্দ রাজার দাপট গ্যাল বাতাসে মিশিয়া
(হায় বিষহরির দোয়া)।
বেউলা সতী কান্দে শোন আলু থালু হইয়্যা
(হায় বিষহরির দোয়া)।
কালনাগিনী খাইল আজি সোনার লখাইরে
(হায় বিষহরির দোয়া)।
সোনার অঙ্গ ভাসাইল গাঙ্গুনীর নীরে
(হায় বিষহরির দোয়া)।
তাহার দোয়ায় সূর্য ওঠে পুবের আকাশে
(হায় বিষহরির দোয়া)।
পরাণ পাইয়্যা ভেলায় বইস্যা লখাই দেখ হাসে
(হায় বিষহরির দোয়া)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাদুগান ও পরব

ভাদ্র মাসের প্রথম দিন হতে শুরু করে সংক্রান্তি পর্যন্ত দেখা যায়, পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মানভূমের মেয়েরা যার যার নিজের বাড়িতে 'ভাদলী' বা ভদ্রেশ্বরী দেবীর একটি মাটির মূর্তি স্থাপন করে, তাঁকে তারা অনেকটা টুসু দেবীর মতোই কখনও কন্যাস্নেহে, কখনও বা জননীভাবে পূজা করে থাকে। তাঁর সম্মুখে তারা নাচে, গান গায় এবং প্রতিদিন পূজাও দিয়ে থাকে। এই ভদ্রেশ্বরী বা 'ভাদু পরব' মূলতঃ বর্ষ-উৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভাদু পূজা সম্পর্কে যে কিংবদন্তীটি প্রচলিত আছে—তা হলো মানভূম অঞ্চলের 'পঞ্চকোট' জেলার কাশীপুর রাজ্যের রাজার ভদ্রেশ্বরী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। ভদ্রেশ্বরীর বয়স বাড়ে, কিন্তু বর আর পাওয়া যায় না। শেষটায় একদিন অনূঢ়া অবস্থায়ই ভদ্রেশ্বরী প্রাণত্যাগ করে। কাশীপুর-রাজ কন্যাশোকে প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। সেই বছরই তিনি তার প্রিয়তমা কন্যার নাম চিরদিনের জন্য লোকের মনে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য একটি ব্রত উদ্‌যাপন করলেন। এবং জনসাধারণের মধ্যে এই ব্রত প্রচার করবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হলেন। জনসাধারণও ভদ্রেশ্বরীর এই নিদারুণ দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য ব্যথিত হয়েই ছিল, কাজেই তারাও সাগ্রহেই রাজপ্রস্তাব গ্রহণ করল এবং তখন থেকেই প্রতিবছর ভাদ্রমাসে ভদ্রেশ্বরী বা ভাদুমূর্তি গড়িয়ে পূজা করতে থাকে। তারা জানে, ভাদু ছিলেন অবিবাহিতা, কাজেই তাঁর বিয়ে দেওয়াটাই বড় কথা। তাই এই গানের মধ্যে ভাদুর বিবাহ-সংগীতই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাদ্র মাসের পয়লা তারিখে হলো ভাদুর আগমনী। মেয়েরা ভাদু বা ভদ্রেশ্বরী দেবীকে বেদীর উপর স্থাপন করে সুর করে গাইতে আরম্ভ করল :

আজি ভাদুর আগমনে
কী আনন্দ হয় গো মোদের পরাণে,
(ভাদুর আগমনে)।

মোরা সারা রাতি করব পূজা গো—
ফুল দিব, ফুল দিব গো চরণে
(ভাদুর আগমনে)।

এর পর প্রতিদিন চলে ভাদুর প্রশস্তি ও তাঁকে নিয়ে নানারকমের গান। কখনও বলতে থাকে :

আমার ঘরকে ভাদু এলেন
কুথাকে বসাব ?
পিয়াল গাছের তলায়
বেদী আসন সাজাব। (অ-গ)
না-না, না-না, না-না,
আমার সোনার ভাদু কোলে তুলে
সোহাগে লাচাব
ভাদুর লেগে সাধের মোয়া লাড়ু বেঁধেছি,
আঁচল-ভরা কড়্‌কড়া কদমা রেখেছি।
ভাদু খাবে, কড়্‌কড়া
মোতির দাঁতে আওয়াজ দিবে
কুটুর কুটুর মড়্‌মড়া।

কখনও বা ভাদুর রূপ বর্ণনা করতে বসে বলতে থাকে :

আমার ভাদু চলেছেন লাচ্যে লাচ্যে,
(পায়ে) ঝুম্‌ ঝুম্‌, ঝুম্‌ ঝুম্‌, ঝুম্‌ ঝুম্‌
নেপুর বাজে,
(অ-গ) আমার ভাদুর উপের কিবা কথা,
চারিদিকে তার আলোর ছটা—
বিশ্বলোকের চোখ-ঢুলানী,
ইন্দর-লোকের মন-ভুলানী ;
ব্রেম্ভা-বিষ্টু শিব-নারদের
ধন্দ লাগে মনের মাঝে।

ভাদুগান কখনও শুধুমাত্র গীত, কখনও বা নৃত্যগীত সহযোগেও হয়ে থাকে।

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ের প্রান্তবর্তী অঞ্চলে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে যে-সব ভাদুগানের দল আছে, সেখানে অনেক সময় ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে নাচ এবং গান শোনাবার ব্যবস্থা আছে।

এই ভাবে গোটা ভাদ্র মাসভর ভাদুকে পূজা করবার পর সংক্রান্তির দিনে ভাদু বা ভদ্রেশ্বরী দেবী মূর্তির বিসর্জনের দিন মেয়েরা সব ভাদুর মূর্তি মাথায় করে চলে নদীর ঘাটের দিকে। এই সময় টুসু ব্রতের মতোই একপক্ষীয় গিন্নী অপ বাড়ির গিন্নীর ভাদুর সঙ্গে সংগীত মারফতই চালায় বাদ-প্রতিবাদ। অনেকটা কবির লড়াই-এর মতো। এই সমস্ত গানের মধ্যে অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক খবরাখবরও পাওয়া যায় ; ক্রমান্বয়ে সে-বিষয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

ভাদ্র সংক্রান্তির দিন। মেয়েরা সারামাস ভাদুর পূজা করেছে। তারা এসেছে তাঁকে বিদায় দিতে। মেয়েরা নদীর ঘাটে ভাদুকে নামিয়ে রেখে গান শুরু করে দেয় :

বিদায় দিতে মন সরে না ভাদু তোমারে।
নিচ্চয় যদি যাবি গো ভাদু,
    ভুলিস না আমারে।
যাচ্ছ যদি ভাদুমণি,
কেঁদো নাকো মনোমোহিনী,
আর বচ্ছর থাকি যদি ভাদু—
    আনিব তোমারে।
আর কেঁদো না, ধৈর্য ধরো—
    মাসিক প্রণাম গ্রহণ করো,
কী করিবি, যেতেই হবে ভাদু—
বিধাতার নিয়ম রে ॥

ভাদু ঠাকুরানী যেন তাদের অনূঢ়া কন্যাটি। তাই সে যেন শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কান্নাকাটি শুরু করেছে দেখে মেয়েরা সবাই তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। এর সঙ্গে বাঙালীর আগমনী ও বিজয়া সংগীতের অপূর্ব মিল রয়েছে। লোকগীতির বৈশিষ্ট্য এইখানেই। লোক-কবিরা এখানে দেবতার লীলাখেলা বর্ণনা করে তাঁদের জীবনের কাহিনীও বর্ণনা করে, কিন্তু তার ভিতর দেবত্ব আরোপ না করে, সেই দেব বা দেবীকে তাদেরই ঘরের লোক—পরমাত্মীয় বলে বর্ণনা করে। তাই

বিজয়া সংগীতে প্রকাশ পায় বাৎসল্যরস। ভাদু এবং টুসু গানেও জননী বা ভগ্নীদের সেই স্বভাবসুলভ স্নেহেরই সন্ধান মেলে।

মানভূমের ভাদুগানে অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু রাজনৈতিক কথাবার্তাও ঢুকে পড়েছে। মানভূমের নিরক্ষর পল্লীবালারা ঠিক টুসু গানের মতোই ভাদু গান মারফত বলছে: 'ভাদু, তুমি তো প্রতি বছরই চড়ক ঘুরোচ্ছ। তোমার ঐ আবর্তনের পাকে পড়ে আমরাও ঘুরে মরছি। আমরা তো তোমার একান্ত অনুগত ছাড়া আর কী বলব বলো? কিন্তু এতে যে আমাদের জীবন কোন্ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে কে জানে? আমরা নেহাতই হাবাগোবা, তাইতো বিনা প্রতিবাদেই তোমার সকল বিধানই মাথা পেতে নিচ্ছি':

ভাদুধন চড়ক ঘুরাল্যো,
ঘুরছি ফি-সন পাকে পাকে ঠহর না মিলে।
যা খুশি তা বল তুমি, তড়াক্ বলি হঁ,
(আমরা) ডুবেছি কী, ডুবতে বাকি
কেনই জানি না।
'রাখ্ ধরম' 'রাখ্ ধরম' বলে চেঁচা করাল্যেক
কী যে হবেক্, কে বলবেক্—লাগোল না মিলে,
আধ পাগ্‌লা পাঁয়ে মোদের
আস্ত ডুবাল্যে॥

গানের ভিতর এই ধরনের রাজনীতি-ঘেঁষা কথা বাঁকুড়া, বীরভূমের ভাদু গানের ভিতরও পাওয়া যায়। সেখানে নিরক্ষর পল্লীবালারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, রাজনীতির কোনো খবরাখবর না রেখেও, আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে:

ও সোহাগী ননদিনী, নীলাম্বরি পরবি?
খোঁপায় সাধের গেঁদা-ফুলের পেরজাপতি ধরবি?
হায়-হায়-হারে পরনে নাই টেনা,
ভাসুর ঠাকুর আঙ্গনেতে ছিঁড়া-কাঁথাটা দেনা॥
সরম ধরম রইবে কুথায় বিবির হাটে যাব—
কন্‌ডোলেতে নাইন দিয়ে চাল মাগিয়ে খাব॥
কন্‌ডোলেতে চাল নাইরে,
কপালে মার ঝাঁটা

পথের পাশে মানুষ মরে
কুকুর-বিড়াল-পাঁঠা ॥

দিনের সাথে সাথে সমাজের সর্বনিম্ন তলার মানুষের মনেও রাজনৈতিক চেতনা জেগেছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই একথা ঠিক, কিন্তু তাই বলে পুরুলিয়া মানভূমের মেয়েরা তাদের আদরিণী ভাদুকে আগের চাইতে কিছু মাত্র অন্য চোখে দেখে না। তাই এখনও প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসভর তাদের গাইতে শোনা যায়:

রাজকুমারী ভাদু আমার দুখের মর্ম জানে না,
শুকালো দুখেরি গলা আ মরি কাঁচা সোনা।
হেদে যাব, পোদ্দার আনব গড়িয়ে দেব সিংহাসন,
তার মধ্যে খেলা করে রাজকুমারী ভাদুধন।
ভাদু আমার গরবিনী, হায় গো সোনার নথখানি,
গায়ে দিব মল চাদর, বুকে দিব জামদানী।
বেলা গেলো সন্ধ্যা হলো মাথা বান্ধ মা জননী,
আর কেন্দো না ওগো ভাদু আর পাঠাব না আমি।
কার বাড়িতে ছিলে ভাদু, কে করেছে পূজা গো,
বুকে মায়ের রক্তচন্দন পায়ে লাল জবা গো!
ভাদু আমার মান করেছে মানে গেলো সারা রাত,
মানের কপাট ভাংগ ভাদু পায়ে পড়ে প্রাণনাথ।
এনেছি বনেরি ফুল সুগন্ধ মালতী গো,
ভাদুর গলে হার গাঁথিব বসাইয়া গো।
অগুরু চন্দন ঘষে দিব ভাদুর বদনে,
বাঁকা করে বেন্ধে বেণী কাজল দিব নয়নে।
ভাদু আমার গরবিনী, ভাদু আমার প্রাণের ধন,
না দেখতে পেলে খনে মনে অচেতন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

করম পূজা ও উৎসব

শাল মহুয়ার দেশ মানভূম। সরল ঋজু এখানকার অধিবাসীদের চেহারা। মহানগরীর 'নিয়ন'ঘেরা কৃত্রিম আলোর অনেক দূর থেকে প্রকৃতির সাথে এক হয়ে মিশে গেছে সেখানকার কৃষাণ-কৃষাণীরা। ভুঞা মাহাতো এরাই হলো সাধারণত এখানকার কৃষাণ-সম্প্রদায়। জমি চাষ করে, রোজ মজুর খাটে আর অবসর সময় নিজেদেরই গড়া আসরের মাঝে কখনও সারেঙ্গী কখনও বা খোল কিংবা মাদল বাজিয়ে জুড়ে দেয় গান। এই রকমই ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীতে চন্দ্রের কিরণে যখন স্নাত হয়ে ওঠে বনপ্রান্তর, দূরে দূরে দেবদারু গাছের পাতার শন্‌শনানির সাথে ডুংরির ধার থেকে ভেসে আসে সাঁওতালী বাঁশীর সুর। সেই দিনই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে 'করম পূজা'।

'করম পূজা' অদ্ভুত কিছু নয়। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে যাকে বলে কদম ফুল ও কদমগাছ, মানভূমে তাকেই বলা হয়েছে করম ফুল ও করম গাছ। কদমফুল শ্রীকৃষ্ণের বড়ই প্রিয়। এই গাছের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সম্পর্ক থাকায় স্থানীয় নিরক্ষর কৃষাণ-সম্প্রদায় মনে করে, করমগাছ (কদম) হলো ভালবাসার প্রতীক। মূলতঃ করম উৎসব হলো আদিবাসী সমাজে প্রচলিত বর্ষা-উৎসবেরই নামান্তর। কিন্তু মানভূম ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা একে অন্যরকম ধরে নিয়েছে যেমনটি নিয়েছে ভাদু পরবকে। সে যাই হউক ঐ শুক্লা অষ্টমীতে তাই দেখা যায় গাঁয়ের যত কৃষাণ কুমার ও কুমারীরা বন থেকে একটি করে করম (কদম) গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এসে নিজেদের আখ্‌ড়ার মাঝে পুঁতে দেয়। পরে ঐ সব কৃষাণ কুমার ও কুমারীর দল একত্রে মিলে মিশে ওই পুঁতে দেওয়া করমের ডালখানাকে ঘিরে নাচতে ও গাইতে থাকে :

আইজরে করম রাজা ঘরের ভিতরে
কাইলরে করম রাজা ঘরের বাহিরে।
রুমুঝুমু বাঁকপরা, কানে কদম ফুল পরা
(মরি হায় হায়)

লাচো লাচো কুল ঘুচাস না।
দিদি ডেগিস না,
আড় বাজু দোলায়েঁ লাচিস না।
পাক্ দিয়ে বাঁধলি ঝুটি,
যত লোকে ছুটা ছুটি
না মিলে তোর ঠহর ঠিকানা,
দিদি ডেগিস না;
আড় বাজু দোলায়েঁ লাচিস না।
না শুনে কাহারও মানা
ধরলি লিজের তানা,
সারভেল জ্বালা গাঙ্গুনা ॥
দিদি ডেগিস না,
আড় বাজু দোলায়েঁ লাচিস না ॥

কৃষাণ কুমার-কুমারীদের মনে আজ কতই না আনন্দ। তাই তারা ভালবাসার প্রদীপ জ্বালিয়েছে তাদের আঙ্গিনায়। এক সখী বলে উঠ্ছে, 'দেখ্লো দিদি, হাত-বাজু পরে অত নাচানাচি করিস না। তোর যে ধরন-ধারণ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। নিজেদের খেয়ালেই নিজেরা মত্ত। কুলমানের দিকে তাকিয়েও দেখিস্ না। কারও মানা বা নিষেধও শুনিস্ না।'

করম পূজার নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এ পরবটি এখনও পুরোপুরি ভাবে বাঙালী সমাজের সাথে মিশে যেতে পারেনি। এর ভিতর আদিম সমাজের নৃত্য-গীত-প্রিয়তা, অবাধ প্রেম বর্তমান রয়েছে। করম পূজা ও পরব বাঙালী সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে এতদিনে সেও ঝুমুরের মতোই শ্রীকৃষ্ণেরই একটি পরব বলে বন্দিত ও আদৃত হয়ে উঠত। তাই বোধ হয় শুধুমাত্র মানভূম ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই বলতে গেলে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে এ পরব, পশ্চিম, পূর্ব বা উত্তরবঙ্গের ভিতর বিস্তৃতি লাভের তেমন সুযোগ পায়নি।

নবম পরিচ্ছেদ

[শারদোৎসব]

আগমনী ও বিজয়া

বাংলার লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্যই হলো এখানে লোক-কবিরা তাদের কাব্যে, গানে, গাথায় সর্বত্রই স্বর্গের দেবতা আর মর্ত্যের মানবীকে একাসনে বসিয়েছে। তারা তাদের কাব্যে, গানে মর্ত্যের মানবীকে দেবতার আসনে বসায়নি বা স্বর্গের দেবতাকে টেনে মাটির মানুষের সাথেও এক করে দেখায়নি। তারা এই দুটি রীতিই সযত্নে পরিহার করেছে তদের কাব্য গাথায়। এক কথায় স্বর্গের দেবতাকে তারা দেখেছে তাদেরই ঘরের লোক বলে। দুর্গাকে কল্পনা করেছে তাদেরই কন্যারূপে, তাইতো বছর শেষে দুর্গোৎসব উপস্থিত হলে আকাশে বাতাসে যখন আগমনী সুর ভেসে আসে, তখনই বাংলার কবিকুল কল্পনা করে তাদের প্রবাসী তনয়ার পিত্রালয়ে ফিরবার সময় হলো বলে। দুর্গা যেন তাদের ঘরের ছোট্ট মেয়েটি। অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছে, বেচারী শ্বশুরবাড়ি আছে। বাপের বাড়ির জন্য খুবই কান্নাকাটি করেছে সারাটা বছর ধরে। তাই তারা কল্পনা করেছে, যেমন অনেক দিন পর তাদের মানবী কন্যা পিত্রালয়ে ফেরে, দুর্গাও তেমনি তাদেরই মেয়ে, মা মেনকা যে তার মা। কাজেই তারা অনায়াসে কল্পনা করে নিতে পারে মা মেনকাও কাতর হয়ে পড়েছেন প্রবাসী তনয়া দুর্গাকে দেখবার আশায়। এ অনুভূতি সম্পূর্ণ ভাবেই মানবীয় অনুভূতি। এই রকম অনুভূতি না থাকলে তারা কল্পনা করে নিতে পারত না জগম্মাতা দুর্গারও কোনো কষ্ট থাকতে পারে। তারা এখানে দুর্গার দৈবশক্তি বা অলৌকিক শক্তির কথা আদৌ আমলই দেয়নি তাদের মনে। তারা জানে, দুর্গাও তাদের ঘরের আর পাঁচটা মেয়ের মতোই। কাজেই সে কি আর এতদিন বাপ মাকে (মেনকা ও গিরিরাজ হিমালয়) না দেখে থাকতে পারে ?

এই যে অনুভূতি এ শুধু বাংলার লোক-কবির তা নয়, এটা হলো সমগ্র বাঙালী জাতির। দেবতাকে একান্ত ভাবে আপনার পরিজন বলে ভাবার এই যে কল্পনা এটাই বাংলার লোকসংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতের

অন্য কোনো প্রদেশের লোকসংগীতে দেবতাকে ঠিক এতটা আপনার, এতটা ঘরোয়া করে দেখতে বা দেখাতে সক্ষম হয়নি। তাই দুর্গার আগমন উপলক্ষ্যে লোক-কবি-রচিত আগমনী ও তাঁর বিদায় উৎসব সম্পর্কিত বিজয়া সংগীত, বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ হয়ে রয়েছে, ভারতের অন্য কোনো প্রদেশের সাথে যার তুলনা চলে না। বাঙালী জাতি, ফলে ফুলে, রবির কিরণে, চাঁদের সুষমায়, আকাশের নীলিমায়, সাগরের নিস্তব্ধতার মাঝে খুঁজে পেয়েছে তার প্রাণের ঠাকুরকে। তাই তারা কল্পনা করেছে দশভুজা-দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গার। পৃথিবীর দশদিক হলো দুর্গার দশখানি হাত। ত্রিনয়ন—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে এক কথায় সর্বত্রগামী দৃষ্টি। বাহন হলো সিংহ, শৌর্যের প্রতীক। আয়ুধও এক একটি বড় কম নয়। এই সংগে দেবীর পুত্র কন্যাগণ যাঁরা আসছেন, তাঁরাও এক একটি জিনিসেরই প্রতীক। লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের, সরস্বতী জ্ঞান ও বুদ্ধির, কার্তিক শৌর্য্য বীর্যের, গণেশ বুদ্ধি বৃত্তি ও জনগণের প্রতিনিধি। এঁদের প্রত্যেকটি বাহনেরও তাৎপর্য আছে, যায় অসুর, সাপ, পেঁচা—বাদ যায়নি কেউই। এঁদের একত্রে আগমনেরও সমুচিত ব্যাখ্যা আছে। এসম্পর্কে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। দেবীর এই রূপ, সম্পূর্ণভাবেই বাঙালীর কল্পনা। কিন্তু যাই হউক, লোক-কবিরা অত তাৎপর্য বুঝে বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে কিছু রচনা করেনি। তারা যেটা বুঝেছে সেটা হলো দুর্গা তাদেরই ঘরের মেয়ে, বহুদিন মাতৃক্রোড়চ্যুতা, তাই যেন মা মেনকারাণী গিরিরাজকে বলছেন :

গিরিরাণী কহেন বাণী
কী হেরিনু স্বপনে,
সম্বৎসর হলো উমা আমার গেলো
নাই কি তা স্মরণে ॥

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
কন্যা বিনা শূন্য এ পুরী,
বিরহ যাতনা সইতে না পারি
ভুলিব তা কেমনে ॥

ভাঙ্গর ভোলা শ্মশানে মশানে
থাকেন ভূত প্রেত সনে,
মায়ের প্রাণ কী প্রবোধ মানে
তিলেক কন্যা বিহনে ॥

উমা বছর শেষে বাপের বাড়ি ফিরেছেন। সঙ্গে এসেছে তাঁর ছেলে মেয়েরা। মা মেনকা তো মেয়েকে দেখে কেঁদেই অস্থির। আহা বাছার কী হালই না হয়েছে! তিনি আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে বললেন :

বাবা পাগলা ভোলা ত্রিপুরারী
গৌরী মা এলো বাপের বাড়ি।
এলো বছরের পরে
দেখলে বছরের পরে
মায়ের একি বেশ
মুখে নাই হাসি লেশ
উমা মা এলো বাপের বাড়ি।
মাকে পূজিব বলে
ফুল চন্দনে আর ভক্তিতে
মায়ের চরণে দিব রক্তজবা।
জামাই আমার ভোলা ত্রিপুরারী
আমার ঘরেতে এলো উমা শংকরী।

বেশ আমোদে হাসিতে গল্পে কেটে গেল সপ্তমী, অষ্টমী, এল নবমী। মা মেনকার বুকের ভিতরটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল আসন্ন কন্যাবিচ্ছেদের আশংকায়, তাই নবমীর রাতকে সম্বোধন করেই তিনি বলে উঠলেন, 'ওগো রজনী, তুমি প্রভাত হয়ো না, তা হলে তো আর আমার নয়নের মণি উমাধনি আমার বুক খালি করে যেতে পারবে না' :

নবমীর নিশি গো তুমি
আর যেও না।
তুমি গেলে আমার উমা যাবে
নয়ন জল আর শুকাবে না।।
সপ্তমী আর অষ্টমীতে
আমি সুখে ছিলাম দিনে রাত্রে
আজি আমার ক্ষণে ক্ষণে
নয়ন জল কেন বাধা মানে না।।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি দুর্গার আগমন নিয়ে বাংলার পল্লী-কবিরা

যে-গান গেয়ে বেড়ায় পল্লীতে পল্লীতে, ঘোষণা করে দুর্গার আগমন বার্তা তাকেই বলা হয়েছে আগমনী সংগীত, আর তাঁর বিদায় কথা নিয়ে যে-সংগীত রচনা করেছে পল্লী-কবিরা, তাকেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে বিজয়া সংগীত বলে। কন্যা বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যাত্রার সময় মাতৃহৃদয়ের সেই যে করুণ মনোবেদনা অতি অনবদ্য ভাবে ফুটে উঠেছে লোক-কবির কাব্য গাথায় :

মাগো আমার দুঃখ গেল না
মনের আশা রইল মনে
আশা পূর্ণ হইল না।
তারা আমার দুঃখ গেল না ॥

মা মেনকা তথা সমগ্র বাঙালী নারীজাতির মনের কথা ব্যক্ত করেছে লোক-কবি :

রাণীর দুঃখ হইল ভারী
আজ প্রভাতে রইবে না আর
উমা শংকরী।

কিন্তু কান্নাকাটিতে কী-ই বা ফল আছে? নবমীর রাত তো প্রায় শেষ হয়েই এলো। ওদিকে সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই শুরু হবে দশমীর বাজনা। মনটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল মেনকার। তিনি রেগে গিয়ে বাঙালী ঘরের মেয়েদের মতো ছড়া আউড়ে বলে উঠলেন :

আসবেন জামাই নেবেন ঝি,
তার বেশি আর করবেন কী?

কিন্তু বললে কি হবে? ওদিকে বিসর্জনের বাজনা শুরু হয়ে গেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন—মহাদেব পত্নী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে যাবেন বলে। মেয়েরা সব অশ্রুজলের সাথে বিদায় দিলেন উমা ধনিকে। কেউ কেউ তাঁর কানে কানে বলেও দিলেন, 'আবার এসো মা'।

মা মেনকা যেন সমগ্র বাঙালী জাতির মাতৃ-হৃদয়ের প্রতীক। মেয়েকে জামাইবাড়ি পাঠাবার আগে আবার আদর করলেন, মিষ্টি খাওয়ালেন, নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়ে মেয়ের মুখ মুছিয়ে দিলেন সযত্নে। অশ্রুতে চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। মুখে 'মা, মাগো' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না।

কিন্তু মা মেনকার এই না-বলা-বাণী প্রকাশ করবার ভার নিল বাংলার চারণ দল। তারা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে জানাতে লাগল :

মায়ের দুঃখ হইল ভারী
যাত্রা করে কৈলাস পুরে
উমা শঙ্করী।

মায়ের নেত্রনীরে বক্ষ ভাসে
যায় গো হৃদয় বিদারি
আম্রপল্লব তার উপরি
দিয়াছে নারী ॥

শান্তি করে দ্বিজ বরে
বেদ মন্ত্র উচ্চারি।
যাত্রার মঙ্গল যত
সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত
মনেরই মতো।

মুখে শিব শম্ভো বলে
চলে দোলা ভর করি ॥

সন্তানের যে মমতা
মা বিনে আর কেউ বোঝে না
দ্বিজ রাধানাথে বলে
যাতনা হইল ভারী ॥

বাংলার লোকসংগীত বাঙালী সমাজের তথা বাঙালী জাতিরই ইতিহাস। আগমনী ও বিজয়া সংগীত ও বাঙালী জাতিরই সমাজ জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করেছে। এ সংগীতের মাধ্যমেই বাঙালী পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিচ্ছেদ, লোক-লৌকিকতা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ছবি অতি নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। স্নেহপ্রবণ বাঙালী জননীরা বারবার দেখা দিয়েছেন মা মেনকার মধ্য দিয়ে। এখানে দর্শনের দুরূহ তত্ত্ব নেই, বৈজ্ঞানিক গবেষণারও কোনো খবর মিলবে না একথা ঠিক, কিন্তু বাঙালী জাতির বিশেষতঃ মাতৃজাতির সহজ সরল সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যাবে বারে বারে। তাই আগমনী ও বিজয়া সংগীত বাঙালীর এত প্রিয়—এত আদরের ধন।

আহিরা উৎসব

বিজয়ার সাথে সাথেই সাধারণত শরৎকালীন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। কিন্তু একেবারে যায় না। আগমনী ও বিজয়া গানের রেশটুকু থাকতে থাকতেই মানভূমে শুরু হয়ে যায় 'আহিরা উৎসব'।

আহিরা উৎসব মানভূমের একটা চিরাচরিত প্রথা। কালীপূজার দিন রাত্রে গৃহস্থেরা তাদের বাড়ির গোরু ও মহিষগুলিকে পূজা দিয়ে থাকে এবং সারারাত্র যাতে এই প্রাণীগুলি ঘুমিয়ে না পড়ে এজন্য তাদের জাগিয়ে রাখবারও ব্যবস্থা করে। সাধারণত গান বাজনার মাধ্যমেই তাদের সজাগ রাখার ব্যবস্থা চালু আছে। আহিরা উৎসবের সাথে পূর্ববঙ্গের গোক্ষুরব্রতের কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কালী পূজার দিন রাত্রে মানভূমের আদিবাসীদের পল্লীর ভিতর শোনা যায় তারা গোরুর উদ্দেশ্যে বলছে :

আমি যে যাইতেছিলি কুলি বল কুলিরে
বাবু হো—।
রাঙ্গি গাই আনল ঘুঁরাইরে ॥
না কাঁদ না কাঁদ ও রাঙ্গি গাইয়া
সরোগে পাতোলে ধুলা উড়রে।

'আমিতো কুলি খাটবার জন্যই যাচ্ছিলাম, কেবল এই রাঙ্গি গাইতো (লাল রং-এর সুন্দর গাভী) আমায় ফিরিয়ে আনল। সুতরাং ওহে রাঙ্গি গাই মনে আর দুঃখ করো না, তোমার পায়ের ধুলো স্বর্গ থেকে পাতাল পর্যন্ত ব্যপ্ত হবে।'

কোনো কোনো সময় মহিষের উদ্দেশ্যেও বলতে থাকে—

কিয়া বরণ কাড়া তোরি দুই শিংয়ে
কিয়া বরণ দুই কান,
মাল খুঁটায় ঝুলত ওরে ভাই কাড়োয়া,
দুধা খাঁয়ে হলি বলবান।

'আহা কিবা তোমার গায়ের রং! কেমন সুন্দর তোমার খাঁড়া দুই শিং!' কেমন চমৎকার তোমার কান দুটো, মাল টানতে টানতেই অস্থির হয়ে পড়েছ। আবার তোমার দুধ খেয়েই তো আমরা এতটা বলবান হয়ে উঠেছি।'

আহিরা উৎসব মূলতঃ আদিবাসীদেরই, বিশেষতঃ গোয়ালা শ্রেণীরই উৎসব

একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—এ হলো মূলতঃ কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষেরই প্রতীক। কৃষিকাজে গোরু এবং মহিষ যে একান্তই প্রয়োজনীয় এবং ভারতীয় সমাজ যে সে কথা কোনো দিনই ভোলেনি এ গীতি ও অনুষ্ঠান থেকে এ কথাই পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। ধলভূমের এই ধরনের একটি গানে দেখা যাচ্ছে সেখানে গোরুর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা কি নিবিড়। কার্তিক মাসের শিশিরে গোরুর মাঠে যেতে কষ্ট হচ্ছে, সে যেন সেই কথাটাই বলছে, আর তারই উপরে রাখাল বলছে তার শীত নিবারণের জন্য সে সব রকম ব্যবস্থাই করবে :

খুকড়া মা ডাকি গেল ভাগল বিহান গো
শ্রীগাই তো ঠুকে রে কাঠাড়।
উঠরে আহিরা জাগরে আহিরা শ্রীগাইকে খুলত ময়দান ॥
নাই হামে উঠব নাই হামে জাগব গো
কার্তিক মাসে শিশিরে গা কাঁপে অঙ্গ মোর হইবে মিলন।
গায়ে যে দিব আহিরা দহরী চাদর গো পায়ে যে দিব
আহিরা রেশমের জুতা গো
মাথায় যে দিব আহিরা ঝিলি মিলি টুপি গো
হাতে যে দিব আহিরা টইনীর বাঁশি গো
শ্রী গাইকে খুলত ময়দান ॥
নাই যে লিব বাবা দহরী চাদর গো
নাই যে লিব বাবা রেশমের জুতা গো
নাই যে লিব বাবা ঝিলি মিলি টুপি গো
নাই যে লিব বাবা টইনীর বাঁশি
কার্তিক মাসে শিশিরে গা কাঁপে অঙ্গ মোর হইবে মিলন ॥

পশুর সঙ্গে মানুষের মনের এই যে অচ্ছেদ্য বন্ধন এর জুড়ি মেলা ভার।

দশম পরিচ্ছেদ

[পৌষ উৎসব]

টুসুগান ও পরব

'টুসু' হলেন শস্যের দেবী। দেখতে একটি মেয়ে-পুতুলের মতো। মাথায় থাকে রাংতার মুকুট। পরণে তার লাল, নীল কাগজের শাড়ী, হাতে গলায় সোনালী রাংতার গয়না। পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে একেই বলা হয়েছে 'তোষলা দেবী' এবং 'তুষ তুষলী ব্রত' বলে। একে পশ্চিম বাংলা এবং মানভূমের নারীকুল কখনও দেখেছে জননী ভাবে, কখনও বা কন্যা ভাবে। মেয়েরা তাদের সারা বছরের সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে এঁর কাছে, প্রতিকার চায় দেশজোড়া অভাব অনাচারের। এর অধিকাংশ গানগুলিও মেয়েদেরই রচনা। তাই এর ভিতর নারীজাতির সহজ সরল সংবেদনশীল মনের পরিচয় পাওয়া গেছে বারে বারে। এ অনুষ্ঠানে কোনো পুরোহিতের দরকার হয় না। মেয়েরাই এর ব্রতী। একজনে বসে বসে মূল গানটি (ছড়াও বলতে পারেন) বলে যায়, বাদবাকী সব ব্রতীরা সংগে সংগে আবৃত্তি করে চলে সেই ছড়া গানের।

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় পাঁচ বাড়ির মেয়ে বৌদের এক জোট হয়ে বসতে দেখা যায় কোনো এক বাড়ির টুসু দেবীর কাছে। বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অবশ্য তোষলা দেবীর পুজা হয় খুব ভোরে। বেদী তৈরি করে মাটির। সাধারণতঃ তুলসী মঞ্চটিই বেদীর উপযুক্ত জায়গা বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। মেয়েরা পিটুলীগোলা দিয়ে আঁকে তার উপর সুনিপুণ আলপনা। আলপনারই বা কী বাহার! শাঁখলতা, ঝুমকো লতা, পদ্ম, চাঁদ, সূর্য, ধানের ছড়া কত কী যে আঁকছে তার হিসেব করবে কে, এর উপর সাজিয়ে রাখে থরে থরে নিজের নিজের টুসু দেবীকে, তারপর আরম্ভ করল গান গেয়ে গেয়ে দেবীকে জাগাতে :

উঠ উঠ উঠ টুসু
উঠাতে এসেছি গো

তোমারি সেবিকা মোরা
পূজিতে বসেছি গো।

এরপর শুরু হলো দেবীর সম্মুখে ভোগ দেবার পালা। ভোগ দেয় চিঁড়ে, মুড়কী, খই, নারকেল কুচি, আকের টুকরা আর বাতাসা। মেয়েরা সবাই যে যার ঘরের কাজকর্ম সেরে এসে বসে। কাজেই ব্যস্ততার কোনো কারণ নেই, তাই তারা একে একে বর্ণনা করে যায় তাদের সাধারণ ঘরের কথা :

চল্ টুসু চল্ দেখ্‌তে যাবো
রাণীগঞ্জের বড়তলা
আসবার সময় দেখাই আনব
কয়লা খাদের জলতুলা।

পল্লীনারীর সহজ সরল বিশ্বাসের গুণে দেবতা আর মানুষ এখানে এক হয়ে মিশে গেছে। টুসু দেবীকেও তাই তারা তাদের মতোই সমশক্তি সম্পন্না বলে ধরে নিয়েছে। বিশেষত বর্ষিয়সী নারী যারা তারা তো এঁকে কন্যাভাবেই দেখেছে। কাজেই তাদের কাছে টুসুকে ছোট খুকীটি ভাবা ছাড়া আর কি-ই বা গতি আছে? তাই তো তারা স্বর্গের দেবীকেও দেখাতে নিয়ে চলেছে রাণীগঞ্জের বড়তলা এবং ফিরতি মুখে দেখাবে 'কয়লা খাদের জলতুলা'।

গায়িকাদের এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ মনে পড়ল, তাইতো দেখতে যে যাবে, কিন্তু কি উপায়ে? ঠিক করল, বাড়ির ভিতর যে বড় নারকেল গাছটা আছে, সেটাকে কেটে বানাবে কলগাড়ি (রেলগাড়ি)। টুসুকে তাইতে চাপিয়ে নিয়ে যাবে, সংগে অবশ্য তারাও থাকবে। শুধু কি তাই, দেখুন পরেই আবার বলছে ওই গাড়িতে করেই ডাক্তারবাবুর বাড়িও ঘুরে আসবে :

বাড়ির ভিতর নারকেল গাছটি
কেট্যে করব কলগাড়ি,
কলগাড়িতে চাপ্যে যাবো
ডাক্‌তারবাবুর ঘর বাড়ি।
ডাক্‌তারবাবু ডাক্‌তারবাবু
আর খাব না জল সাবু,
জল সাবু খাঁয়ে ধর্যেছে মাথা
আন্যে দাও কমলা লেবু।

তা বেশ কথা, কলগাড়িতে চেপে বেড়াতে যাবে। পথে রং-বিলাসী তেল কিনতে পাওয়া যায় তার এক শিশিও কিনে আনা যাবে, নইলে চুল বাঁধা হবে কি করে ?

কিন্তু পয়সা ?

সেজন্য ভাবনা নেই। সঙ্গেতো টুসুমণি, মা জননীই আছেন। তিনি কি আর দু আনা পয়সা দেবেন না, 'রং-বিলাসী তেল' কিনবার জন্য ? :

টুসুমণি, মা জননী
পয়সা দাও মা দু আনা,
রং-বিলাসী তেল উঠ্যেছে
রুখু মাথা বাঁধব না।

রাত গভীর হয়। মেয়ে বৌরা যে যার বাড়ি বা ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় আবার তারা টুসুকে জাগিয়ে নিয়ে, তার সামনে ভোগ দিয়ে নানা রকমের ফুল দিয়ে দেবীকে সাজিয়ে আবার শুরু করে গান। এবার আর শুধু সাধারণ কথা নয়। এ গানের মধ্যে তারা তাদের মনের কথা, দেশের সাধারণ সুখ-দুঃখের কথা আরও অনেকটা স্পষ্টভাবে বলতে সক্ষম হয় :

একলা ঘরের বউ ছিলি
চঞ্চলা মন কে করে দিলি।
পুরুলিয়ার সরু চাদর
উড়ে গেলে ধরব না,
যার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা
প্রাণ গেলে রা কাড়ব না।
জুনবাজারের শিলাই ধারে
নানা রংয়ের হাট পরে,
আমার টুসু বসে আছে
গোলদারি দোকান কইরে,
ও দোকানী দোকান খোল
গোলমরিচ কি পাব না,
মুল গায়েনের রা ধইর‍্যাছে
গোল মরিচ বই ছাইড়ব না।

তুই নাকি হে বড় দোকানী

পয়সা দিয়ে তাও মেলে না

এলাচ লবং দারচিনি।

সরপে সরপে যাব রাজাকে কোলে লিব

যেমনি রাজার কালো ব্যাটা

সবাই মিলে সাজাব।

টুসু গানের কথা বলতে বসে একটা কথা বলে নেওয়া ভাল, মেয়েদের এ সবই কবি গানের মতো হঠাৎ-রচনা (Extempore)। কোনো গানই তারা আগে থাকতে তালিম দিয়ে তৈরি করে আসে না। তাই তারা তাদের গানের মধ্যে অনেক সময় এক গান গাইতে গাইতে অন্য গান ধরে বসে। একজনের একটা গান শেষ হতে না হতেই অন্যে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। এই রকম অন্য একদিন টুসু জাগাবার পরই হয়তো পেড়ে বসে রামায়ণের কথা। তরুণ কিশোর রামকে বনে পাঠিয়ে দিয়ে কি যাতনা যে কৌশল্যার বুকে তার সুস্পষ্ট ছায়া পড়েছে এই মাতৃকুলের হৃদয়-মন্দিরে। শুধু কি তাই? মা জানকীর কথাও তারা ভেবেছে। রাবণ সীতাকে হরণ করেছে, তাই তাকেও অনুরোধ করছে রাজনন্দিনী অযোধ্যার কুলবধূ সীতাকে যেন সে কষ্ট না দেয়:

ও রামের মা, ও রামের মা,

রাম কে দিলি কোন্ বনে

রামের পায়ে সোনার নেপুর বাজে গো।

অশোক বনে পাতার কুঁড়ে

সীতা আছেন তাতে

সীতা হরণ করলি রাবণ

রাখবি সীতা যতনে।

অনেক সময় এই সব টুসু গানের ভিতর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গানও থাকে যেমন:

(১) যমুনার জলে,

বাঁশি বাজে গো রাধা বলে।

যদি আমি থাকি ঘরে বাঁশি বাজে নাম ধরে।

শাশুড়ী ননদী ঘরে, কেমনে যাব চলে ॥
না জানে প্রেমের মরম, যাও সখি কর বারণ
অসময়ে বাঁশি বাজে; যাব আমি কোন ছলে ॥

(২) রইবো কেমনে ।
দিবানিশি হয় মনে ॥
যে দিন দেখা হয়েছে, মন ভুলেছে সেই দিনে ।
প্রাণবঁধু না দেখিলে, মনে হয় বনে বনে ॥
আমি দেখা পাব কোন্ খানে ॥
কি উপায় করি সখি, মরি প্রেম জ্বলনে ।
জগন্নাথের হয় মনে ॥

(৩) চল সখি সব যমুনা ।
আমার গৃহেতে মন থাকে না ॥
সবাই মিলে চল জলে, হেরিব কাল সোনা ।
কাল সোনা না হেরিয়ে থাকিতে আর পারি না ॥
বনে মনে বাঁশি বাজে, ভুলিতে আর পারি না ।
কি উপায় করি সখি, প্রাণ ত আমার বাঁচে না ॥
আমি আশা করি মনে, মিলিব গো দুজনা ।
জগন্নাথ বলে, চল হেরিবো কাল সোনা ॥

(৪) পিরীত কইরো না ।
পিরীত করলে তো কুল রবে না ॥
যে কোন থাকিলে জাতি, তাও করিবে পিরীতি ।
পিরীতি এমন নীতি, ভুলা ত আর চলে না ।
যদি কথা না শুনিবে, কলঙ্কিনী নাম হবে ।
জগন্নাথের কথা এই বার, বুঝে ত দেখ না ॥

(৫) ঐ ধনির বিনে ।
আমি রইতে না পারি ঘরে ॥
মন মানে না কোন খানে, দেখা পাব কেমনে ।
মুচকি হাসি দিবানিশি, জাগিছে মনে মনে ॥

যদি দেখা হয় নয়নে, ধরবো তবে চরণে।
মনের আশা ভালবাসা, পুরাই দুইজনে ॥

(৬) কি আছে মনে।
তুমি খুলে বল এখানে ॥
যদি পিরীতি করিবে, এই কথা শুন কানে।
সত্য যদি কর তুমি, মিলিব তোমার সনে ॥
অনেক দিনের পরে, দেখা হইল নয়নে।
জগন্নাথ কয়, এতদিন ছিলে তুমি কোন খানে ॥
সময় গুচালে অকারণ ॥

(৭) কেন বাজাও বাঁশি।
বাঁশি শুনি মন হইল উদাসী ॥
শুন ওহে নব নাগর, তোর বিনে ওঠরে।
কেমন করে থাকবো ঘরে, জাগিছে দিবানিশি ॥
আমরা যে নারী জাতি, কি করে রাখিবো পিরীতি।
আর বাজাও না প্রেমের বাঁশি, শাশুড়ী আছে বসি ॥

(৮) পুরুষ কেমন ধন।
জানে সেই সতী জন ॥
বাহির হইল রাম লক্ষ্মণ, সীতাও চলিল তখন।
রামের সংগেতে সীতা, চলে গেল বনে ॥
সীতা করে ক্রন্দন, রামে করে বারণ।
সীতা বলে আমি তোমার না শুনিব বচন ॥
দীন জগন্নাথ ভনে, তিন জনা গেল বনে।
পুত্রশোকে দশরথের হইল গো মরণ ॥

(৯) চল সখি ফুল তুলিতে।
বঁধু আসিবেন কুঞ্জেতে ॥
সবাই মিলে আনবো তুলে
দিব বঁধুর গলে,
সেই ফুল হেরি যেন
ফিরে না যায় ঘরেতে ॥

ফুলমালা দিব গাঁথি, জেলে দে রতন বাতি।
নিশ্চয় আসিবে বঁধু, বলিছে জগন্নাথে॥

(১০) দুদিনের জন্যে।
ধনি গরব্ করিস কেনে॥
দিনে দিনে দিন ফুরাবে, সেই মতন তুমি হবে।
এমন সময় আর পাবে না,
বুঝে দেখ না মনে॥
পিরীত করিব দুজনে
কেওনা দেখে নয়নে।
জগন্নাথ কয় সকল ছেড়ে
পিরীতি রাখ বনে॥

(১১) ধৈর্য না ধরে
আমি থাকিব কেমন করে॥
আসব বলে আশা ছিল,
কেন ফিরে না এলো।
দিবানিশি থাকি বসি প্রাণ বঁধুর তরে।
পিরীতি করি গোপনে,
কিন্তু তাহার নাই মনে।
কি উপায় করি সখি জানিছে অন্তরে॥
দীন জগন্নাথ গায়, পিরীত করা বড় দায়!
ঘরে পরে সকুলেতে, জানিল আমারে?

(১২) বসন দাও ফেলে।
আমরা থাকতে না পারি জলে।
শুন হরি লাজে মরি,
আর না করি দেরি।
বসন করিলে চুরি, রাখিলে গাছের ডালে।
ঘর যাব কেমনে চলে, উলঙ্গে আছি জলে॥
আমরা অবলা নারী, কেন দেরি করিলে।
দীন জগন্নাথ ভনে, বুঝে দেখ মনে।

জল মাঝে আছি লাজে
যাব আমি কোন্ ছলে ॥

শুধু কি তাই—এদের গানে অনেক সময় দৈনন্দিন খবরাখবরও পাওয়া যায়, অথচ এই সব রচয়িতা বা রচয়িত্রীদের কেউই সজ্ঞানে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী নয়:

(১) দেখ নয়নে।
সুপার ফাইন ছাড়া নাই মনে ॥
রাঁড়ি যারা, শাড়ি শায়া পরিছে এই মানভূমে ॥
যৌবনের গরবে, সাদা বসন নাই মনে ॥
কলি যুগের ব্যবহার, দেখিলে জাগে মনে।
দীন জগন্নাথ ভনে ॥

(২) ফের কর সবাই।
ধান গেল গো জলের জ্বালায় ॥
জল ছাড়িল ভাদরে, সকল ধান গেল মরে।
ধানের আশা দেখিলে, প্রাণ বাঁচা ত হবে দাই ॥
হাটে হাটে কিন ধান, তবে ত বাঁচিবে প্রাণ।
সেই ধান ঘরে আন, জলেতে ভিজায়ে দাও।
সিঝাঁয়ে শুখায়ে কুট, তারপরে লেগ হাট।
দীন জগন্নাথ বলে, এবার কর উপায়।

(৩) পয়সা ঝুড়ি।
কাজ করগো তরাতরি ॥
পেটের জ্বালাতে, যায়গো মাটি কাটিতে।
কম ঝুড়ি দেখিলে বাবু তখন করে জারি ॥
ভাদর আশ্বিনেতে, দিন যাবে গো কিমতে।
সে সকল ভাব মনে, যাছে গো তাড়াতাড়ি ॥
পয়সা যদি ফুরাইল, কালিবাবু ডাক দিল।
একবার পয়সা দিলে, কাজ দেয় বন্ধ করি ॥
একে একে পয়সা দিলে, রেজাকুলির কাজ মিলে।
সবাই মিলে পয়সা দিলে, কাজেতে হয় দেরি ॥

বারটা বাজিলে পরে, যায় গো আপন ঘটরে।
রেজাকুলি কদাল ফেলি, চলে গো সারি সারি ॥
দীন জগন্নাথ ভনে, দেখ সবাই নয়নে।
মাটি ঝুড়ি মাথায় করি, চলিছে কুলের নারী ॥

(৪) মাঘ ফাগুন মাসে।
তোরা থাক না ঘরে বসে ॥
আগে কর জলের আশ,
নানা রকম কর চাষ,
এই কলিতে খাটতে হবে,
সবাই মিলে মিশে ॥
চুরি কাজ ছেড়ে দাও, ধরালে জানে সবাই।
পুলিসেতে বাঁধে হাতে, কত লোকের পাশে ॥
জগন্নাথের এই বাত
বলিলে কি মিলে ভাত,
চাষ না করিলে বল,
দিন যাবে গো আর কিসে ?

(৫) সাধুর দৌলতে।
চলে যাব পরব দেখিতে ॥
সাধু করিল রাস,
কত লোক আসিল পাশ,
এ তুলিনে সাধু বিনে,
কে পারিবে তরিতে ॥
দেখিলে নাচ গান,
ভুলে যায় গো প্রাণ।
দিবা নিশি থাকি বসি,
বিছানার উপরেতে ॥
চল সবাই একই সাথে
দেখিব নয়নেতে।
মটর রেল গাড়ি চেপে,

আসিছে লোক দেখিতে,
বলিছে জগন্নাথে ॥

ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসে মকর সংক্রান্তি (পৌষ সংক্রান্তি)। গোটা পৌষ মাস ধরে এই ভাবে টুসুদেবীর কাছে নিজেদের সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে দেশের দশের খবর জানিয়ে সংক্রান্তির দিন তাঁকে ভাসিয়ে (বিদায়) দেবার পালাও এসে যায়, এরই আগের দিন রাতেই হয় টুসু-জাগরণ :

পৌষ পরব মেলা
সবাই দেখতে চল এই বেলা।
হাতে টুসু মুখে গান,
দেখিতে ভুলে প্রাণ।
কত ভাবে চলে যায় সবার অঙ্গে ঝুলা
শাড়ি শায়া আছে গাতে,
চলে সবাই এক সাথে।
নাকে নুলুক গলে হার,
ঐ দেখি মন চঞ্চল ॥
বছর দিনের মতন,
চল দেখিব এখন।
জগন্নাথ কয় নানা রকম হয়
তুলিনে খেলা ॥
দেখ কেমন উড়ে ধুলা ॥

এই দিন এবং এর পরের দিনই (সংক্রান্তির দিন) হলো টুসুগানের সব চাইতে বড় ধুম ধাম। জাগরণের দিন এক পাড়ার মেয়ে বৌরা দল বেঁধে চলে যায় আরেক পাড়ায়। আগেই বলেছি কয়েক বাড়ির মেয়ে বৌরা মিলে এক একটি ছোট ছোট দল সৃষ্টি করে নেয়। সুতরাং এক দলের সঙ্গে আরেক দলের যে সেখানে গানে গানে প্রতিযোগিতা চলবে এ আর একটা বেশি কথা কি?

মনে করুন পুরুলিয়ার পূবপাড়ার টুসুর দল বেড়াতে এসেছে পশ্চিম পাড়ায়। বেড়াতে এসেই পশ্চিম পাড়ায় টুসুদলের নেত্রী নিমিকে আক্রমণ করে বসল পূবপাড়ার কর্ত্রী তার গানের মারফত :

নিমির টুসু্র চোখগুলো রসুন ভাজা
নিমি তুই যতই সাজা,
আমার টুসু নেয়ে (নৌকায়) আসছে
জোড়া শঙ্খ বাজে গো,
নিমির টুসু নেয়ে আসছে
জোড়া কুকুর ডাকে গো।
আমার টুসু মুড়ি ভাজে
চুড়ি ঝল্‌মল্‌ করে গো,
নিমির টুসু মুড়ি ভাজে
পোকা লেড়বেড় করে গো।
আমার টুসু রুটি বেলছে
চাকী বেলনা ঘুরে গো,
নিমির টুসু হেংলা মাগী
হাত পেত্যে তাই চায় গো।

বুঝুন তা হলে, মানভূমের এইসব টুসু গায়িকারা নিরক্ষর হলে কি হবে, তাদের রসজ্ঞান কত গভীর! অবশ্য নিমিও কমতি যাবার পাত্রী নয়। সেও পাল্‌টা জবাব দিচ্ছে :

আমার টুসু পান খাচো
থুক্‌ থুক্‌ পিচ ফ্যালাইচ্যে গো
রুনির টুসু হেংলা মাগী
চাইট্যে চাইট্যে তাই খাচ্ছে গো।

অবশ্য এসব বাদ-প্রতিবাদেরও এক সময় অবসান ঘটে। শেষটায় দু'পক্ষের দলনেত্রী পরস্পর পরস্পরের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে পরস্পরকে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ করে। এই ভাবেই সারা রাত-ভোর তারা গানের পর গান গেয়ে রাত জেগে টুসুকে 'জাগায়', শেষটায় ভোর হবার সাথে সাথে দলে দলে চলে নদীর ঘাটে টুসু ভাসাতে।

এই টুসু ভাসাবার ব্যাপারটা আরও বিচিত্র। মকর সংক্রান্তির দিন ভোর হবার আগেই ব্রতী-মেয়ে-বৌরা যে যার টুসু কোলে নিয়ে (যেন আদরের দুলালীকে কোলে নিয়ে যাচ্ছে) তাড়াতাড়ি চলতে থাকে নদীর ঘাটের দিকে। সকলের টুসু যে একই রকমের তা নয়। কারও কারও টুসু আসে রঙিন জামা

কাপড় পরে। কারও টুসু আসছে পাল্কীতে চেপে, কেউ বা গাড়ি, কেউ বা রথে চড়ে। এই সব গাড়ি, পাল্কী, রথ এগুলি দেখতে যেন ছোটখাট তাজিয়া। নদীর ঘাটে গিয়ে তারা সূর্য উঠবার আগেই সেই শীতের ভোরে স্নান সেরে নিয়ে সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে গান ধরে :

ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুম্ বাজনা বাজে
মোরা বলি কি বাজে
ওলো ওই নদীর ধারে ?
তোদের টুসু কাঁদছে লো
ওলো ওই নদীর ধারে।

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন এখানেও গত রাতের সেই বাদ-প্রতিবাদের রেশ স্বরূপ ঠেস দিয়ে কথা বলবার আভাষটা একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে। এরপরই তারা টুসুদেবীকে ভাসাতে বসবে। তার আগে তাঁকে স্নান করাবে। শেষটায় সেই সব নৌকা, পাল্কী, রথ সব ভাসিয়ে দেবে গাঙের জলে। টুসুদেবী কুমারী মেয়েদের জন্য বর খুঁজে নিয়ে আসবেন, আর এয়োতীদের জন্য নিয়ে আসবেন ধন-দৌলত। তাই বিচিত্র সুরে গান ধরে মেয়েরা :

টুসু সিনাচ্ছেন, গা দোলাচ্ছেন
হাতে তেলের বাটি,
নয়ে নয়ে চুল ঝাড়ছেন
গলায় সোনার কাঠি।
কার ঘরে মা বৌ ঝি আছে,
কে বা খাবে পান।
শাশুড়ী ননদের ঘরে করে অপমান ॥
টুসালু গো রাই,
আমরা গাঙ সিনানে যাই
গাঙের জলে রাঁধি বাড়ি
মকরের জল খাই ॥
হাতে পো, কাঁখে পো,
পিরথিম জুড়িয়া টুসু
না পারিলো রো ॥

তবেই বুঝুন, টুসুদেবী এখানে আর স্বর্গের দেবী নন। তিনি তো তাদেরই ঘরের মেয়ে, কাজেই তাঁর স্নান করবার পদ্ধতি তো তাদের মতোই হবে।

টুসুকে ভাসিয়ে দেওয়া হলো গাঙের জলে। একে একে সকলের টুসুই চলল গাঙ দিয়ে ভেসে ভেসে। আমাদের পূর্ব পরিচিত পূব ও পশ্চিম পাড়ার নিমি ও রুনির টুসুও ময়ূরপংখী নৌকাতে চেপে যাত্রা করলেন। সূর্য দেখা দিলেন কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে। মেয়েরা ফিরে চলল ঘরের দিকে।

টুসুকে আমরা জেনেছি শস্যের দেবীরূপে। তাঁর দৌলতেই আমরা শস্য পেয়ে থাকি, সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করি। তাঁর কাছে মেয়েদের দেখেছি তাদের সুখ-দুঃখের খবর জানাতে। তাদের সরল অকপট হৃদয়ের ছোট খাট সুখ-দুঃখের কথা শুনেছি আমরা। তিনি আবার কুমারী মেয়েদের জন্য বর খুঁজে নিয়ে আসেন সময় বিশেষে, এমন কি এই সময় যদি ভোটপর্ব এগিয়ে আসে তা হলে তিনি আবার ভোট দিতেও এগিয়ে যান। দেখুন না আমাদের পূর্ব পরিচিত টুসুদলের নেত্রী রুনিও কেমন নিমির টুসুকে ঠেস দিয়ে বলছে :

আমার টুসু ভোট দিচ্ছে
ইঞ্জিনিয়ারের ইঞ্জিনে,
নিমির টুসু ভোট দিচ্ছে
কাঁচা কয়লার গোদামে।

তা যাই হউক, শত হলেও টুসু তো বাঙালীর 'তুষ-তুষলী' বা 'তোষলা দেবীর'ই অপর নাম। কাজেই তিনি যে বাঙালী দেবী একথা আর স্বীকার না করে উপায় কি? তাই টুসু যখন এতই করছেন তখন মানভূমের ভাষা আন্দোলনে বা বাঙালী বিহারী সমস্যার সময় কি তিনি একেবারে পেছিয়ে থাকতে পারেন? তা নিশ্চয়ই নয়। তাই তো টুসু-জাগরণের দিন রাত্রে কোনো এক পক্ষের টুসু দলের অধিনেত্রীকে বলতে শুনি :

ও তুই চলে যা মানে মানে
রইতে নারি তোর অনাচারে॥
অনাহারে লোক মরিল
হুড়াপুঞ্জার গ্রামেতে,
এক কলমেই লিখে দিল
সবাই ভিখারী বটে॥

মাতৃভাষার টুঁটি টিপে
উঠালো আদালতে,
তাই তো এখন চায় না রে মন
অনাচারে রহিতে ॥

শুধু কি তাই, অকর্মণ্য রাজপুরুষের এইসব কাজের প্রতিবাদ করলেও উপায় নেই, তা হলেই তো সাধারণের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেবার জন্য ব্যবস্থা আছে :

টুসু লো কি দশা হবে,
আমদের কথা বল্‌লে দিগার গারদ
ঘরে নিয়ে যাবে।
এড়েং ব্যড়েং বইল্লে তবে অরা
আমদের ছাইড়িবে,
ওলো কি দশা হবে।

টুসু হলো লোক-দেবতা। লৌকিক দেব-দেবীর মজাই হলো তাঁদের উপরের আবরণ যতই দেবত্ব মহিমায় মহিমান্বিত হউক না কেন আসলে তিনি যে জনগণেরই প্রতিনিধি। তাই তো তাঁর কাছে নিজেদের মনের কথা, অভাব অভিযোগের ছবি তুলে ধরতে এতটুকু দ্বিধা আসে না মনে। প্রতিকার চেয়ে ফল না পেলে তাঁর উপর রাগ করতেও আমাদের বাধে না। মানভূমের বাঙালী অধিবাসীদের বাংলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবি চিরদিনের। বাঙালী তারা, বাংলা তাদের মাতৃভাষা। কাজেই এর জন্য তারা বিহার সরকারের সব রকম অত্যাচারই হাসি মুখে সহ্য করে নিতে পেরেছিল। মানভূমের বাঙালীদের জন্মগত অধিকারের দাবিকে বিহার সরকার আখ্যা দিল 'হিন্দীবিরোধী আন্দোলন'। সুতরাং সেখানে শুরু হলো অত্যাচার। অবিচার চলতে লাগল বাঙালীদের উপর নির্মম ভাবে। ১৯৫৫ সালের টুসু পরবে তাই শোনা গেল টুসুব্রতীদের বেশ দরদপূর্ণ অথচ দৃঢ়কণ্ঠের গীত :

শুন্‌রে বিহারী ভাই,
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ দেখাই।
তোরা আপন পরে ভেদ বাড়ালি,
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।
ভাইকে ভুলে করলি বড়

বাংলা বিহার বন্ধুটাই।
বাঙালী বিহারী সবাই
এক ভারতের আপন ভাই,
বাঙালীকে মারলি তবু
বিষ ছড়ালি হিন্দী চাই।
বাংলা ভাষার দাবিতে ভাই
কোন ভেদের কথা নাই,
এ ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে
মাতৃভাষার রাজ্য চাই।

বাঙালীর পক্ষে বাংলা ভাষাকে পরিত্যাগ করা আর তার মাকে পরিত্যাগ করা একই কথা। সন্তান যেমন কোনো অবস্থায়ই তার জননীকে ত্যাগ করতে পারে না তেমনি পারে না তার মাতৃভাষাকেও। মানভূমের টুসুব্রতীরা তাই শেষ কথা ঘোষণা করল:

আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষারে
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তাকে ?
বাংলা ভাষারে ॥
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাত পুরুষের আমলে।
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা বলে।
এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড
এই ভাষাতেই চেক কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি
সাত পুরুষের হক পাটা ॥
দেশের মানুষ ছাড়িস্ যদি
ভাষার চির অধিকার,
দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার ॥

লোক-কবিরা শহরের মেকী সভ্যতার ধার ধারে না। বিজলী বাতি আর কলের জল চোখে দেখে না। সংবাদপত্র আর বেতারের ওজন করা কথার সঙ্গেও

তারা পরিচিত নয় একথা ঠিক! কিন্তু তাদের গণ-চেতনা তথাকথিত বাবু ভুইঁফোঁড়দের চাইতে যে কিছুমাত্র কম নয় এ পরিচয় আপনারা শুধু টুসুগান কেন বাংলার অধিকাংশ লোক-সংগীতের মারফতই পাবেন। এইসব গানই হলো নিরক্ষর পল্লীবাসীদের সংবাদপত্র—এর মারফত তারা তাদের মত গঠন করবার সুযোগ পায়। এখানে ভেজালের যেমন কোনো সম্ভাবনা নেই 'সেন্সরসিপে'রও তেমনি কোনো বালাই নেই।

কিন্তু এ সত্ত্বেও কত লোক-কবিকে যে কতবার 'রাজ-রোষে' পড়তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

পৌষ পার্বণ

হৈমন্তিক ধানের মিঠে গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠল বাংলার আকাশ বাতাস। গৃহস্থ বাড়ির আঙিনায় দেখা গেল ধানের আঁটি। কুলবধূরা দেয়াল অথবা বেড়ার গায়ে আঁকল সিঁদুর পুত্তলী। ঘরে ঘরে নতুন ধানের শীষ মঙ্গলাচারের সঙ্গে দেয়াল বা খুঁটির গায়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। চাষীবাসী গৃহবাসীদের হাতে এইবার এল অবসর। তারাও তৈরি হলো পৌষ-পার্বণ বা পৌষালি উৎসবের জন্য।

বার মাসে তের পার্বণের দেশ এই বাংলা। ঋতুতে ঋতুতে এখানে নিত্য নতুন উৎসব যেন লেগেই আছে। এই ঋতু উৎসবের সঙ্গে যেমনি রয়েছে মাটির সম্পর্ক, তেমনি মনের যোগাযোগ। এ দেশের লোক মাটির সঙ্গে একাত্ম, দেবতাকে ভাবে আপনার পরিজন বলে। পৌষলক্ষ্মীকেও তারা বরণ করে নিয়েছে জননী অথবা কন্যা ভাবেই। লোক-কবিদের কাব্যের বৈশিষ্ট্যই এই, একথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। তারা দেব-দেবীর বন্দনা গেয়েছে, তাঁর স্তুতিবাদ করেছে, একথা ঠিক। এমন কি তাদের রচিত অধিকাংশ গীতি ও গাথাই যে দেব-দেবীকে উপলক্ষ্য করেই একথাও সত্য। কিন্তু এই দেবতা চিরকালই 'লোক-দেবতা'। বাংলায় পল্লী-কবিদের কাব্যে তাই পৌষলক্ষ্মীর পূজার বন্দনায় প্রকৃত পক্ষে শষ্য-দেবীরই বন্দনা গাওয়া হয়েছে। কৃষিপ্রধান ভারতের অন্তর এবং ভাবরূপটি অপূর্বভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে এই সব অজ্ঞাত লোক-কবিদের কাব্যের মাধ্যমে।

পূর্ব বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও দেখা যায় পৌষ মাসের মাঝামাঝি দলে দলে মেয়ে অথবা পুরুষ বাড়ি বাড়ি ঘুরে পৌষ সংক্রান্তির মাগন আনতে

যায়। কখনও পুরুষ কখনও মেয়ের দল। সন্ধ্যার পর থেকেই তারা পাড়ায় পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গাইতে শুরু করে। সঙ্গে যে এদের বাজনা বাদ্য খুব বেশি কিছু থাকে, তা নয়। ঘরে লক্ষ্মীঠাকুরানী উঠেছেন সেই আনন্দেই তারা বিভোর। মনের আনন্দে একে অপরের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে গাইতে থাকে :

শাঙ পাঙ নড়িল হস্তী ঘোড়া চড়িল।
হস্তী ঘোড়ায় কী কাম করে
রাজার মাইনা খাইয়া নড়ে,—
রাজার বাড়িরে— ।
রাজার বাড়ি হাজার ভাত
তাই দেখিয়া রে—
তাই দেখিয়া ওড়ে হাঁস—
হাঁস ওড়ে রে—
হাঁস ওড়ে দিয়া মোড়া
পায়রা ওড়ে বত্রিশ জোড়া।
পায়রা ওড়ে রে—
ওড় পায়রা সরল হাতে—
ডিগ্ দাইন্যা লক্ষ্মী হাতে
ডিগ্ দাইন্ রে—

এক বাড়ির মাগন নিয়ে তারা আরেক বাড়িতে গিয়ে ওঠে। গিয়েই যে গান ধরে তা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আপনা আপনির বাড়িতেই যেয়ে থাকে এই মাগন আনিয়ের দল, তাই সে বাড়িতে গিয়ে একটু পান সুপারী মুখে না দিয়ে পারে কি? পান সুপারী মুখে দিয়ে আবার নতুন ছড়া ধরে :

অ গিরি অ গ গিরি
বাইর কইর‍্যা দ্যাও সোনার পিঁড়ি।
সোনার পিঁড়িতে বসবে কে?
লক্ষ্মী ঠাক্‌রাণ আইস্যাছেন।
লক্ষ্মী ঠাক্‌রান দেলেন বর,
ধনে ধাইন্যে ভরুক ঘর।
এ ঘর ভরে, উঘর ভর,
কলা তলায় গোলা কর।

কলাতলায় হাঁটু পানী,
ধান লইয়্যা টানা টানি।
ধানে পইলো শ্যাওলা
ধান হইলো একশো বত্রিশ গোলা।

পৌষ পার্বণ মূলতঃ কৃষি উৎসব একথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। টুসু পরবও তাই। অনেক সময় একই জিনিষ, অঞ্চল বিশেষে বিভিন্ন নাম ধারণ করে। একথাও আগেই বর্ণনা করেছি যেমন নীল, গাজন, গম্ভীরা ও গমীরা একই জিনিসের বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম মাত্র। সেই রকম বাঁকুড়া মানভূমের টুসু পরব বা তোষলা পরবও যেমন শস্য দেবীর উপাসনা, পৌষ লক্ষ্মী ও পৌষ পার্বণও তাই। এই রকম পূর্ববঙ্গের 'চুঙ্গির ব্রত' আর পশ্চিমবঙ্গের 'ইতু পূজা'ও এক, এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করব। তাই বাঁকুড়ার মেয়েদের টুসু গানের ভিতর পৌষ পার্বণের দিনে যেমন পিঠে পায়েসের ব্যবস্থার কথা আছে এই গানের ভিতরও তেমনি শোনা যায়:

তোষলা গো রাই তোমার দৌলতে
আমরা ছ বুড়ি পিঠে খাই।
ছ বুড়ি, ন বুড়ি গাঙ সিনানে যাই
গাঙের বালি দু হাতে মোড়াই।

এগিয়ে আসে পৌষ সংক্রান্তি। এই দিন ভোরে বাড়ির মেয়েরা জেগে উঠে ঘর বাড়ি সব ঝেড়ে মুছে ঝক্ ঝকে তক্ তকে করে তোলে। গোহাল নিকোয়, ঘরের দরজার সুমুখে দেয় আল্পনা। আল্পনারই বা কত বাহার! শাঁখলতা, ঝুমকো লতা, ধানের ছড়া, 'লক্ষ্মীর পাড়া' এ সব তো আছেই। তা ছাড়া হাতী, ঘোড়া এ সবও বাদ যায়নি। মায় টাকা, আধুলী, সিকি, দোয়ানি, আনি, পয়সা পর্যন্ত। এই আল্পনা এবং রেখা চিত্রের মধ্যে বাঙালী মেয়েদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। এগুলিকে সামগ্রিক ভাবে বা পৃথকভাবে যে ভাবেই ধরা যাক না কেন, প্রত্যেকটি চিত্রেরই একটি করে বিশিষ্ট অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু মাত্র ঘর সাজাবার জন্যই এগুলি সাজায়নি তারা। নতুন ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে শস্যের দেবী, ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী লক্ষ্মীদেবী আসছেন গৃহস্থের ঘরে। তাঁর দয়ায় তাদের হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, টাকা পয়সা, ধন দৌলতের অভাব নেই কিছুই।

এই দিন দুপুরে, কোথাও কোথাও বা সন্ধ্যার সময় পাঁচ ঘরের এয়োতীরা একজোট হয়ে বসে করে লক্ষ্মীর আরাধনা। কোথাও বা মূর্তিতে, কোথাও বা ঘটে অথবা লক্ষ্মীর চুপড়িতে। তবে অধিকাংশ জায়গায়ই ঘটে-পটেই সেরে নেয়। পুরোহিতের কাজ খুব সামান্যই, এক যদি কেউ এই সংগে নারায়ণ পূজাও করে তা হলে, নইলে নয়। এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই হলো মেয়েদের ব্যাপার, পুরোহিতের পূজার পরই তারা বেশ ভক্তিবিনম্র চিত্তে, গলায় কাপড়ের আঁচল দিয়ে, হাতে দূর্বা নিয়ে এক মনে বসে শুনতে থাকে অথবা সকল ব্রতী এক সুরে পাঠ করতে থাকে পৌষ লক্ষ্মীর পাঁচালী।

এই পাঁচালীর কাহিনীও অঞ্চল ভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করে এ কথা বলাই বাহুল্য। এই সব ছড়ার অধিকাংশই গাঁয়ের বর্ষীয়সী মহিলাদের রচিত, এক কণ্ঠ থেকে অপর কণ্ঠে প্রচারিত হয়ে আসছে নতুন কোনো পাঁচালী বা ছড়ার আমদানী না হওয়া পর্যন্ত। তবে সব পাঁচালীরই বক্তব্য বিষয় একই, কিভাবে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় ধনী হয়েছিল ইত্যাদি। তবে এই সব পাঁচালী খুব সংক্ষিপ্ত আকারেরই হয়ে থাকে। তারা একে অপরের সুরে সুর মিলিয়ে আউড়ে যেতে থাকে :

শুন সবে ভক্তিভাবে শুন দিয়া মন।
পৌষ মাসে লক্ষ্মীব্রত করে নারীগণ॥
ধন ধান্যে পূর্ণ হয় লক্ষ্মীর কৃপায়।
সুখ ঐশ্বর্য তার রহে সাত কোঠায়॥
উজানী নগরে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
এক বেলা কোন মতে করে উদর পূরণ॥
ব্রাহ্মণী একদিনে স্বপ্ন দেখে রজনীতে।
লক্ষ্মীদেবী আসিয়াছেন তাহার আলয়ে॥
সোনার বরণী দেবীর চেলীর পরনী।
তাঁহার হাতেতে আছে ধানের ছাড়নী॥
পৌষ মাসে সংক্রান্তিতে যে জন পূজিবে।
আমার দয়াতে তার দুঃখ না রহিবে॥
পূজা কর বিধিমত ভক্তিযুক্ত হইয়া।
চতুর্বর্গ ফললাভ পাইবে বসিয়া॥

সকালে উঠিয়া ব্রাহ্মণী বলে দ্বিজবরে।
পৌষ মাসে পৌষ-লক্ষ্মীর ব্রত কর
পঞ্চ উপচারে ॥
পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজা করিল ব্রাহ্মণী।
তাঁহার প্রসাদে সুখ বাড়িল তখনি ॥
এইরূপে এইভাবে পৌষ লক্ষ্মীর ব্রতকথা
হল সমাপন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর মোর এই আকিঞ্চন ॥

পাঁচালী পাঠের পর মেয়েরা শাঁখ বাজায়। উলুধ্বনি দেয়। সাঙ্গ করে পৌষ লক্ষ্মীর ব্রত কথা।

এই ভাবেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে বছরের পর বছর ধরে পৌষ উৎসব উদ্‌যাপন করে, শস্যের দেবীকে বরণ করে, তাঁর বন্দনা গায়, ভবিষ্যতের আশায় নব উৎসাহে, নব উদ্দীপনা নিয়ে বেঁচে থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গারাম ঠাকুরের গান

গারাম (গ্রাম) ঠাকুরের পূজা ও গান জলপাইগুড়ির একটি প্রাচীন লোক-সংস্কৃতির নিদর্শন। গ্রামের কোনো লোকের বাড়িতে কোনো ক্রিয়া-কর্ম বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আগেই গ্রাম্য দেবতা বা গারাম ঠাকুরের পূজা দিতে হয়। বিশেষ করে বিবাহাদি ব্যাপারে তো কথাই নেই। পূজা বা উৎসবের দিনে সকালে ঐ ক্রিয়াবাড়ির মেয়েরা দল বেঁধে যায় গারাম ঠাকুরের কাছে পূজা দিতে সংগে সংগে চলে তাদের গান :

গারাম ঠাকুরের ঘরোৎ কিসের বাজনা বাজে
বাপর, ভাইর আজি গারাম ঠাকুরের পূজে।

মেয়েরা তাদের নিজ নিজ বাপ ভাইয়ের মংগল কামনা করে। তাঁর কাছে তাদের ধন ঐশ্বর্য কামনা করে। অনেক সময় বিয়ের আসরে বসে দুপক্ষের লোকের ভিতরও গানের মারফতই বাদ প্রতিবাদ ও কথা কাটা কাটি চলে। তবে সব চাইতে মজার হলো বাসরের গান। বর কনে বসে আছে, কনে পক্ষের মেয়েরা বরের কাছে এসে কন্যার রূপের ব্যাখ্যা করছে, আর সংগে সংগে বিদ্রূপ করছে বরের চেহারার। মেয়েরা বলছে, 'দেখ আমাদের মেয়ের রূপ কি সুন্দর, চাঁদের মতো তার জ্যোতি যেন রূপোর মতো জ্বল্ জ্বল্ করছে, গায়ের রং কাঁচা সোনার মতো। কিন্তু তোমাদের বরের কি ছিরি !! কালো কাঠের মতো গায়ের রং, গোল গোল পাকানো চোখ! তা ছাড়া ওর (বরের) কালো রং-এর কালো পিঠটা দেখে মনে হচ্ছে যেন ধোপার পাট, ওখানে ফেলে কাপড়ে আছাড় মারি' :

চান্দের মতন ছাটা উপার মতন জলে গে
হামার মাইটা সোনার মতন ॥
ওরে আগ উঠেছে আগ উঠেছে
কালা মুটাখান দেখিয়া গে।
ওরে আগ উঠেছে আগ উঠেছে
ভোটরা চোখাটাক দেখিয়া গে ॥
উয়ার পিঠিখান দেখিয়া
ছ্যাকা পাড়িবার মনাছে গে ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পাঁচালী গান

হিন্দু সমাজের 'সত্যনারায়ণ' আর মুসলমান সমাজের 'সত্যপীর' ও 'মাণিকপীর'কে অনেকটা 'কমন' দেবতা বলা চলে। এই দুইটি পূজার ধরন ধারণ প্রায় একই। তাছাড়া সত্যনারায়ণের শিন্নিতে মুসলমানের উপস্থিতি কিংবা সত্যপীর ও মাণিকপীরের শিন্নির সময় হিন্দুর উপস্থিতিই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কাজেই এই সব লৌকিক দেবতাদের প্রতি যে উভয় সম্প্রদায়ই শ্রদ্ধাশীল একথা বলাই বাহুল্য। আমরা এই পরিচ্ছেদে পৃথক ভাবেই হিন্দুদের সত্যনারায়ণ প্রভৃতি ও মুসলমান সমাজের মাণিকপীরের পাঁচালী গান সম্পর্কে আলোচনা করব।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী

সত্যনারায়ণ পূজা সাধারণত প্রায় প্রতি শনিবারই কোনো না কোনো গৃহস্থের বাড়িতে হয়ে থাকে। এ পূজার আরও একটি বিশেষত্ব, এ পূজার জন্য কাউকে ঘটা করে নিমন্ত্রণ না জানালেও চলবে, শুধুমাত্র কানে শুনলেই এসে জায়গা মতো যোগ দিতে হবে, পুরোহিত ঠাকুরের পূজার সংগে সংগেই দেখা যায় পাড়ার—অনেক সময় সমস্ত গ্রামের উৎসাহী যুবক ও প্রৌঢ়েরা একযোগে সম্মিলিত কণ্ঠে সুর করে পড়তে থাকে সত্যনারায়ণের পাঁচালী। এই পাঁচালীর গল্প বা উপাখ্যান এক এক দেশে এক এক রকমের হয়ে থাকে। এই পাঁচালীকারের সংখ্যাও একাধিক এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে মোদ্দা কথা একই—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কী করে সত্যনারায়ণের কৃপায় প্রভূত ধনৈশ্বর্যের মালিক হয়, পরে নারায়ণের কোপে তার সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট এবং পরিশেষে সত্যনারায়ণের কৃপায় পুনঃপ্রাপ্তি।

মনে করুন, কোনো এক বাড়িতে শনি ও সত্যনারায়ণের পূজার আয়োজন হয়েছে। প্রশস্ত উঠানের মাঝে দুপাশে ছোট ছোট দুখানি কাঠের পিঁড়ি, তার উপর পাঁচটি করে ফল (যে কোনো ফল) আর সেই আসনের সম্মুখে

কলার আগমাজে সব সওয়া পরিমাণের জিনিস সাজানো—বিশেষতঃ সওয়া সের চালের গুঁড়া (অভাবে আটা) পাকাকলা, গুড়, দুধ ইত্যাদি। আসনের উপর স্থাপন করা হয়েছে পুরোহিতের শালগ্রামশীলার সিংহাসন। পুরুত ঠাকুর শাস্ত্রীয় পূজাটুকু করেন, তারপর পূর্ববর্ণিত যুবক ও প্রৌঢ়ের দল শুরু করেন পাঁচালী পড়তে। কোনো বাজনা বাদ্যির ব্যাপার নেই এখানে, সম্মিলিত কণ্ঠস্বরই যথেষ্ট। প্রথমে শুরু হয় সত্যনারায়ণের গুণকীর্তন:

বন্দি গজানন, বিঘ্নবিনাশন হে
গৌরীসুত লম্বোদর।
জাপ্যমাল্য ধর, অভয়ার বর হে
শোভা পায় চারিধার॥
করীন্দ্র বদন, জিনিয়া মদন হে
কুসুমে বেষ্টিত তনু।
সিন্দুরে কী শোভা, জগমন লোভা হে
জিনিয়া প্রভাত ভানু॥
সর্ববিঘ্নহর, তুমি সর্বেশ্বর হে
সর্ব আগে তোমায় পূজে।
তুমি গুণধাম, পূর্ণ কর কাম হে
যে তোমার চরণ ভজে॥
যত মহাকবি, ও চরণ সেবী হে
প্রকাশ পুরাণে যত।
চারি বেদ সার, মহিমা তোমার হে
অপার কহিব কত॥
কৃতাঞ্জলি করে, শত নত শিরে হে
প্রণাম তোমার পায়ে।
বাসনা মনের, তুমি পূর্ণ কর হে
কৃপাকরি গণ রায়ে॥

এইবার শুরু হলো উপাখ্যান। পাঁচালীকার বর্ণনা করে যেতে লাগলেন কিভাবে সত্যনারায়ণদের মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হলেন:

তুমি সত্যনারায়ণে, যে পূজিবে
গৃহে সিদ্ধ সুতা অচিরাতে পাবে॥

বিপদ ঘোর মধ্যে, ভাবিলে তোমাকে
পরিপূর্ণ বাঞ্ছা পাবে সর্বলোকে ॥
তবে সর্ব দেব, গেল নিজ ধানী
হিমালয়ে গেলা হর লইয়া ভবানী ॥
পরে দেব সত্য, চলিলেক মর্ত্যে
পূজার প্রশংসা প্রচারিতে চিত্তে ॥
পথে কাশী ধামে, সদানন্দ নামে
দেখে দুঃখী দ্বিজে ভজে কৃষ্ণনামে ॥
ভালে দীর্ঘ ফোঁটা, গলে যজ্ঞসূত্র
মহাজীর্ণ ধুতি, বিহীনান্নবস্ত্র ॥
ধরে ভিক্ষা জন্য, করে মৃৎপাত্র
মিলে দিন অন্তে উদরান্ন মাত্র ॥
দেখি সত্য দেবে, আসি দ্বিজ বেশে
করে ভিক্ষুককে মৃদু মধু ভাষে ॥
কহে বিপ্র ঠাকুর, কোথা যাও কী কার্যে
বলে বিপ্র ভিক্ষা করি রাজ্যে রাজ্যে ॥
তবে কন নারায়ণ, দরিদ্রতা যাবে
ভজ সত্যনারায়ণে ভক্তি ভাবে ॥
দ্বিজ কয় মহাশয়, কী বল আপনি
কভু সত্যনারায়ণে নাহি জানি ॥
কিরূপে ভজে তায়, বল দেখি আগে
কী বা তন্ত্রমন্ত্র কত দ্রব্য লাগে ॥
নিজে হই দরিদ্র কোথা বিত্ত পাব
বল না তাঁহাকে কিরূপে ভজিব ॥
শুনি হাস্য তুণ্ডে, বলেন বিপ্র আগে
নহে সে সেবাতে বহু দ্রব্য লাগে ॥
চিনি আটা দুগ্ধ, সু-রম্ভা সহিতে
দিবে সত্যরূপে সোয়া পরিমিতে ॥
পূজার প্রশংসা, বলি ভিক্ষুককে
গেলা অন্তরীক্ষে নহে ভিক্ষু দেখে ॥

নিজে দ্বিজ জাতি, তবে চিত্তে ভাবে
বুঝি সত্য সেবা হতে দুঃখ যাবে ॥
পূজিলেন নারায়ণ, মহাভক্তিভরে
বাড়ে ধনধান্য তাঁহার প্রভাবে ॥
হৈল হয় হাতী দাস, দাসী ঘর বাড়ি
মহোৎসব কলরব বাজে দিব্য ঘড়ি ॥
দেখি নৃপ দূতে, কহে রাজ আগে
হেন কাজ মহারাজ দেখি ভয় লাগে ॥
নৃপতি আদেশে, চলে সৈন্য বর্গে
করে রোল মহাগোল উঠে ধূলি স্বর্গে ॥
ধরি তার হাতে পায়, দিয়া রজ্জু বান্ধে
মহা ভয় লাগে তায় ভাবি সত্য কান্দে ॥
দ্বিজে কয় মহাশয়, কী আশ্চর্য লীলা
দিয়া ধন নারায়ণ বুঝি প্রাণ নিলা ॥
ধনেতে প্রয়োজন, কী আছে দরিদ্রের
কর ত্রাণ ভগবান নৃপতি সমুদ্রে ॥
তবে নিজ দাসে, দেখি বন্দি পাশে
বলেন সত্যনারায়ণ স্বর্গ দেশে ॥
হৈল দৈববাণী, কেন বিপ্র আজি
স্ব-রাজ্যে স্ব-বংশে মজিলে আপনি ॥
নহে বিপ্র দস্যু, সেবে সত্যদেবে
থাকে যদি বাঞ্ছা তাঁহাকে সুধাবে ॥
তবে রাজধানী, শুনি দৈববাণী
মহা ভীতিযুক্ত হল রাজ-রাণী ॥
অতি ব্যস্ত চিত্তে, বলে পাত্রমিত্রে
আন না কারাগার হতে ডাকি বিপ্রে ॥
শুনি শীঘ্র বিপ্রে, আনিলেক দূতে
বসিতে সভাতে দিল নৃপ সুতে ॥
গেল সব সভাজন, সবাকার নিজ ঘর
যামিনী অমনি পোহাইল সদাগর ॥

জামাতা দুহিতা,　　　　　সহ হর্ষ চিত্তে
কতকাল বসিয়া খাইল পূর্ব বিত্তে ॥
জামাতা সহিতে,　　　　　করে কল্প ধার্য
যাবে সিংহলেতে করিতে বাণিজ্য ॥
সাজায়ে তরণী,　　　　　ভরিয়া নানা ধন
করে ধীর দিন স্থির সুলগ্ন নিরূপণ ॥
গেল ধার হয়ে পার,　　　　　তরী সিংহলেতে
চলে পর সদাগর নৃপতি ভেটিতে ॥
ভূপতি সমীপে,　　　　　করে সব নিবেদন
ভূপে কয় মহাশয় কর ক্রেয় মনে লয় যত ধন ॥
ভূপতি আদেশে,　　　　　করে সে বাণিজ্য
বলে ভাই কোথা নাই হেন ধন্য রাজ্য ॥
শতে শত তরণী,　　　　　ভরিয়া সুবর্ণে
মাণিক্য প্রবাল মণি নানা বর্ণে ॥
স্বদেশে যাবে সে,　　　　　পরে চিত্তে ভাবে
হয়ে বিস্মৃত না সেবে সত্য দেবে ॥
চলিল স্বদেশে,　　　　　না বলি ভূপেকে
তে কারণ নারায়ণ লাগিলেন বিপাকে ॥
শুনিয়া ভূপতি,　　　　　কোপে কয় দূতেকে
নিয়ে আয় হাতে পায় বেঁধে দুই বেটাকে।
ভূপতি আদেশে,　　　　　ধেয়ে সব দূত যায়
আনিলেক বাঁধিয়া দোঁহাকে হাতে পায় ॥
পরে তায় দয়াময়,　　　　　করুণা প্রকাশে
গেলা সিংহলেতে বৃদ্ধ দ্বিজবেশে ॥
বসিয়া ভূপতি,　　　　　সভা মধ্য ভাগে
ডেকে কন নারায়ণ কোপে রাজ আগে ॥
কেন ছল করি বল,　　　　　কর এ অবিচার
অকারণ সাধুগণ রাখিলে কারাগার ॥
ভাল চাও ছেড়ে দাও,　　　　　ভরি দাও নানা ধন
নহে তার প্রতিফল পাবে ভূপ বিলক্ষণ ॥

বলিয়া ভূপেকে, হৈল দ্বিজ অদর্শন
ভূপে কয় এ কী দায় ঠেকালেন নারায়ণ ॥
আনিয়া কারাগার, হতে তুই সদাগর
দিয়ে ধন অগণন বলে যাও নিজঘর ॥
বেয়ে সব নদী জল, চলে রাত্র দিনে
করে অর্চনাদি দেবালয় যেখানে ॥
চলে ঘর সদাগর, সদা গান নৃত্যে
কভু সত্য সেবা নাহি ভাবে চিত্তে ॥
ত্রিবেণী নিকটে, বৃদ্ধ দ্বিজ বেশে
বসিয়া নারায়ণ কহেন মৃদু ভাষে ॥
কোথাকার সদাগর, নিয়ে যাও কিবা ধন
হেসে কয় মহাশয় লতা আর পাতা বন ॥
পরিহাস ভাষে তার, কুপিলেন নারায়ণ
লতাময় তরী হয় ছিল তার যত ধন ॥
ভাসি ভার টুটিয়া, উঠে সব তরী তার
সবে কয় মহাশয় একী দায় পুনর্বার ॥
দেখি পরে সদাগর, তরী সব লতাময়
বিষাদে নিষাদে দ্বিজ দীনহীনে কয় ॥

এইবার আবার সদাগরের কান্নার পালা। সদাগর সব ধনরত্ন হারিয়েছে নারায়ণের কোপদৃষ্টিতে। তাই দীর্ঘ ত্রিপদীছন্দে সদাগর শুরু করে বিলাপ :

কান্দি কয় সদাগর, কোথা হে পরমেশ্বর
একী মোর হল অকস্মাৎ।
কতমত বিড়ম্বনা, ছিল তোমার বাসনা
পথিমধ্যে তাহে বজ্রাঘাত ॥
বাণিজ্য সিংহল দেশে, অকারণ বন্দি পাশে
কত দুঃখ দিলে কারাগারে।
সমুদ্রে বিষম বেলা, কৃপা করি সেই বেলা
অনাসে করিলে তাহে পার ॥
লইয়া অসংখ্য ধনে, আসিলাম রাত্রিদিনে
কোথা কিছু নাহি অমঙ্গল।

আনি প্রাণ ত্রাণ করি,　　　রাখিলা সর্বস্ব হরি
কেমন বিষম কর্মফল ॥
ঠাকুর বলেন পর,　　　কেন কাঁদ সদাগর
পূর্বেতে স্বীকৃত ছিলা সেবা ॥
সেবা না করিলা তুমি,　　　বিপাকে লাগিলাম আমি
সিংহলেতে ভূপতির আগে ।
পরে সুধালাম হাসি,　　　তাহে পরিহাস ভাষি
গমন করিয়া রাগে রাগে ॥
ছিল তব বহু দোষ,　　　এবে শাস্তি হল রোষ
পরিতোষ হইলাম মনে ।
কর গিয়ে সেই সেবা,　　　বিপদে উদ্ধার হবা
তরী পূর্ণ হবে পূর্ব ধনে ॥
শুনিয়া ঘরণী তার,　　　করিয়া মঙ্গলাচার
চলে রামা তরণী বরিতে ।
হেনকালে দ্বিজগণে,　　　সেবি সত্যনারায়ণে
প্রসাদ আনিয়া দিল হাতে ॥
প্রসাদ খাইয়া মায়,　　　তরণী বরিতে যায়
ফেলাইয়া চলিল দুহিতা ।
প্রসাদের অপমানে,　　　কোপযুক্ত নারায়ণে
অকস্মাৎ ডুবিল জামাতা ॥
শুনিয়া বিশেষ কথা,　　　কাঁদে সদাগর সুতা
ঝাঁপ দিতে চাহে সে সলিলে ।
কখনও ভূমেতে পরে,　　　কাঁদে পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে
কাটারি ধরিতে চাহে গলে ॥
পাষাণ ধরিয়া করে,　　　শিরেতে আঘাত করে
বলে প্রবেশিব দাবানলে ।
শোকে হয়ে জ্ঞান হত,　　　পড়ে মৃত কায়ামত
মূর্ছাগত হয়ে মহীতলে ॥
মূর্ছাগত স্বপ্নাদেশে,　　　নারায়ণ দ্বিজবেশে
ঠাকুর আসিয়া সন্নিধানে ।

জীবন ত্যাজিবে কেন, কহি উপদেশ শুন
এ দশা প্রসাদ অপমানে ॥
প্রসাদ ফেলেছ যথা, পুনরায় যেয়ে তথা
ভক্ষণ করহ ভক্তিভাবে।

নাটকের শেষ অংক। সদাগরের পরিবারবর্গের সংগে মিলন ও কলিতে সত্যনারায়ণের পূজা প্রচার :

নারায়ণ আদেশে, ভাসে সব তরী তার
উঠে ভর্ত্তা সংগে ঘাটেতে পুনর্বার ॥
তরণী বরিতে, চলে ঘর একত্রে
সদাগর সুতাবর সুতা আর কলত্রে।
নিয়ে ধন নিকেতন, মহানন্দ ভাবে
দিয়ে লক্ষ মুদ্রা সেবে সত্য দেবে ॥
শুন সর্বলোকে, কহি সত্য কথা
কলিতে নারায়ণ সেবা দুঃখনাশা।
ভজিলে দরিদ্রে, দরিদ্রতা যাবে
হলে পুত্র বাঞ্ছা বহু পুত্র পাবে ॥
সদাগর রহে ঘর, সুতাবর সহিতে
হল সত্য সেবা প্রকাশ এই রূপেতে।
মহীতে নারায়ণ, সেবা কল্প শাখা
বিপদ্ধংশ ভানু মনু বেদ লেখা ॥

এর পরই প্রসাদ ভক্ষণ। সেদিনের মতো অনুষ্ঠান ওইখানেই শেষ।

মাণিকপীরের পাঁচালী

মাণিকপীরের গান সাধারণত মুসলমান ফকিরদের কাছ থেকেই শোনা যায়। সত্যনারায়ণের মতো এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট মাস বা সময় নেই। অবশ্য কোনো কোনো জায়গায় অগ্রহায়ণ মাসটিকেই মাণিকপীরের গানের প্রশস্ত মাস বলে ধরে নিয়েছে। মাণিকপীরের গানের দলে একজন হলো গায়ক (বয়াতীও বলে কোথাও কোথাও), সে-ই প্রায় সম্পূর্ণ গানটা গায়, মাঝে মাঝে ধুয়া ধরে তার দোহারবৃন্দ। এর সংগে বাজনা বলতে শুধু 'ডুগডুগি' নামে কাঠের উপর চামড়ার ছাউনী দেওয়া বাদ্য যন্ত্র আর ঘুংগুরই প্রধান। এর পাঁচালীও কাহিনী

প্রধান। কাহিনীর মোদ্দা কথা হলো—মাণিক নামে এক মুসলমান বালক কৈশোরেই ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠে এবং ঐ সময়েই (বয়স বার কি তেরো) সে গৃহত্যাগ করে চলে যায়, পরে সে পীর আখ্যা লাভ করে। সাধারণত গো-মড়কের সময়ই মাণিকপীরের গান খুব শোনা যায়, কারণ, তিনি নাকি গো-মড়ক নিবারণ করতে পারেন। এঁর কাহিনীতে দেখা যায় যে এই পীর সাহেব প্রথমেই আত্মপ্রকাশ করেন কোনো এক হিন্দু গোয়ালার বাড়িতে, তারপর ক্রমান্বয়ে নানা জায়গায়।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। গো-জাতি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই দেবতাতুল্য। কাজেই গো-মড়ক লাগলে শুধু হিন্দু বা মুসলমান কেউই একা এ বিপদের সম্মুখীন হবে না। মাণিকপীর তাই উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই সমান পূজ্য—এঁর শিন্নিতে উভয় সম্প্রদায়েরই আগ্রহ সমতুল্য।

আসর বসেছে। ফকির সাহেব মাথায় কাপড়ের টুপি পরেছেন, গলায় পরেছেন স্ফটিকের মালা, হাতে নিয়েছেন চামর—এইবার শুরু করলেন তাঁর পাঁচালী :

আমার তুর্কের ছাওয়াল পীর।
বারো বচ্ছরের কালে হইয়াছে ফকির ॥ (ধুয়া)
আশা হাতে খড়ম পায় মুখে নূর-দাড়ি।
ধীরে ধীরে চললেন মাণিক কানু ঘোষের বাড়ি ॥
দোম দোম বলে ফকির জানালেন জিগির।
কানুর মা বুড়ি বলে ওই আইল ফকির ॥
একে তো গোয়ালের নারী কত মকর জানে।
ভাঙা একখানা ডালায় কইর‍্যা গোড়া দুই চাউল আনে ॥
চাল কড়ি জাম্বিল বডি সব বাড়ি পাই।
ফটিক দুগ্ধ দেওগো মা দোয়া কইরা যাই ॥
দোয়া পীরের ফকির তুমি দোয়া দিতি পার।
রাত পোয়ালে ক্যান তুমি হাবড় ভাইঙা মর ॥
হাবড় ভাইঙা মরি আমি লইয়ে আল্লার নাম।
তেরা বাড়ির ভিক্ষা নিতে নাইকো কোন কাম ॥
আমার বাড়ি আছে দুগ্ধ কনতে এলে শুনে।
হাকিমে ফরমাজে দুগ্ধ তাও যোগাই কিনে ॥

বেশালি পোরা আছে দুগ্ধ হাঁড়ি পোরা দই।
আমাকে যে ফাঁকি দিয়ে থাকবা তুমি সুখী।
গোরু-বাছুর মইরে যাবে, ছাই লাগবে তোর মুখি॥
কানুর বউ বলে ঠাকুরণ দুধ ননী দেও।
সব দই দিয়ে কিছু দোয়া চেয়ে নেও॥
আমি বললাম কিছু নাই তুই দিলি কয়ে।
তোর বাপের গাই থাকে ত তাই দিগে দুয়ে॥
আসুক আগে কানু বাড়ি সব দেবো কয়ে।
তোর বাপের দেশের ফকির বলে দরদ গেল বয়ে॥
দেয়ান বলে, মা তুমি কথা বলো না।
উচিত মত সাজা না দিলে জাহির হবে না॥
দুধ যদি খাও ফকির গোয়াল দোরে যাও।
গোয়ালে আছে বাঁঝো গাই তাই দুয়ে খাও॥
বাঁঝো গাইর দুধ তুমি কখনও খেয়েছো॥
এত বলি মাণিক জেন্দা গোয়াল দোরে গেল।
দেখিয়া বাঁঝুয়া গাই উঠিয়া খাড়া হোল॥
দেয়ান বলে, গাই মা একটু দুধ দ্যাও।
থোড়া দুধ দিয়ে আমার ইজ্জত বাঁচাও॥
বারো বছরের বাঁঝো আমার আগুণ-বিগুণ নাই।
আমার মত পোড়াকপালি এ ত্রিভুবনে নাই॥
দেয়ান বলে, গাই মা ভেবো না তুমি।
আল্লার দরবার হতে দুধ চেয়ে নেব আমি॥
হাত উঠাইয়া দোয়া চাহেন জেন্দা পীর!
গায়ের খবর দিল আল্লার উকীল॥
মনুরথ রথ বলে তিন ডাক দিল।
স্বর্গ থেকে মনুরথ আসিয়া পেঁীছিল॥
দেয়ান বলে কানুর মা, একটা ভাঁড় দেও।
গাই দুয়ে দিয়ে যাই জন্মের মত খাও॥
মাচার তলে ছিল একটা সাত ছেঁদা ভাঁড়।
দেয়ানেরে এনে দিল হারামজাদা রাঁড়॥
আস্তে আস্তে দেয়ান তখন গোয়ালে যায় হেঁটে।

পানাইল বাঁঝো গাই ছাদন দড়ি এঁটে।
দুইতে দুইতে দুধ দোলেন সাত মেঠে ॥
ছাড়িয়া দিলেন মনুরথ গেল যে চলে।
দেখিয়া নগরের লোক ধন্য ধন্য বলে ॥
এত দুধ দুয়ে দেলেন কানুর মা তবু দেলে না।
ফকির গায়েব হল কেহ জানে না ॥
ফকির গেল গায়েব হয়ে মড়ক এল দেশে।
দুই একটি মরিতে লাগিল গ্রামের আশে পাশে ॥
পরে এল মড়ক কানু ঘোষের পালে।
মড়ক দেখিয়া বুড়ির মাছি গেল গালে ॥
আগে যদি জানতাম আমি মানি সত্যপীর।
আগে দিতাম দধি দুগ্ধ পাছে দিতাম ক্ষীর ॥
ও আমার মাণিক সনাতন।
কোন্ পথে গেলি তোমার পাব দরশন ॥
কারুর ফোলে হাঁটুর মালা কারুর ফোলে পা।
অসাড় হয়ে খাড়া আছে ফুলেছে কেবল গা ॥
মরিতে লাগিল গোরু লেখাপড়া নাই।
পঞ্চাশ হাজার দামড়া এক লক্ষ গাই ॥
আঁড়ে বক্না কত মোলো তা কে গোনে।
সহস্র সহস্র শকুনি বাথানে পড়ে খোনে ॥
আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কাঁদে উভরায়।
কোথা গেলে মাণিক জেন্দা ধরি তোমার পায় ॥
সাত দিন অনাহারে পড়িয়া রহিল।
স্বপনে দেয়ান তখন বুড়িকে কহিল ॥
গলায় কুড়ালি বেঁধে দোরে দোরে মেঙে।
হাজত আদায় কর জবন সব ডেকে ॥
নির্জলা দুধের ক্ষীর ঘি মাখন দই।
ভিক্ষা করে দিবি যাহা ঘরে ছিল নাই ॥
ঘটপুরে পানি থুবি আসনের সামনে।
সেই পানি হাড়ের উপর দিবে।
আল্লার হুকুমে সব বেঁচে যাবে ॥

ফকির সাহেবের পাঁচালী পাঠ শেষ হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই একযোগে মাণিকপীর-সত্যপীরের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে 'দোয়া মাঙে' পীরের। এই ভাবেই চলে আসছে স্মরণাতীতকাল থেকে।

ত্রিনাথের পাঁচালী

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেই উল্লেখ করেছি বৌদ্ধধর্মের অবসানের সময় বৌদ্ধদের পাল-পার্বণ হিন্দুধর্মের আবরণে বেঁচে থাকবার চেষ্টা পেতে থাকল—এই রকম একটি অতি পরিচিত লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের সন্ধান পাওয়া যায় পূর্ব বাংলায়। ইনি ত্রিনাথ ঠাকুর নামে পরিচিত। পূর্ব বাংলার ত্রিনাথের ছড়ায় পাওয়া যায়:

আমার ঠাকুর তেরনাথ
যে করিবেন হেলা,
হাত পাও দেবে কোঁকরা-বোকরা
চৌউখ দিয়া বাইরাবে ঢ্যালা।

তাদের ভাষ্য অনুসারে ইনি হলেন মহাদেব। এঁর পূজার মূল উপকরণ হলো এক বিড়ে (গোছ) পান, একপণ সুপারী, এক ছটাক আলাপাতা (দোক্তা পাতা) আর এক সিকি গাঁজা। সন্ধ্যার দিকে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে ব্রতীরা (সকলেই পুরুষ) সকলেই জমায়েত হয় আসরে। এর ভিতর একজন বর্ণনা করে ব্রত-মাহাত্ম্য, তারপর শুরু করে গান:

এলোরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে
আজ বুঝি তামাশা হল কলিতে।
কলিতে হরি সর্ব ঠাঁই
ও সে পাগলের প্রায়।
পূবেতে পাগলের আশ্রয়
চিতোল্যাতে শম্ভুচাঁদ সে আপনি উদয়।
ওরে ড্যামরা ভোলা সিদ্ধেশ্বরী
ওরে ধামরাইলের মাধব জগতে,
আজ বুঝি তামাশা হল কলিতে।

শোন মন তোমারে বলি,
ঢাকায় আছেন ঢাকেশ্বরী,
কইলকাতাতে কালী।
ওরে মুক্তাগাছা রাজেশ্বরী
ঐ দ্যাখ অন্নপূর্ণা কাশীতে।

কারও কারও মতে ত্রি-নাথ অর্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের ত্রি-দেবতার উপাসনা। প্রকারান্তরে বৌদ্ধ ধর্মের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ—এই তিন দেবতাই হিন্দু ধর্মের তিন দেবতার খোলসের মাধ্যমে আত্মগোপন করে রয়েছেন। নাথ-পন্থীরা বলেন, ত্রি-নাথ প্রকৃতপক্ষে গোরক্ষনাথ প্রভৃতি তিনজন শ্রেষ্ঠ ও প্রধান নাথ ধর্মগুরুরই কাহিনী। কিন্তু এ যুক্তির পিছনে জনমত খুব বেশি প্রবল বলে মনে হয় না, অন্তত: সংগৃহীত ঢাকার এই ত্রি-নাথের গানটিতে তো নয়ই। এসবই গভীর গবেষণার বিষয় সন্দেহ নেই। আমরা এস্থলে পূর্ব-বঙ্গের ঢাকা জেলায় প্রচলিত ত্রি-নাথের পাঁচালী (গান) যেমনটি শুনেছি, ঠিক তেমনটি উপহার দিলাম।

শনির পাঁচালী

পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মতোই শনি-ঠাকুরের পাঁচালী পাঠেরও প্রচলন আছে। এর কাহিনীও মূলত: কি ভাবে শনি ঠাকুর মর্ত্যলোকে জনসাধারণের কাছ থেকে পূজা পেতে আরম্ভ করলেন তারই বর্ণনা।

সুমঙ্গল নামে ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পূর্বদোষে নানা লাঞ্ছনা ভোগ করবার পর শনিঠাকুর তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করলেন, সেই দেশের রাজাকেও দর্শন দিলেন আর সেই থেকেই তাঁর পূজার ব্যবস্থা চালু হলো মর্ত্যলোকে:

বন্দন ওহে (ধুয়া)
বন্দি দেব গণপতি বিঘ্ন বিনাশন।
বৃষ্ণি আদি দেব আগে পূজে যে চরণ।।
ও পদ ভজিলে হয় অশেষ সম্পদ।
ভজ মন গজানন না হবে বিপদ।।
ভ্রমর পঙ্কজ ভ্রমে মধু লোভে ধায়।
কী আশ্চর্য পদাম্বুজ ওহে গণরায়।।

বিমল কমল নিন্দি রাঙ্গা পদতল।
অকলঙ্ক আধশশী নখেতে উজ্জ্বল॥
খর্বস্থূল কলেবর মূষিক বাহন।
আজানু লম্বিত কর মাতঙ্গ বদন॥
তনুর তুলনা দিতে সাধ্য রাখে কেবা।
জিনি শত শত ভানু শ্রীঅঙ্গের আভা॥
দিবাকর করে দগ্ধ কঠিন কিরণে।
তব তনু শশীতুল্য শীতলত্ব গুণে॥
গজানন ত্রিনয়ন কী আশ্চর্য রূপ।
তুমি হে ত্রিগুণান্বিত তুমি বিশ্বরূপ॥
তোমার মহিমা আমি কী বর্ণিতে পারি?
না পাইল অন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিপুরারী॥
দীনবন্ধু নাম তব ব্যক্ত চরাচর।
আমি দীন হীনে দয়া কর লম্বোদর॥
কোন্ দিনে কোন্ দীনে যদি নিদয় হবে।
অকলঙ্ক নামে তব কলঙ্ক রটিবে॥
অতএব কৃপা করি হইয়া সদয়।
আসিয়া হৃদয় মাঝে হইও উদয়॥
বাসনা কমল কলি কর বিকশিত।
দয়াময় নাম তব জগতে বিদিত।

শুন সভাজন, মম নিবেদন
স্কন্ধ পুরানোক্ত বাণী।
যে রূপে ভূতলে, লীলা প্রকাশিলে
ভাস্কর তনয় শনি॥
ছিল পূর্বকালে, জন্ম বিপ্র কুলে
হরিনাথ নাম ধরে।
বৈদিক ব্রাহ্মণ, অতি বিচক্ষণ
মালিণ্যহীন অন্তরে॥
ছিল তার সুত, রূপ গুণ যুত
সুশর্মা নামে বিদিত।

দিন কত গতে তাহার রাশিতে
শনি হইলা কুপিত ॥
সেই কোপানলে, কত দুঃখ পেলে
কাল হইল পিতার।
দেশ দেশান্তরে, প্রতি ঘরে ঘরে
ভিক্ষা করে অনিবার॥
তবু উদরান্ন, না হয় সম্পূর্ণ
শীর্ণ তনু অন্ন বিনে।
ভাবিয়া না পায় কী হবে উপায়
কে করিবে দয়া দীনে॥
বলে কোথা যাই, ভাবিয়া না পাই
বিধি বিড়ম্বিল মোরে।
মহারাজ ঠাঁই, যাইয়া জানাই
যদি দয়া হয় অন্তরে॥
এত ভাবি পর চলে দ্বিজবর
উপনীত রাজধানী।
সম্রাট নিকটে, কৃতাঞ্জলিপুটে
সুশর্মা বলিছে বাণী॥
ওহে দয়াময় হইয়া সদয়
দরিদ্রতা কর নাশ।
গেল গেল প্রাণ, কর পরিত্রাণ
ঘুচাও মনের ত্রাস॥
দেখি বিপ্রবর, করি সমাদর
বসিতে বলিলা ভূপ।
বসিয়া সভায়, নিজ পরিচয়
সুশর্মা বলে স্বরূপ॥
বিপ্রের দুর্গতি, শুনিয়া ভূপতি
প্রসন্ন হইয়া তায়।
বলেন বচন, শুনহে ব্রাহ্মণ
আমি বলি সদুপায়॥

হয়ে অধ্যাপক, সকল বালক
পাঠশালে পড়াইবে।
ভোজন কারণ, হইল নিয়ম
দ্বিমুষ্টি তণ্ডুল পাবে॥

এতেক বচন, শুনিয়া ব্রাহ্মণ
হরষিত অতিশয়।
ভূপতি আদেশে, রাজার আবাসে
রহিলেন বিদ্যালয়॥

ভোজন কারণ, যে ছিল নিয়ম
দ্বিমুষ্টি তণ্ডুল পেত।
ভাস্কর নন্দন, করিয়া হরণ
একমুষ্টি তার নিত॥

হল এই মত, অনুদিন গত
দুঃখের নাহিক শেষ।
রাখিতে গৌরব, শনৈশ্চর দেব
মর্ত্যে করিলা প্রবেশ॥

দ্বিজে করি দয়া, হয়ে ছায়া কায়া
উপনীত দ্বিজ পাশে।
শনৈশ্চর কন, শুনহে ব্রাহ্মণ
আসিয়াছি যে আশ্বাসে॥

হয়েছে মনন, শাস্ত্র অধ্যয়ন
করিবারে তব ঠাঁই।
কর মোরে শিষ্য, হয়ে তব বশ্য
দুঃখ নাশিব গোসাঁই॥

শনির বচন, করিয়া শ্রবণ
ব্রাহ্মণ বলিছে ভাষা।
রহ বিদ্যালয়, পড়াব নিশ্চয়
পুরাইব তব আশা॥
অধ্যাপক বাণী, শুনি দেব শনি
রহিলেন সেই স্থানে।

পাঠ দিতে যেয়ে, শনিকে দেখিয়ে
বিস্ময় দ্বিজ তখন ॥
দেহে নাহি ছায়া, বিপরীত কায়া
নিমেষহীন নয়নে।
দেব কি দানব, যক্ষ কি মানব
সদা ভাবে মনে মনে ॥
একদা সুধীর, মনে করে স্থির
বৃক্ষ-মূলোপরি বসি।
হেন কালে শনি, বলিছেন বাণী
দ্বিজ সন্নিধানে আসি ॥
বৃক্ষ শাখা পর, বসে শনৈশ্চর
হইয়া বায়স রূপ।
নরাশঙ্কিত প্রায়, বলিছেন তায়,
শুন হে দ্বিজ স্বরূপ ॥
আমি শনৈশ্চর, তোমার গোচর
পড়িনু পড়ুয়া বেশে।
মেগে লহ বর, ওহে দ্বিজবর
যে হয় তব মানসে ॥
এতেক বচন, করিয়া শ্রবণ
ব্রাহ্মণ হয়ে বিস্মিত।
করে দৃষ্টিপাত, দেখে অকস্মাৎ
বৃক্ষোপরি সন্নিহিত ॥
কাকরূপে শনি, বলিছেন বাণী
শুনি দ্বিজ হরষিত।
শনির নিকটে, কৃতাঞ্জলি পুটে
বলে যদি কর হিত ॥
যদি নিজগুণে, দয়া হল দীনে
তবে করি নিবেদন।
ছাড় মোর রাশি, ওহে গুণ রাশি
দুঃখ কর নিবারণ ॥

দেহ এই বর, ওহে শনৈশ্চর
ছাড়হে আমার কায়া।
নিজ কায়া লীন, হইয়া অধীন
জনে দেহ পদ ছায়া॥
তুমি শনৈশ্চর, ব্যক্ত চরাচর
ভূচর খেচরগণে।
তব কোপানল, হইলে প্রবল
সহিবে কাহার প্রাণে॥
দেখ তার সাক্ষ্য, ওহে লোহিতাক্ষ
গৌরীসুত গণপতি।
নরাসুরগণ, পূজে যে চরণ
তার কি হইল গতি॥
প্রাগ্‌দেশপতি শ্রীবৎস নৃপতি
কত দুঃখ বনে পেলে।
বিক্রম রাজন্, বিক্রম ভাজন,
তারে কত দুঃখ দিলে॥
আমি দীন জন, অতি অভাজন,
কি মতে সহিব তায়।
মক্ষিকা কখন, সুমেরু বহন
করিবারে সাধ্য পায়॥
আর এক বাণী, শুন দেব শনি
ত্রেতাযুগে সুবিদিত।
রাম মহাবলী, বধিলেন বালী,
লোকে বলে অনুচিত॥
আমাকে বধিবে, কী লাভ হইবে
কেবল কলংক সার।
হইয়া অধীন, বধিলে অধীন
প্রভুত্ব নাহিক তায়॥

এইরূপে স্তুতি নতি করে দ্বিজ বর।
প্রসন্ন হইয়া বলে দেব শনৈশ্চর॥

শুন বলি ওহে দ্বিজ মাগি লহ বর।
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইনু বিস্তর ॥
কল্য শনিবার দিবা দশদণ্ড গতে।
আমার কু-দৃষ্টি আর না রবে তোমাতে ॥
নিজ অঙ্গ সঙ্গ আমি হইব নিশ্চয়।
আর না পাইবে দুঃখ যাহ নিজালয় ॥
ক্রমশঃ দশম বর্ষ ভোগের নিয়ম।
দ্বিবর্ষ হয়েছে গত আছয়ে অষ্টম ॥
এ অষ্ট বৎসর আমি থাকি নিজাশ্রয়।
তব দুঃখভাগী আমি হইব নিশ্চয় ॥
আর এক উপদেশ বলি তব ঠাঁই।
গঙ্গাস্নানাধিক ফল ত্রিভুবনে নাই ॥
অতএব কল্য যেয়ে জাহ্নবীর তটে।
স্নান করি গুরুমন্ত্র জপ অকপটে ॥
দশদণ্ড যোগাসনে ভজ গুরুপদ।
অবশ্য হইবে অন্ত এ ঘোর বিপদ ॥
মোর বাক্য অন্যথা না কর দ্বিজবর।
এত বলি লুকাইল দেব শনৈশ্চর ॥
যে দিবা হইল গত হরিষ অন্তরে।
যামিনী হইলে ভোর চলে গঙ্গাতীরে ॥
উপনীত হয়ে করে স্নানাবগাহন।
প্রথমে করিল সন্ধ্যা দ্বিতীয়ে তর্পণ ॥
তৃতীয়ে তটিনী তটে বসে যোগাসনে।
নিজ শক্তিমন্ত্র জপে মহাভক্তি মনে ॥
কর্মফল বিফলতা কে করিতে পারে।
দুই দণ্ড অগ্রে দ্বিজ যোগ ভঙ্গ করে ॥
নয়ন মেলিয়া দেখে দুই দণ্ড বাকি।
পুনঃ যোগে বসে দ্বিজ মুদে দুই আঁখি ॥
পাইয়া এতেক সন্ধি সূর্যের তনয়।
পুনঃ আসি দ্বিজ অঙ্গ করিল আশ্রয় ॥

এতেক বিপদ বিপ্র কিছুই না জানে।
বিড়ম্বিতে বিপ্রে শনি ফিরে নানা স্থানে ॥
পথি মধ্যে রাজদূত পেয়ে দুইজনে।
অচৈতন্য করে নিয়া রাখিলা গোপনে ॥
সৃজিলেন মায়ামুণ্ড দেব শনৈশ্চর।
রাখিলা দ্বিজেরে দুই জানুর উপর ॥
শনিকোপে বশীভূত সুশর্মা ব্রাহ্মণ।
হইল চৈতন্য হত দ্বিজেতে কারণ ॥
উরুদেশে মুণ্ড শনি রাখিয়া যতনে।
চৈতন্য না হল তবু দ্বিজের নন্দনে ॥
ফেলিলেন মায়া জাল মায়া বিধিবর।
রাজাকে বারতা দিতে চলিলা সত্বর ॥
রাজদূত রূপ ধরি শনি মহামতি।
সেরূপে চিনিতে পারে কাহার শকতি ॥
উপনীত রাজধানী দেব শনৈশ্চর।
সমাচার বলে গিয়া রাজার গোচর ॥

তো হম যোবোলে মহারাজ শুনো আরজিয়া।
গঙ্গাতীরমে এক বামুনকো দেখ্‌খে অভী আয়া ॥
সো যোগীকে মাফিক ধ্যান করতা হ্যায় আঁখ বুতাকে।
জ্বল্‌তা হ্যায় মেরা উসকা বেজায় কাম দেখ্‌কে ॥
সো হুজুরকে দোনোঁ লড়কেকো আপনে খুন কিয়া।
বটে রহা দোনোঁ শির জানুমে রখ দিয়া ॥
তো হম পহচানে সো বামুন কো বোল দিয়া সব লোক।
আপকে ঘরমে রহনেওয়ালা পড়ানেওয়ালা বালক ॥
সো য্যায়সা খায়া আপকা নিমক্‌ ত্যায়সা কিয়া কাম।
ক্যা করেঙ্গে মহারাজ আপকো বোলায়ে যাতা হম ॥
অগর হমকো হুকুম দো মহারাজ তব যায়েঙ্গে ওহাঁ।
পাকড় করকে ম্যায় উসকো বাঁধ লে আউঙ্গা য়হাঁ ॥
তখন শুনিয়া ভূপতির অতি লাগে চমৎকার।
আরক্ত নয়নে রাজা করে হাহাকার ॥

পরে দূতকে বলে জলদ যাও তুম মৎ কর দের।
জহাঁ বৈঠা খুনী বামুন লেকে ঝুঠো শির॥
অভী এ্যায়সা মাফিক্ বাঁধ লে আও নহ্‌ী ভাগ সকে।
দূত কহিছে য্যায়সা হুকুম লে আও ত্যায়সা করকে॥
পরে আশীষ কীজিয়ে মহারাজ বলি শনৈশ্চর।
অবিলম্বে উপনীত যথা দ্বিজবর॥
তখন শনি বলে ভণ্ড বামুন আজ পায়াহো তুমকো।
মহারাজ হুকুম দিয়া হ্যায় তুমকো লেনে হমকো॥
তু আও গিদর তু ডাকু হ্যায় খুন কিয়া রাজসুত।
আজ তুমকো খুন করেংগে হম রাজাকা দূত॥
তখন এতেক বলিয়া শনি ধরি দ্বিজবরে।
রাজ সন্নিধানে আনি দিলেক সত্বরে॥
তখন দ্বিজে দেখি কোপে রাজা বলিছে বচন।
মেরে লড়কেকো খুন কিয়া তুম ক্যাছারে বামুন॥
শুনি সুশর্মা কহিছে শুন ওহে মহারাজ।
আমারে দিয়াছে বিধি এ দারুণ লাজ॥
আমি নাহি জানি ভালমন্দ বসেছিনু ধ্যানে।
কর্ম্মদোষে বিধি মোর থাকিয়া সন্ধানে॥
(এবে) করিলেন বিধি মোরে এত বিড়ম্বনা।
মনুষ্য অসাধ্য দিতে এতেক লাঞ্ছনা॥
তখন রাজা বলে উওবাতি নহ্‌ী কেরামত।
দূতকে বলে জেল দেনেকো লে আও উসকো জলদ॥
হম ক্যা করেংগে মেরা লড়কেকো বামুন কিয়া খুন।
বামুন বধমে পাপ নহীভী বামুন হোতা ছে খুন॥
উও য্যায়সা মাফিক দুখ দিয়া হ্যায় ত্যায়সা উনকো কীজে।
য়হাঁসে উঠাকে তুম জলদ উসকো লীজে॥
(তখন) এত শুনি দ্বিজে ধরি নৃপতির চর।
বন্দীশালা পথ পানে চলিল সত্বর॥
তখন কারাগারে রাখে দ্বিজে রাজার আদেশে।
দ্বিজে বিড়ম্বিলা শনি মনুষ্যের বেশে॥

হেথা পুরবাসী যত, শুনি রাজপুত্র হত
বিলাপ করিয়া কত রোদন করি কহে ॥
ওহে নিদারুণ বিধি, এ নহে তোমার বিধি
দিয়ে দুটি গুণনিধি পুনঃ হরে নিলে হে ॥
কান্দে রাজা নরেশ্বর, পুত্রশোকে শোকাতুর
ক্রন্দন বিহীন স্বর নাহি রাজপুরে হে ॥
রাজা দোহাকাররাণী, সদাকাল হাহাকার
ক্ষণে যেন সবাকার অবনী লোটায় হে ॥
হেথা দ্বিজ বন্দীশালে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে
এ সময়ে কোথা রইলে দেব শনৈশ্চর হে ॥
পড়িয়া বিপদ ঘোরে, দাসে ডাকে সকাতরে
দুঃখেতে প্রাণ বিদরে না দেখি উপায় হে ॥
ভাবিয়া বুঝিনু স্থূল, মোরে বিধি প্রতিকূল
তাহে হয়ে বুদ্ধি ভুল যোগভঙ্গ কৈনু হে ॥
সেই অপরাধে নাথ, এ কি কল্লে অকস্মাৎ
শিরোপরি বজ্রাঘাত উচিত না হয় হে ॥
দুঃখানলে দহে প্রাণ, কিসে পাব পরিত্রাণ
কর দুঃখ অবসান তুমি বিশ্বময় হে ॥
এইমতে দ্বিজবর, কাঁদিছেন নিরন্তর
শুনি দেব শনৈশ্চর দয়া প্রকাশিল হে ॥
শুনি অপূর্ব কথন, রাজপুত্র দুইজন
হইলেন সচেতন নিদ্রাভঙ্গ প্রায় হে ॥
এ বলে উহারে ভাই, চল মোরা গৃহে যাই,
বিলম্বিতে কার্য নাই চল চল চল হে ॥
এত বলি দুই জনে, চলিলেন ততক্ষণে
উপনীত নিকেতনে যথা নৃপমণি হে ॥
রাজা দেখিয়া তখনে, জিজ্ঞাসেন দুই জনে
এতেক বিলম্ব কেনে আছিলা কোথায় হে ॥
এথাকার বিবরণ, জাননা রে বাছা ধন
দেখ সবে অচেতন ধরণী লোটায় হে ॥

রাজপুত্র দুই জনে, জিজ্ঞাসে জনক স্থানে
সবে অচেতন কেন পড়ে ধরাসনে হে ॥
পুত্রের শুনিয়া বাণী, বলিছেন নৃপমণি
শুন বাছা সে কাহিনী অতি অসম্ভব হে ॥
পূর্বের বৃত্তান্ত যত, শুনিয়া নৃপতি সুত
হইয়া বিস্মিত যুত ভূপতি প্রতি কহে ॥
শুন পিতা নিবেদন, বলিলে যে বিবরণ
শুনিয়া বিস্মিত মন হইল আমার হে ॥
কাননেতে দুই ভাই, অলসেতে নিদ্রা যাই
এবে মনে ভাবি তাই একি বিপরীত হে ॥
কোথা সে দ্বিজ তনয়, বল পিতা মহাশয়
শুনিয়া ভূপতি কয় বন্দীশালে দ্বিজ হে ॥
এত বলি নরপতি, বলিলা দূতের প্রতি
আন সে দ্বিজ সন্ততি কারাগার হতে হে ॥
শুনিয়া এতেক বাণী, প্রণমিয়া নৃপমণি
চলিলা দূত অমনি কারাগার পানে হে ॥
দূত যেয়ে কারাগারে, বলিলেক দ্বিজবরে
চল রাজা ভেটিবারে দুঃখ অবসান হে ॥
শুনি বিপ্র হরষিত, হয়ে চলিলা ত্বরিত
ভূপালয়ে উপনীত রাজ সন্নিধানে হে ॥
হয়ে সশঙ্কিত কায়, বলে ওহে নররায়
বধিতে দ্বিজ তনয় উচিত না হয় হে ॥

এরূপে দ্বিজবর মহাভক্তি ভাবে।
বলে প্রাণ গেল ত্রাণ কর স্বপ্রতাপে ॥
তুমি হে ভূপতি সবাকার ভর্তা।
বল কে রাখে তায় তুমি যার হর্তা ॥
তনয় সতুল্য প্রজা রাজ সমীপে।
নাশিলে প্রজাচয় সবে নিন্দে ভূপে ॥
এমতে বহু বোল বলে দ্বিজ রাজ্ঞে।
রাজা কন এত দুঃখ পেলে তব ভাগ্যে ॥

সুখদুঃখ সকলি কপালে নিবিষ্ট।
তব ইষ্ট কোপে হল এ অনিষ্ট॥
আপনি স্বচক্ষে দেখ হে মহাশয়।
মৃত সুত বাঁচিয়া এসেছে নিজালয়॥
সুশর্মা দেখিয়ে সচকিত অংগ।
ছিল শনিকোপ কৃত যোগ ভংগ॥
ভূপতি প্রতি কয় পুরাকাল বার্তা।
শুনি ভূপ অপরূপ ভীত রাজ ভর্তা॥
সুশর্মা প্রতি ভূপ বলে হে দ্বিজবর।
মনোনীত বাঞ্ছা দেখিতে শনৈশ্চর॥
স্বচক্ষে দেখিয়া পূজিব তাঁহাকে।
মনের বাসনা বলিনু তোমাকে॥
দ্বিজে কয় মহাশয় বলিলে যে ভাষা।
পুনঃ তায় দেখিলে হবে পূর্ণ আশা॥
এতেক বলে দ্বিজ চলিল আপনি।
যেই স্থানে পূর্বে দেখেছিল শনি॥
মহাভক্তিভাবে ভাবে দেব শনৈশ্চর।
দেখি দ্বিজে ভক্তি শনৈশ্চর অতঃপর॥
আসি বিপ্র পাশে বলে মিষ্ট ভাসে।
আমাকে ডাকিলে বল কী মানসে॥
শুনিয়া শনি বোল বলে বিপ্র বাণী।
তোমাকে পূজিতে চাহে নৃপমণি॥
স্বচক্ষে দেখিয়া তব পাদপদ্ম।
ভজিবে তোমাকে যথা শক্তি সাধ্য॥
শনি অংগীকার করি দ্বিজ ভাষে।
চলিল দুজনে ভূপতি আবাসে॥
উপনীত ভূপালয়ে ভূপতি সমক্ষে।
অপরূপ শনিরূপ দেখে ভূপ স্বচক্ষে॥
সভামণ্ডলস্থ আছিল যত জন।
কেহ না পাইল তাহার দরশন॥

করে যোড়পাণি বলে রাজারাণী।
মোরা মূঢ়মতি তোমাকে না জানি॥
দিয়াছি যত দুঃখ তব ভক্ত জনে।
সে দোষ ক্ষমিবে তব নিজগুণে॥
এবে মনোবাঞ্ছা পূজিতে তোমাকে।
করি কৃপাদৃষ্টি বলহে আমাকে॥
সেবিতে তবপদ কত দ্রব্য লাগে।
নিশিতে পূজে কি পূজে দিবা ভাগে॥
শুনি বিপ্রবাণী বলিলেন শনি।
শুনহে ভূপতি বলি সে কাহিনী॥
যে জাতি যে যে ফল মিলে সেই কালে।
পূজিবে সে কালে সেই পঞ্চ ফলে॥
চিনি শর্করা আর দিয়ে সন্দেশাদি।
দিয়ে কর্পূর তাম্বুল সব নিবেদি॥
উপকরণাদি না হলে ঘটনা।
দিয়ে পঞ্চফল পূজিবে সাধুজনা॥
যথা শক্তি পূজা দিলে ভক্তিভাবে।
হবে অর্থশালী দারিদ্রতা যাবে॥
পূজিবে শনিবারে ঘোর সন্ধ্যাকালে।
যত বন্ধুবর্গ ডাকিবে সকলে॥
যতন না হতে আসিবে যে আগে।
করিবেক যত্ন যত বন্ধুবর্গে॥
উপহার দ্রব্য একত্র করিয়া।
করিবে নিবেদন শনি উদ্দেশিয়া॥
পড়িয়া পাঁচালী শুনিবে প্রসঙ্গ।
খাইবে প্রসাদ হলে কথা সাঙ্গ॥
খাবে সভামধ্যে বাসী না করিবে।
এ মতে আমাকে যে জনে পূজিবে॥
হলে সে দরিদ্র নানা অর্থ পাবে।
না পূজিলে হে ভূপ নানা দুঃখ পাবে॥

যেখানে যে পূজে শুনি যে না যাবে।
পাঁচালী যে নিন্দে অতি তুচ্ছ ভাবে।
চাহিবে যে শিন্নি খাইবার আশে।
হবে তার শনিকোপে শনৈশ্চর ভাষে ॥
পূজে স্বর্ণঘটে মহাভক্তি চিত্তে।
কিবা সাধ্য ভাবে পূজে যে যেমতে ॥
এতেক বলিয়া শনি মহামতি।
হইল অদৃশ্য না দেখে ভূপতি ॥
ভূপে কয় দ্বিজবর যাও নিজ ধানী।
করিনু তোমায় দান গ্রাম পঞ্চখানি ॥
ভূমিদান পেয়ে দ্বিজ মহাহর্ষ মনে।
চলিল অমনি নিজ সিন্ধু গ্রামে ॥
পূজিল শনৈশ্চর গিয়া দ্বিজ নিজঘর।
হয়ে দুঃখ অন্ত হল যে ধনেশ্বর ॥
হল সুপ্রকাশ্য শনিপূজা মতে।
আছে যার বাঞ্ছা পূজ এই মতে ॥
দ্বিজ গোপীকান্ত করে যোড়পাণি।
বলে ভীত চিত্তে সকরুণ বাণী ॥
সভামণ্ডপস্থ শুনি সর্বজনে।
করে কৃপাদৃষ্টি দ্বিজ দীনহীনে ॥
শনির পাঁচালী শুনিয়া শ্রবণে।
ক্ষমি দোষ পরিতোষ হও নিজগুণে ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিয়ের গান

বাংলার লোকসাহিত্যে পুরনারীদের রচিত গীতি-গাথার সব চাইতে বড় অবদানই বোধ হয় বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত 'বিয়ের গান' ও ছড়াগুলি।

প্রায় সকল সমাজেই বিবাহ উপলক্ষ্যে বেশ কিছু গান-বাজনার ব্যাপার এককালে চলতি ছিল। কিন্তু লোকে যত বেশি শহরের সংস্পর্শে আসতে শুরু করল ততই বেশি করে অপ্রচলিত হতে লাগল মেয়েদের এই সব গান। অথচ এক সময় এমন কি আজও এই সব গান আনন্দ বিতরণ করে থাকে পল্লী বাংলার নিভৃত প্রাঙ্গণে। এর ভিতর শুধু আচরণীয় বা ক্রিয়াকর্মের খবরটুকুই নয়, বাংলার তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থারও একটা আভাষ পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হতে হয় নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিতা বঙ্গললনাদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পেয়ে।

বিয়ের পাকা কথা যে-দিন হয়ে গেল (পূর্ববঙ্গে বলে 'পাটিপত্তর') সে দিন থেকেই প্রকৃত পক্ষে গানের আসর বসে গেল। এবং এ চলতে থাকবে দ্বিরাগমন অর্থাৎ জামাই-মেয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত (পশ্চিম বঙ্গে বলে 'ধূলপায়')। কোনো কোনো জায়গায় এর স্থায়িত্ব পনেরো বিশ দিনও হয়ে থাকে।

বিয়ের দিন এগিয়ে আসে। এরই মধ্যে একদিন শুভদিন দেখে এয়োতীরা সব এগিয়ে আসে বৃদ্ধির ধান ভানতে। অধিকাংশ সময়েই যারা ঐ মাঙ্গলিক গান গায় তারাই একাজে বহাল হয়। কারণ এই ধান ভানা থেকেই শুরু হলো নিয়ম মাফিক মাঙ্গলিক গান। বাজনার দরকার নেই, নারীদের সম্মিলিত পাঁচমিশালী কণ্ঠস্বর আর ঢেঁকীর পাড়ের শব্দই বাজনার কাজ করে।

গান গাইতে বসেই প্রথমেই যে যার ইচ্ছামতো পান-সুপারী মুখে দিয়ে (প্রাচীনাদের কেউ কেউ সঙ্গে সঙ্গে দোক্তাপাতাও ব্যবহার করেন) শুরু করে গান :

ও ধান ভান রে মুরলীর গীত শুনি,
বৃন্দাবনে ভানে ধান রাই বিনোদিনী।

ঢেঁকীর পাড়ের সাথে সাথে তাদের গানের উঠতি পড়তি আছে। তাদের

এখন কত কাজ! বিয়ের দিন তো দেখতে দেখতে এগিয়ে এল। মহাধুম-ধামের ব্যাপার। বাড়ি ভর্তি লোক। ঘুম অনেকের চোখেই নেই। হঠাৎ দেখা গেল বিয়ের আগের দিন শেষ রাত্রে বিয়ে বাড়ির এক পাল মেয়ে ও বৌ দল বেঁধে চলেছে পুকুর কিংবা নদীর ঘাটের দিকে। মেয়েদের কারও হাতে বরণ-কুলা, কারও কাঁখে জলের মঙ্গল কলসী। ছোট ছোট মেয়ের দল চলেছে শাঁখ বাজাতে বাজাতে। পিছন পিছন আসছে ঢোল আর কাঁসি। কখনও বা 'সাঁনদার' (সানাই বাদক)-ও থাকে এই দলে। পূর্ববঙ্গে একেই বলে 'জলসইতে' যাওয়া। অনেক জায়গায় 'জলসই'ও বলে থাকে। পুকুরের দিকে বা নদীর ঘাটে যেতে যেতে তারা গান ধরে :

আইজ রামের অধিবাস কাইল রামের বিয়া গো কমলা,
আমরা জল ভরিতে যাই, সই আমরা জলে যাই।

কিংবা : তোমার রামের অধিবাসের রাণী সময় গেল।
গা তোল কৌশল্যা রাণী নিশি প্রভাত হইল॥
তোমরা সখি আনগো হলুদ, আন গো হলুদ সকলে।
আমার রামেরে সিনান করাও অতি সকালে॥

নদীর ঘাটে এসে পেঁীছেছে মেয়েরা। ছোটরা শাঁখ বাজায়, বড়রা উলুধ্বনি দেয়। বর্ষিয়সী সধবা গিন্নী-বান্নী মানুষ অর্থাৎ যার হাতে রয়েছে মঙ্গল কলস, তিনি এইবার ঘাটে নামলেন কলসীতে জল ভরতে। পাড় থেকে মেয়েরা নতুন গান ধরল :

জলে ঢেউ দিওনা গো সখি
ঢেউ দিওনা, ঢেউ দিওনা,
আমরা জলের চাতকী।
জলের কালোরূপ নিরখি
জলে ঢেউ দিওনা গো সখি।
আগে সখি, পাছে গো সখি
মধ্যে রাধা চন্দ্রমুখী।
ঢেউ দিওনা সখি কৃষ্ণের কালোরূপ নিরখি।
কেহর পৈরণ নীলাম্বরী
কেহর পৈরণ সাদা ধুতি,

রাধার পৈরণে শাড়ি
তাতে কৃষ্ণের নামটি লেখা দেখি ॥

জলভরা সাঙ্গ করে মেয়ের দল আবার ফিরে চলে ঘরের দিকে। সানাই বেজে চলে, ঢুলীভায়া বাজায় ঢোল, তাল দেয় কাঁসি। মেয়ের দল গান ধরে :

বরণ কুলা আনো সখি, বরণ কুলা আনো
আমরা শ্যামের ঘাটে যাই।
আমরা জল সইতে যাই।
ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও সখি,
ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও,
ধান দিয়া, দূর্বা দিয়া, রামের ওই
বরণ ডালা সাজাও।
আমরা জল সইতে যাই,
আমরা ফুল তুলতে যাই।

বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই কাজ হলো মংগল ঘট স্থাপন করা। যে-কলসীতে করে জল নিয়ে আসা হলো সেইটাই হলো মংগল ঘট। এই ঘট স্থাপনার সময় পাঁচজন এযো একত্রে এটিকে মাটির উপর স্থির ভাবে বসায়। বসাবার আগে পেঁঠেটিতে দিয়ে নেয় ধান দূর্বা প্রভৃতি। এই মংগল ঘট স্থাপন করবার সময়ও তারা গান গায় অতি কোমল এবং মিহি সুরে :

ওগো মংগলো আসিছে দুয়ারে
মংগলো অবনী আজ।
মংগলো জলধর, মংগলো কলসে
পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে এসো হরষে,
অতিথি, ভূপতি, দেবতা, স্বদেশে,
মংগলো অবনী আজ ॥

এবার আরম্ভ হলো বৃদ্ধির কাজ। চলতি কথায় বলে 'অধিবাস'। মেয়েকে নতুন কাপড় পরানো হলো। তার কপালে আঁকে চন্দন কুমকুমের ফোঁটা। গলায় পরানো হলো তুলসী কাঠের মালা। কোমরে জড়ানো হলো নতুন লাল ঘুনসী। চোখে দেওয়া হলো কাজল, আর সংগে সংগে মেয়েরা শুরু করে গান :

ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মোণ চাউল লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল বিড়া পান লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মোণ গুয়া (সুপারী) লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মোণ মুগ লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মোণ ধান লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মোণ কড়াই লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মোণ যব লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মোণ হরীতকী লাগে গো। ইত্যাদি।

বেলা বাড়তে থাকে। কাজের বাড়ির ব্যাপারতো! কেউ কাজে ঘুরছে। কেউ বা বে-কাজেই বেশি ঘোরাফেরা করছে। ফলে মেয়েকে স্নান করাবারও বেলা বেড়ে যায়। অবশেষে গিন্নী-বান্নীদের নজর পড়ে। তাইতো! মেয়েটা স্নান করবে কখন? বেলা যে আর নেই! আর একটু পরেই তো আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ি বোঝাই হয়ে যাবে। কাজেই সাজ সাজ রব পড়ে যায় মেয়েকে স্নানো করানো নিয়ে। নিয়ম কানুন সব গায়-হলুদের মতো। অন্ততঃপক্ষে পাঁচজন এয়োতী একযোগে শিলের উপর কাঁচা হলুদ, গিলে, দুর্বা প্রভৃতি নিয়ে থেঁতো করে। তারপর তা মাখিয়ে দেয় মেয়ের মুখে, হাতে, পায়ে সর্বাঙ্গে। এই হলুদ বাটা শুরু করবার সময় থেকে মেয়েকে স্নান করানো পর্ব সমাধা না হওয়া পর্যন্ত চলে মেয়েদের সমবেত কণ্ঠের গান:

তোরা আয়গো সকলে
রাম-সীতাকে স্নান করাব সুশীতল জলে।
কস্তুরী মিশায়ে জলে ঢেলে দাও গো রামের শিরে।

সখি সকালে আয়গো মাজ কেটে আরো
কুর হরিদ্রা বেটে আনো
ধোপার ছেলে ডেকে আনো সখি সকালে।
ছুতারের পিঁড়ি আনো
কুমারের কুম্ভ আনো
গঙ্গাজল ভরে আনো, সখি সকালে।
কুমারের মুছি আনো
চার কোণার ছন আনো
আইওগণে ডেকে আনো সখি সকালে।

কিংবা : ব্যালা দশটা বাইজ্যাছে
রাধারাণী ছানে চইল্যাছে।

সুতারের পিঁড়ি আনো
আনো সকালে
রাধারাণী ছানে চইল্যাছে।

পুরুইতের সুতা আনো, আনো সকালে
রাধারাণী ছানে চইল্যাছে।

কুমারের মাটি আনো, আনো সকালে
রাধারাণী ছানে চইল্যাছে।

আনো আনো হলুদ বাইট্যা, আনো সকালে
রাধারাণী ছানে চইল্যাছে।

পূর্ববঙ্গে অবশ্য এর পরেই মেয়েদের ফুল তুলতে যাবার কথা, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও রেওয়াজ আছে বিয়ের দিন নাপিতানীরা আসে মেয়েদের পায়ের নখ কেটে দিতে, আলতা পরিয়ে দিতে। এই আলতা পরিয়ে দেবার সময়ও নাপিতানীর গান শোনা যেত :

পা কামাবি কেহুটে মোড়লের বাড়ির বউ,
এমন কর‍্যা কামায়্যা দিমু বাহারেবেনা লহু।
আমার হাতে যে-বা কামায়,
দেখ্যা ভোলে শ্বশুর জামাই,
পিরীত লাগানি, অ নাপতানি কহে কত শাদু।

আমার আলতায় কী গুণ ধরে,
স্বর্গের সিঁড়ি টান্যা আনে,
সতী অহল্যা, দ্রৌপদী, বেহুলা, আছে সাক্ষী রহু ॥

এইবার মেয়েকে সাজাতে হবে—একেবারে বিয়ের সাজে। গহনাগাঁটি, কাপড়-চোপড় ছাড়াও সকল সাজের বড় সাজ হলো ফুলের সাজ। ফুলের গহনা, ফুলের মালা, অনুষ্ঠানের ফুল, সব কাজেই ফুল। কাজেই বিবাহাদি ব্যাপারে ফুল একান্তই দরকার। তাই মেয়েরা আবার দল বেঁধে চলল বাগানে ফুল তুলে আনতে।

প্রত্যেকের হাতেই একখানা করে ফুলের সাজি। তারা ফুল তুলছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই দলের কর্ত্রী শুরু করলেন গান। সঙ্গে সঙ্গে তান ধরল সঙ্গী সাথীরা :

তোরা কে কে যাবি আয় ফুল তুলিতে নিকুঞ্জ বনে,
ত্বরা করি আয়রে সকলে নিধুবাবুর বাগানে।
কে কে যাবি আয় ফুল তুলিতে নিকুঞ্জ বনে ॥

ফুল তোলা হয়ে গেল। এইবার মেয়েকে সাজাতে বসানো হলো। কিন্তু সাজাবারও তো অনেক নিয়মকানুন আছে। প্রথমেই চাই চন্দন-কাজল। তারপর নতুন পাটি—যার উপর বসিয়ে মেয়েকে সাজানো হবে। চাই নতুন পিঁড়ি। এই পিঁড়ির উপর বসেই তো মেয়ের বিয়ে হবে। কাজেই আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার দরকার বইকি। তাই তারা গান ধরে :

চল সজনী দেখে আসি সীতা সাজাবার বাকি কী ?
আমরা বকুল বনে যাই বকুল ফুল টোকাই (কুড়াই)।
বকুল ফুলের মালা গেঁথে আমরা রাম-সীতা সাজাই।
আমরা বিনা জলে চন্দন ঘষে রাম ললাটে দিয়েছি,
বিনা তেলে কাজল পেড়ে সীতার চোখে দিয়েছি,
আমরা মালী বাড়ি যাই, মুকুট নিয়ে এসে রামকে সাজাই।
আমরা পাত্রা বাড়ি যাই, পাটি নিয়ে এসে সীতাকে বসাই।
আমরা কুমার বাড়ি যাই, পিঁড়ি নিয়ে এসে রামকে বসাই ॥

এইবার গহনা পরাবার পালা। সাধ্যানুসারে মেয়ের মা-বাবা মেয়েকে যৌতুক

স্বরূপ যে-সব গহনাগাঁটি দিয়েছে কিংবা আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকে পাওয়া গহনা সব একত্রে নিয়ে, এমনকি দরিদ্র ঘরে কোনো গহনাগাঁটি না থাকলেও সংগী সাথীরা বসল তাদের সখিকে সাজাতে :

সীতার সুন্দর মাজাতে চেলেনীর কোচাতে
সাজ সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর ললাটে সোনার টিপটি
সেজেছে সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর কণ্ঠে সোনার হাঁসুলী
সেজেছে সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর মস্তকে সুন্দর বেণীটি
বেঁধেছে সীতা সুন্দর খোঁপাটি।
সীতার সুন্দর হাতে সোনার বাজুটি
সেজেছে সীতা সুন্দর সাজে।
সীতার সুন্দর আংগুলে সোনার অংগুরী
পর সীতা আভরণ হে।

কিন্তু গানের ভিতর যে সব গহনাগাঁটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যুগে যুগে এরও পরিবর্তন হয়। কাজেই নতুন নতুন গানে এই সব পুরনো গহনাগাঁটির পরিবর্তে নতুন নতুন গহনার নামও শোনা যায়। আরও একটু লক্ষ্য করা যাবে তাদের আধুনিককালের গানের ভিতর কতকগুলি চলিত গহনার ইংরেজি নামও আছে। এই সব ইংরেজি কথা তাদের অজ্ঞাতসারেই গানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে সন্দেহ নেই। তাই মেয়েকে সাজাবার পর যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে বিয়ের আসরে নিয়ে যাওয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একটার পর একটা গান চলতে থাকে। এই সময় এঁদের ভিতর যিনি একটু নতুন গহনাগাঁটির খোঁজ রাখেন তিনি এবং অপরাপর সকলে মিলে গান ধরেন :

শ্যামেরই কাচমে (কাছে) নদীয়ারই বামে
হাওয়া লাগে রাধার গায়।
হাতেতে চুড়ি, কানে দেব মাকুড়ী,
আলতা পরাও রাধার পায়।
শ্যামেরই কাচমে নদীয়ারই বামে
হাওয়া লাগে রাধার গায়।

গলেতে ‘নেকলেস, হাতে দেব ‘বেস্‌লেট্‌’
আলতা পরাও রাধার পায়।
মাথাতে টিক্‌লী পায়ে দেব তোড়া,
আলতা দেব রাধার পায়।

উলু-উলু-উলু—পোঁ-ও-ও-পোঁ-ও-ও—

তুমুল সোরগোল শুরু হয়ে গেল কনে-বাড়িতে। সাজ সাজ রব পড়ে গেল, ‘জামাই আইছে, জামাই আইছে’।

ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল চল্‌ল বর দেখতে। অভিভাবক শ্রেণীর কর্তারা চললেন অভ্যর্থনা করতে। আর এই সংবাদ নারীমহলে প্রচারিত হবার সাথে সাথে তাঁরাও তৎপর হয়ে উঠলেন। কনেকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসবার সাথে সাথে তাঁরাও গান জুড়ে দিলেন :

আমতলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া,
আইলো গো সুন্দরীর জামাই মুটুক মাথায় দিয়া।
মুটুকের তলায় তলায় চন্দনের ফোঁটা
চল সখি সবাই মিল্যা জামাই বরি গিয়া।
(ও রাধে) ঠমকে ঠমকে হাটে
শ্যাম চাঁদের পাছে যেমন ময়ুরে প্যাখম ধরে।
আগে যায় গো শ্যাম রাজা পাছে যায় গো রাধা,
তারও পাছে যায় গো পুরুত ভৃংগার হাতে লইয়্যা ॥
একও পাক দুইও পাক তিন পাকও যায়,
সাত পাক গিয়া রাধা নয়ন তুইল্যা চায় ॥

বিয়ের আনুষ্ঠানিক পর্বটা মিটে যাবার পরই বর-কনে চলে এল বাসর ঘরে। এইবার শুরু হলো স্ত্রী-আচার। পূর্ববঙ্গ সমাজের স্ত্রী-আচারের ভিতর ‘চাল-খেলা’ একটি প্রধান বস্তু। বর-কনেকে নিয়ে বসানো হলো পাটির উপর, সেখানে আগে থাকতেই কিছু চাল এনে রাখা ছিল। বর সেই চালগুলি মুঠ মুঠ নিয়ে ভর্তি করে দিল কনের হাতে, কনে সেগুলি ঢেলে নিল পাটির উপর। এই চাল ঢেলে দেবার ব্যাপারটা অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো। মেয়ে শুধু হাতদুটো প্রসারিত করেই থাকে বাদ বাকি সব করিয়ে নেয় তার সঙ্গিনীরা। এইবার বরের পালা। তাকে সাহায্য করার কেউ নেই। সে সেখানে অভিমন্যুর

মতো অবস্থায়, কাজেই সে চালগুলিকে একটু বেশ দূরেই সরিয়ে দেয়, মেয়েরা আবার সেগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে কৃষিপ্রধান ভারতে ধান এবং চালের উপর লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান যে অনেকখানি নির্ভরশীল এ-থেকে তাই প্রমাণিত হয়। নব বর এবং বধূ সর্বপ্রথম শস্যের দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে পরিচিত হোক লৌকিক আচার নিরূপণকারীদের এই ছিল বোধ হয় অভিপ্রায়।

এইভাবে চলে কিছুক্ষণ। এরপর হলো মঙ্গল প্রদীপের হাঁড়ির ঢাকনা ওঠানো। তারপর জল খেলা ('যো-খেলা'ও বলে কোথাও কোথাও) এইসব। কিন্তু এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে একদল, অন্যদল কিন্তু সময় বুঝে নতুন নতুন গান গেয়ে চলে :

চলো সখী যমুনায়, বাঁশী ডাকে আয় আয়
দিনমনি ধীরে ধীরে যায়।
পাটিতে ঢালিয়া চাউল, রাধা করে আলো উজল,
আইজ বুঝি শ্যামেরে হারায়।।
চলো সখী যমুনায়, বাঁশী ডাকে আয় আয়
দিনমনি ধীরে ধীরে যায়। (২)
পাথরে ঢালিয়া জল, রাধা করে টলমল
আইজ বুঝি শ্যামেরে হারায়।।
পানেতে দিয়া লঙ্গ, রাধা করে কত রঙ্গ
আইজ বুঝি শ্যামেরে হারায়।।
রাধা করে নমস্কার, শ্যাম করে আশীর্বাদ
থাক তুমি সাবিত্রী সমান গো লক্ষ্মীর সমান।।

স্ত্রী-আচারের পরই বাসরের গান। বাসর ঘরে বর কনেকে ঘিরে বসেছে নানা বয়সী মেয়ে বৌ। পাঁচ থেকে পঁচাত্তর। বরের শ্যালিকা থেকে দিদি শাশুড়ী সবাই এসেছে বাসর ঘরে জামাই-মেয়েকে নিয়ে একটু হাসিঠাট্টা করতে। দিদিমা সম্পর্কীয়া একজন তো বলেই বসলেন :

ওগো বর এলাম তোমার বাসরে
একটা গান গাওনা শুনি,
গান যদি না গাও, আমার নাতনীর ধর পাও,
নহিলে মিলবে না সোনার চাঁদ বদনী।

বাংলার লোকসাহিত্যে বাসরের গানেও কিছু কিছু ছড়ার সন্ধান পাওয়া

যায়। অনেক সময় ঠাকুরমা দিদিমা শ্রেণীর মহিলারা জামাইকে ঠাট্টা করে বলতেন :

হড়কো মুখো জামাই এলো চাঁদনা তলাতে,
এমন কইন্যা দিবনা হে তোমার হাতেতে ॥
(ওকি জামাইয়ের ছিরিরে)
হাতির মতন কুলা কান কাঁথা চেপে ধর
(দিদি কাঁথা চেপে ধর),
হলুদ বরণ কইন্যা ঘরে ম্যাঘের মতন চুল,
বরের ছিরি বলিহারি গায়ে ফোটে হুল
(দিদি গায়ে ফোটে হুল।)

যখন ছেলে-মেয়েদের খুবই ছোট বয়সে বিয়ে হতো, তখনকার দিনে এর চাইতেও মজার মজার সব ছড়ার প্রচলন ছিল :

ভাঙ্গা ঘরে শুতে দিলাম ইঁদুরে নিল কান
কেঁদোনা, কেঁদোনা জামাই, গরু দিব দান।

যাক বিয়ের পাট তো মোটামুটিভাবে চুকে গেল। তাই এ-উপলক্ষে গানও প্রায় শেষ হয়ে এল। স্বামীর সঙ্গে মেয়ে যাত্রা করল শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে। মেয়ে-জামাইকে বিদায় দিতে এসে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল পুরনারীদের আঁখিপল্লব। সানাইতে বেজে উঠল করুণ রাগিণী। কন্যাবিচ্ছেদের এই করুণ রসঘন পরিবেশটা অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে পূর্ববঙ্গের এক লোক-কবির কণ্ঠে :

সুনামগঞ্জের নৈদ্যার ঠাকুর
দ্যাখন গঞ্জের মাইয়্যারে,
(ও) মাইয়্যা লইয়্যা যায় লইয়্যা যায় রে—।

বিয়েবাড়ির উৎসব কোলাহল থেমে যায়। নিভে যায় চোখ ঝলসানো আলোর রোশনাই। প্রতিমা বিসর্জনের পর চণ্ডীমণ্ডপের যে দৃশ্য—এখানে যেন তারই পুনরাবৃত্তি। একদিকে বাঁশীতে বেজে চলে বিচ্ছেদের সুর আর অন্যদিকে বরের বাড়িতে ঠিক এই সময় বেজে ওঠে সানাই। নববধূ বরণ করবার জন্য এগিয়ে আসছে বরের বাড়ির পুরনারীগণ। আনন্দের আজ বান

ডেকেছে সেখানে। শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে 'বৌ-নাচের' যে কথা শোনা যায় তাতে দেখা যায় এই নববধূকে প্রথম শ্বশুর বাড়ি এসে ওখানকার সকলের অনুরোধে (অন্দর মহলে) সেই বেনারসী (চেলী) শাড়ি, গহনাগাঁটি সমেতই লজ্জাজড়িত ভঙ্গিমাতেই গানের ভাবের সাথে সংগতি রেখে নাচ দেখাতে হতো। নববধূ ঘোমটা ঢাকা অবস্থাতেই প্রথমে জোড় হাতে সকলকে প্রণাম জানিয়ে পরে অন্যান্য মুদ্রা সহকারে নাচতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে চলে বরের বাড়ির এয়োতীদের গান :

সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি, নাচত দেখি,
নাচত দেখি বালা, নাচত দেখি।
নাচেন ভাল সুন্দরী, বাঁধেন ভাল চুল,
হেলিয়া তুলিয়া পরে নাগকেশরের ফুল।
রুমঝুম নূপুর বাজে ঠুমুকু ঠুমুক তালে,
নয়নে নয়ন মিশাইয়্যা সরমে রং লাগে গালে।
যেমনি নাচে নাগর কানাই, তেমনি নাচে রাই,
নাচিয়া ভুলাওত দেখি নাগর কানাই।

পূর্ববঙ্গে হিন্দু সমাজেরই মতো মুসলমান সমাজের ভিতরও অনুরূপভাবেই বিয়ের গান প্রচলিত রয়েছে। সেখানেও সিন্দুর খেলা, চাল খেলা প্রভৃতি মেয়েলী আচার এখনও বিদ্যমান। মনে হয় এইসব গান এককালে হিন্দু সমাজের ভিতর থেকেই এসেছে। এখানেও বরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ কিছু কম করা হয় না। সংগৃহীত গান কটি নিয়ে আলোচনা করলেই একথা বেশ স্পষ্ট করেই চোখে পড়বে :

১। ঢাকাই পানে তো আলর দামাদ
দামাদ মশুরী টানায়ে, মশাল জ্বালায়ে
কী কী জেওর আনিছরে দামাদ
বিবির লাগিয়া।

এনেছি এনেছি রে আম্মা সাহেবা
কাগজ জড়াইয়া নিক্তিতে তালইয়া।

বিবি বড় গুমেনীর গুমেলা
খেলাল ছিটায়ে ফেলল উদেয়ে।

দামাদ বড় রসিকের রসিক
(হারে) তুলিল খুঁটিয়ে
(হারে) পড়াল বসায়ে।

২। বিবির সিন্দুর লইয়্যারে বিদেশী দামান
চান ফেরে নদীর কূলে,
কার লগ্যা কেনলাম সিন্দুর রে,
আল্লা বিধি চিনতে না পারে।
মুই আগে যদি জানতাম, ছোবহান আল্লা
ছোট ভাইধন আনতাম সাথে রে।

৩। আগার দিয়া আইল বিহাই,
পাগার দিয়া আইল বিহাই গো,
সরান দিয়া আইল দুলোবের দামান্দ নারে।
কিসে বা বসতে দিব বিহাইকে,
কিসে বা বসতে দিব বিহাইগোকে,
কিসে বা বসতে দিব দুলোবের দামান্দ নারে।
মোড়াতে বসতে দিব বিহাইকে,
মাচ্যাতে বসতে দিব বিহাইগোকে,
ম্যাচে না বসতে দিব দুলোবের দামান্দকে নারে॥

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ব্রত অনুষ্ঠান

বাংলার লোক-সংগীত তথা লোকসাহিত্যে বাংলার মহিলাদের দান যে নেহাৎ নগণ্য নয় এ কথা আমরা একাধিকবার বলেছি এবং তার যথাযথ প্রমাণও দেবার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। একথা বলা নিতান্তই অতিরিক্ত বলে মনে হতে পারে যে বাংলায় প্রচলিত অধিকাংশ লৌকিক ব্রত অনুষ্ঠানের "কথা" ও তৎসম্পর্কিত ছড়া কিংবা গানগুলির প্রায় সবটাই বাংলার পুরনারীদের দান। এইসব ব্রতকথা, ছড়া ও গানের মাধ্যমে একদিকে যেমনি পাই সামাজিক খবরাখবর অন্যদিকে মহিলাদের কাব্য প্রতিভারও তারিফ না করে কোনো উপায় নেই।

এক কথায় বার মাসে তের পার্বণের দেশ এই বাংলায় এমন মাস খুব কমই আছে যে-মাসে একটা না একটা ব্রত বা অনুষ্ঠান নেই। কাজেই আমরা এই পরিচ্ছেদে মাস ভেদে ব্রত কথার বিবরণ অতি সংক্ষেপে কিছু কিছু দিয়েই "ধর্ম অনুষ্ঠান" প্রসঙ্গ শেষ করব।

কুমারী ব্রত বা শিবপূজা

একদিকে চৈত্র উৎসব শেষ হলো চৈত্র সংক্রান্তির দিনে, অন্যদিকে ঘরে ঘরে শুরু হলো কুমারী ব্রত। চৈত্র উৎসব যেমন শৈবানুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়, তেমনি কুমারী মেয়েদের বৈশাখের কুমারী ব্রতও শিব পূজা ছাড়া আর কিছু নয়। পতি হিসাবে শিব হলো মেয়েদের আদর্শ। পুরাণে এ সম্পর্কে বিলক্ষণ নজির আছে, হয়তো এ কারণেই বাংলার মেয়েরা কৈশোর থেকেই শিব পূজা করতে শুরু করে। এ শিব পূজায় পুরোহিতের কোনো দরকার নেই। সংস্কৃতে কঠিন শ্লোকও উচ্চারণ করবার কোনো প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেদেরই তৈরি ছড়া আউড়ে কখনও বা সমস্বরে সুর করে ছড়া বলে যায়। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন খুব ভোরে উঠে মেয়েরা বেলে মাটি দিয়ে ছোট ছোট শিব মূর্তি তৈরি করে। পরে সকলের শিবমূর্তি একত্রে বসিয়ে, আবার কখনও ব্রতী একা থাকলে শুধুমাত্র তার নিজের শিবমূর্তিটি তামার টাটের উপর বসিয়ে তাঁর

সামনে ভোগ দেয় ফলমূল, আলোচালের নৈবেদ্য, জ্বালিয়ে দেয় ধূপদীপ, পরে শুরু করে শিবকে স্নান করাতে।

এই স্নানের সময়ও মন্ত্র আছে ; তবে এ মন্ত্র তাদের নিজস্ব বানানো মন্ত্র। তারা ডান হাতে ধরে ঘটি বা কমণ্ডলুর মাথা, বাঁ হাতে স্পর্শ করে ডান হাতের কনুই, পরে বলতে থাকে :

শিল শিলাটন শিলে বাটন
শিল অঝ্ঝর ঝরে
স্বর্গ হতে বলেন মহাদেব
"গৌরী কি বর্ত করে ?"
নড়ে আশ নড়ে পাশ নড়ে সিংহাসন
হর গৌরী কোলে করে গৌরী আরাধন ॥

এরপরে প্রণাম মন্ত্র, তাও তাদেরই তৈরি ছড়া :

আকন্দ বিল্বপত্র আর গঙ্গাজল
এই পেয়ে তুষ্ট হোন ভোলা মহেশ্বর ॥

এইভাবে তারা তাদের ব্রত সমাপন করে সেদিনের মতো চলে যায় যে যার কাজে ; গোটা বৈশাখ মাস ধরে এইভাবে শিবপূজা করে সংক্রান্তির দিন করে উদ্‌যাপন।

অশ্বত্থ নারায়ণের ব্রত

বাংলার লোকসাহিত্যে শুধু দেবতাকে নিয়ে নয় ; এক ধারে তারা যেমন বন্দনা করেছে দেবতার, অপরদিকে ক্ষেত্র দেবী, অর্থাৎ শস্যেরও বন্দনা গেয়েছে। তাদের এই কাব্য-গাথার তথা ব্রতকথার ভিতর বনানীও বাদ পড়েনি। বট, অশ্বত্থ, তুলসী, হিজল প্রভৃতি বৃক্ষরাজিকেও তারা পূজা করে এসেছে। সূর্যের কিরণ, মাতা বসুমতী এবং শস্যই যে আমাদের সকল সুখ ঐশ্বর্যের মূলাধার এই সত্যকে বাংলার পুরনারীরা বুঝেছিল বহু পূর্ব থেকেই, কিন্তু সে উপলব্ধির ভিতর কোনো পাণ্ডিত্য নেই, নেই দর্শনের কোনো গূঢ় তত্ত্ব। এসবই তাদের নিজস্ব অনুভূতির ভিতর দিয়েই তাঁরা সৃষ্টি করে নিয়েছে। তাই তাদের ব্রত কথায় হিংস্র জানোয়ার সাপ বাঘও বাদ যায়নি। নাগ

পঞ্চমীতে মনসার ব্রত কিংবা বাঁকুড়া ও সুন্দরবন অঞ্চলে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের পুজাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাংলার প্রচলিত অশ্বত্থ নারায়ণের ব্রতটিও মূলতঃ বৃক্ষ-বন্দনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পহেলা বৈশাখ নববর্ষ বাঙালীর কাছে একটি পবিত্র দিন। এই দিনই দেখা যায় পাড়ার মেয়ে বৌরা দলবেঁধে চলেছে নদী অভাবে পুষ্করিণী বা দীঘির দিকে স্নান করতে। তাদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে এক গোছা করে অশ্বত্থ পাতা। তারা স্নান সমাপন করে এক একটি পাতা মাথায় দিয়ে ডুব দিয়ে উঠেই ছড়া বলতে থাকে :

শিব বলে গৌরীরে,
নরলোকে গঙ্গার ঘাটে
মেয়েরা সব কী ব্রত করে ?
গৌরী বলে, মেয়েরা সব
অশ্বত্থ নারায়ণের ব্রত করে।
শিব বলে এ ব্রত করলে কী হয় ?
গৌরী বলে, পাকা পাতাটি মাথায় দিলে
পাকা চুলে সিন্দুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে
কাঁচা সোনার বর্ণ পায়।
শুক্‌নো পাতাটি মাথায় দিলে
হীরে মুক্তোর ঝুরি পায়,
কচি পাতাটি মাথায় দিলে
কোলে কোমল পুত্র পায়।
শিব বলে আর কী কী পায় ?
গৌরী বলে,
মহাদেবের মত শ্বশুর পায়, গৌরীর মত শাশুড়ী পায়,
রামের মত স্বামী পায়, লক্ষ্মণের মত দেওর পায়,
সীতার মত জা পায়।

পর পর চার বছর ধরে মেয়েদের এই ভাবে গোটা বৈশাখ মাস ধরে ব্রত করে শেষ বছর, অর্থাৎ চতুর্থ বৎসরে করতে হয় উদ্‌যাপান। এই উদ্‌যাপনের সময় কিছু খরচ আছে। পুরোহিত ডেকে পুজা তো করতে হয়ই, তা ছাড়া

পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই সময় সোনার ও রূপার তৈরি বেলপাতা গড়িয়ে পূজা দিতে হয়।

হরির চরণ

বৈশাখ মাসকে এক কথায় বলা যায় পুণ্য মাস। এই মাসে যে কত রকমের ব্রত নিয়মের কথা শুনতে পাওয়া যায় তার আর ইয়ত্তা নেই। অঞ্চল ভেদে একই ব্রত বিভিন্ন নামে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। অনেকগুলি ব্রত আছে যেগুলি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের উভয় স্থানেই প্রচলিত, ছড়ার ভিতরকার পার্থক্যও খুব সামান্যই দেখা যায়। 'হরির চরণ' ব্রতটি সেই শ্রেণীর। এতেও ঠিক বৈশাখ মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, কুমারী মেয়েদের দেখা যায় পিতলের থালায় বা বাটায় চন্দন দিয়ে এক জোড়া পা আঁকতে। এই পদযুগলই হলো শ্রীহরির পাদপদ্ম। বালিকারা সেই থালার উপর একটি করে ফুল ফেলে দিয়ে মন্ত্র পড়তে থাকে :

> হরির চরণ, হরির পা, হরি বলেন 'মা গো মা',
> কোন্ ভাগ্যবতী পূজে মা ?
> সে ভাগ্যবতী কি চায় ?
> আপনাকে সুন্দর চায়, রাজ রাজেশ্বর স্বামী চায়,
> গিরিরাজ বাপ চায়, দশরথের মত শ্বশুর চায়,
> মেনকার মত মা চায়, দুর্গার মত আদর চায়,
> বসুমতীর মত ক্ষমা চায়, দরবার আলো বেটা চায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণ নিশ্চয় বললেন, শিশুদের মনে প্রথম থেকেই শ্বশুর, শাশুড়ী ও শ্বশুরবাড়ির কথা ঢুকিয়ে দেওয়া কেন ? আমরা এ কথার জবাবে শুধু বলব, বাঙালী সব সময়েই তাদের মেয়েদের দেখাতে চেয়েছে কল্যাণময়ী মাতৃরূপে। তাই শিশু বয়স থেকেই তাদের প্রার্থনা করতে শেখায় :

> হবে পুত্র মরবে না,
> পৃথিবীতে এক ফোঁটা চোখের জল পড়বে না।
> পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে, মরণ যেন হয় গঙ্গার জলে।

পুণ্যি পুকুর

'পুণ্যি পুকুর' ব্রত পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের উভয় অঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায়। ছড়াও প্রায় একই রকমের, তবু আমরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত একটি 'পুণ্যি পুকুর' ব্রতের ছড়াই আপনাদের কাছে তুলে ধরব। বৈশাখ মাসের প্রায় সবগুলি ব্রতই কুমারী ব্রত না হলেও এর প্রত্যেকটি ছড়াতেই লক্ষ্য করবেন এর ভিতর মেয়েরা সব সময়ই চায় একদিকে পিতৃকুলের অপরদিকে শ্বশুর কুলের মঙ্গল। শৈশব হতে মেয়েদের এই ভাবে ঘরের এবং পরের মঙ্গল কামনা করবার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হতো বাংলার মেয়েদের। তাই আজও গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে শোনা যায় এই সব ব্রত কথা। অতি সংক্ষিপ্ত এসব ব্রত কথা। উঠোনের মাঝখানে ছোট একটি চৌকোণা পুকুর তৈরি করে পহেলা বৈশাখ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত তার ভিতর প্রতিদিন এক ঘটি করে জল ঢেলে দিয়ে ছড়া বলে, আর একটি করে ফুল ফেলে দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়:

পুণ্যি পুকুর পুষ্প মালা
কে পুজেরে দুপুর বেলা,
আমি সতী নিজ ব্রতী
সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী,
হবে পুত্র মরবে না
চোখের জল পড়বে না,
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে
মরণ যেন হয় এক গলা গঙ্গাজলে।

চার বছর ধরে ঠিক একই নিয়মে এই ব্রত করে শেষ বছর করতে হবে উদ্‌যাপন। এইবার পুরোহিত ডাকতে হবে, তিনি শাস্ত্রীয় পূজানুষ্ঠান করবেন। অশ্বত্থ নারায়ণের ব্রতের মতো, এ ব্রতেও লাগে সোনার ও রূপোর তৈরি মাছ, বেলপাতা ইত্যাদি। সাধ্যানুসারে নিমন্ত্রণ অথবা ব্রাহ্মণ ভোজন এতো আমাদের ধর্মের একটা অংগই।

অলক্ষ্মী পূজা

পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে শারদ পূর্ণিমা তিথিতে কোজাগরী পূর্ণিমায় যেমনি লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা আছে, তেমনি বছরের সেরা অমাবস্যা কালীপূজার দিন রাত্রে হয় এই অলক্ষ্মী ঠাকুরানীর ব্রত বা পূজা।

এ পূজার নিয়ম-কানুন সবই একটু অদ্ভুত ধরনের। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভিতরও এ পূজার প্রচলন এখনও দেখা যায়। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ হয়তো বলবেন, এ হলো অনার্য সংস্কৃতির ভগ্নাবশেষ, আমরা তাঁদের সু-চিন্তিত অভিমতের প্রতিবাদ না করে বরং বলব, বাংলার সমাজ জীবনে কাউকেই দূরে সরিয়ে দেবার নীতি গ্রহণ করেনি। তারা একদিকে যেমন ধনের অধীশ্বরী লক্ষ্মী ঠাকুরানীর পূজা করেছে, জগতের যতকিছু মঙ্গল তাঁর কাছে কামনা করেছে, তেমনি এর বিপরীত অলক্ষ্মী ঠাকুরানীকেও একেবারে ঠেলে ফেলতে পারেনি। তারা তাঁকেও স্মরণ করেছে, তাঁরও পূজার ব্যবস্থা রেখেছে।

এই মূর্তি একটি গোবরের তৈরি পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। যে বাড়িতে এঁর পূজা হয়, সে বাড়ির গিন্নী-বান্নীরা সকালেই বাসী কাপড়ে বসে যান একতাল গোবর সম্মুখে নিয়ে। তারপর শুরু করলেন সেই গোবর ছানতে। তাও আবার বাঁ হাতে করে। এ কাজে ডান হাত লাগানো একদম নিষেধ। তারপর বাঁ হাতে করে গড়ে তুললেন একটি পুতুল। তার চোখ বানালেন দুটো কড়ি দিয়ে। মাথার চুল তৈরি হলো মেয়েদের উঠে যাওয়া, ফেলে দেওয়া ছেঁড়া চুল দিয়ে। আর সর্বাঙ্গে ফুটিয়ে দেওয়া হলো তুলোর বিচি। দেখতে হলো অনেকটা 'যম বুড়ি' ব্রতের 'যম বুড়ি'র মতো।

এইবার এঁর পূজার ব্যবস্থা; এঁকে সাধারণত ঠাকুর ঘরে বা লক্ষ্মী ঠাকুরানীর ঘরের ত্রি-সীমানায়ও আনা চলবে না, একে বসিয়ে রাখা হলো ঘরের বাইরে রাখা একটা ভাঙা তক্তা বা পিঁড়ির উপর। ঘরের ভিতর হচ্ছে লক্ষ্মী ঠাকুরানীর পূজা, বাইরে হচ্ছে অলক্ষ্মী ঠাকুরানীর। পুরুত ঠাকুর বাড়িতে এলেন পূজা করতে। হাত পা ধুলেন। মণ্ডপ বা ঠাকুর ঘরে ঢুকবার মুখেই দরজার গোড়ায় দেখা হলো অলক্ষ্মী ঠাকুরানীর সঙ্গে। তিনি বসলেন তাঁর সম্মুখে, বাঁ হাতে তুলে নিলেন কটি ফুল। চাঁদ সদাগরের মনসা পূজার মতো ঐ মূর্তির দিকে না তাকিয়েই শুরু করলেন তাঁর পূজা:

'ওঁ অলক্ষ্মী ত্বং কুরূপাসি কুৎসিত স্থানবাসিনী
সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ণ পূজাঙ্ক শাশ্বতিম্‌।'

ঠাকুর মশাই নৈবেদ্যে ফুল ছিটোলেন সে দিকে না তাকিয়েই। তারপর পূজা সাঙ্গ করে উঠে গেলেন ঘরের ভিতর। এখন করতে বসলেন লক্ষ্মী ঠাকুরানীর পূজা।

এখানে লক্ষ্য করুন পুরুত ঠাকুর মশাই কিন্তু আগেই করলেন অলক্ষ্মীর পুজা তারপরে করলেন লক্ষ্মীর। যেমনি শনি-সত্যনারায়ণের পুজার সময় পুরুত ঠাকুরকে আগে করতে হয় শনি-গ্রহের পূজা তারপর সত্যনারায়ণদেবের।

অলক্ষ্মী ঠাকুরানীর পুজার সংগে সংগেই তাকে ঢেকে রাখা হলো একটি ডালা বা ধামা চাপা দিয়ে।

অমাবস্যার রাত্রি শেষ হয় হয়, বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করে উঠল অলক্ষ্মী ঠাকুরানীকে বিদায় দেবার জন্য।

লক্ষ্মী ঠাকুরানীর বিসর্জনের সময় দেখেছেন কত বাজনা-বাদ্যি, কত রকম-বেরকমের আলোর জৌলুস, মিছিল কত কি? অলক্ষ্মী ঠাকুরানীর বিদায় শোভাযাত্রা দেখুন। ছেলেমেয়েগুলো ঘুম থেকে উঠেই হৈ হুল্লোড় শুরু করে দিল। কেউ কেউ আদাড়ে কুলা দু একখানা সংগ্রহ করে নিয়ে এল, কাঠি দিয়ে আরম্ভ করল সেগুলি বাজাতে। এই হলো অলক্ষ্মী ঠাকুরানীর শোভাযাত্রার বাজনা। আর সংগে সংগে বলতে লাগল:

অলক্ষ্মী কাটতে যাচ্ছি,
মা-লক্ষ্মী ঘরে আসুন।

এইভাবে তারা কিছুদূরে কোনো এক তে-রাস্তার মোড়ে গিয়ে এদের ভিতর একজন সেই ধামা চাপা অলক্ষ্মী ঠাকুরানীর মূর্তিটি বের করে বসিয়ে দিল সেই তে-রাস্তার মোড়ে, আর অমনি সংগে সংগে অন্য একজন বাঁ হাত দিয়ে হাতের কাটারির এক ঘা বসিয়ে দিল মূর্তিটির উপর। তিনি তো দুখানা হয়ে পড়ে রইলেন সেই তে-রাস্তার উপর, এদিকে বেজে উঠল ভাঙা আদাড়ে কুলার কন্সার্ট বাজনা, আর হৈ চৈ হুল্লোড়, কেউ কেউ সমস্বরে বলতে লাগল:

অলক্ষ্মী কেইট্যে আলাম
মা-লক্ষ্মী মাথায় থাকুন।

এই হলো অলক্ষ্মী ঠাকুরানীর পূজা এবং অনুষ্ঠান পদ্ধতি। এর ভিতর গান বা ছড়া বিশেষ কিছু নেই—পদ্ধতি এবং অনুষ্ঠানটুকুই প্রধান। বার মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলায় কখনও একপেশে শালিসীর ব্যবস্থা করেনি। তারা এক-ধারে যেমনি করেছে সুন্দরের উপাসনা অন্যদিকে অ-সুন্দরকেও একেবারে দূরে সরিয়ে রাখেনি। লক্ষ্মীঠাকুরানীর কাছে আমরা ধন দৌলত মংগল কামনা

নিশ্চয়ই করব একথা সবাই বলবেন। কিন্তু অলক্ষ্মী ঠাকুরানী? তিনি কি দেবেন? কি-ই বা চাইব তাঁর কাছে?

তাঁর কাছে নিবেদন করা হয়, 'হে অলক্ষ্মী ঠাকুরানী! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও আর কখনও আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় এসো না; আধি ব্যাধি যত কিছু অমঙ্গল নিয়ে তুমি চলে যাও আমরা একটু শান্তিতে থাকি, বছর বছর তোমার পূজা দেব। দয়া করে এ বাড়ির দিকে আর দৃষ্টি দিও না।'

ইতু পূজা

অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই একটা মাস প্রতি রবিবার ভোরে বাসী বিছানায় বসে পশ্চিমবঙ্গের পুরনারীদের দেখা যায় ইতুপূজা করতে। ইতুও শস্যের দেবী। একটি মাটির সরার উপর একটি মাটির ঘট বসাতে হয়। এই মাটির ঘটই হলো ইতু ঘট। ঘটটি পূর্ণ করা হয় দুধ দিয়ে। ঘটের মধ্যে দেয় কল্মী ফুল ও আম্র পল্লব; তাছাড়া সরার উপর পুঁতে দেওয়া হয় ধানের শীষ, যবের শীষ, কল্মীলতা, কচু গাছ। এই ব্রত না করে ব্রতীরা জল খায় না। ইতু পূজার উদ্দেশ্য হলো সংসারের সুখ ও ঐশ্বর্য কামনা। পূর্ববঙ্গে একেই বলে 'চুঙ্গির ব্রত'। চুঙ্গি অর্থে চোঙ্গ। সেখানে ঘটের পরিবর্তে বাঁশের চোঙ্গ ব্যবহার করা হয়—এইমাত্র পার্থক্য। সাধারণতঃ ব্রতী নিজেই এই ব্রতের ছড়া বলে সেদিনের মতো ব্রত সাঙ্গ করে। কোথাও কোথাও পাড়া-প্রতিবেশীরা একত্র হয়ে বসে একজন ইতুর ব্রত কথা বলে, আর ব্রতীরা হাতে ফুল নিয়ে বসে বসে শুনে যায় ব্রত কথা:

অষ্ট লোক পালনী মাতা সংসারের সার
জগৎ পালনে মাতা যারে অবতার।
খণ্ডিয়া পাপ দারিদ্র্য সকল
সকল বিপদে বন্ধন হয় যায় রসাতল।
তোমার মহিমা কে কহিতে পারে
তোমার মহিমা (ও গো) কে বুঝিতে পারে,
একচিত্ত হয়ে যেবা যম লোক তরে।
ধর্মরাজ বলে আয়লেন নরপতি,
ব্রাহ্মণ কুলে তারা ব্রাহ্মণে বিদ্যাবতী।
জয়া-বিজয়া তারা কন্যা দুইখানি,

অরণ্য ভ্রমিয়া তারা নানা দ্রব্য আনে
প্রভাতে ভিক্ষার তরে আইলেন দ্বিজবর
বনের মধ্যে আছে এক সরোবর।
স্ত্রী সহ পুরুষ সহ কাটত বিধি
নিয়ম করিয়া তারা দিলেন তিন ডাক
আসিবারে দিব বরত বিস্তর
না আসিব দিব শাপত বিস্তর,
কর পাঠ, কর রানী, কর নমস্কার।
হাসিতে খেলিতে গেল যত নারীগণ
শনিবার সপ্তমীতে থাকিবে নিয়মে
রবিবারে ব্রতের কথা শুনিবে প্রভাতে
দুইভগ্নী ব্রত করে, করে একমনে,
দুই বোনে কথা শোনে শোনে একমনে।
কাটিলেন অশ্বারিকা মঙ্গল আঁকিয়া
রাজা লয়ে যান হস্তে ধরিয়া।
ললাটে লিখন রাজা হের বিধির ফল
কাটিল অষ্টম বুড়ি বছর অষ্টম সুফল
হাড়িকীর ব্রতের কথা হল সমাপন
যার যা মনবাঞ্ছা করহ পূরণ।

গোটা মাস এইভাবে ব্রতকথা শুনে পৌষ সংক্রান্তির দিন সেই সরায় বসানো ঘট এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সহ মেয়েরা দল বেঁধে যায় নদীর ঘাটে কিংবা পুষ্করিণীর পাড়ে। একে একে টুসু ভাসান দেবার মতোই তারা ভাসিয়ে দেয় তাদের যার যার ইতুর ঘট ও সরা। সাঙ্গ হয় ইতু পুজার পালা সে বছরের মতো।

তুষ-তুষলী

বাঁকুড়া বর্ধমানের 'তুষ-তুষলী' ব্রত আর মানভূমের টুসু ব্রত যে প্রায় একই একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তবু এর মধ্যে যেটুকু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় এ প্রসঙ্গে সেইটুকুই বর্ণনা করব।

টুসু এবং তুষ-তুষলী দুজনেই শস্যের দেবী, তাঁর কাছে স্বামীপুত্রের মঙ্গল, আত্মীয় পরিজনের মঙ্গল কামনা করা হয়। টুসু হলেন একটি মেয়ে পুতুল,

তাঁকে রাংতার সাজ পরিয়ে লাল, নীল কাগজের কাপড় পরিয়ে একটি মূর্তিতে রূপ দেবার চেষ্টা পায়। তুষলী ব্রতে সে নিয়ম নয়। ব্রত কথার ভিতর তুষলী দেবীকে একটি মেয়ে মনে করা হলেও আদতে কোথাও মূর্তি নেই। আলো চালের তুষ আর কালো গোরুর গোবর একত্রে মেখে নিয়ে তাই দিয়ে তৈরি করতে হয় একত্রিশটি নাড়ু। সেই প্রত্যেকটি নাড়ুর মাথায় দেওয়া হয় পাঁচ গাছি করে দূর্বা এবং সরষের ফুল, স্থান ভেদে মুলার ফুলও দেওয়া হয়। প্রতিদিন ঐ নাড়ুর একটি করে নিয়ে একটি সরার মধ্যে ফেলে দেয় আর সংগে সংগে ছড়া আউড়ে যায় :

তুষ-তুষলী কাঁধে ছাতি
বাপ মার ধন যাতাযাতি,
স্বামীর ধন নিজবতী।
ঘর করবো নগরে
মরবো গিয়ে সাগরে।
তুষলী গো রাই, তুষলী গো ভাই
তোমার ব্রত করে কী বর পাই
ছ বুড়ি, ছ গণ্ডা ক্ষীরের নাড়ু পাই।
ব্রত করলে কী হয় ?
দরবার আলো স্বামী পায়,
সভা উজল জামাই পায়,
সভা পণ্ডিত ভাই পায়,
সিঁথের সিঁদুর ঝক্‌মক্‌ করে।
গোয়ালে গরু মরায়ে ধান,
স্বামীর কোলে পুত্র দিয়ে
মরণ যেন হয় এক গলা গংগাজলে।

এই ভাবে গোটা পৌষ মাস ভর মেয়েরা তুষ-তুষলীর ব্রত করে। সংক্রান্তির দিন পাড়ার মেয়েরা দল বেঁধে পুষ্করিণী বা নদীর ঘাটে চলে তুষ-তুষলী ভাসান দিতে। এর সংগে টুসু ভাসাবার দৃশ্যটি মনে করুন, মেয়েরা সেই নাড়ুভর্তি সরাটা জলে ভাসিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকে :

তুষলী গেল ভেসে
আমার বাপ-ভাই এল হেসে।

তুষলী গেল ভেসে
আমার শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী-পুত্র এল হেসে।
তুষলী গেল ভেসে
ধন দৌলত টাকা কড়ি এল হেসে।

এই ভাবেই তোষলা বা তুষ-তুষলী দেবীকে সে বছরের মতো বিদায় দিয়ে মেয়েরা ফিরে চলে ঘরে, প্রতীক্ষা করতে থাকে পরের বছরের জন্য।

বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমানে যেমনি তোষলা ব্রত, তেমনি চব্বিশ-পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে যে সব সাঁওতাল ও আদিবাসীদের বাস রয়েছে তাদের ভিতরও টুসু ব্রতের প্রচলন দেখা যায়। তারা একে 'তোষালা' ব্রত বলে না, পরিবর্তে টুসুই বলে থাকে, অনুষ্ঠানের আঙ্গিক কিন্তু তোষলা ব্রতের মতোই। মূর্তি পূজার প্রচলন বিশেষ দেখা যায় না :

১। এক পয়সার ভাজা মালা চিঠি সাপের গাঁথনি,
গাঁথতে গাঁথতে নয়ন গেল পেরেনে মা জননী !

২। সাঁজ দেলাম সলিতা দেলাম সগ্‌গে দেলাম বাতি,
একে একে সঙ্গে লে মা লক্ষ্মী সরস্বতী।
গাই এলো বাছুর এলো, এলো ভগবতী,
সঙ্গে দিয়ে চলে গেলো, ঘরের কুলবতী।

৩। সত কেওয়ার ভিতর পাইরা গুন্‌ গুন্‌ করে গো,
পৈরা নই মা, পঙ্খ নই মা, টুসু খেলা করে গো।
খেলো না খেলো না টুসু শংখ মইলা হবে গো,
তোর বাপ মা অভাগিনী শংখ কোথাই পাবে গো ?

৪। তোদের পাড়ায় বসতে এলাম, বসতে দিলি পুঁই মাচা,
বসবার ভারে হেলে ঢুলে যায় তোদের পুঁইমাচা।
আমাদের পাড়ায় বসতে এলে বসতে দিব পিঁড়া,
পিঁড়ের নিচে খড়িসাপ, খাবে তোদের মাথা।

৫। পাড়ায় পাড়ায় গেলো টুসু কিবা কিবা পালে গো
আগে পালেন বসতে পিঁড়া
শেষে পালেন ঘটি জল ও ঘে,
শেষে পালেম ধান দুব্বো যে।

৬। কোলকাতাতে দেখে এলাম ছোট ছোট ঝর কদম,
ছোঁড়ারা কুলকুলি দেয়, ছুঁড়িরা গাছের বাঁদর।
ওরে ওরে গোহা বাবলা তোরে করব রেইল গাড়ি
ওই গাড়িতে চেপো যাবো যতীনবাবুর ঘর বাড়ি।

৭। আমার বন্ধু লাঙল চষে ডাইনে বায়ে লাল গরু।
বেছে বেছে পীরিতি কোরো, দাঁতভাঙ্গা মাজা সরু।
ভমর এলো খাটা খাটা সাই পাটা বেছে বেছে,
মনের মতন রসিক পেলে চলে যাব কোলকাতা।

৮। রাস্তার ধারে ঘর বেন্ধেছি, এলে গেলে সমায়ো না,
কিসে তোমার মন ভেঙেছে, খুলে কথা বল না।

৯। আধপাই ধানের দুপাই মুড়ি, খায়ে যা লো শাশুড়ী,
আর যাব না শ্বশুর বাড়ি, ধরে মারে আট কুড়ি।
এক কিল মারো, দু কিল মারো, তিন কিল মারো সইব না,
বারণ করো গুণের দেওর, তোর ভাইয়ের ঘর করব না।

মাঘ মণ্ডল

'মাঘ মণ্ডল' ব্রত মূলতঃ সূর্য উপাসনা ছাড়া আর কিছু নয়। পূর্ববঙ্গেই মাঘ মণ্ডল ব্রতের ঘটাটা খুব বেশি। তা হলেও পশ্চিম বঙ্গেরও কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু পরিমাণে এ ব্রত প্রচলিত রয়েছে। আমরা পূর্ব-বঙ্গের মাঘ মণ্ডলের ছড়াই এখানে আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

মাঘ মাসের পহেলা থেকেই মেয়েরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঘুম থেকে উঠে শুচিশুদ্ধ ভাবে দল বেঁধে এগিয়ে যায় পুকুর ঘাটের দিকে। এছড়ার সবটাই হলো সূর্যকে উদ্দেশ্য করে। প্রথমেই তারা সূর্যকে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘুম ভাঙালে আগেই তিনি বলবেন, 'মুখ ধোয়ার জল কোথায়' ? তাই মেয়েরা (সাধারণতঃ একজন বলে যায়, অপর সকলে তার কথার পুনরাবৃত্তি করে) বলতে থাকে :

চোখে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে
শরুয়া মরুয়া দুটি ফুল লাগে।

ভাই এনে দিল সরষের ডালি
তাই দিয়ে আমরা মুখ প্রক্ষালি।

এর পরই বলতে থাকে:

উঠ্‌রে উঠ্‌রে সূর্য উদয় দিয়ে
বাওন বাড়ির পিছন দিয়ে।
বাওনেরা হল বড় সেয়ান
পৈতা জোগায় বেয়ান বেয়ান॥

তারপর বলে:

মাঘ মণ্ডল মাঘ মণ্ডল
সোনার কোণ্ডল,
সোনার কোণ্ডলে ঢালিয়া মউ
আমি যেন হই বড় মানুষের বউ।

মাঘ মণ্ডল ব্রতের ভিতরও ছোট ছোট মেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবনের একটা স্বপ্ন যেন লুকিয়ে থাকে। পূর্বাকাশ লাল হবার সাথে সাথে মেয়েরা তাড়াতাড়ি করে তাদের পূজা শেষ করতে করতে বলে:

সূর্য ঠাকুরের দুয়ারে কাঁসর ঘণ্টা বাজে
তবু না সূর্য ঠাকুরের নিদ্রা ভাঙে।

পর পর পাঁচ বছর ধরে মেয়েদের এই ভাবে ব্রত করবার পর শেষবারে শেষ দিনে করতে হয় উদ্‌যাপন। এই পাঁচ বছরের মধ্যে পুরোহিতের ডাক পড়বার কোনোই দরকার নেই। মেয়েরাই সব। তবে শেষ বারে পুরোহিত ডাকতেই হয়। সে বছর একটু খরচ খরচাও আছে। এইবার উঠানে বিশাল আকৃতির আল্‌পনা দিতে হয়। তাতে থাকে পশুপাখী ও সূর্যের মণ্ডল। ক্ষীরের নাড়ু দিয়ে ভোগ দিতে হয়। এইবার ছড়া বলার ধুমটাও একটু বেশি পরিমাণে।

ব্রত উদ্‌যাপনের বছরে মেয়েরা অন্যান্য বছরের চাইতেও ভোরে ঘুম থেকে উঠে আগের মতোই ছড়া বলতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্যদেবের নিদ্রাভঙ্গ হয় অর্থাৎ সূর্যোদয় হয় ততক্ষণ তারা একের পর এক ছড়া বলে চলে। অনেক সময় একজনের ছড়ার তহবিল শূন্য হয়ে গেলে অপর ব্রতীও ছড়া বলে চলে:

আম কাঁঠালের পিঁড়িখানি গঙ্গা জলে ভাসে
তার উপর আমার ভাই মুরারী বসে।

আইজ আলা যাওরে কান্‌তে কান্‌তে
কাইল আলা আইসোরে হাস্‌তে হাসতে।
আইজ আলা যাওরে শাকভাত খেয়ে,
কাইল আলা আইসোরে দুধ ভাত খাইতে।

একটু লক্ষ্য করে দেখুন এ যেন ছেলে ভুলানো ছড়ার মতো, সবই অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। মেয়েরা বলে চলে :

গুরু ঠাকুরের আঙ্গুল মোটা
শিন্নি পড়ে ফোঁটা ফোঁটা
কাউয়া লো কা—
শিন্নি পড়ে ফোঁটা ফোঁটা।

মেয়েরা অনেকক্ষণ পুকুর ঘাটে এসেছে, এখনও বাড়ি ফিরছে না কেন, দেখবার জন্য এগিয়ে আসে তাদের দিদিরা। শেষটায় তারাও এসে যোগ দেয় :

জেলেদের পুকুরে ফ্যালালাম জাল
তাতে উঠল আগে রাঘব বোয়াল।
পেয়েছি, পেয়েছি নেবে কে ?
আসতে আছেন সূর্যাই ঠাকুর—নেবে নেবে সে।
আউলো-ছি-লো, বাউনী মেয়ে
আমরা আনে নেবোলো যেমন তেমন করে।
নিয়েছি নিয়েছি কুটবে কে,
আসতে আছেন সূর্যাই ঠাকুর নেবেন আনে সে।
আউলো-ছি-লো বাউনি মেয়ে
আমরা আনে কোটব যেমন তেমন করে।
কুটছে কুটছে রান্না করবে কে ?
আসতে আছেন সূর্যাই ঠাকুর নেবেন-আনে সে।
আউলো ছি-লো বাউনের মেয়ে
আমরা আনে করব রান্না যেমন তেমন করে।
করছি করছি খাবে কে ?
আসতে আছেন সূর্যাই ঠাকুর খাবেন আনে সে।

খাইছেন খাইছেন পান খাবেন কে ?
আসতে আছেন সূর্যাই ঠাকুর খাবেন আনে সে।
খাইছেন খাইছেন দরজা দেবে কে ?
আসতে আছেন সূর্যাই ঠাকুর দেবেন আনে সে ॥

বেলা বাড়ে, মেয়েরা ফিরে যায় ঘরে। এই বার উঠানের মাঝে পিটুলী-গোলা দিয়ে আঁকে সূর্যমণ্ডল। সন্ধ্যায় এই মণ্ডলের পাশে বসে শোনে এই ব্রতের কাহিনী। কাহিনীর নায়ক সূর্য ঠাকুর, পৃথিবীর মানুষ মাধবের কন্যা চন্দ্রকলার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ। তিনি প্রস্তাব পাঠালেন মাধবের কাছে তার কন্যা চন্দ্রকলাকে তিনি বিবাহ করতে চান। মাধব রাজী হলো। সূর্য ঠাকুর চন্দ্রকলাকে বিবাহ করে স্বর্গে নিয়ে চলে গেলেন :

চন্দ্রকলা মাধব কইন্যা মেইল্যা দিছেন ক্যাশ,
তারে দেইখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফিরেন দ্যাশকে দ্যাশ।
চন্দ্রকলা মাধব কইন্যা মেইল্যা দিছেন শাড়ি,
তাই দেইখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ি বাড়ি।
চন্দ্রকলা মাধব কইন্যা গোল খাড়ুয়া পায়,
তারে দেইখ্যা সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায়।
তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই মা বলিব কারে ?
আমার মা তোমার শাশুড়ী মা বলিও তারে।
তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই বাপ বলিব কারে ?
আমার বাপ তোমার শ্বশুর বাপ বলিও তারে।
তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই ভাই বলিব কারে ?
আমার ভাই তোমার দেওর ভাই বলিও তারে।
তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই বইন বলিব কারে ?
আমার বইন তোমার ননদ বইন বলিও তারে।

এই ব্রত কথা শুনবার পর ব্রতীরা একটি একটি করে ফুল ছিটিয়ে দিতে থাকে সেই সব গোলাকার বৃত্তের উপর (সূর্যমণ্ডলের উপর), আর সঙ্গে সঙ্গে বলে চলে :

মাঘ মণ্ডল সোনার কুণ্ডল
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া ঘি,

আইজ হইতে হইব আমরা

বড় মানুষের পুত্রের ঝি।

সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া মধু

আইজ হইতে আমরা বড় মানুষের পুত্রবধূ।

সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া লাড়ু

আইজ হইতে আমাগো—

শাঁখার আগে সোনার খাড়ু

চন্দ্রসূর্যে দিয়া ফুল, ভইর‍্যা উঠুক দোনো কুল ॥

এই ভাবেই মেয়েরা কৈশোর থেকে ঘরের এবং পরের মঙ্গল কামনা করার পদ্ধতি আয়ত্ত করে। বছরের পর বছর শুনেও এ ছড়া পুরানো হয় না।

মাঘ মণ্ডল প্রকৃত পক্ষে সূর্য বন্দনা—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত ব্রত কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়ায় তা হলো সৃষ্টির আদি দেবতা সূর্য। চন্দ্র পৃথিবী গ্রহেরই একটা অংশ মাত্র—একে উপগ্রহও বলা হয়। সূর্যের আলোই চন্দ্রের আলো। তাই কল্পনা করা হয়েছে চন্দ্রসূর্যের মিলন। চন্দ্র পৃথিবী গ্রহেরই অংশ—তাই কল্পনা করা হয়েছে সে যেন পৃথিবীর দুহিতা। মাধব অর্থে শ্রীকৃষ্ণকেও ধরা যেতে পারে অর্থাৎ সৃষ্টির আদি পুরুষ হিসাবে। সে যাই হউক কবে এবং কে যে এই সুবিন্যস্ত কাব্য কাহিনীর সৃষ্টি কর্তা তা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়—গাঁয়ের অশীতিপর বৃদ্ধার কাছে খোঁজ নিয়েও এসম্পর্কে কোনো সন্ধান মিলেনি বরং শুনেছি আরও নতুন নতুন কাহিনী।

গো-ক্ষুর ব্রত

'গো-ক্ষুর' ব্রত—কোনো কোনো জায়গায় বলে গোক্ষুর ব্রত। কৃষিপ্রধান ভারতে গো-জাতির স্থান অতি উচ্চে। তার কাছে মানব সমাজের ঋণ অনেক। তাই তাকেও দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে তাদের বাধেনি। পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয়ায় (অথবা অন্য কোনো দিন) দেখা যায় বাড়ির গিন্নীরা অতি ভোরে উঠে বাড়ির গোহালঘর নিকোয়, তারপর গাভীগুলির (স-বৎসা হলে তো কথাই নেই) শিং-এ তেল মাখায়, কপালে সিন্দুরের টিপ দেয়, দেয় চন্দন কুমকুমের ফোঁটা, তারপর গলায় পরিয়ে দেয় মোটা একছড়া ফুলের মালা। এরপর বাড়ির এবং পড়শী মেয়ে বৌরা সবাই এগিয়ে আসে ব্রত করতে। প্রথমে গোক্ষুর ক্ষুরে দেয় জল—তারপর তার মুখের কাছে ধরে দেয় আলোচাল, ফল প্রভৃতি দিয়ে সাজানো নৈবেদ্যের থালা।

ব্রতীরা ধূপ দীপ জ্বালিয়ে প্রকৃতপক্ষে দেব মূর্তিকে পূজা করার ভঙ্গিতেই গলবস্ত্র হয়ে গাভীর উদ্দেশ্যে বলতে থাকে :

গো গোবিন্দ সুরধুনী,
চার ক্ষুরে দিয়া পানী।
মাথায় নৈবেদ্য মুখে ঘাস,
বর্তীরা গ্যাল স্বর্গ বাস।

এইদিন গাভীকে আর বাঁধা হয় না, সে নিজের ইচ্ছামতো চরে বেড়ায়। সন্ধ্যার দিকে গোহালে ফিরলে আবার তার সম্মুখে ধূপ দীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, আর দেওয়া হয় এক আঁটি করে নতুন ঘাস।

বনদুর্গার পূজা

মাঘ মাস পড়বার সাথে সাথেই পল্লীবাংলার বিশেষ করে যশোহর, নদীয়া ও চবিবশ-পরগণার কোনো কোনো অঞ্চলে বালক বালিকারা শুরু করে দেয় 'বনদুর্গা'র পূজা। তবে এর জন্য তৈরি হতে থাকে প্রায় দশ বার দিন আগে থাকতেই। এই সময়ের মধ্যে তারা প্রচুর পরিমাণে পূজার ফুল সংগ্রহ করে। ফুলই বনদুর্গা পূজার প্রধান উপকরণ। যে কোনো ফুল দিয়েই এ পূজা হতে পারে। কয়েক বাড়ি বা ঘরের ছেলে মেয়ে মিলে এক একটি ছোট দল তৈরি করে নেয় নিজেদের ভিতর। তারপর তারা নিজেদের পূজার জন্য একটি বেদী তৈরি করে। মাঘ মাসের পয়লা থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন অতি ভোরে এবং সন্ধ্যায় দলের ছেলে মেয়েরা এসে ঘিরে বসে সেই বেদী মণ্ডপ। তারপর তারা শুরু করে পূজা। এই পূজায় পুরোহিতের কোনো দরকার নেই, তারা নিজেরাই পুরোহিত। এ পূজার মন্ত্রও কিছু নেই। কেবল কতকগুলি ছড়া—এর প্রায় সবগুলিই তাদের নিজেদেরই তৈরি। এর ভিতর একাধারে তাদের সাংসারিক খবরাখবরের কাহিনী, রাধা-কৃষ্ণ, হর-গৌরীর কাহিনী সব কিছুই পাওয়া যায়।

ভোরবেলা সূর্য উঠবার এখনও অনেক দেরি (কারণ, সূর্য উঠলে আর পূজা হবে না) ছেলে মেয়েরা সব বেদীর চারদিক ঘিরে বসে শুরু করে বন্দনা গাইতে :

উঠরে উঠরে সূজ্জ্য উদয় দিয়ে,
বায়ণ বাড়ির পাছ দিয়ে।

বায়ণের মেয়েলো বড়ই সিয়ানা,
পৈতা জোগায় লো অতি বিয়ানা।

এরপর একে একে বলে যায় অনেক ছড়া। পূর্বেই বলেছি এসব ছড়ার ভিতর নির্দিষ্ট কোন নীতি বা রীতি নেই। এর ভিতর একাধারে বিয়ের ছড়া থেকে বিরহের সব কিছুই থাকা সম্ভব। যতক্ষণ না সূর্য উদিত হয় ততক্ষণ এইভাবে ছড়ার পর ছড়া বলতে থাকে, তারপর যে যার ঘরে চলে যায়। আবার সবাই এসে জোটে সন্ধ্যা বেলা। এইবার ধূপ, দীপ সব জ্বালিয়ে দেয় সেই বেদীর উপর। হাতের ফুল ছিটাতে ছিটাতে তারা আবার শুরু করে ছড়া বলতে। একে বন্দনা গীতিও বলতে পারেন :

সাজে এসরে সাঁজনা গীতি।
ক্যানরে সবে এত রাতি ॥
বাড়ির কাছে ভাঙ্গা বন।
তাই ভাঙ্তি এতক্ষণ ॥
এক কড়ার ঘুটি মুচি দুই কড়ায় ঘি।
সাজ পরদীপ লাগাল বায়ণগের ঝি ॥
বায়ন ঝি, বায়ন ঝি বলে আলাম তোরে।
তোর গৌরাঙ্গের বিয়ে শনি মঙ্গল বারে ॥

এ ছাড়া আরতির ছড়াও আছে আলাদা। প্রদীপ হাতে নিয়ে ছেলে মেয়েরা বেদীর সম্মুখে আরতি করতে করতে সমস্বরে ছড়া গায় :

গঙ্গা পার করহে, না করিলে পার।
হাতের বাজু বাঁধা থুয়ে মারিব সাঁতার ॥
সকল সখি পার করিতে লাগবে আনা আনা।
রাধিকাকে পার করিতে লাগবে কানের সোনা ॥
আমরা তো গোপের মেয়ে সোনা কোথায় পাব।
হাটের বেসাতি ভাসে গেলি উপোস করে রব ॥
নলোক দেবে, বাজু দেবে, দেবে কানের ফুল।
তবেই না নিয়ে যাব ওপারেরি কুল ॥

পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন এ ছড়ার সঙ্গে বনদুর্গার কোথাও কোনো সম্পর্কমাত্রও নেই। এ পূজাও যেমনি বালকদের তেমনি এ ছড়াগুলিও প্রায়ই

তাদেরই রচনা। তারা বুড়ো-বুড়িদের মুখে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী যেরূপ শোনে সেগুলিই তারা ছড়ার আকারে এখানে পরিবেশন করে।

বনদুর্গার পূজার তাৎপর্য সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, এ পূজা করলে নাকি ফোঁড়া, পাঁচড়া প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এরসঙ্গে পূর্ববঙ্গের 'পাঁচড়া পূজা' এবং পশ্চিমবঙ্গের 'ঘেটু' পূজার বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। এই প্রসঙ্গে বনদুর্গার প্রণাম মন্ত্রটি লক্ষ্য করা যাক। এর ভিতর দেখা যায় এঁকে বলা হয়েছে, 'হে দেবতা (ঠাকুর) তুমি ফোঁড়া, পাঁচড়া প্রভৃতি নিয়ে চলে যাও, আবার যখন আসবে তখন টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় নিয়ে এসো' :

এবার যাওরে ঠাকুর ফোট পাঁচড়া নিয়ে।
আবার এসো ঠাকুর শংখ শাড়ি নিয়ে॥

এই ভাবে গোটা মাঘ মাসটা পূজা করবার পর সংক্রান্তির দিন বিকালে ছেলেরা মহা উল্লাসের সাথে সেই বেদীতে সঞ্চিত এক মাসের ফুল, দূর্বা গুছিয়ে নিয়ে নিকটস্থ কোন জলাশয়ে বিসর্জন দিয়ে আসে।

ভাই-ফোঁটা

'ভাই-ফোঁটা' সম্পর্কে বাঙালী সমাজের কাছে খুব বেশি কিছু বলবার দরকার হবে বলে তো আমার মনে হয় না। 'ভাইফোঁটা' হলো ভাইয়ের জন্য বোনের মঙ্গল কামনা। সারা বছরই বোন সে ছোটই হউক, কি বড়ই হউক, দাদা বা ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু না কিছু পেয়ে আসছে, শুধু এই দিনটিতেই বোনের কাছে ভাইয়ের প্রাপ্য। এর সঙ্গে নেপালীদের "তিওহার" উৎসবের একটা বেশ মিল আছে। ভাই-বোনের যে মধুর সম্পর্ক—তাকে ভিত্তি করে ভারতের অন্যান্য জায়গায়ও অন্য রকম উৎসব চালু আছে। আপাততঃ আমাদের বাংলার 'ভাই-ফোঁটা' উৎসব সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক।

কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিকেই বলা হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাই-দ্বিতীয়া। কেউ কেউ বলেন 'যম-দ্বিতীয়া'। লোকশ্রুতি অনুসারে যমরাজের ভগ্নী যমুনা এই বিশেষ দিনে যমরাজকে ভাই-ফোঁটা দিয়েছিল। সেই থেকেই এই প্রথাটির প্রচলন। এর ছড়ার ভিতরও এর যেন একটু আভাস মেলে। এই দিন ভোর থেকেই প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে বোনেদের ভিতর সাজ সাজ রব পড়ে

যায়। কেউ কেউ এই দিনে ভাইকে কি কি খাওয়াবে সেই নিয়ে আগে থেকেই জল্পনা-কল্পনা শুরু করে, তার ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতও হয়। কেউ কেউ যতক্ষণ না ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়া হয় ততক্ষণ জলস্পর্শও করে না। কোথাও সকালে কোথাও বা প্রদোষে (সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে) ভাই-ফোঁটা দেবার প্রথা আছে। অনেকের ভিতর আবার ভাই-ফোঁটায় বারদোষ দেখেও সে বছর ভাই ফোঁটা বন্ধ থাকে। তাদের শনি-মঙ্গলবার ভাই-ফোঁটা পড়লে তারা ফোঁটা দেয় না, শুধু ভাইয়ের হাতে খাবারের থালা তুলে দেয়। অনেকেই খাবারের সংগে ভাইকে নতুন জামা কাপড় দিয়ে থাকে। যার যেমন সাধ্য, সে সেই ভাবেই ভাইকে ফোঁটা দেয়। তাদের বিশ্বাস এই দিন এই ছড়া বলে ভাইকে চন্দন তিলক পরিয়ে দিলে ভাইয়ের পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

সকালে বা সন্ধ্যায় যখনই হোক না কেন, ভাইকে বসানো হয় পিঁড়ি অথবা কোনো আসনের উপর। তার সামনে জ্বালিয়ে দেয় প্রদীপ, আর সম্মুখে থাকে একখানা বাটা, তাতে থাকে ধান, দূর্বা প্রভৃতি। এরই পাশে থাকে এক থালা (যার যেমন সাধ্য) মিষ্টি সামগ্রী।

ভাই প্রথমে বোনের দেওয়া নতুন কাপড় পরে এসে বসে পিঁড়ি বা আসনের উপর। বোন পানের বোঁটায় করে কাজল পরিয়ে দেয় ভাইয়ের চোখে, তারপর বাঁ হাতের কনিষ্ঠা অংগুলির সাহায্যে চন্দন নিয়ে ভাইয়ের কপালে পরিয়ে দিতে দিতে মন্ত্র (?) বা ছড়া বলতে থাকে :

প্রতিপদে দিয়ে ফোঁটা, দ্বিতীয়াতে নিতে,
আজ হতে ভাই আমার, যমের ঘরে
নিমের অধিক তিতে।
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, আরও বাজে কাড়া,
বোনের ফোঁটা না নিয়ে ভাই,
না যেও যম পাড়া।
না যেও যমের ঘর,
আজ হতে ভাই আমার রাজ রাজেশ্বর।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দেই আমার ভাইর কপালে ফোঁটা।
ভাইর কপালে দিলুম ফোঁটা,
যম দুয়ারে পড়লো কাঁটা।

তিনবার চন্দন সহ এই শ্লোক (ছড়া) বলে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয় বোন, আর প্রতিবার শ্লোক (ছড়া) বলা শেষ হলে ঐ কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা মাটিতে একটি করে কাঁটা × চিহ্ন এঁকে দেয়। তারপর বোন ছোট হলে ভাইকে কিংবা ভাই ছোট হলে বোনকে করে প্রণাম এবং মিষ্টির থালা তুলে দেয় ভাইয়ের হাতে, আর ভাই বড় হলে বোনকে, কিংবা বোন বড় হলে ভাইকে ধান দূর্বা দিয়ে করে আশীর্বাদ।

তারার ব্রত

আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি বাংলার ব্রত-কথার সবগুলিতেই শস্য, পৃথিবী, সূর্য, বনস্পতি, সৌরজগত এদের বন্দনা গাওয়া হয়েছে আর এই সঙ্গে সঙ্গে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে নিজের এবং পরিবারবর্গের জন্য সুখ ও ঐশ্বর্য। এই ব্রত-কথার কোনোটাই বৈদিক সূক্ত অনুযায়ী বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সহকারে প্রতিপালিত হয় না একথা সত্য, কিন্তু এগুলি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ। বেদ ও উপনিষদে যাঁদের বন্দনা গাওয়া হয়েছে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ও সংস্কৃত মন্ত্রের সাহায্যে, তাঁদেরই ঘরোয়া রূপটি অতি সযত্নে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালীর মেয়েলী-ব্রতের মাধ্যমে। এই ব্রত-কথা আর বৈদিক সূক্তগুলি সম্পর্কে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের একটি বাণী উল্লেখ করা চলে :—"দুজনেই পৃথিবীর, কিন্তু বেদ সূক্তগুলি ছাড়া ও স্বাধীন, বনের সবুজের উপরে নীলাকাশের গান, উদার পৃথিবীর গান, আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন সবুজের আড়ালে পক্ষীমাতার মধুর কাকলি—কিন্তু দুইগানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা।"

মাঘ মণ্ডল ব্রত যেমনি সূর্য বন্দনা ও উপাসনা ছাড়া আর কিছু নয়, তারার ব্রতও তেমনি সৌর জগতের বন্দনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন এ ব্রত আরম্ভ হয়, এবং এর সমাপ্তি হলো ফাল্গুন সংক্রান্তির দিনে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেয়েরা উঠানের মাঝে একটি করে ছোট চৌকোনা ঘর কাটে। তার ভিতর ঠিক চৌকোনা আকারে ষোলটি ঘর থাকে। প্রত্যেকটি ঘরে আঁকে একটি করে তারকা। মেয়েরা সেই আঁকা ঘরের এক পাশে বসে হাতে ফুল দূর্বা নিয়ে শুরু করে ব্রত-কথা বলতে।

এই আলপনা আঁকা চৌকোনা ঘর প্রতিদিনই আঁকতে হয় ছোট আকারে, সংক্রান্তির দিন আঁকে বড় আকারে। এই সংক্রান্তির দিনেই শুধু পুরোহিত ডাকে। এই পূজার সময় একটু খরচও আছে, বিশেষ করে চতুর্থ বর্ষে অর্থাৎ

প্রতিষ্ঠার বৎসরে তো বেশ ধুমধামই হয়। ব্রতীকে নতুন কাপড় পরে, সারাদিন উপবাসী থেকে এই পূজা করতে হয়।

পূজার উপকরণও মন্দ নয়। পূজায় ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ছাড়াও সংক্রান্তির দিন লাগে খই, দই, চিড়ে, মুড়ি ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও নিয়ম আছে। প্রথম বছর চারটে ছোট ঘট ও তার মুখে ঢাকা দেবার জন্য চারটে ছোট সরা। সেই ঘটগুলি পূর্ণ করা হয় খই ও নারকেল নাড়ুতে। দ্বিতীয় বৎসর লাগে আটটা ঘট ও আটটা সরা, তৃতীয় বৎসরে বারোটা ঘট ও বারোটা সরা। চতুর্থ বৎসর অর্থাৎ শেষ বৎসরে লাগে ষোলটি ঘট ও ষোলটি সরা। প্রতিষ্ঠার বৎসর, পূজার দিন সারা দিনের মধ্যে সেই উপবাসী অবস্থায়ই একশ ষোল বার করে এই ব্রত-কথা (ছড়া) বলে সেই তারকা অঙ্কিত ঘরে ফুল দিতে হয়। ব্রতী অসমর্থ হলে অন্য কেউও উপবাসী থেকে তার হয়ে এই ব্রত-কথা বলে তারায় ফুল দিতে পারে :

ষোল ষোল তারা মুকুটের ঝরা
তোমরা হলে সাক্ষী
ঘৃত দিয়ে করি আমরা পঞ্চগ্রাসী।
শিব জিজ্ঞাসা করে—
গৌরী এত রাত্রে মেয়েরা কিসের ব্রত করে ?
গৌরী বলে—মেয়েরা সব তারার ব্রত করে।
এ ব্রত করলে কী হয়—শিব জিজ্ঞাসা করে।
গৌরী বলে—এ ব্রত করলে,
শিবসম স্বামী পায়, লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,
জয়া বিজয়া দাসী পায়, বাটা ভরা টাকা পায়,
গোলা ভরা ধান পায়, গোহাল ভরা গরু পায়,
কৌটা ভরা সিঁদুর পায়।
ষোল বর্তীর হাতে ষোল সরা দিয়ে
বর্তীরা গেল ইন্দ্রের দুয়ারে ল্যাট্রো হয়ে।
চন্দ্র সূর্যে দিয়া ফুল,
ভইরা উঠুক দুই কুল ॥

ব্রত-কথা শেষ হলে ব্রতী সেই ছোট ছোট খই ভর্তি ঘট ও সরাগুলি বিলিয়ে দেয় অন্যান্য ব্রতী অথবা সেখানে উপস্থিত যে সব ছোট ছোট বালক বালিকা থাকে তাদের হাতে।

ঘেঁটু

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলীতে খোস ও চুলকানির হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে এই লৌকিক দেবতাটির পুজার ব্যবস্থা আছে। সাধারণত হিন্দু সমাজের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেই এঁর খাতির সমধিক। ফাল্গুন মাসের কদিন আগে থাকতে কৃষাণ বালকেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গেয়ে গেয়ে ঘেঁটুর মাগন সংগ্রহ করে ; শেষটায় ফাল্গুন সংক্রান্তির দিন করে এঁর পুজা। এর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের, 'পাঁচড়া পুজা' এবং যশোর জেলার বনদুর্গা পুজার কিছুটা মিল পাওয়া যায় বটে, তবে ঘেঁটুতে যেমন মাগন আনবার ব্যবস্থা আছে, পূর্বোল্লিখিত পুজা দুটিতে এটা সেরূপ প্রাধান্য পায়নি। অবশ্য উদ্দেশ্য একই, শুধু স্থান ভেদে নাম ভেদ মাত্র। ঘেঁটুর একটি গানের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ইনি খোস-পাঁচড়ার দেবতা, এঁর সারা গায়ে খোস আর চুলকানী ও দগ্‌দগে ঘা ইত্যাদি :

ঘেঁটুর রূপ দেখবি যদি আয় সজনী যমুনারি ঘাটে,
ও ঘেঁটুর গায়েতে ঘা, চোখে ছানী পেটটা বুঝি এখুনি ফাটে।
এমন জামাই আনল রাজা লাজে মোরা মরে যাই,
চল সখী চল দেখে আসি ঘেঁও ঘেঁটুর মূর্তিখানি।
এ বছরে যাও গো ঘেঁটু খোস পাঁচড়া নিয়ে
ফি বছরে এসো ঘেঁটু সাজ পোষাক নিয়ে।

অবশ্য এ ঘেঁটু দেবতারও বন্দনা-গীত আছে। তার ভিতরে ঘেঁটুর বন্দনা করতে বসেও লোক-কবির দল তাঁর আসল মূর্তিটি আমাদের চোখের সুমুখে উপস্থিত করতে ভুল করেনি :

আজি আনন্দে ঘেঁটু লয়ে সঙ্গে
নাচিয়া নাচিয়া চল যাই,
আনন্দে সব দাওগো পুজা
এমন দিনত হবে নাই।
খোস আর চুলকানী ঘেঁটু দিছিস সারা গায়,
সতী নারীর বীর পতির গায়।

সতী নারীর বীর পতি
বামেতে দাঁড়ায়ে সতী,
পতি বিনা সতীর গতি নাই ॥

আবাহন থাকলে তার বিসর্জনও থাকাটাই স্বাভাবিক। ঘেঁটুরও ভাদু ঠাকুরানীর মতো বিদায় সংগীত আছে। ঘেঁটু বিসর্জনের দিনে তাই মেয়েদের গাইতে শোনা যায় তাঁর বিদায় সংগীত। তবে এর ভিতর বিদায়ের ছবির পরিবর্তে ঘেঁটুর বিবাহের আয়োজনটাই নজরে আসে :

আজ হবে গো ঘেঁটুর বিয়ে
চল সব শাঁখ বাজিয়ে।
চল সবে পরে শাড়ি,
জল ভরিতে যাই তাড়াতাড়ি,
নিয়ে আয় মংগলা হাঁড়ি,
যায় সব কুলো মাথায় লয়ে।
নিয়ে তখন বরণ ডালা,
আনছে সব কুলবালা,
আনন্দে হয়ে উতলা,
জল সহিতে চলিল ধেয়ে ॥
আজ হবে গো ঘেঁটুর বিয়ে,
যাব আমরা উলু দিয়ে।
শাঁখ বাজিয়ে বরণ ডালা,
ঘরে যাব আমরা আনন্দেতে ॥

কিংবা : চল গো সখি ত্বরা করি ঘেঁটু পূজিতে।
আবার বৎসর অন্তে একদিন গো ফাল্গুন সংক্রান্তিতে।
কোথায় গেল ও চঞ্চলা
তুমি শীঘ্র আন ভাজনা খোলা,
হইল অধিক বেলা, দেখনা গগনেতে।
কোথায় গেল চমৎকারী,
তুমি শীঘ্র আন ঘেচ কড়ি,
নৈবেদ্য সাজাগো বড়ি, চালে আর ডালেতে ॥

কোথায় গেল বিনোদিনী,
তুমি দূর্বা আন হলুদ কালি,
ফুল তুলে আন ফুলমণি, তুমি ছুটি গিয়ে বাগানেতে ॥
ত্বরা করে লয়ে চল রাস্তার মাঝেতে।
এইরূপেতে নারীগণ
তারা করে পূজা আয়োজন,
আনন্দে কর গমন, ঘেঁটু পূজা করিতে ॥

অথবা : ঘেঁটু গাইতে এলাম বাবুদের বাড়িতে,
পয়সা কড়ি পাই কিছু গাইছি ঘেঁটুর সাক্ষাতে ॥
এদের সতীন কোথায় গেল,
এসে এবেলা কিছু দিতে বল,
নইলে ঘেঁটু কানা হবে মনের দুঃখেতে ॥

পাঁচড়া পূজা

পশ্চিমবঙ্গে যেমনি ঘেঁটু, যশোহর-খুলনা জেলায় যেমনি বনদুর্গার পূজা, তেমনি পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বিশেষ করে ফরিদপুর জেলায় দেখা যায় 'পাঁচড়া' পূজার ধুম। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দেশে যখন খুব ফোঁড়া-পাঁচড়ার ধুম লেগে যায় তখন দেখা যায় গাঁয়ের মেয়ে বৌদের এ ব্রত করতে। এর আয়োজন বিশেষ কিছু নেই—পুরুত তো দূরের কথা! গাঁয়ের ভিতর সব চাইতে যে পুরনো হিজল গাছটা থাকে সেখানেই এসে জড়ো হয় গাঁয়ের মেয়ে বৌরা। এখানে আসবার আগে তারা একটা ভাঙা কুলায় করে নিয়ে এসেছে পাঁচড়া দেবীর পূজার উপকরণ, যথা—বইন্যা গাছের ফুল, কুমড়ার ফুল, ধুতুরার ফুল, ইঁদুরের মাটি, বাসী উনুনের ছাই প্রভৃতি। এই সব উপকরণ সাজিয়ে নিয়ে হিজল গাছের তলায় বসে পাঁচড়া দেবতার উদ্দেশ্যে বলতে থাকে :

হ্যাচরা মাগীর প্যাঁচরা চুল,
তাইতে লাগে বইন্যার ফুল।
বইন্যার ফুল না লো ধুতুরার ফুল,
ধুতুরার ফুল না লো কুমড়ার ফুল,
কুমড়ার ফুল না লো লাউয়ের ফুল,

লাউয়ের ফুল না লো বাসী আঁখার ছাই,
বাসী আঁখার ছাই না লো ইন্দুরের মাটি,
ইন্দুরের মাটি না লো ভাঙা চাড়া
হিজল গাছে দিয়া সাড়া,
পাঁচড়া মাগীরে কর গেরাম ছাড়া।

এইভাবে কদিন ধরে পাঁচড়া পূজা করবার পর শেষ দিন তারা প্রত্যেকে নিম হলুদ দিয়ে স্নান করত: যারা ব্রত শুনতে আসে না—বিশেষ করে পুরুষরা তাদেরও কপালে এই পূজার (?) নিম হলুদ একটু ছুঁইয়ে দেয় যাতে তারাও পাঁচড়া চুলকানীর হাত থেকে রক্ষা পায়।

মঙ্গলচণ্ডী

বাংলার লৌকিক দেব-দেবী ও বার-ব্রত যে কতগুলো এবং কত রকমের আছে তা এ অল্প পরিসরে বলে শেষ করা সম্ভব নয়। আমরা বাংলায় প্রচলিত মাত্র গুটি কয়েক লৌকিক দেব-দেবী তথা ব্রত-কথার উল্লেখ করে 'ব্রত-কথা' পর্যায় শেষ করছি। যে কটি ব্রতের কথা উদাহরণ সহযোগে উল্লেখ করেছি তা ছাড়াও আরও যে কত বার-ব্রত রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই সব অবশিষ্ট ব্রত-কথার মধ্যে "মঙ্গলচণ্ডী" ব্রত সম্পর্কে কিছু না বললে বোধ হয় এ সম্পর্কে বক্তব্য নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এই মঙ্গলচণ্ডী ঠাকুরানী দুর্গারই সাধারণ ভাবে ডাকার ব্যাপার। যেমন কুমারীব্রতের সঙ্গে শিবপূজা কিংবা পুরাণোক্ত রুদ্রের সঙ্গে গাজনের শিবের যেমন কোনো সম্পর্ক নেই, তেমনি এই চণ্ডীপূজার সাথে শ্রীশ্রীচণ্ডী-মহিমা বা সংস্কৃতের চণ্ডী শ্লোকেরও কোনো সম্পর্ক নেই। এ চণ্ডী আমাদের ঘরের চণ্ডী যেমন টুসু, ভাদু, ইতু এঁরা। অবশ্য চণ্ডী মানেই একটু গুরুতর ব্যাপার। কাজেই 'চণ্ডী পূজা' যতই ব্রতানুষ্ঠান হউক না কেন, এর নিয়ম কানুন অন্যান্য সকল ব্রত অপেক্ষাই একটু কঠিনতর—এ সম্পর্কে ধীরে ধীরে আলোচনা করছি। তার আগে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে এই চণ্ডী আছেন অনেক রকম, যথা—মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ মঙ্গলচণ্ডী, সংকটা মঙ্গলচণ্ডী, জয় মঙ্গলচণ্ডী, নাটাই চণ্ডী, উদ্ধার চণ্ডী, কলুই মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। স্থান ভেদে নাম ভেদ, প্রত্যেকটিরই মোদ্দাকথা একই। এ পূজা করলে কী হয়? অপরাপর ব্রতেও

যেমন শুনেছেন, নির্ধনের ধন হয়। রোগী নিরোগ হয়। অপুত্রের পুত্র হয়। আগুনের ভয় থাকে না, সাপের ভয় থাকে না ইত্যাদি।

পূর্বেই একাধিকবার উল্লেখ করেছি, এই সব ব্রত অনুষ্ঠানের ছড়াগুলি সবই বাংলার পুরনারীদেরই রচনা। কাজেই এর ভিতর নারীজাতির সহজাত নারীত্ব ফুটে উঠেছে ছত্রে ছত্রে।

মঙ্গলচণ্ডী পূজার এক এক অঞ্চলে এক এক রকম নিয়ম। কোথাও বা বছরের নির্দিষ্ট একটি বা দুটি দিন করে। কিন্তু ব্রতের নিয়ম কানুন ও ব্রত-কথার সারমর্ম পূর্ববর্ণিত মতো একই।

মঙ্গলচণ্ডী ব্রত যদিও সম্পূর্ণভাবেই মেয়েদের, কিন্তু শোনা যায়, বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলীর কোনো কোনো অঞ্চলে নাকি পুরুষেরাও এ ব্রত করে থাকে।

সাধারণত কয়েক বাড়ির এয়োতী একত্রে বসে চণ্ডীর কাছে অর্ঘ্যদান করে এই ব্রত কথা শুনে থাকে। হাতে বানান আটটি চাল আর আট গাছি দূর্বা। এই এক একটি চালের সংগে এক এক গাছি দূর্বা কার্পাস সুতা দিয়ে বেঁধে অর্ঘ্য তৈরি হয়। আর তা ছাড়া ঘট হলো চণ্ডীর প্রতীক। এই ঘট কারও পিতলের, কারও বা মাটির বা তামারও হতে পারে। ব্রতীর ব্রত-কথা শুনবার সময় এই ঘটগুলি একত্রে পর পর সাজিয়ে নিয়ে বসে, কোথাও বা ঘট একটিই মাত্র থাকে, শুধু অর্ঘ্যগুলি যে যার নিজের মতো তৈরি করে নিয়ে আসে। যে দিন ব্রত করা হয় সে দিন খুব সাত্ত্বিক মতো থাকতে হয়। এক বেলা মাত্র আহার করবার বিধান আছে। ব্রত-কথা বলে যান একজন ব্রতী আর অপরাপর ব্রতীরা হাতে একটি করে গোটা সুপারী নিয়ে শুনতে থাকেন ব্রত কথা :

আট কাঠি আট মুঠি,
সোনার চণ্ডী রুপোর বাটি,
কেন মা চণ্ডী এতক্ষণ!
হাসতে খেলতে,
মন পুরে হাট বসাতে,
রোগা নিরোগা করতে,
অপুত্রের পুত্র দিতে,
নির্ধনীকে ধন দিতে;
দক্ষিণে পড়েছেন মা,
তাই জন্য এত রা।

পুত্র দণ্ডী ভো চণ্ডী
উদ্ধার কর মা মঙ্গলচণ্ডী !

অবশ্য এই একটি ব্রত-কথা যে সব জায়গারই বলে, তা নয়, স্থান ভেদে পাঠভেদ আছে, প্রয়োজন বোধে সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও হয়। কোথাও কোথাও ব্রত-কথার মধ্যে ধনপতির কাহিনীও শোনা যায়। পণ্ডিতগণের মতে চণ্ডীব্রতও হয়তো কৃষি-ব্রতেরই অন্যতম প্রকরণ মাত্র। এ সব অবশ্য গবেষণার বিষয়। আমরা বাংলায় প্রচলিত চণ্ডীব্রতের একটি নমুনা তুলে ধরলুম মাত্র। এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লৌকিক ধর্ম-উৎসব ও অনুষ্ঠান পর্বেরও শেষ হলো।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড

বহিঃ প্রাকৃতিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাওয়াইয়া

রংপুর, দিনাজপুর ও কুচবিহার অঞ্চলে 'দো-তরা'র সঙ্গে একশ্রেণীর গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় 'ভাওয়াইয়া'। আর যারা এ গান গায় তাদের বলে 'বাউদিয়া'। অনেকে বলেন 'বাউড়া' বা বিবাগী কথা থেকেই 'বাউদিয়া' শব্দের উৎপত্তি, এবং 'ভাব' থেকেই 'ভাওয়াইয়া' কথাটা এসেছে। এ গানের ভিতর একাধারে অধ্যাত্মবাদ, মনস্তত্ত্ব সব কিছুই মিলে। তবে এর অল্পবিস্তর সব গানেই পরকীয়া প্রেমের আধিক্য বড় বেশি রকমের। অনেকে হয়তো বাউদিয়া শ্রেণীর গানের এই পরকীয়া প্রেমের রূপটি রাধা-কৃষ্ণের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন, কিন্তু আদতে তা মোটেই নয়। বাউদিয়ার গান সমাজ-সংস্কার মুক্ত। আদিবাসীদের গানের মতোই মুক্ত বিহঙ্গ—প্রেম ও বিরহ সঙ্গীতই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এই ভাওয়াইয়া গানের অন্তর্গত হলো 'গাড়োয়ালী', 'মৈষাল' ও 'চট্‌কা' গান। আমরা পৃথকভাবে সেগুলি দেখাবার চেষ্টা করব।

ভাওয়াইয়া সম্পর্কে কিছু বলার আগে রংপুর ও দিনাজপুরের বাউদিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া বোধ হয় প্রয়োজন। এদের দেখতে পাওয়া যায় সাধারণত দিনাজপুর, রংপুর ও কুচবিহার অঞ্চলে। এরা সাধারণত ঘর বাঁধে না। কোনো সামাজিক সংস্কারেরও বড় একটা ধার ধারে না, এদের সাধন পদ্ধতি, জীবনযাত্রা প্রণালী সবই যেন একটু আলাদা ধরনের। এরা একাধারে বাউলের মতো আত্মভোলা কিন্তু তাই বলে সঙ্গীতগুলি ঠিক সেই অনুপাতে অধ্যাত্মভাবসমৃদ্ধ নয়। অপর দিকে পূর্ববঙ্গের উদাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও রয়েছে এদের প্রচুর মিল। তাই এদের গানে বৈষ্ণবের মতো বিচ্ছেদ, অন্তরা, পূর্বরাগ ও পরকীয়া প্রেমেরও সন্ধান মেলে। কিন্তু তাই বলে কোনো নির্দিষ্ট মূর্তি বা

গণ্ডীর মধ্যেও এদের আটকানো যায় না। এরা সারা জীবন এদের প্রেমের দেবতাকে খুঁজে বেড়ায়। হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও এদের এই খোঁজার শেষ হয় না। তাই এরা ঘুরে বেড়ায় পথে-পথে, মাঠে-ঘাটে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তারা তাই ঘর বাঁধারও কোনো আবশ্যকতা বোধ করে না, যদি বা কখনও কোথাও আস্তানা গাড়ে, তবে তাও হয় ক্ষণস্থায়ী। দুদিন ঘর করতে না করতেই যেন হাঁপিয়ে ওঠে। প্রতি মুহূর্তেই যেন কান খাড়া করে থাকে বাঁশির সুরের দিকে, দূর হতে আগত বাঁশির সুরে ভুলে যায় তার ঘরের কথা। হাতের কাজ যাই থাকুক না, ফেলে দিয়ে অমনি বেরিয়ে পড়ে। এদের ভিতর তাই বিরহটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়।

সবচেয়ে মজার কথা হলো এ সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচলিত ধর্ম নিয়ে কোনো ভেদাভেদ নাই। তাই এদের গানে বাউল, বৈষ্ণব এবং সাঁই, দরবেশ ও সুফীদের ভাব ও সুর এক হয়ে মিশে গেছে। বাউদিয়া হলো একটা সম্প্রদায় মাত্র, জাত নয়। এই খেয়ালী বাউদিয়া আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে রচনা করে যে গীত ও লহরী, তার নাম দেওয়া হয়েছে ভাওয়াইয়া।

মনে করুন, ধূলি ধূসরিত পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে মাটদিয়া তার দো-তরা (দো-তারা) হাতে নিয়ে। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যায় সে আপনার খেয়ালেই কখন সে দাঁড়িয়ে পড়ে এক জায়গায়। বিলীয়মান সূর্যরশ্মির দিকে তাকিয়ে হয়তো নিজের অজ্ঞাতেই ঝংকার তোলে তার দো-তরার তারে। বিবাগী মনের মণি কোঠা থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকে অলোর ঝলকানি। ফেলে-আসা দিনগুলির কথা স্মরণ করে নিয়েই হয়তো সে আবেগের সঙ্গে গেয়ে উঠে :

(ওরে) সখী আর কি দেখা পাব জীবনে।
আমার দিনে দিনে তন (তনু) হইল ক্ষীণ
সখী ভাবদে ভাবদে তাহারি।
আর কি দেখা পাব জীবনে।
দুই নয়নের জলে আমার বক্ষি ভাসে নদী,
সখী এত দিনে ক্ষয় হইতাম পাষাণ হইতাম যদি।
আমার হাড় মাংস হইল ফাঁপা (রে)
(সখী) অন্তর-কাঁটা পোকারে।
আর কি দেখা পাব জীবনে॥

হইতাম যদি জলের কুমীর,
খুঁজ্যা দ্যাখতাম জলে,
(সখী) হইতাম যদি বোনের বাঘ রে
খুঁজ্যা দ্যাখতাম জোঙ্গলে।
দারুণ বিধি যদি দিত পাখা রে,
সখী দ্যাখতাম জগৎ ভরে
আর কি দেখা পাব জীবনে।।

বাউদিয়া বলে চলে :

দিনের শোভা সুরুয রে রাইতের শোভা চান,
চাষার শোভা হাল, কৃষ্যি জমিনের শোভা ধান।
ঘাসের শোভা সবুজ রং, মাটির শোভা ঘাস,
কাশিয়ার শোভা ধল্লা ফুলে আইলে ভাদ্দর মাস।
সড়কের শোভা বটরে বিরিক্ষি, বিরিক্ষির শোভা ছায়া,
বনের শোভা রসের ফুল ফল, মনের শোভা মায়া।
দীঘির শোভা রাজরে হংস, আরও পদ্ম ফুল,
নদীর শোভা বাইছালী খেলা, ভাঙ্গিয়া নামায় কুল।
দীঘল ক্যাশ শোভা করে যৈবতীর জাতী,
গাবুর পুরুষের শোভা খোলা বুকের ছাতী।
খঞ্জনা পক্ষীর শোভা হইছেরে খঞ্জনারে লইয়্যা,
মোর পুরুষের শোভা হইছে মোক সুন্দরী পায়্যা।

বাউদিয়া আবার এগিয়ে চলে। এগিয়ে চলাই তো তার ধর্ম। আপনার খেয়ালে কখন সে এসে পড়েছে নদীর কিনারায় হয়তো খেয়ালই করেনি। এদিকে কালবৈশাখী দেখা দিয়েছে। আকাশ মুখ ঢেকেছে তার ভ্রমর কালো মেঘের ওড়নায়। হয়তো তার মাঝে ক্ষণিকের তরে দেখা দেয় তার চটুল চাহনি—ঝিলিক্ মেরে উঠে ক্ষণপ্রভার হাসি। বাউদিয়ার বুকের মাঝে হু হু করে উঠে তার প্রাণ বঁধুর কথা মনে করে। সে ভাবে, হয়তো তার প্রিয়তমাও তার জন্য ঠিক এই রকমই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাই তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে :

প্রেম জানেনা অসিক কালা চান
ও সে ঘুইরে পরে (মরে) মোন

কতদিনে বন্ধুর সনে হবি দরশন (বন্ধুরে)।
আমি একলা ঘরে শুইয়ে থাকি
পালঙ্কের উপারে (বন্ধুরে)
মোন আমার ক্যারাম্, কি কুরুম্
কি ক্যারাম্ ক্যারাম্ করে (বন্ধুরে)।
বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি
যাইতি আসতি এত দেরি,
বন্ধু যাব না রব, শুধাই কর মানা (বন্ধুরে)।
হ্যাটিয়া যাইতি নদীর জল খাক্লুম্ কি খুকলুম্
কি খলাল্ খলাল্ করে (বন্ধুরে)।
বন্ধু তোমার আশায় বইসে থাকি
বটবিরিক্ষের তলে,
মোন আমার উড়াম বাইরাম করে রে
উড়াম বাইরাম করে।
ফাল্গুন মাস্যা ম্যাথের দিনে
টম্বর, কি টুম্বুর,
কি ঝপ্ ঝপাইয়্যা পড়ে রে ঝপ্ ঝপাইয়্যা পড়ে।
মোন আমার উড়াম বাইরাম করে ॥

পাঠকগণ এই ফাঁকে লক্ষ্য করুন এদের গানের শব্দ চয়ন এবং সুরঝঙ্কারের উপর। এক প্রেমিক অভিসারে চলেছে, পথিমধ্যে আছে "চিরল" নদী। নদীর গর্জন ভীষণ। এর উপর আছে বরুণ দেবের ভ্রূকুটি। নদীর গর্জনের সঙ্গে ঝড়ের মিতালিতে তখনকার আবহাওয়া কি অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে এই গানে। নদীর জল কল্লোল, কিংবা অশান্ত মনের দুরন্ত ভাবরাশি যেন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে এদের গানের মাধ্যমেই। স্বভাব কবি বাউদিয়ারা সাধারণত অক্ষরজ্ঞান বর্জিত। কিন্তু দেখুন কি অপূর্ব তাদের রসবোধ, সেই সঙ্গে কবিত্বশক্তির কি স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এরা সজ্ঞানে কেউ কোনো শব্দ চয়ন করেনি।

নদীর ঘাটে এসে পৌঁছেছে অভিসারিকা। ওপারে তার বঁধুর বাড়ি, এপারে সে অবলা নারী। কি করেই বা সে এই দারুণ নদী পার হবে ভেবে ঠিক করতে পারে না। স্পষ্ট কণ্ঠেই সে ঘোষণা করছে, যে তাকে এই দুস্তর নদী পার করে দেবে, সেই মাঝিকে শুধু যে তার গলার রত্নহারই উপহার দেবে তাই নয়—

তনু, মন সবই দিতে প্রস্তুত। ভরা যৌবনের বাঁধন ছাড়া জলধারা জীবননদীর কূলেকূলে ভরাট করে মহাপ্লাবনের সূচনা করেছে। বাউদিয়ার হাতের দো-তরা আর কণ্ঠের অপূর্ব সুরে মায়াজাল রচনা করে চলে :

ওকি কাজল ভোমরা গরুর আখুয়াল রে
মুই নারী কোলেরে কাচা ছওয়াল।
যে মোরে করিত রে পার,
দান করিতাম গলার হার,
পার হয়্যা যৈবন করতাম দান।
ওপারে বন্ধুর বাড়ি
এ পারে মুই নারী
মধ্যে আছে চিরল নদীর ধারা।
ওকি কাজল ভোমরা গরুর আখুয়াল রে
মুই নারীর কোলেরে কাচা ছওয়াল ॥
বালিতে আধিনু, বালিতে বাধিনু,
জলেতে ভাসায়্যা দিলাম হাড়ি
ওকি কাজল ভোমরা গরুর আখুয়াল রে
মুই নারীর কোলেরে কাচা ছওয়াল।
আমার বিয়ার সোয়ামী মইলে
খাব মাছ আর ভাত রে।
আমার পান বঁধুয়া মইলে পরেরে
হব আড়ি (বিধবা)।
না জানি সাঁতারো রে
না জানি পাহাড়,
না জানি ঘুর্‌য়্যা বাইর
আমি অকুল দরিয়ায় ক্যামনে হব পার
মুই নারীর কোলেরে কাচা ছওয়াল।

তবেই বুঝুন, এত যে প্রেমপ্রীতি সবই বুঝি হলো সৈকতে সৌধ নির্মাণ। তা হোক, আমার প্রেমের দেবতাকে যদি পাওয়া যায় তা হলেই তো আমার সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া, সকল চাওয়ার শেষ চাওয়া সাঙ্গ হলো, আর তো কিছুই চাই না। আজ যদি আমার বিয়ে করা স্বামী মারা যায় সেজন্য আমি কিছুমাত্র

দুঃখিত হব না। বৈধব্যবেশও ধারণ করব না। বিধবার লক্ষণস্বরূপ মাছ ভাত খাওয়াও ছাড়ব না। কিন্তু যদি আমার প্রাণপ্রিয়ের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তা হলেই তো আমি সত্যিকারের বিধবা হব।

পরকীয়া প্রেমের এতবড় নিদর্শন একমাত্র পদাবলী সাহিত্য ছাড়া জগতের যে-কোনো সাহিত্যেই দুর্লভ। তত্ত্বজ্ঞানী বাউদিয়া তাই আবার তার দো-তরার তারে ঝঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠে :

প্রেমের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি
মুই সেন জান।
বন্ধুর ঘরে প্রেম করা ভালো
কাইন্দে কাইন্দে চোখের জল মোর
হলো সারা রে।
মুই সেন জান॥
চন্দ্র সূর্য যাচ্ছে জ্বলিয়ারে
আরে ওই রকম নারীর প্রাণ সদাই ঝুরেরে
মুই সেন জান।

কিংবা (১) ওকি ওরে কদমের ছেঁয়া
তোর তলে ভুকাও বাড়া
বুক বায়া পড়ে নারীর ঘাম।
মোর দরদী হবে
বুকের ঘাম মুছাইয়া দিবে
হায়রে হায়রে
সোনা মুখে তুলে দিবে পান।
ওরে কদমের ছেঁয়া
সবল দেখে চড়িলাম গাছে
ডাল ভেঙ্গে পড়িলাম নিচে
কোন সাথী মোর
চড়াইল পেম গাছে॥

(২) (অ) অল্প বয়সে যার পতি নাইরে
সেইও অভাগিনী ক্যামনে পরাণ বান্ধে।

(ও) রাইখা গ্যাল পতি মোরে
নলি বাঁশের ডেরা
বিনা ঝড়োৎ জারে ভাইঙ্গা পরে
সেই বাঁশের ডেরা (লো)।

সেই অভাগিনী কেমতে পরাণ বান্ধে
(ও) প্রাণ কান্দে মোর পরাণ পতির আগে।

(ও) ভাদর যাইয়া আশ্বিন মাসে
ঢাক বাজে ডেন্ ডেনা,
সেইও দুই মাস গ্যাল কইন্যার কান্দিয়া কান্দিয়া।
(হারে) এমন কালে যার পতি নাইরে
সেই অভাগিনী ক্যামনে পরাণ বান্ধে।

(ও) গতর না উঠে কইন্যার চরণ না চলে
অঙ্গের বসন বিজিল তার নয়নের জলে।

ভাদ্দর মাসে যেমন দেওয়া করে বরিষণ
সেই অবাগীর পইরাণ পাটের শাড়ি
নয়নে জল ঝরে।

আউলাইন্যা মাথার ক্যাশ উইড়া উইড়া পড়ে,
এমন সময় যদি কাউয়া কা কা করবার লাগে
কেমনে সেই কইন্যার জীবনও কাটে।
আহা রে দারুণ বিধি কেন হইল বাম,
বিনা দোষে পিতা কেন বনে দিল রাম।
(আরে ও) বিয়ার রাইতে যে হইল কাঁচা রাড়ি (গো)
সেই ও অভাগিনী ক্যামতে পরাণ বান্ধে।

(৩) ও কুরুয়া হায় হায়
দেখাও কুরুয়া তোমার বাবার দেশের ময়াল,
আর সোনার লাঙল উপার ফাল
মরি কুরুয়া জুড়িছে মোষের হাল।
ওহে কুরুয়া হায় হায়
দেখাও কুরুয়া তোমার বাবার দেশের ময়াল।

আরি পুবিয়া পছিয়া বায়
মরি কুরুয়া ধূলায় অন্ধকার ॥
মাও নাই মোর বাপো নাইরে
ভাইও নাই মোর,
নাইওর নিয়ে যাবে রে
পুবালো পছিয়া বায় রে
মোর কুরুয়া হালখানি জুড়িছে রে ॥

(৪) ওরে তুঁই লো আমার রসিক নাগর শ্যাম।
বাঁশির আরে আরে
বন্ধুকে দেখবারে—
কোন্ বা রসিয়ায় করে গান ॥
তুঁই লো আমার রসিক নাগর শ্যাম।
(আজ) যৌবনের ভাটার দিনে
তোমারে পড়িছে মনে,
এই তো আমার ভগবানের দান।
তুঁই লো আমার রসিক নাগর শ্যাম ॥

(৫) যে ঘাটে ভরিব জল
সেই ঘাটে আছে কালারে।
যে ঘাটে ভরিব লোটা
সে ঘাটে চন্দনের ফোঁটা,
যে ঘাটে ভরিব ঘটি
সেই ঘাটে তোলো মাটি,
যে ঘাটে বাঁধিলাম বাড়ি
কলা গাড়লাম সারি সারি
ওগো সাধের ললিতে!
কোন্ ঘাটে ভরিব জল
আমি গো?
ও ঘাটে বাঁধিলাম বাড়ি
গুয়া গাড়লাম সারি সারি
ও গো সাধের ললিতে!

কোন্ ঘাটে ভরিব জল
আমি গো ?
আসিবে মোর প্রাণের-সুয়া
পাড়িয়া দিব গাছের গুয়া,
আসিলে মোর প্রাণের নাথ
কাটিয়া দিব কলার পাত।
কলার পাতারে হায় !
আমরা পছিমে বন্দনা করি গো
আমরা আল্লাবী ধাম
তাহারি কারণে তাহারি চরণে
আমরা জানাইলাম সেলাম।
আমরা উত্তরে বন্দনা করি গো
ঐ না দেবী মায়ের চরণ,
তাহারি কারণে আমরা জানাইলাম প্রণাম।
আমরা পুরব বন্দনা করি গো
ঐ না ধর্ম নিরঞ্জন,
তাহারি চরণে আমরা
জানাইলাম সেলাম।
আমরা দক্ষিণে বন্দনা করি গো
ঐ না ক্ষীর নদী-সাগর,
সেখানে হারাইছে সেরা আলি
খেলাড়ি পাথর ॥

৬) নদীর পাড়ের কুরুয়া রে মোর
জামের গাছের কোরা,
আজি কেনে কান্দেন অমন করি
চোখের জল ফেলেয়া রে।
কোরা রে মুই ও কাদোং
চিটুল বিধুয়া হয়য়া
ঢাল কাউয়াটার কান্দন শুনি
মনের আগুন জ্বলে,

ওরে পতি যে মোর মরি গেইচে
আর নাইও ঘরে রে।
ওরে কোয়ারে মুই ও কাদোং
চিটুল বিধুয়া হয়য়া ॥
জল কান্দে জল (কোয়ারে)
ফুটিক (চাতক) লাগিয়া
মুই অভাগী কাদোং বসি
পতিকে হারেয়া রে।
ভাঙ্গিচে-মোর মনের আশা
ভাঙ্গিচে মোর বাসা
আজি ভরা যৈবন কেম্‌নে রাখিম্‌
পতিকে হারেয়া রে।
পতি ধন কোন্‌টে গেইলেন
অভাগীক ফেলেয়া ॥

(৭) ও পাড়ে শিমিলার গাছ
তারও নাকি পঞ্চ ডালও সই।
তারই উপরা বইসে কাকাতুয়া।
পাড়ার পড়সী সেও হইল পরাণের বৈরী,
কার হাতে কাটাঙ্‌ বঁধুর গুয়া ॥
ও পাড়ে শিমিলার গাছ
তারও নাকি পঞ্চ ডালও সই।
তারই ওপরা বইসে কাকাতুয়া ॥
ফাগুন মাসের কাঁচারে জোনাক্‌ দখিনা বাতাস বয়,
মনের কথা যায় না চাপা
বনে ডাকে গুয়া রে ॥
ও পাড়ে শিমিলার গাছ…।

(৮) ও কি নাগর কানাই তুই মোরে—
উজান ছাড়ি ভাটির দ্যাশোৎ
করলেন যায়য়া বাড়ি,

ও রে যৈবন কালে দোনো জনায়
হলং ছাড়া ছাড়ি রে ॥
তুইও ছোট মুইও ছোট
এক বয়সের জোড়া,
ও রে মইনা কইচং রসের গীতি
তুই বজাইস দো-তরা রে ॥
তোমার বাড়ি আমার বাড়ি
(নাগর) অনেক দূরের ঘাটা,
ওরে কেমন করি হইম্ দেখা
ঝোরে চোখের পাতা রে ॥
ভোমরা খালি উড়িয়া পড়ে
ফুলের মধুর বাদে,
ও রে তুই ভোমরার বাদে আজি
মোর বা পরাণ কান্দে রে।
নাগর কানাই তুই মোরে ॥

(৯)

কন্যারে ও রে কন্যা !
তোর কন্যার পীরিতির আশে
বাপ ভাই কন্যা ছাড়িনু দ্যাশেরে।
কন্যারে পীরিতি করিয়া
ছাড়িয়া রে গেইলেন মোকে রে ॥
কন্যারে কন্যা ॥
তোর কন্যার এমনি মায়া
ছাড়িতে যে না যায় ছাড়া রে।
কন্যার মায়া লাগেরে
ছাড়িয়া গেইলেন মোকে রে ॥
কন্যারে কন্যা !
তোর কন্যার এমনি হানা
ভাসি যাং মুই সাগরের ফেনা রে।
কন্যারে পীরিতি করিয়া
ছাড়িয়া গেইলেন মোকে রে ॥

কন্যারে কন্যা !
আজি ঘুঘু না পঙ্খী হইয়া গাছে না বসিয়া রে।
কন্যারে বুঝাইমু কন্যা তোক ঐ ডালে বসিয়া রে ॥

(১০) ওকি তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে।
লজ্জা নাহরে তোরে কালা।
লজ্জা নাইরে তোরে ॥
ওরে কাপড় চুরি করিয়া
গাছোৎ তুলিয়া থুলু কেনেরে।
তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥
হাত ধরোং তোরে কালা,
পাং বা ধরোং তোরে,
ওরে গাছের কাপড় পাড়িয়া দে তুই
যাং এলা ঘরে রে।
তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥
একে ত শীতের দিন তাতে আছোং জলে।
ওরে এত কষ্ট দেখিয়া কি তোর দয়া না হয় মনে রে।
তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥
দেরি কেনে করিস কালা মানুষি বুঝি আইসে।
ওরে এত রঙ্গ দেখিয়া কি তোর আশা না মিটে রে।
তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥
হাতের বাঁশী ফেলিয়া কালা কাপড় পাড়ি দে।
ওরে ডাঙ্গায় উঠি কাপড় পিন্দি যাং এলা ঘরে রে।
তুই মোর নিদারুণ কালিয়ারে ॥

(১১) অকি প্রাণ ধন কেমন কর‍্যা বাঁচবেরে আমার জীবন।
মাসের পর মাসরে গেল আইলা বছর ঘুর‍্যা,
কৈ রইলা প্রাণের পতি আইলানা আর ফির‍্যা,
কেমন কর‍্যা বাঁচবেরে আমার জীবন।
গাছের শোভন ফলরে যেমন চিরাল লাগলে জল,
আমার শোভা তুমিরে বন্ধু নিদানের সম্বল।
রে বন্ধু কেমন কর‍্যা বাঁচবেরে আমার জীবন ॥

ময়ূরের শোভা পচ্ছুরে যেমুন গানের শোভা শোর,
আমার শোভা তুমিরে বন্ধু সিন্থার সিন্দুর।
রে বন্ধু কেমুন কর‍্যা বাঁচবেরে আমার জীবন॥
নায়ের শোভা বৈঠারে বন্ধু গাঙের শোভা কূল,
নারীর শোভা পতিরে বন্ধু অকূলের কূল॥
অকি প্রাণধন ক্যামন কর‍্যা বাঁচবেরে আমার জীবন॥

(১২) তোর্ষা নদীর উতলি পাতলি কার বা চলে নাও।
নারীর মন মোর উতলি পাতলি কার বা চলে নাও।
সোনাবন্ধু বাদেরে মোর কেমন করে গাওরে॥
বন্ধুয়া মোর বনিজ গেইচে উজানীয়ার দ্যাশে।
সেই না দ্যাশে পুরুষ পাঙ্খা পরে নারীর ক্যাশেরে।
এক্না তারা দুক্না তারা তারা কিল্ কিল্ করে।
এমন মজার রাতিটা মোর মন না রয় ঘরে রে।
তোর্ষা নদীর উতলি পাতলি।

(১৩) আমার গলার হার খুলে নে ওগো ললিতে।
আমি কৃষ্ণ নামে মালা গেঁথে দিব বন্ধুর গলেতে।
আমার হার খুলে নে, কি ফল হবে সখি
প্রাণ বন্ধু নাই বগলে ওগো ললিতে।

(১৪) অকি বাইদন কী দেইখ্যা বা দিলারে বিয়া মোরে
আমার শ্বশুর বাড়ির চালে নাইরে ছোন,
পিন্দনে নাই কাপড় বাইদন গরে নাই খাওনের,
কি দেইখ্যা বা দিলারে বিয়া মোরে।
গোনের স্বোয়ামী মোরে মাইরা করে খুন,
আমারে যে ধরব আইস্যা নাইত এমন জন,
কি দেইখ্যা বা দিলারে বিয়া মোরে রে বাইদন।
ছোড বেলা মা মরিল বাপের উদ্দিশ নাই,
পাইলা পাইলা, যমরাজার ঠায় সইপ্যা দিলা,
কি দেইখ্যা বা দিলারে বিয়ারে বাইদন।

(১৫) কালা আর না বাজান বাঁশরী

সাধের ঘরে আর রইতে না পারি।

কালারে,

ওরে তোর কালার ঐ বাঁশীর সুরে

নারীর মন মোর না রয় ঘরে

কেন্‌রে কালা বাজান বাঁশী সাঁঝে সকালে।

কালারে,

ওরে কুল গেল কলংক রইল

ওকি তুই কালা মোর গলার কাটি।

সকাল বৈকাল কালা আর না বাজান বাঁশী ॥

আমি না যাব যমুনার জলে

না শুনিব তোমার বাঁশীর গান।

ফুল ফুটিলে যেমন ভোমরা আইসে

গুন গুন সুরে করে মধু পান ॥

কালা আর না বাজান বাঁশরী ॥

(১৬) আরে ও নৌকা ঠেকিল বালুচরে রে।

ডুবিলরে মোর ছাউদের ডিংগারে ॥

বাপে আমাকে জন্ম নাই দেয়, জন্ম দিছে পরে।

যে দিন আমার জন্ম হইল রে, মাও না নিল:ঘরে রে,

ডুবিল রে মোর ছাউদের ডিংগারে।

(১৭) সকালে কর মোরে পার।

বেলা ডুবিলে মন হবে অন্ধকার।

অবোধ মন রে।

কিনারায় চাপিয়া নাও

নায়ের বাদাম তুলিয়া দাও।

অবোধ মন রে।

একে তো আন্ধার রাতি,

আরো নাই মোর সংগে সাথী,

পার করে দাও দয়াল গুরু

সময় বয়ে যায়।

অবোধ মন রে।
কেশাঘাট কদম্বতলা,
ঐখানে সাধুর মেলা,
ঐটে বসে অবোধ মন
কর হরি সাধনা ॥

(১৮) পুরুষ : আইল বাঁধ কন্যা জলর ছাঁক হ
সুন্দর গায়ে কন্যা কাদো মাখি
আজি চোখ তুলি কন্যা দ্যাখি
আমার আগে হে।
হল্‌দি গায়ে কন্যা কাদর হাতেরে
আইল বাঁধ কন্যা কিসের আশেরে,
আজি কথা কও হে কন্যা
বৈদেশিয়া আগে হে ॥

কন্যা : চোখের জলে বন্ধু জলে পইল্‌
বাঁধা জলো বন্ধু বেশি হইল্‌
আজি বাঁধ আইল্‌ বন্ধু
আটক করিবার আশেরে।
টোপে টোপে বন্ধু জলর পড়িল্‌
অনেক কথা বন্ধু হৃদে ধরিল্‌
আজি তোমাক দেখি বন্ধু
মনের পংখী হাসেরে ॥

পুরুষ : বলো বলো কন্যা কিবা দুখ
তোলো একবার কন্যা চাঁদ মুখ
আজি নিতে পারি কন্যা কিছু
তোমার দুখ হে ॥

কন্যা : বন্ধুর বাদে বন্ধু কাঁদিব আমি
ও বন্ধু মোর হৃদয়ের স্বামী
আজি ভরা যৈবন বন্ধু
দ্যাখে অন্য লোকেরে ॥

পুরুষ : কোনটে থাকি কন্যা তোমার স্বামী
কোনটে দ্যাখা তাহার পাব আমি
আজি কওরে কন্যা
কোন সে কথা আমারে ॥

কন্যা : উজান গ্যাছে বন্ধু বাণিজ্যের আশেরে
এলাও তার বন্ধু গামছা হাতে
আজি কতর কথা বন্ধু
কইও তাহার আগে রে ॥

(১৯)

গুরুগো তোমরা রইলেন ঘরে গো বসে
আমারে পাঠাইলেন বৈদেশে।
তোমার সঙ্গে যাবো গুরু গো
সদাই আমার প্রাণ গো কান্দে
গুরু আমায় ন্যাওনা সাথে।
এ দেহ খাটিছেন, গুরু গো
কামিনী কাঞ্চন লোভে
গুরু আমায় ন্যাওনা সঙ্গে ॥

(২০)

তোমরা জানিয়াও জানেন না
শুনিয়াও শোনেন না,
ওকে জ্বলেয়া গেইলেন মনের আগুন
নিভিয়া গেইলেন না।
ও তোর নয়নের কাজল
তিলেক দণ্ড না দেখিলে,
মনে হয় যে পাগল।
ও তোর কাঞ্চি ছাঁটা চুল
হয়না কেনে চেংরা বন্ধু
খেইল কদম্বের ফুল।
ও তুই নায়ের কাণ্ডারী।
নাওবা পাওরে নদীর ঘাটে
নাও-এর কাণ্ডারী।

ও মুই ভাবিয়া করিম কি।
আশপড়শি পাড়ার লোকে
ভাঙ্গিল পীরিতি ॥

(২১) (ওকি) কানাই রে,
কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে।
ও হো হো হো কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে।
অখুটা শিমিলার নাও বৈঠায় না ধরে ভাও
ওরে কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে ॥
যে নাইয়া করিবে পার
তাকে দিব আমি গলার হার রে,
(ওহো) পার হইলে মুই নারী তোমারে ॥
ও কি কানাইরে কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে ॥
এলুয়া কাশিয়ার ফুল
নদী হইল কানাই হুলুস্থুল রে।
ওরে কানাই রে,
পার হইলে করিবারে যৈবন দান রে ॥
ওকি কানাই রে,
কেমন করিয়া হব দরিয়া পার রে ॥

(২২) ভাল্ করিয়া বাজান্ রে দো-তরা
সুন্দর কম্‌লা নাচে।
সুন্দর কম্‌লার পায়ের খাড়ু
হাটিয়া গেইতে বাজে ॥
সুন্দর কম্‌লার কমরের শাড়ি
রোদে ঝল্‌মল্ করে।
সুন্দর কম্‌লার নাকের নোলক
হাটিয়া যাইতে ঢোলেরে।
সুন্দর কম্‌লার কানের মাকড়ি
ঝল্‌মল ঝল্‌মল করে রে ॥

সুন্দর কম্‌লার গলার মালা
হাটিয়া যাইতে পড়ে।
এ বাড়ি হাতে ও বাড়ি যাইতে
খাটায় ছিপ ছিপ পানি।
বরের ভিজিল জামারে জোরা
কইন্যার ভিজিল শাড়ি রে।
ভাল্‌ করিয়া বাজাও রে দো-তরা
সুন্দর কম্‌লা নাচে ॥

(২৩) উড়াইল্‌ যুবতীর পায়রা রে।
পায়রা মন্দির করিয়া খালি রে।
বাপের বাড়ির জোড়ে পায়রা, শ্বশুর বাড়ির খোপ।
উড়িয়া গেইলেন ওরে পায়রা, দিয়া দারুণ শোক ॥
কার খালু পাকা ধান পায়রা, কার করলু হানি।
উড়িয়া গেইলেন ওরে পায়রা, কোলা করি খালি ॥
থির থির থির থির থির র, কিসের বাজন বাজে
তোরে পায়রা মারবার বাদে, কারী ভাইয়া সাজে রে ॥
উড়াইল্‌ যুবতীর পায়রা, পায়রা মন্দির করি খালি রে ॥
এক বাটুলে মারে কারী ভাই, পায়রার বরাবরে,
উড়িয়া যায়য়া পড়ে পায়রা, যুবতীর কোলে রে ॥

(২৪) শান বাঁধা ঘাটে বন্ধু হে, জল কেনে ঘোলা,
জানিলে আসিনু না হয়, ঘাটত একেলা (হে)।
কথা ছিলো থাইকবেন বন্ধু, ঘাটের উপারা বসি,
জলের ছেঁয়ায় দিখিম নারী, মুই তোমার মুখ শশী (হে) ॥
শান বাঁধা ঘাটে বন্ধু হে।
মোরে দেখি লাজে সুরষ, মুখ ঢাকিবার চায়,
মজাক্‌ করি ঘাটের জলত, আধার ছিটি দেয় (হে) ॥
শান বাঁধা ঘাটে বন্ধু হে ॥
গুয়া মুড়ি আনিছ বন্ধু, আঁচলৎ গুয়া পান।
বেজার কেনে সোনার বন্ধু, আসিয়া খায়া যান (হে) ॥
শান বাঁধা ঘাটে বন্ধু হে ॥

বিয়াও করি কঙ্ হে বন্ধু মোক্ কাঁদাইলেন আজি।
সারাজীবন কাঁদাইম তোমাক, পোড়া পরাণ ত্যাজি।
শান বাঁধা ঘাটে বন্ধু হে ॥

(২৫) ওরে বাছা মোর তোতা ময়না (রে)।
গেলুরে গেলুরে বাছা গেলুরে ছাড়িয়া।
যাবার কালে গেলু বাছারে বুকে শেল দিয়া ॥
বাছা, হাতে পুষনু দুধ ভাত দিয়া
যাবার কালে গেলু বাছারে বুকে শেল দিয়া ॥
ওরে বাছা মোর তোতা ময়না (রে)।
কার বা কাড়িয়ে খালু ঝোলগুার গুয়া,
সে কারণে উড়িয়া গেল মোর পিঞ্জরের শুয়া ॥
কারো বা কাটিয়া খালু ক্ষেতের পাকা ধান।
সে কারণে হারাইনু এ সুন্দর ধন ॥

(২৬) এ ভব-সংসারে রে
মন না মজিল রে।
চলো চলো দেশে যাই।
(ভাই রে) নিধুয়া পাতারে গাছ
তারও হইল শত ডাল
(ওরে) সেই ডালে বগিলারে করিছে বাসা ॥
আহারের কারণেরে
জমিনে না মিলয়ে
সেও বন্দী মায়ার জালে ॥
এ ভব-সংসারে রে
মন না মজিল রে।
চলো চলো দেশে যাই ॥
অথুটা শিমিলার নাও
টলমল করে গাও
বত্রিশ-বাঁধা, খসিয়া পড়েরে জোড়া।
(মন) মন-কাষ্ঠের নৌকাখানি

(আর) পবন-কাষ্ঠের বৈঠাখানি
সেও ঠেকিল বালুচরে ॥
এ ভব-সংসারে রে
মন না মজিল রে ॥

(২৭) ও মোর কালারে কালা
ও পাড়ে বান্ধিলাম বাড়ি,
কলা বাঁধলাম সারি সারি
কলার বাগুচায় ঘিরিয়া লইলাম
বাহাড়ি রে।
ও মোর কালারে।
কলার খোপে খোপে
গুয়া গাড়িয়া দিলাম
পাহান রে।
বাড়ির দক্ষিণ পাড়ে
বেল চম্পা দিলাম গাড়ি,
সেই না বকুলের মালা,
দিলাম বন্ধুয়ারে
গলায় রে।
বাড়ির উত্তর পাশে
তোরষা না নদী আছে
সেই না নদী বন্ধুয়া খেওয়া দ্যাওরে ॥

(২৮) কোন্ ঘাটা দিয়ারে নদী
কোন্ বা দিকে যাও*।
সেই দিকে যাইতে কি নদী
বন্ধুর দেখা পাও* ॥
তোমার জলে নৌকা ছাড়ি
বন্ধু হইলেন দেশান্তরী
কোন্ বা বন্দরের ঘাটে
ভিড়িল সাধুর নাও*।

মুই নারী কান্দিয়ারে
পন্থের দিকে চাওঁ ॥
বাপো মায়ের দ্যাশ ছাড়িয়া
যাইতে পতির দ্যাশ।
বাউরা তুমি হইলারে নদী
আউলাইন তোমার ক্যাশ।
চিকণ তোমার জলের ভাঙ-এ

(নদী) আষাঢ় মাসে কাছাড় ভাঙে
জ্যৈষ্ঠি মাসে নাও ডুবাইতে
রুখি আইসে বাও,
মুই নারী কান্দিয়া যে
পন্থের দিকে চাওঁ ॥

(ও নদীরে) দেখা হইলেন বন্ধুর
কইও কথা দুই চারি।

(ও নদীরে) ছাড়লেন যারে
চায়া রয় সেই নারী ॥
নিন্ ভুলি যায়
চুলক্ না তায় বান্ধে।
ওরে জলোক্ যায়া
ঘাটোৎ বসি কান্দে,
ওরে কাঙেখর কলস
চোখের জলে ভরি
ফিরি যায় বাড়ি ॥

(২৯) তবে তারে কে করে যতন।
বশীভূত হতো যদি আপনার মন।
(ওই) তবে তারে কে করে যতন।
প্রথম মিলন কালে
হাতে শশী আনি দিলে।
প্রেম-জালে ফেলি দিয়া

পালায় যে জন ॥
তবে তারে কে করে যতন ॥

(৩০) আরে ওরে প্রাণের কন্যা
না করি আর বৈদেশা পিরীতি।
তোমার সাথে পিরীতি করি
রাত পোহাইলে যাব নিজ দেশে ॥
দিনহাটার পূবে বাড়ি
ভাঙ্নী তালুকে বসতি করি রে।
আমরা হলং খাঁটি কুচবিহারী ॥

আমার দেশের ভাওয়াইয়া গান
আরও দো-তরার থিরল ডাংরে—
সেই না গানে বুঝি মন হরিয়া নিচে রে ॥
তুমরা হলেন ভাটী দেশী
আমরা হলং কুচবিহারী
কেনে কন্যা পিরীতি করির চান।

পিরীতি করিয়া যে জন ছাড়ে
দো-তরার ডাঙে হিয়া ঝোরে
বুক ভাঙে তার ভাওয়াইয়া গানের সুরে ॥

(৩১) ও কি পতি ধন প্রাণ বাঁচে না
যৈবন জ্বালায় মরি।
গাছের বসন্ত কালে ঝইরা পড়ে পাতা,
নারীর বসন্ত কালে মিঠি মিঠি ভাষা (রে)।
নদীর বসন্ত কালে ধুইয়্যা নামায় মাটি,
মাছের বসন্ত কালে করে উজান ভাটী (রে)।
খোপেতে যার কৈতর নাইরে কি করে সে খোপে,
যেও নারীর সোয়ামী নাইরে কী করে সে রূপে (রে) ॥
আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কী করে তার তারায়,
যেও নারীর সোয়ামী নাইরে জীবন্তে সে মরা (রে)।

পুরুষের বসন্ত কালে বাজায় মোহন বাঁশী,
নারীর বসন্ত কালে কথায় কথায় হাসি (রে)॥

৩২ কিসের মোর রাঁধন, কিসের মোর বাড়ন
কিসের মোর হলুদ বাটা,
মোর প্রাণনাথ অন্যের বাড়ি যায়
মোর আঙিনা দিয়া ঘাটা।
ও প্রাণ সজনি!
কার আগে কব দুস্কের কথা,
আর যদি দ্যাখোং, আর যদি শোনোং
অন্য জন্যের সাথে কথা,
এ হেন যৈবন সাগরে ভাসাব
পাষাণে ভাঙিব মাথা।
ও প্রাণ সজনি!
কার আগে কব দুস্কের কথা॥
মোর বন্ধু গান গায় মাথা তুলিয়া না চায়
মুই নারী যাও জলের ঘাটে,
থমকি থমকি হাটোং চোখেদ ইসারা করোং
তবু বন্ধু না দেখে মোরে।
ও মরি হায় রে!
বন্ধু পাগল হইতে পারে
নিদের আলিসে হাত পড়ে বালিসে
মনে করো বন্ধু বুঝি আসে,
চ্যাতন হইয়া দ্যাখো বন্ধু নাই বগলেতে
প্রাণ মোর সাঙ স্যাঙা হইচে॥
ও প্রাণ সজনি!
কার আগে কবো দুস্কের কথা॥

(৩৩) আহা রে—
ওরে বাবার দেশের ওরে হংসা,
তুই কাঁদিস কেনে বয়ড়ার গাছে পড়িয়া।

বাবার দেশের হংসা তুই
চিটুল বিধুয়া মুইরে—,
ওরে বাবার দেশের হংসা তুরা
মুইও হনু স্বামীহারা রে।
ওরে বাবার দেশের হংসা তুমরা
মুইও হনু স্বামীহারা রে ॥

হংসা হাত ধরন্ ত'রে,
হংসা পাও ধরন্ ত'রে,
উড়া উড়া উড়া হংসা উড়া হও রে,
আকাশে পাংখা মেল্যো
বাবার দেশে বলিয়া যাওরে
ওরে বাবার দেশের হংসা ॥

(৩৪) মুখ কোনা তোর ডিবো ডিবো
ও ভাবী গুয়া কোন্টে খালু,
গালাৎ হইল মালার, রূপা কোন্টে পাবু ?
ভাবী ও ! জোড় ভুরু কপালে লেখাও।
ও ভাবী ! দীঘল ক্যাশের মায়া,
রসিক তোমার নয়ন তারা,
তোমার হিয়াৎ ছায়া ॥
ভাবী ও ! কাঞ্চা সোনার বরণ তোমার ও
ও ভাবী !
মনত শতেক আশা।
কোন্ রসিয়ার বাদে তোমার
কদম তলে বাসা ভাবী ও ॥
ভাদর মাসি জল পায় না ও
ও ভাবী ! দেহা রংগে কুটি
তোমার বাজনা পাইলে কানে, কানাই আসে ছুটি ॥
ও ভাবী ! ও দেহা তোর রোদেনা আরো
ও ভাবী দেহাৎ কোরবি ভাটী,

রসিক কানাই ছাড়িয়া গেলে
পড়বে গলায় কাঠি ॥
ও ভাবি !

(৩৫) ও রে পঁাছিয়া বাতাস, তুই বড় নিদয়া রে ।
সোনার চাঁদোক্ দিনু বড় দুখ ।
নিধুয়া পাতারত ক্ষেত, ঘাসত ভরিচে রে—
না নিড়াইলে মনত নাইরে সুখ ॥
ঐ না ক্ষেত নিড়ায় চাঁদ মোর, ভরা দুপুরে রে
রইছে সোনার পুড়ি গেইছে মুখ ।
তিয়াষে ফাটে বা চাঁদের ছাতি, ফাটিছে রে ।
ঘরের ভিতরা কেমনে বাঁধি, রঙ বুক ॥

(৩৬) ও বন্ধু মোর রসিয়া
দেখা দেও মোক্ একবার আসিয়া ।
বঁনি ধানে ভাজিনু খই
সোনার বন্ধু আসিলেন কই,
ও কি আসিবার চায়া আসলেন না,
সোনামুখে রাও কারলেন না ।
ও বন্ধু মোর .... আসিয়া ।
অদুরের বন্ধু মোর আসলেন কই
বাটা ভরা চিনি খাঁয়লেন কই,
ও কি আসিবার চাযা আসলেন না,
সোনা মুখে রাও কারলেন না ।

(৩৭) মাঝি ভাইরে,
ভাল্ করিয়া মাঝি, ধর নায়ের হাল ।
ভব নদীর কুলে কুলে রে
বিষম বাঘের ভয় ।
গুরু শিষ্যে নাইরে দেখা
ডাকা ডাকি সার ॥

ভব নদীর পারে পারে রে
ধূলায় অন্ধকার।
গুরু-শিষ্যে নাইরে দেখা
ডাকাডাকি সার॥

কখনও ভাবে তার স্বামী গেছে বিদেশে বাণিজ্য করতে। তাই তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে 'বন্ধু বিদেশ যাচ্ছ, সৎভাবে থেকো, দাঁড়ী-মাঝিদের সঙ্গে যেন তোমার ঝগড়া বিবাদ না ঘটে। ন্যায্য ওজন দিয়ে বেচাকেনা কোরো, মূলধনে হাত দিও না। আর এই সঙ্গে মনে রেখো কখনও যেন পরনারীর উপর তোমার আসক্তি না জন্মায়। কারণ পর কখনও আপন হয় না, শেষটায় সে তোমায় একদিন প্রাণে মেরে ফেলবে। তুমি বিদেশ থেকে বাণিজ্য করে ফিরে এসো, আমি ইতিমধ্যে লোক দিয়ে তোমার জমি চাষ করাব আর মনে করব তোমার নাম। তুমি ফিরে এলে সেই জমির ধানে সুখে দুধভাত খেতে পারবে':

ও প্রাণ সাধুরে—
তোমরা যাইমেন সাধু দূর দেশে
হামরা থাকিমো সাধু একেলা ঘরে
এ হেন যৈবন খাইবে পরে।
দাঁড়ী-মাঝি সাধু ষোল জনা,
না করেন তোমরা দুরবচনা রে
নিজ হাতে রান্ধিয়া খান ভাত রে॥

পুরিয়া পশ্চিয়া বাও ঘোপা চায়া
সাধু বান্ধেন নাও রে
ধর্মডারি দিয়া করেন বেচা কেনা রে

কোছার কড়ি সাধু না করেন ব্যয়
পরনারী কি সাধু আপন হয়রে,
পরনারী একদিন বধিবে পরাণ রে॥

মানুষ দিয়া সাধু করিম কাম
আবাদ হইলে সাধু তোমার নাম রে,
ঘুরি আসি সাধু খাবেন দুধ ভাত রে॥

অথবা :

বিদ্যাশেতে যায়ছেন পতিধন
ভাল করিয়া থাকেন,
এই নারীর মনের কথা,
মনে তোমার রাখেন পতি হে।
না চাই, না চাই, আর কোন না চাই,
অন্য কথা মনোত না দেন ঠাঁই।
পতি সতী নারীর ধন,
তাহো কিনা জানেন পতি হে ॥
দোষ বা করি গুণ বা করি নেহাই তোমার পর,
তুমি বিনা আমার পতি,
শূন্য এই যে ঘর হে ॥
না থাউক, না থাউক, না থাউক টাকা কড়ি,
কি করিমো শূন্য ঘর বাড়ি,
কপালে থাইক্‌লে হইবে হায়,
তাহো কিনা জানেন পতি হে ॥

বসন্ত সমাগমে গাছে গাছে ফুটল নতুন ফুল। সবুজে সবুজে ছেয়ে ফেলল বনপ্রান্তর। ঝোপে ঝাড়ে ডেকে উঠল 'বৌ কথা কও' পাখী। অশোক কিংশুকের মেলায় মন হরণ করে নিল কবির। প্রকৃতি হেসে উঠল আবার এতদিন পরে। নতুন জীবন পেল পুরাতন ধরিত্রী। কিন্তু বাউদিয়া? তার তো ঘরও নেই বাড়িও নেই। তার কি আর চলার শেষ হবে না? খুঁজে কী পাবে না তার জীবনধনকে? কেন, এই যে দো-তরা? এই তো তার সারা জীবনের সাথী, এই তো তার প্রেয়সী! এই দো-তরাকে সঙ্গী করেইতো সে ঘর ছেড়েছে :

(আরে ও) ভবের দো-তরা
নবীন বয়সে মোক্ করলিরে বাউদিয়া।
(আরে ও) মরি হায়রে হায়
নবীন বয়সে মোক্ করলিরে বাউদিয়া ॥
যখন দো-তরা তোকে নিলাম হাতে
নিষত করে মোক্ পাড়ার লোকে

নিষত করে মোক্ দয়াল বাপ ভাই।
তোর জন্য মোর গেরাম বাদী
থানাত দেয় ইজাহারী
দারোগা বাবু হাতে দেয় দড়ি।
আজ তুই দো-তরা রাখলি মান
রূপা দিয়া মুই বান্ধাবরে কান
নয়া গাছের মাণিকের মতন ॥

এই গানটি দিনাজপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। ঠিক অনুরূপ গান জলপাই-গুড়ি অঞ্চলেও শোনা যায়। কাজেই গানটি যে আদতে কোন্ অঞ্চলের এ কথা বলা বড়ই কষ্টকর। জলপাইগুড়ি অঞ্চলের গানেও বলছে, 'ওরে কাঁঠাল কাঠের দো-তরা তোর জন্যইতো ঘর ছাড়লুম, আজ তুই-ই আমার মান রক্ষা করলি, আজ, তোকে ছোট ছেলেটির মতোই কোলে তুলে আদর করতে ইচ্ছে যাচ্ছে' :

(ওরে ও) কাঠোল কুঠার দো-তরা রে
অল্প বয়সে করল মোক্
জনমের বাউদিয়া।
যে দিন দো-তরা হাতত নেই
নিষত করে মোক্ বাপ ও মায়
নিষত করে মোক্ পাড়ার লোক,
তুই দো-তরা মোর রাখলিরে মান,
সোনা দিয়া মুই বান্ধাবরে কান,
রূপা দিয়া বান্ধাবরে নয়ান।
সদায় মন নেয় তোক্ যতন করি
পুত্র বলিয়া তোক্ কোলে তুলিয়া নেই।

কখনও কখনও চলতে চলতে বাউদিয়ার মনে প্রশ্ন জাগে—তা হলে কি সে প্রেম-প্রীতি কিছুই জানে না? তাই যদি না হবে তা হলে কেন আসছে না তার বঁধু, কী এমন তার অপরাধ? নারী মনের এই জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে উঠে বাউদিয়ার কণ্ঠে :

ও কি ধন ধনরে
তোর শরীরে এতই রে গোণা (গোসা)

পিরীতি মুই জাননা,
পাড়ার যত চ্যাংড়া মোটেই ছাড়ে না,
দিয়া গেছে মোরে পিরীতির বায়না।
একে ত আন্ধাইরা রাতি,
হাউসের বন্ধু আমার, গোসা হইয়া যায়।
(হারে) নদীর বসন্তকালে ভেংগে পড়ে মাটি
আর নারীর যৈবন কালে, পুরুষ গলার কাঠি (রে)।

মৈষাল ও গাড়োয়াল

আমরা এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই উল্লেখ করেছি মৈষাল ও গাড়োয়ালী গান এই ভাওয়াইয়া গানেরই অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে মোষ চরাতে চরাতে যে-সব গান গায় রাখালেরা, তাকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে মৈষাল, এবং গরু চরাতে চরাতে বা গরুর গাড়ি চালাবার সময় তারা যে-গান গেয়ে তাদের দীর্ঘ পথযাত্রার কষ্ট ভুলবার চেষ্টা করে, তাকে বলা হয়েছে গাড়োয়ালী গান। এই গাড়োয়ালী গানের সুরের সংগে পূর্ববংগের ভাটিয়ালী গানের একটা সুরগত ঐক্যও দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া মৈষাল গানের সংগে পূর্ববংগের রাখালী গানের মিল তো পাবেনই। গাড়োযালী গান শুধু ভাওয়াইয়া সুরে নয় অন্য সুরেও হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা যাবে।

গাড়োয়ালী এবং মৈষাল গানও মূলত বিরহ এবং পরকীয়া প্রেমের ভিত্তিতেই রচিত। দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং কুচবিহারেই এর সমধিক ব্যাপ্তি। মনে করা যাক, কোনো নারী যেন সদাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে কখন শুনবে তার প্রিয়তমের আগমন বার্তা। কোকিল ডাকলে ভুল হয়, এ বুঝি তার প্রিয়তমেরই বাঁশীর সুর, গাছের পাতা ঝরে পড়লে মনে হয় এ বুঝি তারই প্রিয়তমের পদধ্বনি :

চ্যাংড়া বন্ধুরে—
আমারে ছাড়িয়া যাবি রে কোথায় ?
তোমার জন্য ভেবে ভেবে
হইলাম রে গাছের বাকল,
চ্যাংড়া বন্ধু তুই মোর নয়নের কাজল।

রংপুরের রংসুপারী, দিনাজপুরের ছাঁচিপান,
চ্যাংড়া বন্ধু মোর আউলাইল পরাণ।
তোমার জন্য কিনিয়া আনলাম
বালুর ঘাটের মোটর খান,
চ্যাংড়া বন্ধু চড়িয়া বেড়ান,
তবু ক্যান আমায় ছেড়ে যান।

কিংবা:

ওকি চ্যাংড়া বন্ধু
মায়া লাগাইয়া গেলেন রে
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মোর।
খাইবার চাইলেন চিড়া দই,
তখন থাকি আসিলেন কই,
ডাকিতে ভাঙিগল রসের গলা।
মাখিয়া চিড়া দই,
চাইয়া আছি পন্থের দিকে,
কোন দিকে আইসে সোনা বন্ধু।
একলা ঘরে শুইয়ে থাকি, শয়নে স্বপনে দেখি
গাও খানা মোর করে ঝিকিমিকি।
মোনটা মোর উড়াম বাইরাম করে॥
উড়ানী কবুতর হয়্যা,
উড়ি উড়ি যাম মুইরে,
যেইখানে শ্যাম চিকন কালা।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনে পড়ে—তার বন্ধু তো গেছে সেই মোষ চরাতে এই নিদারুণ চোত মেসে রোদের ভিতর। বঁধুর কথা মনে হতেই মনটা করুণায় আর্দ্র হয়ে ওঠে। আহা এই দারুণ গ্রীষ্মে কি কষ্টই না পাচ্ছে তার প্রাণবঁধু! ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে তাকে বলে আসে, ওগো বন্ধু চল আমার বাড়ি:

মৈষাল মৈষাল কর বন্ধু রে (ওরে) শুকনা নদীর কুলে হে,
মুখখানি শুকাইয়ে গ্যাছে চৈত মাইস্যা ঝামালে।
প্রাণ কান্দে মৈষাল বন্ধু রে॥

আমার বাড়িতে যাইও বন্ধুরে এই না বরাবর,
খাজুর গাইছা বাড়ি আমার পূব দুয়াইর‍্যা ঘর।
প্রাণ কান্দে মৈষাল বন্ধুরে ॥
আমার বাড়িতে যাইও বন্ধুরে বইবার দিব মোড়া,
জলপান করিতে দিবও শাল ধানের চিড়া।
প্রাণ কান্দে মৈষাল বন্ধুরে ॥
শাল ধানের চিড়া দিবরে, বিন্দু ধানের খৈও,
(আরও) মোটা মোটা সফরী কলা, গামছা পাতা দৈ ওরে
প্রাণ কান্দে মৈষাল বন্ধুরে ॥

কিন্তু না! কোথায় তার বন্ধু! সে তো গেছে মোষ চরাতে সেই ক্ষীর নদীর কূলে। সে এখানে আসবে কি করে? এ তো তার শ্বশুরবাড়ি, ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ। কাজেই বঁধুর দেখা পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু এ ভাবই বা তার কতক্ষণ স্থায়ী হয়। দূরে কোথায় যেন বেজে ওঠে রাখালিয়া বাঁশী। বিরহিনী কান পেতে শোনে। মনে মনে প্রশ্নও করে, একি তা হলে সত্যিই তার প্রাণ বঁধুরই আসার সংকেত?:

আর দিন বাজে বাঁশীরে ও মৈষাল না লাগে এমন,
আজিকার বাঁশীতে কেন্‌হে রে কাড়িয়া লয় মন।
এই বাঁশী সেই বাঁশী নয় বাঁশী বাজে নয়া তানে,
বিনাথ মৈষাল আজি পড়িল বাথানে (মৈষাল রে)।
মৈষ রাখ মৈষাল বন্ধু রে ক্ষীর নদীর পাড়ে,
মজিল অবলার প্রাণ তোমার বাঁশীর সুরে (মৈষাল রে)।
রৌদে কেন পুড় মৈষাল ম্যাখে ভিজ্যা মর,
বিলে আছে পৌদের পাত আইন্যা মাথায় ধর (মৈষাল রে)।

কিংবা: প্রাণ কান্দেন মোর মইষাল বন্ধুরে,
মইষ চড়ান মইষাল বন্ধু ঘাটের উজানে।
বাঙর মইষের ঘণ্টির বাইজে
মন উড়াং বাইরাং করে রে ॥
মইষ রাখ মইষাল বন্ধু বাড়ির বগলেতে,
মুই নারীটা দেখা দিম
সকালে বইকালে রে ॥

ভার বান্ধেন ভারাটি বান্ধেন মইষাল
ছাড়িয়া আপন মায়া,
ওরে আজি কেনে দেখর মইষাল
মোক্ ছাড়িয়া যাবার কায়ারে ॥
তোমরা যাইবেন দূর দেশে আমার হবে কি ?
দিনে রাতে ওরে মইষাল কাঁদি কাঁদি মরি রে ॥

না তাও নয়, চৈতালী ঘূর্ণি হাওয়ায় ঝাউগাছের শন্‌শনানি শব্দে সে ভুল করে, দূরে লাল মাটির পথ বেয়ে চলেছে গরুর গাড়ি, দূরান্তরের পথ ধরে। বিরহিনী ভাবে হয়তো বা ওই গাড়োয়ানের বেশেই চলেছে তার প্রাণপ্রিয়। বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। কিন্তু তার অব্যক্ত কথা প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিয়েছে বাউদিয়া, তার গাড়োয়ালী গানের মাধ্যমে দো-তরার তারে ঘা মেরে গেয়ে ওঠে তার মনের কথা :

ওকে গাড়িয়াল ভাই
উজান উজান করে গাড়িয়াল, উজানে বাঘের ভয়।
গাড়ি ধরিয়া গাড়িয়াল
বাড়ি ফিরয়া যায়।
ভাতও মাগো খায়া গাড়িয়াল মুখে না দেয় পান।
চালের বাতায় ধরয়া কন্যা জুড়িছে কান্দন।
না কান্দ না কান্দ কন্যা, ভাঙিবে রসের গোড়া,
আর একদিন ফিরয়া আসলে সোনা দিয়া বান্ধিবে রে গলা
(কন্যা হে) ॥

গরুর গাড়ি চলে যায় প্রায় তার দৃষ্টির বাইরে। এইবার বিরহিনী তার মনের কথা, নিজেই যেন বলতে শুরু করে আবেগজড়িত কণ্ঠে :

(ওকি) গাড়িয়াল ভাই
হাঁকাও গাড়ি তুই,
চি-ইল মারির ব-অন-দ-অরে
যখন গাড়িয়াল উইজান রে ধায়,
নারীর মন মোর জুড়্যা রয় রে—

হাঁকাও গাড়ি তুই।
ওকি গাড়িয়াল ভাই ।।

গাড়ি আস্তে আস্তে অদৃশ্য হতে থাকে তার চোখের সম্মুখ দিয়ে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে গাড়িয়ালের কাঁধের সেই রঙিন গামছাখানা এখনও দেখা যাচ্ছে। গামছাখানা তার প্রিয়তমের বড়ই প্রিয়। তাই শেষ কথা বলছে :

পতি ধন সোনার চাঁদ মোর
তোমরা যাছেন দূর দেশে
হামাক লাগে ধান্ধা,
তোমার ঘাড়ের সামলাই গামছা
থুইয়া যাও বান্ধা হে।
তোমার ঘাড়ের সামলাই গামছা
খাব না বিলাব রে,
যখন মনে পড়বে পতি ধনে
বক্ষে তুলিয়া নিব হে ॥
ইন্দ্র যদি না বরিষে কি করিবে কূপে ?
যেও নারীর সোয়ামী ছাড়ে
কি করিবে রূপে হে ?
হাত বা ধর পাওবা ধর, না যাবু ছাড়িয়া,
এ হেন যৈবন কালে পতি ধন গেলেন ছাড়িয়া।

ভাবতে ভাবতে হয়তো বা ঘুমিয়েই পড়ে সে। স্বপ্ন দেখে তার বঁধু যেন ফিরে এসেছে তার কাছে—এস, আমরা দুজনে মিলে চলে যাই এখান থেকে, তুমি প্রসন্ন হও আমার উপর, কর পতিত্বে বরণ :

ও তোর মন কেনে আন্ধার কন্যা হে
কন্যা ঝোড়ে দুই নয়ন,
আইস কন্যা তোমার সঙ্গে করি আলাপন ॥
কোন্ বা দেশে ঘর কন্যা, কোন্ বা দেশে বাড়ি
তোমার সঙ্গে যাব কন্যা হব দেশান্তরী রে
বাড়ি ঘর মোক্ ভালোয় লাগে না ॥
ধিক্ ধিক্ তোর বাপ মাও ধিক্ তাদের হিয়া

এত বড় হইচেন কন্যা তাও নাই দেয় বিয়ারে—
হিন্দের জ্বালা কেউ তো বোঝে না ॥
যে দিনে দেখিনু কন্যা ঐনা নদীর ঘাটে
সে দিন থাকি অবুঝ মন মোর মানা নাহি মানে রে
কাম কাজ মোক্ ভালই লাগে না ॥
তোর মতো সুন্দরী কন্যা আর তো দেখি নাই
হামার গলায় দেও যে মালা
সংগে চলি যাইরে,
কতই সুখে রব দুইজনা
তুমি বিনে প্রাণ তো বাঁচে না ॥

কখনও বা বলে :

নদীতে না যাইওরে বউদু
নদীতে না যাইও……
নদীর জল ঘোলা রে ঘোলাপানী ॥
বাপ নাই মোর ভাবিতেরে
মা-ও নাই মোর কান্দিতেরে (বউদু)
ভাইও নাই মোর তুলিয়ারে লইতে কোলে ॥
এক নোটা (ঘটি) ভরত রে বউদু
দুইও নোটা তুলিতে,
খই সাপ (কেউটে) হইল গজরে মতীর মাহালা ॥
পদ্মা নদীর জলেরে কত হংস ভাসে রে বউদু
হংসর গলায় গজরে মতীর মাহালা ॥

স্বপ্ন ভেঙে যায়, বিরহিনী চেয়ে দেখে শূন্য প্রান্তর খাঁ খাঁ করছে বঁধুর বিরহে, দূরে দেখা যায় একটি লোককে। লোকটি হলো একজন ভারী (যারা ভার বহন করে এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অন্য আত্মীয়ের বাড়ি নিয়ে যায়)। বিরহিনী তাঁকে প্রশ্ন করে,—ওগো ভারী, তুমি বলত আমার প্রাণ বঁধু কেমন আছে? ভারী বলছে, সে ভালই আছে, তবে কদিন জ্বর হয়েছিল এই যা, তোমাকে বলেছে কয়েকটা জ্যান্ত মাগুর মাছ পাঠিয়ে দিতে। বধূটি উত্তর দিচ্ছে—দেখ, আমি হলাম গয়লার মেয়ে, মাগুর মাছ কোথায়ই বা পাব? দুধ, দই

যদি চাওতো পাঠিয়ে দিতে পারি তোমার সঙ্গে। আমার বাপ মা এমন যে, আমাকে এমনই জায়গায় বিয়ে দিয়েছে যেজন্য আমার বন্ধুর সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে কিনা সন্দেহ :

ভাটী হইতে আইলেন ভারী
কথা কও বন্ধুর সারি সারি রে।
ও কি ভারীরে কও ভারী মোর
বন্ধুয়া কেমন আছে রে ॥
আছে বন্ধু তোর ভাবে ভাবে
দিনা চারিক কন্যা জ্বর গেইছে রে,
ও কি কন্যারে চায়া পাঠাইছে
জিয়াল মাগুর মাছ রে ॥
আমি ত গোয়ালের নারী
দৈ ও দুধ খোয়াইতে পারি রে,
ও কি ভারী রে কোন্ঠে পাইম মুই
জিয়াল মাগুর মাছ রে ॥
বাপ ও মাও মোর দুরাচার
বেছেয়া খাইলেক মোক্ দুরন্তর রে,
ও কি ভারী রে আর না দেখিম মুই
বন্ধুয়ার বাড়ি ঘর রে ॥

ভারীও চলে যায়, বিরহিনী আবার ডুবে যায় তার ভাবনার রাজত্বে, দূরে আবার চলে যায় গরুর গাড়ি। একই স্বপ্নের জাল বুনে চলে বিরহিনী, ভাবে হয়তো বা এই গাড়িতেই আসছে তার প্রাণ বঁধু। বিরহিনী আবার ভাব সায়রে ডুব দিয়ে ওঠে :

ও বন্ধু মোর রসিয়া
দেখা দেও মোক্ একবার আসিয়া।
বর্ণি ধানে ভাজিনু খই
সোনার বন্ধু আসলেন কই,
ও কি আসিবার চায়া আসলেন না,
সোনা মুখে রাও কারলেন না।
(অ) দূরের বন্ধু মোর আসলেন কই

বাটা ভরা চিনি খাঁয়লেন কই,
ও কি আসিবার চায়া আসলেন না,
সোনা মুখে রাও কার্‌লেন না।

নারীর মনতো! ভাবে বন্ধু তার কোন বিপদে পড়েনি তো?:

ফাঁন্দে পড়িয়া বগা কান্দে (রে)
ফাঁদ পাতিছে ফাঁদুয়া ভাইরে পুটি মাছ দিয়া,
ওরে মাছের লোভেতে বগা পড়ে উড়াল দিয়া (রে)।
ফাঁদে পড়িয়া বগা করে টানা টুনা
ওরে আহারে কুন কুড়ার সুতা
হলু লোহার গুণারে॥
ফাঁদে পড়িয়া রে বগা
করে হায় হায়—
ওরে আহা রে দারুণ বিধি
সাথী ছাড়্যা যায় রে॥
উড়িয়া যায় রে চাকোয়ার পংখী
বগীক্ বলে ঠারে,
ওরে তোমার বগা বন্দী হইছে
ধল্লা নদীর পারে রে॥
এই কথা শুনিয়া বগী
দুই পাখা মেলিল
ওরে ধল্লা নদীর পাড়ে যাইয়া
দরশন দিল রে
বগাক্ দেখিয়া বগী কান্দে রে।
বগীক্ দেখিয়া বগা কান্দে রে॥

চট্‌কা

চট্‌কা হলো চুট্‌কি অর্থাৎ লঘু রসের গীত—এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ভাওয়াইয়া গানেরই একটি শাখা মাত্র। একঘেয়ে তত্ত্ব কথা, বিরহ সঙ্গীত ও গম্ভীর ভাবের কথা শুনতে শুনতে মনপ্রাণ যখন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে,

তখন এই ধরনের লঘু বা হাল্কা রসের গান শ্রোতাদের অনেকটা চিত্তবিনোদন করে বৈ কি ?

বেশির ভাগ চট্‌কা গানের বিষয়বস্তুই সংসারের সুখ, দুঃখ, মান অভিমান প্রভৃতি নিয়ে রচিত, অবশ্য এর মধ্যে ব্যতিক্রমও যে একেবারে পরিলক্ষিত হয় না এমন নয়, তবে তা খুবই সামান্য।

একটি গানের বিষয়বস্তু নিয়েই ধরা যাক :

একটি বড়লোকের মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে এসেছে স্বামীর ঘর করতে। তার মনে বড় দেমাক্‌, সে বড় ঘরের মেয়ে, সে হলো মোড়লের মেয়ে। সে তো আর পাঁচ জনের মতো দাসী বাঁদীর ন্যায় গোয়াল নিকোতে, থালা মাজতে, ভাত রাঁধতে পারে না। তাই শাশুড়ীকে বলছে দেখ, 'আমি হলাম মোড়লের মেয়ে, আমার দ্বারা ওসব ছোট কাজকর্ম করা চলবে না। যদি ভাত খেতে হয় তা হলে তোমাকেই থালা মাজতে হবে, গোয়াল নিকোতে হবে, তা নইলে এখানে ভাত জুটবে না' :

ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই ভাত আন্ধিবার,
মুই ত মোণ্ডলের বিটি,
ভাত আন্ধিবার না জানি,
ভাত খাও ত ধর আন্ধুনী।
ও শাশুড়ী মাই, না পারি মুই বারা বান্ধিবার,
না পারি মুই ধান বান্ধিবার,
মুইত মোণ্ডলের বিটি ধান বান্ধিবার না জানি,
ভাত খাও ত ধর বারহানী।
ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই থালা মাজিবার,
মুই ত মোণ্ডলের বিটি,
থালা মাজিবার না জানি,
ভাত খাও ত ধর মাজুনী।
ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই গোবর ফ্যালাবার,
গোবর ফ্যালাইতি হাত গোন্ধাই,
খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয়,
ঝাঁটা মারি মুই গরুর কপালে।
মুই ত মোণ্ডলের বিটি,
গোবর ফ্যালাবার না জানি,
ভাত খাও ত ফ্যালাও গোবর খানি।

আর একদিন শাশুড়ী বললেন—'দেখ বাছা ও সব ছোট কাজ কর্ম না হয় নাই করলে, তবে একটু রান্না বান্না তো করতে পার। আমার শরীরটা ভাল নয়, দুটো ডাল ভাত একটু রান্না করে নিয়ে এসো।' বউ আর কি করে, ডাল ভাত রান্না করল, কিন্তু তা যে কি অপূর্ব বস্তু সৃষ্টি হলো তা বোঝা যাচ্ছে বাউদিয়ার এই গানটি থেকেই :

ওকি বাপরে মাও না পারু মুই কাম করিতে।
ডাল আঁধিনু, ডাল আঁধিনু, হাঁটু পানি দিয়া,
নয়া জামাই সাঁতার দিল, ডাইলের উপার দিয়া (রে)।
হাল বাহিয়া আসলো গোসাঁই,
ভাল করুরে কামরে,
ভাল করুরে কাম।
ও তোর লাঙ্গল জোয়াল ঘরে থুইয়্যা
বাড়া দুটি বান।
বাড়া দুটি বানলু গোসাঁই, ভাল করুরে কাম,
চাউল চাট্টা ঘরে থুইয়্যা, পানি ফুটিয়ে আন (রে)।

এতো গেল শুধু শাশুড়ীর প্রতি বউয়ের ব্যবহার। এইরকম জবরদস্ত বউয়েরা যে স্বামীকেও একেবারে অনুগত করে রাখবে এতে আর আশ্চর্য কী? সেই চিত্রও পল্লী-কবিদের তুলিকায় অঙ্কিত হয়েছে। লোক-কবিরা নিরক্ষর বটে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি অস্বচ্ছ নয়। তাই তারা হাল ফ্যাশানের কোনো কর্তা-গিন্নীর হাবভাব দেখে নিয়ে অনায়াসেই বলতে সক্ষম হয় :

আমার বাংলায় করে মোন ফাঁপর
চল যাই কইলকাত্তা শহর।
শহরে ভাড়া করলাম ঘর,
থাকি দোতলার উপর।
দিনে দিনে গিন্নীর মন করে ফর্ ফর্।
(আবার) গিন্নী গাড়ি ঘোড়া দৌড়িবার চায়
ও গিন্নী দ্যাখতে চায় দিল্লী শহর,
এসে এই কইলকাত্তা শহর॥
ও গিন্নী আলতা পরে পায়,

পায়ে ছ্যাণ্ডেল লাগায়,
চোখে চশমা, হাতে হাতঘড়ি যে দেয়,
ও গিন্নীর ভ্যানিটি ব্যাগ, সোনার গয়না গায়
ও গিন্নী বাইনতে বলে লেকে ঘর
এসে এই কইলকাত্তা শহর ॥
ভেবে মুকুন্দ বলে মোনের আক্ষেপে
ও গিন্নীর আছে সকলে,
স্বামীর কোলে দিয়ে ছেলে
রাস্তাতে চলে।
ও তার ডুরে শাড়ি, রেশমী চুড়ি, তবু আমায় ভাবে পর,
চল যাই কইলকাত্তা শহর ॥

লোক-কবিরা কিন্তু এক দিকের কথা বলেই নিরস্ত হয়নি। তাদের রচিত সংগীতে শুধু বধূ কর্তৃক শাশুড়ী নির্যাতনের কথাই ব্যক্ত হয়েছে তা নয়। কোনো কোনো গানে এর বিপরীত দিকটাও ফুটে উঠেছে। কি ভাবে একটি বউ তার শ্বশুর বাড়ি এসে এক দিকে শ্বশুর-শাশুড়ী, অন্যদিকে ননদ-ভাজ ও ভাশুরের গঞ্জনা সর্বোপরি স্বামীরও অত্যাচার সহ্য করছে—তাও বর্ণিত হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে :

ডাইল পাক কররে কাঁচা মরিচ দিয়া,
গুরুর কাছে নেওগে মন্ত্র নিরালে বসিয়া।
ছোট বউ চড়ায় ডাইল, মাইঝাল বউ ডাইল ঝাড়ে,
আবার বড় বউ আসিয়া, কাঠি দিয়া ডাইল নাড়ে।
ডাইল পাক কররে কাঁচা মরিচ দিয়া,
গুরুর কাছে নেওগে মন্ত্র নিরালে বসিয়া।
(আমার) শ্বশুর করে ঘুশুর মুশুর, ভাশুর করে গোঁসা,
নিদয় হেন স্বামী আস্যা,
ধরলো চুলের খোসা (খোঁপা)।
ডাইল পাক কররে কাঁচা মরিচ দিয়া ॥
(আমার) শাশুড়ী আছে, ননদ আছে, আছে ভাইগনা বউ,
(হারে) এমন কইর‍্যা মাইর মারিল, আউগাইল না কেউ।

ডাইল পাক কররে, কাঁচা মরিচ দিয়া,
গুরুর কাছে নেওগে মন্ত্র নিরালে বসিয়া ॥

অবশ্য বৌটি যদি আর একটু সেয়ানা হতো তা হলে কুচবিহারের কৃষাণীদের মতো নিশ্চয়ই স্বামীকে সে মুখের উপর শুনিয়ে দিত—তুমি এক নম্বরের মিথ্যাবাদী বিয়ের আগে কতইনা বড়াই করেছিলে—আমার এ আছে, সে আছে, কিন্তু এখন দেখছি তোমার সব কথাই ফাঁকা :

নাক ডোংরার ব্যাটাটা,
চোখ ডোংরার লাতিটা,
মোক্ ভুলানু সতের খাড়ু দিয়া।

তখনে না কছিস তুই রে,
হাল চারখান, গরু পাঁচখান,
ছেউটি গরুর নেকাই জোকাই নাই।

বাড়ি আসিয়া দেখনু মুই,
চাতুরালী ক'রলু তুই,
ঘরোৎ তোর ছাউনী দিবার নাই ॥

তখনে না কছিস তুইয়ে
মোটা কাপড় পিন্ধি না,
সরু কাপড়ের নেকাই জোকাই নাই,
বাড়ি আসিয়া দেখনু মুই,
চাতুরালী ক'রলু তুই,
ঘরোৎ তোর ছেঁড়া ত্যানাও নাই ॥

তখনে না কছিস তুই রে,
মোটা চাউল খাই না,
সরু চাইলের নেকাই জোকাই নাই,
বাড়ি আসিয়া দেখনু মুই
চাতুরালী ক'রলু তুই
ঘরোৎ না তোর কাউনের গুড়াও নাই।

বেচারী স্বামী হয়তো বা একটা কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল বা দিয়েও

ফেলেছিল। কিন্তু সে এখন রণচন্ডী মূর্তি ধারণ করেছে, কাজেই তাকে এখন ওসব কথায় জব্দ করা সম্ভব নয়। বরং সেই উল্টে আবার বলতে থাকে :

ঠগ্ মিনসা মুখ পোড়া
ব্যাহায়া নাই তোর জোড়া,
মিছায় ছাচায় কল্লুরে মোক্ বিয়া,
ভুলিয়া নিলু সীসার খাড়ু দিয়া।
আগেত না বলিয়াছিলু তুই,
(ও তোর) হাতি ঘোড়া, খাট পালং এর
নেকাই যোখাই নাই,
ঘরোৎ আমি দেখলু হায়,
চাতুরালী না ফুরায়,
চালোৎ না তোর ছাউনী দিবার নাই ॥

কিন্তু চট্কাই হোক আর মৈষাল কিংবা গাড়েয়ালীই হোক ভাওয়াইয়া শ্রেণীভুক্ত প্রায় সকল গানের উপরই পরকীয়া প্রেম মূলক ভাবধারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে এসে পড়বেই। একটি গানের বিষয় বস্তু হচ্ছে এই : একটি লোক চলেছে তার প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা করতে, যখন বাড়ি থেকে সে বের হচ্ছে তখন তার স্ত্রী নিষেধ করছে, দেখ কোথায় যাচ্ছ ? আজ আমাদের কালো মুরগীটা ডিম পাড়তে বসেছে। এমন দিনে কোথাও যাত্রা করা উচিত নয়। (রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নিরক্ষর চাষী সম্প্রদায়ের ভিতর বিশেষতঃ মুসলমান শ্রেণীর মধ্যে একটা সংস্কার আছে, যে-দিন তাদের বাড়ির কালো মুরগী ডিম পাড়তে বসে সেদিন বাড়ির পুরুষদের কোথাও যাত্রা করা নিষিদ্ধ)।

কিন্তু কৃষাণ তো তার স্ত্রীর কথা কানেই তুলল না। তার মন পড়ে আছে প্রণয়িনীর কাছে। সে এগিয়ে চলল তার উপপত্নীর বাড়ির দিকে। কিন্তু নিষেধ না মানার ফল পেতে হলো তাকে হাতে হাতে। প্রণয়িনীর শ্বশুর বাড়ির দিকে গিয়ে প্রথমবার তো তাকে পালিয়েই আসতে হলো বাড়ি ভর্তি লোকজন দেখে। পরে সন্ধ্যা নামলে গিয়ে লুকিয়ে রইল বৌটির রান্না ঘরের পিছনে কলার ঝোপের ভিতর। কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট ! বৌটি না জেনে শুনে ভাতের গরম ফ্যানটা বাইরে ফেলে দেবার সময় সেটা গিয়ে পড়ল একেবারে তার গায়।

বেচারীর সারা গায়ে পড়ল বড় বড় ফোস্কা। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ফিরে এসে ক্ষতস্থানে শুরু করল তেল মালিশ করতে :

(আবার) বাড়ি ছাড়িয়া কোথা যান,
দোহাই আল্লাটে মোর মাথা খান,
কালা মুরগীটা ওসন বইস্যাছে।
ও মরি হায় হায় রে……
কালা মুরগীটা ওসন বইস্যাছে।
কন্যা যখন তোর বাড়িতে যাই
কত মানুষ মুই দেখিবারে পাই,
দৌড়া পালাই মুই পাটা বাড়ির মধ্যে।
কন্যা আশা দিলি, ভরসা দিলি,
কলার মোথাত মোক্ বসাইয়া থুলি
স্যারা রাত মোক্ মশায় কামড়াইছে।
কন্যা আগুন নিগুমটা না বুঝিয়া,
ভাতেব উতালটা দিলি ঢালিয়া,
সোনার অঙ্গে মোর ফোসা পইড়্যাছে।
(আবার) বিশ্বাস যদি না হয় তোর,
জামা খুলিয়া দ্যাখেক মোর,
দেড় টাকা সের ফিনাইল ত্যাল গ্যাছে॥

ইলিশ মাছ বাঙালীর বড় প্রিয় খাদ্য, লোক-কবিরা তাই এই ইলিশ মাছকে নিয়েও অপূর্ব গান রচনা করেছে। এর ভিতর দিয়েই সাধারণ এক কৃষাণ ঘরের ছোট্ট জীবনের ছোট্ট একটি ছবি আমাদের চোখের সুমুখে ফুটে উঠছে। গানটি হলো একটি জেলে কী ভাবে নদীতে গিয়ে ইলিশ মাছ ধরল, তারপর তা বাড়িতে নিয়ে এসে কি ভাবে কেটে কুটে, রেঁধে সকলকে খাওয়াল এবং আস্বাদ পেল। জেলেটি যেন ইলিশ মাছকে উদ্দেশ করেই বলছে :

মাছ মোর ইলিশারে,
শুকল সুতা শুকল বড়শী দড়িয়ায় ফেলানু
ওকি উজানে তুলিনু
মাছ মোর ইলিশারে॥
মাছ না মারিয়া মুই খলাই ভরানু

বাড়িতে আসিয়া মাছ চাল্লিতে তুলিনু
মাছ মোর ইলিশারে।
বটিতে বেচিয়া মাছ মালই তুলিনু
মালই না তুলিয়া মাছ ঘরে নিয়া গেনু
মাছ মোর ইলিশারে ॥
তেলে তেলানী মাছ মোর উপরে ঢাকুনী
মজিল মাছের বাসে খাও ননদিনী
মাছ মোর ইলিশারে ॥
কেমনে পরসিম মাছ মুই ইলিশার তরকারী
ভাসুর বসিয়া চালিত করিছে কাছারী
মাছ মোর ইলিশারে ॥

তবেই বুঝুন, ভোজন, ভোজনতত্ত্ব সম্পর্কেও লোক-কবিরা একেবারে উদাসীন নয়। অনেক সময় এই ধরনের রঙ্গরসের গান নৌকার মাঝিদের মুখেও শোনা যায়:

ও ভাই হালুয়া মাঝি
চল যাই বহিয়া নদী।
আন্দি আন্দি পান্থারে ভাই, খাদা খাদা ডাইল,
খায় না বুড়া নাড়ে চাড়ে, বুড়িক্ মারে গাইল।
তাল গাছে শৈলের পোনা, শিয়ালে ধর্য্যা খায়,
তাই দেখিয়া খুড়ুর চাচী, পলো নিয়া যায়,
ও ভাই.........নদী।
গাই বিয়াইলো গহীন জলে, কুমীর থাকে চালে,
ভেড়া বিয়াইল মাছ তলাতে, বাচ্চা নিল চিলে।
ও ভাই......নদী।
বুড়ায় গ্যাল মাছ মারিতে, মায়্যা আনল চ্যাং,
আবার দুই সতীনে ঝগড়া কর‍্যা, বুড়ার ভাংলো ঠ্যাং।
ও ভাই.........নদী।

অথবা:

তেরশাই নদীর ধারে দিদি গো
মালসাই নদীর ধারে ধারে

কোন্ সোনার বঁধু ধান ঝাড়িয়া লয়।
(দিদি গো) ছোট বহিন ঘোরে পাড়ায় পাড়ায়
বড় বহিন ধান ঝাড়ে (২)।
(আবার) মেজ বোনের বুকের ব্যথা লো।
(দিদি) জ্বলে আর জ্বালায়
আর ক্যান বারে বারে (হায় হায়)
তিন্ গাঁয়ের ওই নিদয় বঁধু
মোন কাড়িয়া লয় (দিদি গো)
মোন কাড়িয়া লয়।

কিংবা (১)

ও দিদি শোনেক একটা কথা কং
তোক্ ছাড়া আর কাক শাইকাৎ
তুই ছাড়া আর কবার জাগায় নাই।
(দিদি) বাপ মায়ের কপাল পোড়া
মোরও নারীর অল্প পড়া,
সেইজন্য ভাল পাত্তর আইসে না ॥
আই, এ, বি, এ, ম্যাট্রিক পড়া
তার সাথে নাই নেকে জোড়া
জোড়া নেকিচে মাইনর পাশ করা।
বিয়াও করি আনচে হাতে
নাই দেক মোক্ টারী বেড়াইতে
মোক্ করিচে ধারার তলের এন্তুর।
(আর) গয়নার কথা কইলে কালে
তখনে চোখ পাকড়েয়া উঠে
কিনিয়া নাই দেয় একটা পাইসার সিন্দুর।
বাপ মায়ের বাড়ি যায়য়া
এগুলা কথা দেইম কয়য়া,
না হয় যাইম বারানী বনিয়া।

(২)

ঢাল খোপা সুন্দরী মাঁই
ও তোর মুচ্কী মারা হাসিরে
মন ভোলানো চোখের ঈশারায়।

ও হো মাঁই হে।

মনোত মোর একনা কথা, ঘুট ঘুটিয়া থাকে,
সুট করিয়া একনা কথা শুনিয়া যাও মোরে রে ॥

ও হো মাঁই হে।

খিট্ খিটিয়া মুখের হাসি মন করিলু চুরি।
মধুর লোভে ভোমরা আসি করে পাকা পাকি।

ও হো মাঁই হে।

যেমন চপের মাঁই কোনো তুই শিঁখা পাটি পারা।
নাক মুড়ি কইতরের মতো আমরা হচি জোড়া ॥

(৩) আরে চ্যাং মাছে বলে মাঝি ভাই
আমাক্ না মারিও,
কাইল ডারিক্যার হইবে বিয়্যারে
আমি বৈ ব্যাতি যাবো।
আরে ও মোর ক্যাঁকই মাসী, ম্যান্কা দিদি,
বৌ ভুলানি, মাতা ডাংরি, ফিচ্যা তুলুকী,
ধ্যাং ডিগিল্যা, জটা বগিল্যা,
আলুক সালুক, সালুক ননদিয়া
মোর মাঐ না মোর কে,
কাইল হইবে ডারিক্যার বিয়া
আইজও চাঁদা না আইলো রে ॥

ইচাঁ মাছে বলে মাঝি ভাই
আমাক্ না মারিও,
কাইল ডারিক্যার হইবে বিয়ারে
আমি ঘটক হয়্যা যাবো।
আরে ও মোর ক্যাঁকই মাসী, ম্যান্কা দিদি,
বৌ ভুলানি, মাতা ডাংরি, ফিচ্যা তুলুকী,
ধ্যাং ডিগিল্যা, জটা বগিল্যা,
আলুক সালুক, সালুক ননদিয়া
মোর মাঐ না মোর কে
কাইল হইবে ডারিক্যার বিয়া

আইজও চাঁদা না আইলো রে ॥
টাপা মাছে বলে মাঝি ভাই
আমাক্ না মারিও,
কাইল ডারিক্যার হইবে বিয়ারে,
আমি সানাই বাজাতে যাবো,
আরে ও মোর ক্যাঁকই মাসী, ম্যান্কা দিদি,
বৌ ভুলানি, মাতা ডাংরি, ফিচ্যা ফুলুকী,
ধ্যাং ডিগিল্যা, জটা বগিল্যা,
আলুক সালুক, সালুক ননদিয়া
মোর মাঐ না মোর কে,
কাইল হইবে ডারিক্যার বিয়া
আইজও চাঁদা না আইল রে ॥

ডাইরক্যা মাছে বলে মাঝি ভাই
আমাক্ না মারিও,
কাইল হইবে হামার বিহারে,
আমি কইন্যাক ঘরে নিব।
আরে ও মোর ক্যাঁকই মাসী, ম্যান্কা দিদি,
বৌ ভুলানি, মাতা ডাংরি, ফিচ্যা ফুলুকী,
ধ্যাং ডিগিল্যা, জটা বাগিল্যা,
আলুক সালুক, সালুক ননদিয়া
মোর মাঐ না মোর কে,
কাইল হইবে হামার বিয়া
আইজও চাঁদা না আইল রে ॥

(৪) ও কি বাপরে বাপ ও কি মাওরে মাও,
না পাং মুই কামাই করিবার ॥
হাল বয়য়া আসিলু বাড়ি, ঝাপি মাথাৎ দিয়া।
অতি থো তোর লাঙ্গল, যোয়াল বারা বানেক আসিয়া ॥
ও কি বাপরে বাপ ওকি মাওরে মাও,
না পাং মুই কামাই করিবার ॥
বারা বানিলু ভালে করিলু, খুদি চারটা খা।

কলসী তুইটা ভার সাজয়া জল বুলিয়া যা ।।
ও কি বাপরে বাপ ওকি মাওরে মাও,
না পাং মুই কামাই করিবার ।।
জল আনিলু ভালে করিলু, ঘরের কোনাৎ থো,
তিন দিনিয়া বাসিয়া ডোগা, ভাল্ করিয়া থো ।।
ডোগা ধুলু ভালে করিলু, তুই সে প্রাণের নাথ ।
চট করিয়া চড়োয়া দে তুই, তুইটা মানষের ভাত ।।
ভাত রান্ধিলু ভালে করিলু, তুই যে প্রাণের পতি ।
বিছানা খানা পারেক এলা, ছাওয়া ধরিয়া শুতি ।।
ওকি বাপরে বাপ ওকি মাওরে মাও
না পাং মুই কামাই করিবার ।।

(৫) বন্ধুধন তুমি আমি শিশুকালে
খেলা খেলচি একে সাথে
ইস্কুল পড়চি দিনহাটার বন্দরে ।
কত পরীক্ষায় পাশ করিয়া
ম্যাট্রিক পরীক্ষা ফেল করিয়া
ইস্কুল ছাড়লাক মনের তুঃখেতে ।।
বাপোমায়ের মন হল ব্যাজার
মোক্ ইস্কুল যাবার না দে আর
আরও না দে মোক্ বাড়ির বাহির হতে
বন্ধুধন না দেখিয়া তোমার মুখ
ভাংগে মোর নারীর বুক
মন কান্দে মোর তোমার বাদে ।।
তোমরা ইস্কুল ছাড়ি কলেজ গেইলেন
চলিয়া গেইলেন দিনহাটা ছাড়িয়া ।
বন্ধু সদায় সদায় চিঠি পাঠাং
তেও* বন্ধু তোর খবর না পাং
মোক্ ভুলিলেন বি-এ পাশ করিয়া ।।
তোমরা করলেন বি-এ পাশ
মোর করলেন সর্বনাশ
পিরীতি করি ছাড়িয়া গেইলেন মোরে ।

বিয়াও যদি না করেন মোকে
সত্য সত্য নষ্ট করলেন কানে
কলঙ্ক রইল জগতের মাঝারে ॥
বয়স হইল মোর আঠার বছর
না আইসে মোর বিয়ার খবর
তেঁই বন্ধু অতুয়া করলু মোকে ॥
দিনে দিনে যৈবন বাড়ে,
দুঃখের কথা কং কারে,
যৈবন জ্বলায় না পাং থাকিতে ॥

দেহতত্ত্ব

রংপুর এবং দিনাজপুর অঞ্চলে যদিও বাউদিয়া শ্রেণীর লোকেরাই ভাওয়াইয়া গান গেয়ে থাকে, কিন্তু জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার অঞ্চলের কৃষাণ সম্প্রদায় যে লোক-সংগীত পরিবেশন করে তার অধিকাংশই এই ভাওয়াইয়া সুরে। আমরা এই পরিচ্ছেদের গোড়াতেই বলেছি এ সম্প্রদায়ের ভিতর ধর্মের কোনো গোঁড়ামি নেই, বরং ভাওয়াইয়া গান সম্পূর্ণভাবেই আদিবাসীদের গানের মতোই সংস্কার মুক্ত। কিন্তু তা হলেও এর ভিতর বেশ কিছু পরিমাণে দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গানেরও সন্ধান মেলে। পাঠকগণ লক্ষ্য করতে পারবেন, এদের অনেক গানে ইতিমধ্যেই রাধা-কৃষ্ণের ছোঁয়াচ লেগে গেছে, হয়তো কিছুদিন পর এ-সব গান সম্পূর্ণভাবেই ধর্মমূলক গান বলেই পরিগণিত হবে, যে ভাবে ঝুমুর গান আজ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক গানে রূপান্তরিত হয়েছে।

যাক সে কথা। আপাততঃ ভাওয়াইয়া সুরে যে সব দেহতত্ত্ব তথা আধ্যাত্মিক বিষয়ক গানের সন্ধান পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

শ্রান্ত দেহে উদাস মধ্যাহ্নে উদার মাঠের কিনারায় গাছের ছায়ায় এসে বসেছে বাউদিয়া। জগৎ সংসার সবই তার কাছে মনে হচ্ছে মায়া বলে। এখন সে দিব্য জ্ঞান লাভ করতে চলেছে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও শেষ হয় না তার পরমাত্মার সন্ধান করা। মনে হয়, এই যে দুঃখ, এও হয়তো তার জন্যই জমা করা ছিল বিধাতার ভাণ্ডারে। এ যেন তারই কৃতকর্মের ফল। সুতরাং এজন্যে আর অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ কী? :

আপন কর্মদোষে সব হারালি
দোষ দিবি কারে ?
মোনরে পূবান্ পচ্চিমে বাও,
রাধা-কৃষ্ণের ভাঙা নাও,
ঠমকে ঠমকে ওঠে পানী।
মোনরে ইঙ্গলা পিঙ্গলার ঘর,
ঘুনে করছে জর জর,
খস্যে পড়ল তোর বত্রিশ বান্ধনের জোড়া।
জোড়ার উপর জোড়ারে, পবন কাষ্ঠের নৌকারে,
সেইনা নৌকা ঠেকল বালুচরে।
ও পারে কদম্বের গাছ,
ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করে পাত
তার উপারে জোড় বগিলার বাসা।
আহারের লোভেরে,
জমিনে পড়িয়ারে,
সেই না বগা ঠেকলো মায়া জালে ॥

সন্ধ্যা নেমে আসে। বাউদিয়া আবার পথ চলতে শুরু করে। হাতের দো-তরা তখনও বেজে চলে এক উদাস সুরে। মাঠের পর মাঠ, প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হয়ে যায় সে। কী জানি, কেন যেন ভালবেসে ফেলে নিজের এই এতদিনের দেহটাকে। হয়তো এ কথাই ভাবে, আজ যদি তার দেহাবসান ঘটে, তাহলে তো তার পরমাত্মাকে খোঁজা সাঙ্গ হলো না, তাই হয়তো বলে—হে জীবন, তুমি অত সহজে শেষ হয়ে যেও না। দো-তরার সুরে সুর মিলিয়ে তাই গেয়ে চলে :

ওরে জীবন ছাড়িয়া না যাইশ মোরে।
তুই জীবন ছাড়িয়া গেলে
আদর করবে কে ?
ভাই বল, ভাতিজা বল, সম্পত্তিরো রে ভাগী,
আগে করবে ধনের আশা,
পিছে করবে দেহার গতি।
কাঁচা বাঁশের খাট পালঙ্ক, শুক্‌না পাটের দড়ি
দুই জনাতে নিয়া যাবে, শ্মশান ঘাটের বাড়ি।

চিত্রগুপ্তের খাতা লয়ে, বেড়ায় বাড়ি বাড়ি,
পরমায়ু শ্যাষ হইলে, হস্তে দিবে দড়ি।
দুই জনাতে যুক্তি করে, আনল ভবের হাটে,
তুই জীবন ছাড়ি গেলি, নিধুয়া পাথারে।
ছোট হইতে পুষলাম তোরে, দই ও দুগ্ধ দিয়া,
তুইও জীবন ছাড়িয়া গেলি বুকের শেল দিয়া।

বাউদিয়া তার প্রশ্নের জবাব নিজেই খুঁজে পায় তার অন্তরাত্মার কাছে। চিন্তা করে দেখে, সত্যিই তো এমন দেহের জন্য আক্ষেপই বা কেন, মায়া করেই বা কী হবে ? এই যে আত্মীয় পরিজন, এতো দুদিনের, মৃত্যুর সংগে সংগেই তো তুমি তাদের কাছ থেকে পর হয়ে যাবে, সুতরাং এ পার্থিব ভোগ-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করে সেই অনন্তলোকের প্রতি তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ কর—কোনো কষ্ট, কোনো দুঃখ, কোনো ক্ষোভ আর থাকবার অবকাশ পাবে না :

ওকি মনসুয়া—
একদিন ছাড়িয়া যাবু দেহ আন্ধার কো-রিয়া।
(আর) জোরা নৌকা জোরা বৈঠা মোন,
জোরা বাতিরে (এ) জ্বলে
(ও তার) দেহের বাতি নিভিয়া গেলে মোন,
কে জ্বালাবে বাতিরে মনসুয়া।
ভাই বল, ভাতিজা বল মোন
সম্পত্তি রো রে (এ) ভাগি,
আগে লইবে ধনের ভাগ ভাই,
পিছে দে-হার গতিরে মনসুয়া।
কেউ নিবে খন্তা কোদাল মোন,
কেউ বা জোয়ারে রে লড়ি।
(আর) নিধুয়া পাথারে যাইয়া মোন,
বাঁধবে ঘর আর বাড়িরে মনসুয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সারি ও ভাটিয়ালী

সারিবদ্ধভাবে বা একত্রে কাজ করতে করতে যে লোক-সংগীত গাওয়া হয় তাকে 'সারি' গান বলা যায়। তবে প্রধানতঃ নৌকার মাঝিরা যখন সারিবদ্ধভাবে বা একযোগে নৌকা বাইতে বাইতে গান করে তাদের নৌকা বাওয়ার পরিশ্রমকে মধুর করে তোলবার জন্য সেই সময়কার গানকেই আখ্যা দিয়েছে সারি গান বলে। 'ভাটিয়ালী' গানও সারি পর্যায়ভুক্ত। দুই-ই মাঝি-মাল্লাদের গান। সুরের বৈচিত্র্য এখানে খুব বেশি না থাকলেও এগুলি অত্যন্ত আবেগধর্মী সংগীত। এর ভিতর ভাটিয়ালী হলো একক কণ্ঠের, আর সারি গান হলো "কোরাস" বা সমবেত কণ্ঠের।

সারি

পণ্য সামগ্রী বোঝাই করে সব মহাজনী নৌকা যাত্রা করে বিদেশের পানে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলতে থাকে তারা। তারা চলাচল করে কতকগুলি নৌকা একযোগে ; এই নৌকার দলকে একত্রে বলে 'বহর'। এক এক বহরে নৌকার সংখ্যাও থাকে প্রায় কুড়ি, পঁচিশখানা করে। স্রোতের মুখে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে প্রত্যেক নৌকার মাঝিরা একযোগেই দাঁড় টানতে টানতে কখনও বা বৈঠা বাইতে থাকে। নৌকার হাল ধরে বসে থাকে পাটমাঝি। নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে পাটমাঝি ধরে গান, সংগে সংগে তান ধরে অন্যান্য মাঝি-মাল্লারা। এক নৌকার সুর ছড়িয়ে পড়ে আরেক নৌকায়, তার থেকে আরেক নৌকায়, এইভাবে গোটা বহরটা জুড়ে বিরাজ করে একই গানের সুর। সেই সময় মনে হয় গোটা বহরটাই বুঝিবা একই সংগে একই গান শুরু করেছে। তাদের দাঁড়ের বা বৈঠার টানের সাথে সাথে সুরের অপরূপ মূর্ছনায় সৃষ্টি হয় এক অপরূপ মায়াজালের :

উজান মুখে চালাও তরী দরিয়ার (২)
ওরে ঈশান কোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে রে
লাওয়ের (নৌকার) বাদাম দিলে তায়।

(হারে) বাউরী বাতাস লাগে আইস্যা কালাপাণীর গায়
লাওয়ের বাদাম লিলে তায়।
(ওরে) ঢেউয়ের বুকে হালের দড়ি ছিড়ল বুঝি হায়,
(ওরে) গুরুর নামে শিন্নি দিব রশুল পীরের দরগায়,
লাওয়ের বাদাম লিলে তায়॥

উত্তর বঙ্গে রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন দেখা যায় হিন্দু মুসলমান সকল জাতির মানুষের মিলিত নৌকা বাইচের ঘটা। সারি সারি সব বাইচের নৌকা। নৌকায় নৌকায় শুরু হয় প্রতিযোগিতা। তখনও ঠিক এই একই কায়দায় নৌকার মাঝিরা গানের তালে তালে তাদের বৈঠা ওঠানামা করায় এবং গানের সুরে সুর মিলিয়ে গান গেয়ে গেয়ে নৌকা বাইচ দেয় তথা তাদের পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টা করে। কখনও কখনও এই নৌকা বাইচের সময় এক নৌকার পাটমাঝি অপর নৌকাকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবার জন্য তার দলের মাঝিমাল্লাদের উত্তেজিত করবার জন্যও গান করে। এ-যেন রণস্থলে এগিয়ে চলেছে সৈন্যদল, সেনাপতি উৎসাহিত করছেন তার সৈন্যদের :

"(এই) চলে চলে চলে নাও হেইও।"
"চল্ চল্ উড়াল দিয়া চল্" ইত্যাদি।

তা ছাড়া গানও গায়। এই গানের সময় তাদের সঙ্গে সংগত করবার জন্য প্রয়োজন শুধু দামামা ও কাঁসির। দামামার শব্দের তালের সাথে সাথে কাঁসির আওয়াজ ও সেই সঙ্গে বৈঠার ছপ্ ছপ্ শব্দের সাথে সংগতি রেখেই একধারে তাদের গানও চলে, অন্যদিকে নৌকাও পবন গতিতে অগ্রসর হতে থাকে :

হো ঐ দেখ্ কে যায়রে—
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া,
জিজ্ঞাস কইরা দ্যাখ তারে
কোন্ বা দেশী নাইয়া।
বাইছালী খেলাইয়া মধুর
সুরে যায় গান গাইয়া,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া।
ছাড়ছে তরী তাড়াতাড়ি
কোন্ বা দ্যাশ বলিয়া,

কোন্ দ্যাশ হইতে কোন্ দ্যাশে নাও
লাগাবে যাইয়ারে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া।
নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, ভাত পানি না খাইয়া,
বিনা পয়সায় ব্যাগার খাটে
কোন্ বা যে সুখ পাইয়ারে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া।
দেখিয়া নাওখানি কহে মজিদ মিঞা,
নাওরে বার্নিশ দিছে রং লাগাইছে
চকমকিবার লাইগারে,
নিশান টাঙাইয়া নাও বাইয়া ॥

কিংবা :

(১) আমরা নাও চালাইরে ত্রিতাল গাঙ্গ দিয়া,
বৈঠার টানে গাঙের পানি উঠে ছল্ছলাইয়া।
সাইরে সাইরে বৈঠা উঠে সাইরে সাইরে পড়ে,
সুজন মাঝি পিছায় হাইল ক্যাড়লি তার ধরে।
বামনবাইরার নাওদৌড়ানি সবার জুড়ান জানি,
রং-বেরং-এর নাওরে ভাইরে ঝল্মল্ করে পানি ॥

(২) লাঙ্গর ছাড়িয়া নাওয়ের দে দুখী নাইয়া
বাদাম উড়াইয়া নাওয়ের দে (হো)।
ঢেউয়ের তালে তালে তালে
কোরতালি দে—
(আরে হো হেঁইয়া)
কোত ঝড়্ল চোখের পানি
কোত জান হইল কুরবাণী,
বদর বদর বদর বদর জোয়ধ্বনি দে ॥
ভাঙ্গা নাওয়ের ভাঙ্গা পাল
কোর্ মেরামত,
(আরে হো হেঁইয়া)
আমরা গরমদ্ ইমারৎ,

আমরা ফিরাইমু ইজ্জৎ।
বদর বদর বদর বদর জোয়ধ্বনি দে ॥

দীর্ঘ দিন ধরে চলেছে নৌকা। দিনের শেষে রাত, রাতের শেষে দিন, যাত্রাপথ বুঝি আর শেষ হয় না। এই সময় হয়তো বা মন কিছুক্ষণের জন্য উদাসও হয়ে ওঠে, তখন তাদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে :

আমার একা যেতে ভয় করে,
চল্‌রে গুরু দুজন যাই পাড়ে।
আমার এ দেহ পাষাণের সমান,
গুরু এসে মন্ত্র দিয়ে করল ফুলবাগান।
(চল্‌ দুজন যাই পাড়ে)।
বাগানে ফুল ফুট্যাছে, বাস ছুট্যাছে
সৌরভ ছুট্যাছে রে,
ও তাতে অধর চাঁদ বিরাজ করে,
চল্‌রে গুরু দুজন যাই পাড়ে।
আগে দেহের স্বভাব ছাড়,
বাহির ভিতর সমান কর,
সুজন মাঝির সঙ্গ ধর,
নিবেন নৌকায় তুলে।
মায়ার খেলা ছাড়রে মন
বেলা যায় তোর বহিয়া।
চৌষট্টি বছরে পাড়ি,
বেলা আছে দণ্ডচারি,
বেলা শেষে বসবে নবি,
আসবে ঘাটে বসে আয়,
মায়ার খেলা ছাড়রে মন
বেলা যায় তোর বহিয়া।

সারি গানের বাণী যে সব সময় একই ধরনের হয় তা নয়, উল্লিখিত গীতটিতেই তা প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য চলতি কথায় একে বলা হয় 'পাড়ের গান', কিন্তু এসবই সারি গানের অন্তর্ভুক্ত এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এ ছাড়াও সারিগানের ভিতর তাদের জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙক্ষা, অভাব অভিযোগের কথাও ব্যক্ত হয়েছে অতি সুনিপুণ ভাবে। কারণ, এ গানের রচয়িতা যে তারাই। পল্লীর নিরক্ষর দাড়ি মাঝিরাই হলো এর রচয়িতা। কাজেই এর ভিতর তাদের জীবন চিত্র এবং সমাজ চিত্রের মধ্যেই রয়েছে বাঙালী জাতীর সমাজ ও সংস্কৃতিরই ইতিহাস। উদাহরণ স্বরূপ একটু লক্ষ্য করে শুনুন এই গানটি। সারবন্দী হয়ে চলেছে সব বাণিজ্যের নৌকা বিদেশের পানে। নৌকার মাঝি মাল্লারা সকলেই অনেকদিন হয় দেশ ছাড়া। ঘরের প্রিয়জনের মুখ মনে পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাই হয়তো কোনো প্রবাসী মাঝি মাল্লার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তার পত্নীর গুণপনা। এর ভিতর এক ধারে হাস্যরসের খোরাক, অপর দিকে তাদের সহজ সরল মনোভাবটি অতি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। চল্‌তি কথায় এ-সব গানকে বলে 'নাইওরের গীত'।

'নাইওর' কথাটি পূর্ববঙ্গেই সর্বাধিক প্রচলিত। অবশ্য রাজসাহীর মুসলমানদের ভিতরও 'নাইওর' কথাটি ঐ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর আদত অর্থ হলো—বিবাহ উপলক্ষে কোথাও মেয়েদের বেড়াতে যাওয়া। এই বিবাহ বিষয়ক গীতকে পূর্ববঙ্গের কোন কোনো অঞ্চলে এবং রাজসাহীর কোনো কোনো সম্প্রদায়ের ভিতর বলে 'নাইওরের গীত'। 'নাইওরের গীত' অর্থাৎ বিয়ের গান গাইতে মেয়েরা বিশেষত: এই সব নিরক্ষর পল্লীবাসীগণ খুবই ভালবাসে। লোক-কবি তার বৌয়ের অপরাপর দোষগুণ বর্ণনাচ্ছলে বলছে, তার বৌ ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মধ্যেও 'নাইওরের গীত' গাইতে থাকে :

বউটু আমার নাইওর যাইতে চায়
রঙিলা দিদিগো
বউটু আমার নাইওর যাইতে চায়।
(দিদিগো) ভাত আন্‌তে (রাঁধ্‌তে) জানে না বউ
ভাত যে পাকায়,
আফুটা ভাত খাইয়া গুষ্ঠির
প্যাট বুড বুডায়।
(দিদিগো) আমার বৌয়ের নজর ভালো নয়
বৌ কি সরমায়,
আল্‌গা মানুষ দ্যাখ্‌লে বৌ যে

উঁকি মাইরা চায়।
(দিদিগো) আর একটা দোষ আছে যে বৌর
ক্যাবল পইরা ঘুমায়।
ঘুম দিয়া বৌ স্বপ্নের পরে
নাইওরের গীত গায়।
(দিদিগো) এ বৌ দিয়া কাম চলবে না
কয় মজিদ মিঞায়
নাক চুল কাইট্যা কইর‍্যা দেই বিদায়।

নাইওরের গান (গীত) যে শুধু এই রকমেরই হয় তা নয়। অনেক সময় এইসব গানের ভিতর দিয়ে অল্পবয়সী বৌ-ঝিদের বাপের বাড়ি যাবার আকুলতাও প্রকাশ পায়। মনে করুন, একটি বালিকা বধু যেন তাঁর স্বামীর কাছে আবদার ধরেছে, বাপের বাড়িতে তার ভাইয়ের বিয়ে—সে 'নাইওর' যাবে, অনুমতি চাইছে ; বধুটি বলছে, 'ওগো প্রাণনাথ, দয়া করে এক বারের জন্য আমায় আমার বাপের বাড়ি যাবার অনুমতি দেও, ঠিক দিনে আমার মা এসে আবার আমায় এখানে রেখে যাবে। দাদা আমায় নিতে এসেছে, তাকে আর ফিরিয়ে দিও না। অনেকদিন হয় বাবা মাকে দেখি না, তাদের জন্য আমার মন কেমন করছে, একবারের জন্য অন্তত: যাবার অনুমতি দেও' :

নাইয়োর ছাড়িয়া দেও মোর বন্ধু,
বন্ধু নাইয়োর ছাড়িয়া দেও।
এইবার নাইয়োর গেইলে কালকে
থুইয়া যাবে মাওহে।
দাদায় আইছে তোমহার বাড়িতে
বন্ধু নাইয়োর ছাড়িয়া দেও,
এক নজর দেখিয়া আইসি
দয়াল বাব মাও হে।
কেমন তোমহার কথা হে বন্ধু,
বন্ধু কেমন তোমহার হিয়া,
সরমে মরিবার চাই হে
গলায় দড়ি দিয়া হে ॥
অদ্য গুরু পিতা হে মাতা

বন্ধু জনমদাতা বাবে,
কাঞ্চ সোনা বুড়ার আশ হে
মরবে অভিশাপে।

স্বামী যখন কিছুতেই তাকে তার বাপের বাড়ি যেতে দিল না, তখন কয়দিন পর একাকি বসে থাকতে থাকতে চালের উপর একটি কাক দেখতে পেয়ে মনে হলো, এ কাক বুঝিবা তার বাপের বাড়ির দেশেরই। তাই কাককে সম্বোধন করে বলছে, 'হে কাক, তুমিতো আমার বাপের বাড়ির দেশের, তুমি আমায় বল কেমন আছে আমার বাবা-মা। ওগো কাক, তুমি আমার মায়ের কাছে গিয়ে খবর দিও, টাকার লোভে পড়ে তিনশ টাকা পণ পেয়ে এই দূর দেশে আমায় কেন বিয়ে দিয়েছিল? আজ আমার মন সর্বদাই তাদের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু কী করব? আমার যে এখান থেকে যাবার কোনো উপায় নেই। আমি বুকে পাষাণ ধরে কোনোমতে বেঁচে আছি। ওগো বন্ধু কাক, আমার অভাগী মা আমার জন্য না জানি কত কান্নাকাটিই করছে। তার কাছে দয়া করে পেঁৗছে দিও আমার এই দুঃখের কথা':

ও মোর কাগারে—
কী খবর আনিছ বাবার দেশের,
দুষ্টা বাপের এমন মন
তিনশ টাকা নিয়া পণ রে
কোগারে বেচিয়া খাইলেক মোক্ দুরন্তর দেশেরে॥
(আজি) তোর কাগার ধরং পাও,
কী খবর কাগা কয়া যাওরে
ও মোর কাগারে—
কেমন আছে কাগা মোর অভাগী মাওরে॥
আজি পাষাণ বুকেতে ধরি
দূর দেশে কাগা আছং পড়িরে
ও মোর কাগারে—
নারীর মন মোর ঝোরে রাতি দিনে রে॥
তুই মোর পরাণের কাগা শুনেক ও মোর কথা,
মায়ের আগে কবেন যয়া মোর দুঃখের কথা,
আজি রবে মাও মোর কান্দিয়া কাটিয়া রে॥

প্রবাসে স্বদেশের কোনো লোকের দেখা পেলে তাকেই পরমাত্মীয় বলে মনে হয়। নিজের দেশে আমরা সহোদর ভাইয়েরও মুখ দর্শন করতে চাই না, কিন্তু বিদেশে গিয়ে শুধু মাত্র 'দেশী মানুষ' এই সুবাদে তার সঙ্গেই আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেলি। তখন দেশের কোনো পশু পাখী দেখলেও তাকে পরমাত্মীয় বলে মনে হয়। এই গীতটিতে এক বালিকা বধুর অন্তরের বেদনা বহন করবার ভার দেওয়া হয়েছে একটি অপাঙতেয় পাখীকে। পক্ষীর সঙ্গে এই যে মানবীয় আত্মীয়তা, বোধহয় অন্য দেশের সাহিত্যে খুব কমই মেলে। লোক-কবির কাব্যে মানুষে আর পশুপক্ষীতে কোনো ভেদ নাই। তারা চন্দ্র-সূর্যকে যেমনি 'মিতা' সম্বোধন করেছে, প্রকৃতিদেবীকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে পূজা করেছে—পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গও তাদের আত্মীয়তার গণ্ডীর বাইরে নেই।

ছাত পেটা

সারিগান বলতে যে শুধু 'নৌকোবাইচ' বা মাঝি মাল্লাদের সম্মিলিত গীতিই বোঝায় তা নয়। এর ব্যাকরণগত অর্থ ধরলে 'ছাতপেটা,' 'ধানকাটা' প্রভৃতি গানও এই সারি পর্যায়ভুক্ত বলা চলে।

পরিশ্রম লাঘবের জন্য কখনও শুধু সমবেত কণ্ঠে, কখনও বা একক কণ্ঠে তারা এই গান গেয়ে পরিশ্রমকে সহনীয় করে তোলে, দূর করে তাদের একঘেয়েমী ভাব। নমুনাস্বরূপ ধরা যাক পূর্ববঙ্গে প্রচলিত একটি ছাতপেটা গানের কথা।

সারবন্দী হয়ে বসে গেছে সব মজুর ও মজুরাণীরা। রাজমিস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে এদের থেকে একটু দূরে। সে গাইছে গানের একটি কলি আর মজুর ও মজুরাণীরা সঙ্গে সঙ্গে একযোগে পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে সেই গানের, আর সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করছে হাতের পিটুনিগুলি। এখানে লক্ষ্য করুন ছন্দের সঙ্গে সুরসঙ্গীতির—একই সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে তাদের হাতের কাজ। এখানে সুর ধরে রাখবার জন্য কোনো যন্ত্রের ব্যবস্থা নেই। হাতের পিটুনির আঘাতের শব্দই তাদের যন্ত্রের কাজ করে। এই সঙ্গে যে-সব গান চলে তার বিষয় বস্তু অধিকাংশই নরনারীর চিরন্তন সম্পর্কজনিত, কতকগুলি আবার একটু চড়া রং-এর :

চাঁদ বদনী তুই লো আমার জীবন মরণ কাঠি,
তোরে না দেখিলে পরে মরি লো দম ফাটি।

তালুক মুলুক তুই লো আমার তুই লো টাহার তোড়া,
নামাবলী তুই লো আমার তুইলো ভাঙ্গা বেড়া।
তুই যে আমার রসগোল্লা মণ্ডা মিঠাই ছানা,
শীতের কাঁথা তুই যে আমার রইদের মিছরী পানা।
বর্ষা কালে তুই লো আমার তালপাতার ছাতি,
তোরে না পাইলে ফরশা হয়লো আন্ধার রাতি।
তুই যে আমার পাঁজিপুথি বেদ কোরাণের যুক্তি,
সাধন ভজন তুই যে আমার সাত পুরুষের মুক্তি।
টাহা পয়সা দিয়া তোরে কইর‍্যাছিলাম বিয়া,
বিনা খতে অইচি গোলাম গাঁইটের টাহা দিয়া।
আমার কাছে আয় লো হেসে চাইনা আর কিছু,
আমি লো তোর বান্দার বান্দা ওই চরণের পিছু।

কিংবা :

তুই আমার চান্দের কোনা (কণা)
আন্ধার কইর‍্যা কই গেলি লো,
আন্ধার কইর‍্যা কই গেলি লো,
পাগল কইর‍্যা কই গেলি লো।
আইন্যা দিনু ঢাহাই শাড়ি,
পইর‍্যা যাবি বাড়ি বাড়ি।
দুই তাল্লাতে রাখব তোরে,
খেড়ী ঘরে রাখব না লো।

অথবা :

দে দে কানাইয়া লাল
বসন আমার হাতে দে—
কুলনারী মরি লাজে যে।

পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলেও অনুরূপ গান শোনা যায় কিন্তু সেগুলি যেন একটু আদিরসাত্মক বলে মনে হতে পারে :

হোক্ সে কালো, আমার বড় ভাল লেগেছে,
কাঁঠাল গাছের আঠার মতো জড়িয়ে ধরেছে।

মুচ্কী হাসি হেস্যে আবার চাকু মেরেছে,
কাঁঠাল গাছের আঠার মতো জড়িয়ে ধরেছে।

যদিও এই সব রাজ, মজুর ও মজুরাণীদের অধিকাংশই মুসলমান সমাজের লোক তা হলেও এদের গানের মধ্যে অনেক সময় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাও বর্ণিত হয়েছে, কখনও কখনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মনে হয় এই শ্রেণীর গান গুলিও আদিবাসী সমাজ থেকে এসেছে এবং এ-গানের প্রেম ভালবাসার কথাগুলি রাধাকৃষ্ণের 'বিরহ-মিলন কথায়' স্বগীয়তা লাভ করবার চেষ্টা পেয়েছে :

গেন্ধা ফুল তুলতে গেনু
সাট (আট) ঘড়িয়ার জোঙ্গলে,
আঁড নয়নে দেখলে এসে
গয়লাদের ওই দঙ্গলে।
গয়লার বেটা কিস্টো ছোঁড়া,
মা যশোদার নয়ন মণি,
কুলনারীর ধরম গেইল
দেইখ্যে তাহার চোখ ঠারানি।

ভাটিয়ালী

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সারি আর ভাটিয়ালী উভয়ই মাঝি মাল্লাদের গান। এর মধ্যে সারি হলো সমবেত কণ্ঠের আর ভাটিয়ালী হলো একক কণ্ঠের। মূলতঃ ভাটিয়ালী সারি শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত, একথা সহজেই অনুমান করা যায়, যেহেতু সারিগান সমবেত কণ্ঠের সেইহেতু এর নৌকাগুলিও বড় ধরনের হওয়া স্বাভাবিক। আর ভাটিয়ালী গান যেহেতু একক কণ্ঠের সেইহেতু এর নৌকা-গুলিও সাধারণত ছোট—যাকে বলে এক মাল্লাই। কাজেই এখানে মাঝিকে একাকিকেই গান গাইতে হয়, নদীর কলতানের সাথে বাতাসের সুরে সুর মিলিয়ে তার মনের কপাট খুলে দিয়ে গান ধরে তার অচিন প্রিয়ার উদ্দেশ্যে। কখনও কখনও এদের এই সব গানে অনেক তত্ত্বকথারও সন্ধান মেলে। যেহেতু তাদের গানের পিছনে কোনো কাহিনী নেই, সেইহেতু তাদের গান অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত আবেগধর্মী হয়ে থাকে।

নৌকা ভাটির টানে এগিয়ে চলেছে, মাঝি ধরে আছে বৈঠা, তখন তার করবারই

বা আর কি আছে ! নৌকার নিচে ছল্‌ছলাৎ ছল্‌ শব্দ করে বয়ে চলেছে নদী. গায়ে এসে লাগছে মিঠে হাওয়া যেন ঘুমপাড়ানী গান শুরু করেছে প্রকৃতি দেবী, হালের বৈঠা চেপে ধরে গলা ছেড়ে দেয় মাঝি :

এ লহর দরিয়ার মাঝে
বাইয়া যাইও রে মাঝি
আমার ভাঙ্গা নাও।
ঘরখানি ভাঙ্গা মনা ভাই (তবে) দোর ক্যানে বান্ধ,
(ওরে) আপনি মরিয়া যাইবা তবে পরের লাগি ক্যানে কান্দ।
বাইয়া যাইও রে মাঝি আমার ভাঙ্গা নাও।
কুমারের হাঁড়ি পাতিল ভাঙ্গলে না যায় জোড়া,
ওরে এমন সোনার তনু ক্যামনে যাইবে পোড়া।
বাইয়া যাইও রে মাঝি আমার ভাঙ্গা নাও॥
সমুদ্রের মাঝে মনা ভাই ভাইস্যা ফিরে পানা,
তবে সে কোন গোঁয়ারে বলে এ দেহ আপনা।
বাইয়া যাইও রে মাঝি আমার ভাঙ্গা নাও॥
(ওরে) পুত্র হৈল পায়ের বেড়ী, কন্যা হইল কাল,
(ওরে) ছাড়িয়া না ছাড়ে আমার এ ভব জঞ্জাল (রে),
বাইয়া যাইও রে মাঝি আমার ভাঙ্গা নাও॥

এ মানব জনম যে কিছুই নয়, সবই অনিত্য, এই মহাতত্ত্ব কথা বাংলার লোক-কবি প্রচার করে গেছে অতি সহজ সরল ভাবে। তাই এ ভব নদী পার হবার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছে সেই দীন তুনিয়ার মালিকের কাছে—যে সত্যিকারের পারের কর্তা :

সুজন রসিক নাইয়্যা উজান বাঁকে বাইয়্যা যাওরে।
সাবধানে চালাইও তরী কাণ্ডারী হইয়্যারে॥
রুনু ঝুনু বাদ্য বাজে লিলুয়া বাতাসে।
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু রইয়্যাছে কোন দ্যাশে (রে),
উজান বাঁকে বাইয়্যা যাওরে॥
ডাইনে প্রবাহিত গঙ্গা প্রবল তরঙ্গিনী,
বাণী বলে কোন্‌ সাধনে পার হবি ত্রিবেণী (রে)।

উজান বাঁকে বাইয়া যাইও রে মাঝি
আমার ভাংগা নাও।
একে তোমার ভাটিয়াল সুরে মন নিল হরিয়া রে,
কূলে এসে লাগাও তরী আমারে যাও লইয়া রে।
উজান বাঁকে বাইয়া যাইও রে মাঝি
আমার ভাংগা নাও।

লোক-কবি হয়তো শেষটায় নিজের মনেই প্রশ্ন করে বসছে, এই যে অমূল্য মানব জীবন এতো বৃথায়ই নষ্ট করে ফেলেছে, এ ভব সমুদ্র পার হবার জন্য কি চেষ্টাই বা তুমি করেছ? যদি সত্যিই ভব সাগর পার হতে চাও তা হলে এখনও সময় আছে সেই পরম পিতারই শরণাপন্ন হও :

সুজন নাইয়ারে ক্যামনে যাবি তুই
ভব নদী বাইয়া।
এত সাধের তরী পাইয়া
নষ্ট করলি তুই বাইচ খেলাইয়া (রে)।
ও তোর কাম নদীর ওই নোনা জলে
নায়ের তক্তা যাবে খাইয়া।
অনুরাগের গুণ টানিয়া
বানেতে দেই লাগাইয়া,
ও তুই ভক্তি ভাবে গাব লাগাইও
আর জল উঠবে না বাইয়া॥

জলের দেশ পূর্ববঙ্গ। তাই এখানকার অধিকাংশ গানেই ভাটিয়ালী সুরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে যেমনি গরু বা মোষের গাড়ি, পূর্ববঙ্গে তেমনি চলাচল বা ব্যবসায় বাণিজ্যের একমাত্র সম্বল হলো এই নৌকা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নৌকা বেয়ে চলে দাড়ি মাঝিরা। নদীর কলতান, বাতাসের মোলায়েম স্পর্শ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে মিশে গেছে জ্যোৎস্নার আলো। সব কিছু মিলে উদাস করে দেয় মাঝিদের মন। ফেলে আসা ঘরের কথা স্মরণ করে বাতাসের বুকে ভর করে ছড়িয়ে পড়ে তাদের গীতি গাথা :

বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্ধু রে ও আমার পরাণ বন্ধু রে।
তোমার সনে আমার মনের মিল যেন হয় পর পারে।

(আর) বিধি যদি দিতরে পাংখা
উইড়্যা গিয়া দিতাম দেখা
আমি উইড়্যা পড়তাম সোনা বন্ধুর দ্যাশে।
আমরা ত অবলা নারী
তরু তলে বাসা বান্ধি রে,
আমার বদন চুয়াইয়্যা পড়ে ঘামরে।
বন্ধুর বাড়ি গাঙের পাড়
গ্যালে না আসিবে আর,
আমার বন্ধু না জানে সাঁতার রে।
বন্ধু যদি আমার হও,
উইড়্যা আইস্যা দ্যাখা দাও,
তুমি দ্যাও দ্যাখা জুড়াক পরাণ রে ॥

রাত যায় দিন আসে। দিন যায় আবার ঘুরে রাত হয়। পাট মাঝি হাল ধরে বসে আছে পাছা নৌকায়। দূর দূরান্তরের পথ ধরেছে সে। ধ্রুব তারাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে নতুন বন্দরের দিকে। নিস্তব্ধ নদী, কেবল মাঝে মাঝে অতি মৃদু আওয়াজ আসছে দাঁড় ফেলার। যৌবন এক দিন তারও ছিল। তখনও চুলে পাক ধরেনি, মনটা ছিল সবুজ, জগতের সব কিছুকেই ভাল বলে মনে হতো। সেই সময়কার কথা মনে পড়ে—সদ্য বিবাহিতা পত্নীকে ঘরে রেখে চলে আসতে হয়েছিল মহাজনের নৌকায়, তখনও এমনি নদী ছিল, ছিল এমনি মিঠে হিমেল বাতাস, কিন্তু তার চাইতে ছিল বড় জিনিস, দরাজ গলা। মনের আবেগে গান ধরত :

যহন বন্ধু জ্বলবে রে প্রাণ আমারি নাম লইও,
আমার দেওয়া মালার সনে দুঃখের কথা কইও
(বন্ধু আমারি নাম লইও)।
আমি রইব তোমার লইগ্যা,
(আর) তুমি রইবা আমার লইগ্যা (রে)
এ জনমের আশা লইয়্যা
(বন্ধু) আর জনমে আইসো
বন্ধু আমারি নাম লইও ॥
বিধি মোদের হোলরে বাম

মিলন নাহি হইল
কত অপযশের কথা কত জনায় কইল।

কিন্তু সেদিন আর নেই। তখন সে ছিল জোয়ান বাইছা, আজ পাট মাঝি, আজ তার মাথায় অনেক দায়িত্ব। কিন্তু আজও যে ভুলতে পারা যায় না সে-দিনের সেই রঙিন স্মৃতিগুলি। তাই আজও গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে গান, তবে অন্য ধরনে :

দয়াল গুরু ধন, কোথায় গ্যালে পাব ?
যেই দ্যাশেতে যাইবা গুরুধন
আমি সেইও দ্যাশে যাব।
তুমি হইবা কল্পতরু, আমি হইব লতা
তোমার ছি-চরণ জড়াইয়া রইব
ছাইড্যা যাইবা কোথা ?
সুতেরি শ্যাওলা হইয়্যা ঘাটে ঘাটে ফিরি,
এমন বন্ধু নাই যে আমার উপায় কিবা করি।

নদীর জীবনে সুখ আছে, আনন্দ আছে, বিপদও যে নেই তা নয়। কিন্তু এ পথের পথিক যারা তারা তা জেনে শুনেই নৌকায় পাড়ি ধরে। পাট মাঝির কণ্ঠে আজ আর বিরহ সংগীত শোনা যায় না, প্রেম সংগীতের পরিবর্তে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে তত্ত্ব কথা :

মন মাঝিরে তুমি বেহুশ হইও না
ও তুমি চোরের সঙ্গে নৌকা বাইও না।
চোরের সঙ্গে নৌকা বাইলে,
(মাঝি) নৌকা ডোবে ছাড়া ভাসে না।
ওরে মহাজনের মাল ভরা হলে
(ও তুমি) পদ্মা পাড়ি দিও না।
পদ্মা পাড়ি দিলে পরে
বিনষ্ট ঘটিতে পারে
তাইতে মাঝি করি তোরে মানা।

রাত শেষ হয়ে আসে। আসন্ন উষা দর্শনে পাট মাঝির মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি তার জীবনও এই ভাবেই শেষ হয়ে আসবে :

মন মাঝি (হরিবল) নৌকা খোল সাধের জোয়ার যায়,
আমার মন ভাবনের বেগ হইয়্যাছে বাদাম তুইল্যা দে নৌকায়
মন মাঝি ভাই এই করিও,
(জলের) রং চিনিয়া নৌকারে ধরো না পইরো ঘোলায়।
যাদের নৌকার মাঝি ভাল পিছন থিকা আগে গেল
ফিরা্যা নাহি চায়,
তারা ডাইক্যা বলে মন মাঝি ভাই
নৌকা লাগাও প্রেম তলায়।

দূরে বন্দর দেখা যায়। শেষ হয় তাদের নৌকা বাওয়া—ব্যস্ত হয় নৌকাকে ঘাটে ভিড়াবার জন্য—ভুলে যায় রাতের স্বপ্নের কথা। কর্মমুখর পৃথিবীর হাটে মিশে যায় মাঝি মাল্লার দল। দূর থেকে শোনা যায় তাদের কণ্ঠস্বর :

(১) আরে ও ভাইটাল গাঙের নাইয়্যা
দুঃখিনীর এই খবর কইও বন্ধুর বাড়ি যাইয়্যা।
ও নাইয়্যারে কইও, কইও মোর বন্ধুর কাছে
মোর প্রতিনিধি হইয়্যা,
আইব বইল্যা আইল না বন্ধু গ্যাল দিন বইয়্যা।
হেমন্ত শীতান্ত গ্যাল মোর কান্দিয়া কান্দিয়া
রে বন্ধু বইয়্যা রইলাম বন্ধুর পথ চাইয়্যা।
মনের আগুন জ্বইল্যা উঠল বসন্তের বাও পাইয়্যারে,
কইও, কইও তুমি মোর বন্ধুরে বুঝাইয়্যারে।
অ বন্ধু মোর মাথার কিরা দিয়া।
বন্ধু আইস্যা যদি দিত দেখা
আমি মরিতাম হেরিয়া।

(২) হারে ও...সুন্দর মাঝিরে—
আমার কথা লইওরে মাঝি আমার কথা লইও
ঝড় তুফান দ্যাখলে মাঝি কিনারে লাগাইও।
আমার কথা লইওরে মাঝি আমার কথা লইও॥
নদীতে উজান দ্যাখলেরে মাঝি ভাটিতে নাও বাইও,
মাঝি ভাটিতে নাও বাইও।

বেশি ভাড়া পাইলেরে মাঝি
উজান বাঁকে যাইও।
আমার কথা লইও—।
হারে ও সুন্দর মাঝিরে—
যদি উজান বাঁকে বাতাস পাও
তাইলে বাদাম তুইল্যা দিওরে মাঝি
পাল তুইল্যা দিও
আমারি কথা লইও।

(৩) ও উর‍্যা বন্ধুরে—
তোমার পাংখা নাই কেনে ?
যাও উর‍্যা বন্ধুরে কত না দ্যাশ বিদ্যাশে।
আমার যদি থাকত পাংখা
আমি যাইতাম তোমার দ্যাশে
(ও উর‍্যা বন্ধুরে)।
আমি আছি বসে তোমার আশে
আমায় দেও দেখা একবার এসে
ও আমার উর‍্যা বন্ধুরে।
(হারে) আমি যদি জানতাম উড়তে
যাইতাম তোমার দ্যাশেরে (বন্ধু)
তোমার দ্যাশে যাওয়ার আশে রে
আমায় ল্যাওনা ক্যানে টেনে
ও আমার উর‍্যা বন্ধুরে।

(৪) ওরে ও সোনার চাঁদ পাখী
কোন্ অপরাধে মোরে দিয়া গ্যালা ফাঁকি।
তোরে না দেখিয়া জ্বলিছে হিয়া রে
আমি কি দিয়া জীবন রাখি।
তোরা এই নাকি এক স্বভাবের জাতি
যার ঘরে যাও তার কর ডাকাতি
সোনার পাখীরে—।

কর বিশ্বাসঘাতকতা তার প্রতি
তাই আমারে আজ করলি নাকি,
আমার এ দেহে না রবে জীবন
ও তোর সঙ্গে যাবে আরও কয়জন
সোনার পাখীরে—।
শেষে এ দেহ মোর হবে পতন
ওরে যতন করার লোক না দেখি
সোনার পাখীরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[বারমাস্যা ও বিচ্ছেদী গান]

বারমাস্যা

যে গানের ভিতর বছরের বার মাসের সুখ-দুঃখের, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে তাকেই আখ্যা দেওয়া চলে বারমাস্যা গান বলে।

এ-গানের গায়কদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ করা হয়নি। এক কথায় জমির কৃষাণ, গহীন গাঙের মাঝিমাল্লা, উদাসী, বাউল, বাউদিয়া সকলেই এ-গান গেয়ে থাকে। অনেক সময় বহু নারীকেও এ-গান গাইতে শুনেছি। ফুল্লরার বারমাস্যা এরই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এর ভিতর মূর্ত হয়ে উঠেছে এক বিরহিনী নারীর গোটা বছরের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কাহিনী। পূর্ববঙ্গে কৃষাণদের বারমাস্যায় বর্ণিত হয়েছে কিভাবে তারা পৌষ মাসে বাস্তু দেবতার পূজা দিয়ে তাদের বৎসর শুরু হয় এবং শেষ হয়েছে অগ্রহায়ণ মাসে গোলায় নতুন ধান তোলা পর্ব দিয়ে। অনেক সময় পৌষ পার্বণ উৎসবে যে মাগনের ছড়া গাওয়া হয়, তার ভিতরও বারমাস্যা গানের অনুরূপ মানুষের গোটা বছরের সুখ-দুঃখের কথা শোনা যায়। তবে এর ভিতর দুঃখের চাইতে সুখের কথাই বলা হয়েছে অধিক পরিমাণে। তাই এগুলিকে খাঁটি বারমাস্যা আখ্যা না দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

পূর্ববঙ্গের ফুল্লরার বারমাস্যা গানের সাথে উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ির প্রচলিত বারমাস্যা গানের সাথে কিছু কিছু পার্থক্য নজরে পড়ে। রচনা শৈলী, অনুপ্রাস, সুর-সংগতির কথা বাদ দিলেও এর প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যও বড় কম নয়।

পূর্ববঙ্গের বারমাস্যা গীত গেয়ে থাকে সাধারণতঃ কৃষাণেরা। কিন্তু উত্তর-বঙ্গের কুচবিহার, দিনাজপুর অঞ্চলের বারমাস্যা গান গায় বাউদিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা।

জলপাইগুড়ি অঞ্চলে আবার এ-গান গায় কৃষাণেরাই। তবে উভয় অঞ্চলেই এ-গানের সংগে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় দো-তরা।

প্রসংগত উল্লেখ করা চলে যে, সকল স্থানের লোক-কবির দল ঠিক একই ভাবে বা একই মাস থেকে তাদের কাহিনী বর্ণনা শুরু করেনি। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, কুচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত একখানা ভাওয়াইয়া সুরের বারমাস্যা গানের কথা।

গানের বিষয় বস্তু হলো কোনো নারীর পতি গেছে বিদেশে, পতি বিহনে সেই রমণীর দিন যে কি ভাবে কাটছে তা অতি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে এই গান খানায়।

এ গানটি আরম্ভ হয়েছে ফাল্গুন মাস থেকে, শেষ হয়েছে মাঘ মাসে। কবি যেন বিরহিনী নারীর হয়ে প্রশ্ন করছে তার দূরের সখাকে, 'হে বন্ধু, তুমি কি এতই নিষ্ঠুর—এই তো ফাল্গুন মাস, বসন্ত কাল শুরু হলো, তুমি কাছে নেই কেমন করেই বা আমার দিন কাটে বলো। চৈত্র মাস এল, এতেতো শুধু আমায় পুড়িয়েই মারল। জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছে ধরবে পাকা ফল। তোমাকে ফেলে কি করে তা মুখে দেই বল ? এর পরই আষাঢ় মাসে নদীতে এল নতুন জল, দুকূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হতে লাগল দেশের ভিতর দিয়ে। এমন দিনে তোমার কথাইতো আমার মনে হয় শুধু। ভাদ্র মাসে আমি অস্থির হয়ে উঠলুম তোমার জন্য। আশ্বিনের সাথে সাথে বর্ষা বিদায় নিল, শরৎ হেসে উঠল মিষ্টি সে হাসি। কিন্তু কই তুমিতো ফিরলে না আর আমার কুঞ্জদ্বারে। এর পর আবার অঘ্রাণ মাসে মাঠে মাঠে দেখা দিল হৈমন্তিক ধান। গন্ধে ভরপুর হলো গৃহস্থ আঙিনা। এর পরই এলো দীর্ঘ শীতের রাত, তোমাকে ছেড়ে কি করেই বা থাকব বল ? ওগো বন্ধু, তোমাকে ছেড়ে এই ভাবেইতো আমার দিন কাট্‌ছে':

কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ পতি মনেতে—।
ফাগুন মাসে অধিক জ্বালা,
চৈত্রে নারীর বরণ কালা (রে)।
বৈশাখ মাস গেল কইন্যার ভাবিতে ভাবিতে,
কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ পতি মনেতে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্টফল
আষাঢ় মাসে নয়াজল (রে),
শাবণ মাস গেল কইন্যার শয়নে স্বপনে,
কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ পতি মনেতে।
ভাদ্দর মাসে আউল্যা ক্যাশ,

আশ্বিন মাসে বর্ষার শ্যাষ (রে),
কার্তিক মাস গেল কইন্যার উঠিতে বসিতে,
কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ পতি মনেতে।
অঘাণ মাসে হেমতি ধান,
পৌষ মাসে শীতের বান (রে)
মাঘ মাস গেল কইন্যার দেখিতে দেখিতে,
কত পাষাণ বাইন্ধ্যাছ পতি মনেতে।

জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত বারমাস্যা গান শুরু হয়েছে অগ্রহায়ণ মাস থেকে, এর ভিতর দেখবেন সেই কোনো এক বিরহিনী নারী যেন তার দূর প্রবাসী পতিকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'এইতো অগ্রহায়ণ মাস এলো বছরের প্রথম মাসে, ঘরে ঘরে নতুন ধান উঠছে, গৃহস্থের আঙিনা ভরপুর হয়ে উঠেছে নতুন গুড় আর পায়েসের গন্ধে। কিন্তু হলে হবে কী ? তুমিতো কাছে নেই কেমন করেই বা মাঘের এই দুরন্ত শীত কাটাব বল। দেখতে দেখতে ফাল্গুনের তামাটে রোদে শরীরও কালো হয়ে গেল, আমার-দেহের ভিতর ও বাইরে কত পরিবর্তনই না ঘটল। বৈশাখ মাসে গাছে গাছে ফুটল নানা রংয়ের ফুল, জ্যৈষ্ঠে গাছে গাছে ঝুলতে শুরু করল পাকা পাকা ফল, আষাঢ় মাসে নতুন জলে ছেয়ে ফেলল নদী নালা, পুকুর পুষ্কর্ণী। শ্রাবণ মাসের এমন দিনে শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন ঝুলন যাত্রায়। বছর ঘুরে ঘুরে ভাদ্র মাস এলো, এমন দিনে তালের পিঠে, এবং এর পরই আশ্বিন মাসে কচি-কচি শশা কি চমৎকারই না খেতে লাগে! কিন্তু হায়! সবইতো বিফল হলো তোমার বিহনে। তুমি কি এতই পাষাণ, আমার গোটা বছরের এই কাহিনী শুনেও কি চুপ করে থাকবে ?' :

অঘাণ মাসে নতুন ধানা
পৌষমাসে নায়ের মালা (হে)
বঁধু মাঘের শীত না সহে পরাণে।
কত পাষাণ বেঁধেছ বঁধু হে
ও বঁধু (পরাণে) মাঘের শীত না সহে পরাণে।
ফাগুন মাসে দেহ কালা
চৈত্র মাসে প্রেম জ্বালা (হে)
বৈশাখ মাসে নানা ফুল
ফোটে ফুল বনে (হে)

মাঘের শীত না সহে পরাণে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে, মিষ্টি ফল হে,

আষাঢ় মাসে নতুন জল হে,

শ্রাবণ মাসে জল কেলি করে

(কত) বঁধু সনে বঁধু হে

মাঘের শীত না সহে পরাণে।

ভাদ্দরেতে তালের পিঠা,

আশ্বিনেতে শশা মিঠা,

কার্তিক গেল বঁধু বিনে রইব কেমনে

(হায় হায়)

কত পাষাণ বেঁধেছে বঁধু মনেতে।

'বারমাস্যা' গান যে শুধু এই ধরনেরই হয়, তা নয়। তবে এর মোদ্দা কথা একই—সম্বৎসরের সুখ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা। প্রসঙ্গতঃ মেদিনীপুরের 'লোধা' নামে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত 'বারমাস্যা' গানের উল্লেখ না করে পারা যায় না। এদের ভাষা বাংলা ও সাঁওতালীর সংমিশ্রণে গঠিত। কিন্তু এর ভিতরও দেখুন—সাধের বন্ধু ছেড়ে চলে গেছে অনেক দিন হলো, দিন যায়, মাস যায়, বৎসরও ঘুরে গেল অভাগিনী নারী কেমন করেই বা তার দিন কাটাবে প্রাণবঁধুকে ছেড়ে :

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।

বৈশাখে বসন্ত-জ্বালা, ছেড়ে গেল চিকন কালা

আমরা নারী হই অবলা,

কেমন করে রইব ঘরে,

নাথ আমারে ছেড়ে রইলে গিয়ে দেশান্তরে॥

জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জলে, ডেকেছিল রাধা বলে,

শাড়ির না আঁচল ধরে,

কতই না কাঁদাত মোরে

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে॥

আষাঢ়ে দু কূল জল, পদ্ম ভাসে টল মল

হত যদি গাছের ফল,

অভাগী আনত ঘরে।

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে ॥
শ্রাবণে হয় বরিষা, রাম ছাড়া হলেন সীতা,
আমার বাদী কেবা ছিল,
আমার পতি নিল হরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে ॥
ভাদ্রে ভাবি দিবা নিশি, নয়নের নীরে ভাসি
আমি নারী হই রূপসী,
কেমন করে রইব ঘরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে ॥
আশ্বিনে আনন্দ মাসে বন্ধু রইল পরবাসে,
আমি নারী হই অবলা,
কেমন করে রইব ঘরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে ॥
কার্তিকে কালিকা পূজা, বাবুগণের রং তামাশা
আমি নারী শূন্য ঘরে,
পতি নাহি পালঙ্কের পরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে ॥
অগ্রাণেতে নতুন ধান, ঘরে ঘোচাবে মান
কাল বেঁধেছি রাখির ধান,
ষষ্ঠী রম্ভা ধারণ করে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে ॥
পৌষে পরম সুখী, বন্ধু হলেন পরবাসী,
আমার বাদী কেবা ছিল,
আমার পতি নিল হরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে ॥
মাঘেতে মাঘ বসন্ত, ফুরাইল মনে ভ্রান্ত
আমার কান্ত এলোনা ঘরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে ॥
ফাল্গুনে ফাগুয়া খেলি, ডেকেছিল রাধা বলি
খাট পালঙ্ক ত্যাজ্য করি,

কার পতিকে আনবো ঘরে,
নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে ॥

চৈত্রেতে চড়ক যাত্রা, ফুরাইল মনের ভ্রান্ত
আমার কান্ত এলোনা ঘরে,
নাথ আমারে ছেড়ে গিয়ে রইল দেশান্তরে ॥

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পূর্ববঙ্গে কৃষাণেরা জমি চাষ করতে করতে অনেক সময় যে সব বারমাস্যা গান গায় তার ভিতর বিচ্ছেদ বা দুঃখের কোনো খবর থাকে না, পরিবর্তে ধান চাষের বিষয়ই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে :

আয় লো তরা ভুঁই নিড়াইতে যাই,
ভুঁই মোর গো মাতা পিতা, ভুঁই মোর গো পুত,
ভুঁইর দৌলতে মোর গো আশী কোঠা সুখ।
(এই) পৌষ মাসে দেলাম পূজা বাস্তু দেবতার পায়,
মাঘ মাসে বসুমতীর চরণ ছোঁয়ায।
ফাল্গুন মাসে দেলাম লাঙল, চৈত্র মাসে বীজ,
বৈশাখেতে চিকচিহানী জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ।
আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার ফসল ফলে,
ছেরাবনে আউস ধান গেরহস্তেতে তোলে।
ভাদ্র গ্যাল, আশ্বিন আইল, কার্তিকে দেয় সাড়া,
অগ্রাণেতে ক্ষ্যাতের পরে দ্যাখরে আমন ছড়া।
আমন ওঠে ঘরে ঘরে দুঃখ কিছু নাই,
আইস এবার যাবার বেলা চরণ বন্দি তার।
(ওগো) সপ্ত ডিঙা মধুকরে যত ধানা ধরে,
এবার যেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে।

বিচ্ছেদী গান

'বিচ্ছেদী' এবং 'বারমাস্যা' গানের মূল উদ্দেশ্য একই—উভয়ই প্রিয় বিচ্ছেদ কাতরতায় নায়িকার মনোবেদনা প্রকাশ। পার্থক্যের মধ্যে 'বারমাস্যা' গানে নায়িকার সম্বৎসরের সুখ-দুঃখ বর্ণনা করা হয় আর বিচ্ছেদী গানে নায়িকার সদ্য বিরহ যাতনার কথা বর্ণিত হয়।

বিচ্ছেদী গান সমগ্র বঙ্গ দেশের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিচ্ছেদী গানগুলির অধিকাংশই রাধা-কৃষ্ণের খোলসে মোড়া। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য এ রাধা বা কৃষ্ণের কাহিনী তাদেরই জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ পূর্ববঙ্গে বহুল প্রচলিত একটি বিচ্ছেদী গানে দেখা যাচ্ছে নায়িকা গভীর সুপ্তিমগ্না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কোকিলের ডাকে। ঘুম ভেঙে গেলে তার স্তিমিত বিরহানল পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। আবেগে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু, স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল :

এত রাইতে ক্যানে ডাক দিলি রে প্রাণ কুকিলা,
আমার নিভান অনল জ্বালাইয়া গেলি
(রে প্রাণ কুকিলা)।
(আমার) শিয়রে শাশুড়ী ঘুমায় জ্বলন্ত অগনি,
পৈথানে ননদী ঘুমায় দুরন্ত ডাকিনী।
আমার শাশুড়ী ননদী যদি থাকেরে জাগিয়া,
এখনি মারিবেরে পাথারে ফেলিয়া।
আম গাছে আম ধরে জাম গাছে জাম,
আমি পন্থের পানে চাইয়া দেখি
আসে কি না শ্যাম।
বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মইধ্যে নলের বেড়া,
হাত বাড়াইয়া দিতে পান কপাল দেখি পোড়া।

অনেক দিন হয়তো পতি গেছে বিদেশে, বিরহ কাতরা পল্লীবধূ যেন বলতে থাকে :

আর কত কাল রব রে কালা
তোমার আশা পথ চাইয়া
আমার চাইতে চাইতে জনম গ্যাল,
সময় গ্যাল বইয়া রে কালা,
তোমার আশা পথ চাইয়া।
কত নিশি জলপান বিনে, কান্দি রইয়া রইয়া,
আসি বলে আশা দিয়ে শ্যাম গ্যাল চলিয়া।

আমি একাকিনী সই ক্যামনে রব
অচিন পথ পানে চাইয়্যা ॥
জলধরের কালো ম্যাঘে আকাশ গ্যাল ছাইয়্যা,
আমার হৃদয় মাতানী মালা,
গ্যাল বাসি হইয়্যারে কালা
তোমার আশা পথ চাইয়্যা ॥

কখনও বা বলতে থাকে :

দুঃখিনীরে অকূলে ভাসাইয়্যা
কোথা যাও হে প্রাণ বন্ধু কালিয়া ॥
ও বন্ধুরে আর কী বলিব তোরে,
সকলি আমার কপালে করে,
এখন ক্যান যাইবারে ছাডিয়া ॥
তুমি তিলেক দাঁড়াও, ফিরিয়া চাও,
না দিব ছাড়িয়া,
অ বন্ধুরে, এত যদি ছিল মনে
পিরীতি শিকল ক্যান,
এখন ক্যান যাইবারে ছাড়িয়া ॥
আমি মরিলে যেন তোমারে পাই
পুনঃ জন্ম লইয়্যা,
বন্ধুরে তুমি যদি ছাড় মোরে,
আমি না ছাডিব তোমারে,
তবে ক্যান যাইবারে ছাড়িয়া ॥
ও দীন মহেন্দ্র কয়,
প্রেমের আলসে দীপ দিল জ্বালিয়া ॥

রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বাংলার লৌকিক প্রেমকাব্য। লোক-কবি তাদের মনের বাসনা আকাঙ্ক্ষাকে সংগীতের মাধ্যমে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছে এই রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেম কাহিনীর মাধ্যমেই। তাই বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলেও শোনা যায় বৈষ্ণবীর কণ্ঠে বিচ্ছেদ গান, তারা বলে 'রাই বিচ্ছেদী' :

কালা আমায় পাগল করলিরে—
ঘরে রই ক্যামনে।
পাগল করলি কালারে—
আমায় ঘরে না রাখিলি।
দুঃখের পরে দুঃখ দিয়ে আমায়—
সায়রে ভাসাইলি
ঘরে রই ক্যামনে॥
সুরধনীর ঘাটে গিয়া রে—
আমি দ্যাখলাম রূপের ছবি,
তোরা একলা ঘাটে যাসনা ওলো সই
আমার মত হবি রে।

হিন্দু সমাজের বিচ্ছেদী গানে রাধাকৃষ্ণের প্রভাব থাকলেও মুসলমান সমাজের গানের ভিতর তেমন কিছু না থাকায় তাকে সত্যিই বিরহী নারীর মনোবেদনা আখ্যা দিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। মুসলমান সমাজের গানের ভিতর তাদের নিজেদের বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এখানেও মোদ্দা কথা সেই একই, কোনো এক বিরহিনীর পতি গেছে বিদেশে, বিরহী নারী পতি বিহনে কেমন করেই বা দিন কাটায়? :

সুখ বসন্ত আইসে যায়
কুকিল গাছে ডাকে হায়,
খসম হামার গ্যালোরে বিদ্যাশ
ফিরা্যা ত আর আইলা না।
বাঘ ভাল্লুকের দ্যাশেরে,
খসম হারিয়া কি তায় গ্যালারে,
আমার হাতের রান্ধা ছালুন চাইখ্যা গ্যালা না,
খসম তুমি ত আমার ফিরা্যা আইলা না।
খসম আইলে বসতে দিমু
কাঁঠাল কাঠের পিঁড়া (রে),
কাইট্যা আনুম মানের পাত,
তাতে দিমু খাইতে ভাত,

মানের গোড়ায় ছাই দিয়া
দিমু মাথার কিড়া (রে)।
ঝড় বাদলের শীতেরে,
খসম তোষক নাহি পাও,
হামার শাড়ির আঁচল দিয়া
ঢাইকো তোমার গাও।
পুঁথির মালা কিনতে গ্যালা,
হাট হইতে আর ফিরলা না —
খসম তুমিত আমার ঘরে আইলা না।

কিংবা :

(১) আমার মন যে কেমন করে (বন্ধু রে)
আমার বুকের মাঝে চিতার আগুন
জ্বলছে শাঁ শাঁ করে,
বন্ধু জ্বলছে শাঁ শাঁ করে।
মনের ব্যথা মনে রইল
আমি জানাই বন্ধু কারে,
আমার মন যে কেমন করে।
আমি মনের দুঃখে এলাম বনে
তবু আমার মন যে কেমন করে,
আমি মনের দুঃখে দেশ বিদেশে
ঘুরি দ্বারে দ্বারে।
আমার মন যে কেমন করে ॥
আমার মনের মাঝে চিতার আগুন
জ্বলছে শাঁ শাঁ করে।
সে আগুন নিভবে না কো,
নিভলে সে জন মরে,
আমার মন যে কেমন করে।

(২) চিত্ত বুঝায়ে বুঝায়ে গো সখি
আর কত কাল রাখি,

ও সখি গো দুধ খাওয়াইয়া পালিয়া ছিলাম,
সাধের কালো পাখি,
শিকলি কেটে উড়ে গেল
সই গো আমায় দিয়া ফাঁকি।
সখি গো ঘুমাইলে যে দেখি গো তারে—
জাগিয়া না দেখি,
আমার হৃদয় মাঝে করে খেলা গো
কালো বরণ পাখি ॥

(৩) প্রাণ বাঁচে না রাখাল বন্ধুরে—
দিয়া আশা ভাঙ্গিলি বাসা (অ বন্ধু রে)।
আগে জান্তাম না তুই সর্বনাশা—
জানলে কি প্রাণ সঁপিতাম তোরে।
বইল্যা ছিলি করবি রাণী—
কল্লি কড়ার ৎকারিণী
ভুইল্যা গেলি পাইয্যা কুব্জারে।
একদিন কান্দিয়া কয় রাই বিন্দেরে—
(সখিগো) কই গ্যাল মোর শ্যাম,
আইনে দে নইলে এ প্রাণ রাখি ক্যামনে।
(মোরে) আশা দিয়া পরবোদ দিয়া
কেন বুইল্যা গেলি অবাগীরে—
ও কি রাখোয়াল বন্ধু রে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধান কাটার গান

কৃষিপ্রধান ভারতের মূল সত্যই হলো ক্ষেত্রদেবীর বন্দনা। এই ক্ষেত থেকেই তো আমাদের যত সুখ, সৌভাগ্য—সব কিছু। যদিও ভুঁই চাষের সময় বা ধান কাটার সময় নিয়ম মাফিক কোনো গানই নেই, তবু বৎসরের প্রথমে জমিতে লাঙল দেবার সময় কৃষাণ মনের আনন্দে কিছু কিছু গান গেয়ে ওঠে বইকি। এক ক্ষেতের কৃষাণ ধরে গানের একটি কলি, সমভাবাপন্ন পাশের জমির কৃষাণও তার সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে চলে গান। দূর থেকে শুনলে মনে হয় সারামাঠের কৃষাণেরা বুঝিবা একযোগেই গান গাইছে সারিগানের মতো। এ গানের অধিকাংশই হলো ক্ষেত্রদেবীর বন্দনা—তাঁর মহিমা কীর্তন। বিভিন্ন সুরেই গান গাওয়া হয়ে থাকে। ভাটিয়ালী গানের মতো এ সব গানের সংগেও কোনো যন্ত্রের ব্যবহার অচল। কৃষাণদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর বাতাসের সাথে মিলে সৃষ্টি করে এক প্রাণোচ্ছল সুর। এক কথায় একে বলা চলে 'শ্রম সংগীত'। শ্রমজীবী মানুষ গানের মাধ্যমে তার পরিশ্রমের কষ্টকে লাঘব করবার চেষ্টা করে। ক্ষেত মজুররাও নব আশা, নব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গেয়ে চলে :

হারে ও আমার কাতি শাল,
বছর বছর থাকিস্ রে বহাল।
ভুঁই হামাদের মাতা পিতা,
ভুঁই হামাদের নাতী ছাওয়াল।
সাত পুরুষের জমিন হামার,
তিন পুরুষের হাল।
কাঠ ফাটা রোদেতে পুর্যা,
বলদ জোড়া হল আধমরা,
(আবার) পানি কাদায় ভিজা সারা,
হনু আমি নাজেহাল,
(তোর আশাতে ভাবি বস্যা

কতই রাত সকাল।)
যাঁতের পানি টান্যা টান্যা
করনু তোকে কতই সিয়ানা,
(আজ) তোর দোয়াতে টিকলী সোনার
চিক্‌চিকাছে বোয়ের কপাল।
(হামি) তর্জাগানের আসরে যাই,
গায়ে দিয়া শাল।

ধর্মের গোঁড়ামি যত উপর তলার মানুষের মধ্যে। শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের কাছে হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ বড় কম! তাই এ গান হিন্দু, মুসলমান, খ্রীশ্চান চাষী সম্মিলিত কণ্ঠেই গেয়ে থাকে। হয়তো এ কারণেই তাদের গানে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রভাবই পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। হিন্দু কি মুসলমান, এ প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর। তারা 'বাঙলার কৃষাণ' এই তাদের একমাত্র পরিচয়। তাই তারা এই একই গান উভয় সম্প্রদায়ই গেয়ে থাকে একান্তভাবে নিজেদের গান বলেই।

দিনমজুরী করে তারা। অপরের জমিতে ধান কাটে। অধিক মজুরীর আশায় এদের অনেক সময় ঘর ছেড়ে সাময়িকভাবে বিদেশেও যেতে হয়। এই রকম এক সময় কৃষাণ-পত্নী বায়না ধরেছে পতি যেন তাকে ফেলে বিদেশ না যায়।

এ গানটির ভিতর আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যাকুলা নারী মনের যে অপূর্ব ছবি ফুটে উঠেছে হিন্দু মুসলমানের সামান্য গণ্ডী ছাড়িয়ে তার ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারী:

দোহাই আল্লা মাথা খাও,
হামাক্‌ ফেল্যা কই বা যাও,
বিদ্যাশ গ্যালে এবার তুমার সঙ্গ ছাড়ুম না॥
বাপো নাই মোর মাও নাই,
একলা ঘরে কাল কাটাই,
গোঁসা করলে আরত আমি সালুন রান্ধুম না॥
নয়া শীতের জারাতে,
যাইবা যখন ধান দাইতে,
(তুমার) কাছি (কাঁচি), কেঁথা, হুক্কা তামুক দিমু না,
(খসম) হামি তুমার সঙ্গ ছাড়ুম না॥
আঙ্গনেতে আঁটি ধান,

ঝাড়বা যখন দিনমান,
(হামি) কুলার বাতাস দিয়া তখন ধান ঝাড়ুম না ॥
কাইয়াতে ধান খাইয়া যাক,
(তুমার) ধানের মড়াই খালি থাক,
লক্ষ্মীমায়ের আউরি বাউরি বাঁধা হইব না,
নিদয় হইলে মানুষ পাইবা পিরিত পাইবা না ॥

পূর্ববঙ্গে জমি চাষের শেষে দেখা যায় কৃষাণঘরের বউদের 'ক্ষেত্তরব্রত' (ক্ষেত্রব্রত) করতে। ক্ষেত্রব্রতে পুরোহিত সব সময় দরকার হয় না। বিশেষতঃ নমঃশূদ্র, বাউতী মালো শ্রেণীর চাষীরা তো এ ব্যাপারে পুরোহিত ডাকেই না। আর তা ছাড়া পুরোহিতের কাজও যে খুব বেশি থাকে এমনও নয়। বিশেষ কোনো এক বাড়ির সংলগ্ন মাঠে কয়েক বাড়ির ঝি-বউরা মিলে একটি ঘট স্থাপনা করে। তাতে আঁকে সিঁদুর পুত্তলী, দেয় আম্রপল্লব। কদাচিৎ কখনও ডাব বা এক আধটা ছোটখাট ফলও তার উপর দেখা যায়। এদের ভিতর যিনি প্রাচীনা সাধারণত তিনিই হন মূলব্রতী। অর্থাৎ পুরোহিতের কাজটি তাঁকেই সমাধা করতে হয়। তিনি গল্প করে বুঝিয়ে দেন ব্রতের মহিমা। হাতে ফুল ও দূর্বা নিয়ে তন্ময় হয়ে ব্রতকাহিনী শুনতে থাকে ব্রতীর দল। শেষটায় কথা সাঙ্গ হলে যে যার হাতের ফুলগুলি চাপিয়ে দেয় ঘটের উপর। অবশেষে সমবেত কণ্ঠে ধরে ব্রতের গান :

বন্দে মাতা বসুমতী পুরাণে মহিমা শুনি
অগতির গতি মাগো মোরে কর তেরান্ ।
চাষার ছাওয়াল মোরা যে ভাই,
চাষ বিনা আর জানি নাই,
এবার ধরবে লাঙল শক্ত কইর‍্যা,
জেবন থাকতে ছাড়া নাই।
(ওই) পূর্বকালে মিথিলাতে, জনক নামে রাজা ছিল,
চাষের গুণে লক্ষ্মীদেবী গোলক থুইয়্যা ঘরে আইল।
(মোরা) আসল থুইয়্যা নকল লইয়্যা কাটাই বারো মাস,
(হেইতে) মোরগো দুঃখেরও নাই শ্যাষ।

সন্ধ্যে হয়ে আসে। ব্রতীরা উলুধ্বনি দিয়ে ব্রত সমাপন করে। ঐখানে

বসেই খায় চিড়ে, গুড়, মুড়ি, খই ও দই। সেদিন বাড়িতে কোনো বৌ-ঝি আর ভাত খাবে না। ভোজন পর্ব সমাধা করে যে যার ফিরে আসে বাড়িতে। এ-দিকে ক্ষেতে নতুন ফসলের বীজ বুনে কৃষাণ খুশিতে ডগ্‌মগ্‌ করতে করতে রওনা দেয় ঘরের দিকে। হিন্দু-মুসলমান সমস্বরেই সেদিন গান ধরে:

ও আমার আহ্লাদী, ও তোর সোহাগ বড় ভারী।
এবার ক্ষ্যাতে যদি সুফল ফলেত,
কিনা দিমু ঢাহাই শাড়ি
(ও আমার আহ্লাদী)।
শাড়ি দিমু, গামছা দিমু, দিমু নাহের নাকছাবি,
ও আমার আহ্লাদী, ও তোর সোহাগ বড় ভারী।
(ও) আমি শুভক্ষণে দেলাম পূজা বাস্তু দেবতার পায়,
জমি জিরাত সগলই যে বাই, হেনারই দয়ায়।
ও বাই, মাডির মানুষ, মাডিই খাঁডি
মরলে পরে দেবে মাডি,
এহন সোময় থাকতে ধররে লাঙল
নহিলে শ্যাষে অবে গণ্ডগোল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[প্রাকৃতিক বর্ণনা ও আদিবাসীদের গান]

ভাঁইর শাল বা দাঁড়নাচ

শারদীয় পূজা এগিয়ে আসার সাথে সাথে আনন্দ উছলে উঠতে থাকে বাঙালী হৃদয়ে, কিন্তু মানভূমের আদিবাসীদের ভিতর শারদীয় পূজার চাইতে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতের উৎসবেই আনন্দের বাণ ডাকে বেশি। তাই জোছনা ঝলকানো শারদ পূর্ণিমা নিশিথে ডুংরির ধারে বসে যায় এদের উৎসব। মাহাতো, কুর্মী ও আদিবাসীরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে মাদল, বাঁশী, বাজনা ও নাচের মধ্য দিয়ে তাদের মনের কথা প্রকাশ করবার চেষ্টা করে! এই যে নাচের কথা বললাম এরই নাম হলো "ভাঁইর শাল" বা "দাঁড়ানচ"। এর সংগে এদেরই রচিত যে গান গাওয়া হয়ে থাকে তার ভাষা হলো "খট্টা"। মাদলের বাজনা আর বাঁশীর সুরে সুর মিলিয়ে তারা গাইতে থাকে :

কতিক্ষণে ফুটই হরদোই রে ঝিঙাফুল,
কতিক্ষণে ফুটই লাল শালুকের ফুল।
ভিনিসরে ফুটই হরদোই রে ঝিঙাফুল,
(ওরা) শাশুড়ী ননদে পাতাইল গেঁদাফুল।
(ও মরি হায়রে হায়)।

মানভূমের আদিবাসীরা নিরক্ষর বটে। কিন্তু দেখুন কী অপূর্ব তাদের রসবোধ। লোক-কবি বলছে, আমার হৃদয় মুকুল ফুটবে কতক্ষণে ও ঝিঙাফুল? কতক্ষণেই বা ফুটবে লাল শালুকের ফুল? কবি পরক্ষণেই বলছে, ভোরের সময়েই ফুটবে হৃদয়-মুকুল। ওরা আজ আনন্দে এতটা আত্মহারা হয়ে গেছে যে শাশুড়ী ননদেই গেঁদাফুল (সই পাতান) পাতিয়ে ফেলল।

সাঁওতালী

আদিবাসী সমাজের ভিতর সব চাইতে প্রাধান্য লাভ করেছে প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক ও প্রেম ভালবাসার গীত গুলি। এর মধ্যে এদের প্রেম ভালবাসার

গানগুলি যা সমাজের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু দেশে চলিত এইসব গান ছাড়াও নিছক আদিবাসীদের গান বলে যেগুলি পরিচিত সে সম্পর্কেই আপাততঃ কিছু বলছি। আদিবাসীদের এই সব গান বেশির ভাগই প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক।

প্রকৃতির দুলাল দুলালী সাঁওতাল যুবক-যুবতী। তাই তাদের গীতি ও গাথায় অন্য কথার চাইতে প্রকৃতির কথাই থাকে বেশি। বনানীর শান্ত ছায়া, পর্বত ও উপত্যকার মনোরম দৃশ্য, ঝর্ণার প্রাণ মাতানো হাসিই এদের নিত্য সহচর। সভ্য জগতের বাসিন্দাদের মতো সোনা-দানা এরা ব্যবহার করে না, তার জন্য এদের কোনো দুঃখ নেই। খোঁপায় পরে ফুলের মালা, কানে গোঁজে ফুলের ঝুমকো, কপালে দেয় কাঁচপোকার টিপ। কারও বা গলায় থাকে দু-এক ছড়া রাঙা পাথরের মালা এই পর্যন্ত।

এতেই এরা মহাখুশি, নিত্য নতুন সাজসজ্জার ধার ধারে না, সভ্য জগতের চেয়ে তাই এদের গানে প্রকৃতির বর্ণনা মেলে অকৃত্রিম ভাবে। সামান্য নাতাল ফুল দেখে সাঁওতাল যুবতীর যে আনন্দ, সভ্য জগতের কোনো সুন্দরী তরুণী রত্নখচিত কোনো অলংকার দেখেও এতটা খুশি হয় কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভিতর সাঁওতালগীতি যে কোনো আঞ্চলিক লোক-গীতিকেই হার মানিয়ে দিয়েছে :

বুরুরে নাতাল বাহা,
দলপ্ দলপ্ নাতাল বাহা,
যাহা লেকাতে হইঞ তিরিক গিয়া।
হরিঞ চিপ রেহ ছুঁন্দ কাচ রেহ,
যাহা লেকারে হইঞ বাহাই গিয়াই।

পাহাড়ের উপর নাতাল ফুল দুলছে, হাওয়ায় নাচছে, যে করেই হোক আমি ও ফুল তুলে আনব। যদিও আমি ততো সুন্দরী নই, তবু আমি সেগুলি আমার খোঁপায় পরব। আমার খোঁপার দু'ধারে দুলতে থাকবে নাতাল ফুল। কিংবা :

নদীয়াকা ধারে ধারে আমাকার বাগান রঘু
ফুলাকার বাগান
ফুলাকার বাগান রঘু বাতাসে মারল।
আমাকার বাগান রঘু হুরে মারল।

রঘু নামক কোনো যুবককে বলছে কোনো সুন্দরী—নদীর ধারে রয়েছে আমাদের ফুলের বাগান। ফুলের উপর বাতাস খেলে বেড়ায়, সেখানে এসে খেলা করতে থাকে যত সব পরীর দল।

মানভূমে শাল-মহুয়ায় ঘেরা বনের মাঝে সাঁওতাল নর-নারী আনন্দের আতিশয্যে বসন্ত উৎসবে মিলিত হয়। এই উৎসবে ঘেরিয়া, মাহাতো, ভুঞা প্রভৃতিরাও যোগ দেয়। সেই সময় মাদলের সঙ্গে তারা গাইতে থাকে :

ধা তিন্ তা ধা তিন্ তা
ধা তিন্ তাতাক্ ধা তিন্ তা
তাতাক্ ধা তিন্ ধা তিন্ তা
তাক্তা ধা তিন্ ধা তিন্ তা।

একে ঠিক গান বলা চলে না। বরং বলা উচিত মাদলের বোল।

এই রকম মাদলের মতো বাঁশীর সঙ্গেও গান চলে। তবে একটু ব্যতিক্রম আছে। বাঁশী বাজায় সাঁওতাল যুবক, আর একত্রে হাত ধরাধরি করে নাচতে থাকে সাঁওতাল যুবতীর দল। সাঁওতাল যুবক তার বাঁশীতে সুর তোলে :

তুরু রুরু তুরু রুরু
তুতুর তু আ তু—
তুতুর তু আ তুতুর তু আ
তুতুর তু আ তু।

একেও গান না বলে বলা উচিত বাঁশীর বোল্।

বন্দনা গান

মেদিনীপুরে লোধা নামে যে উপজাতির বাস আছে হিন্দু সমাজের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে তাদের ভাষা আজ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বাংলা ভাষারই অংশরূপে গণ্য হয়ে আসছে। কিন্তু তাদের ভিতর এখনও তাদের আদিম সমাজের কতকগুলি পূজা-পরব ও অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের ভূত-প্রেত বা অপদেবতার উপর অসীম বিশ্বাস। তা ছাড়া তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যেও তাদের উৎসব করতে দেখা যায়। শীতলা, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি এ-সমাজের অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। ভয় থেকেই যখন ভক্তির উৎপত্তি, সেই হেতু এরাও তাদের

সংসারের অমঙ্গল দূর করবার জন্য পুরোহিত ঠাকুরের মারফৎই তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায়,—হে মা তুমি প্রসন্ন হও, আমাদের উপর কু-দৃষ্টি দিও না, আমরা তোমায় ভোগ দেব—এই বলে "চাণ্ডল" নামক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তারা সমস্বরে গাইতে থাকে :

বন্দনা বন্দনা মুই মা—
বন্দনা বন্দনা মুই মা।
প্রথমে বন্দনা করি, প্রথমে বন্দনা করি
জয় মা শীতলা।
বন্দনা বন্দনা মুই মা—।
তারপরে বন্দনা করি শীতলা যুগিনী,
তারপরে বন্দনা করি বসন্ত কুঁয়ারী,
তারপরে বন্দনা করি মিলমিলা বুড়ী,
তারপরে বন্দনা করি ওলাউঠা বুড়ী,
তারপরে বন্দনা করি ছাঁদন বাঁধন,
তারপরে বন্দনা করি বুড়ারে বড়াম,
তারপরে বন্দনা করি বেড়াজাল কন্যা,
দক্ষিণেতে বন্দি আমি জয় জগন্নাথ,
পশ্চিমেতে বন্দি আমি জয় মা মঙ্গলা,
ষোলঘড়ী ষোলবেশ গলায় মুণ্ডমালা,
উত্তরেতে বন্দি আমি জয় কালিঘাটা,
পুরবেতে বন্দি আমি জয় সূর্য চন্দ্র,
ভদ্রেশ্বরে বন্দি আমি জয় মা ভদ্রানী,
নারায়ণ গড়ে বন্দি আমি জয় মা ব্রাহ্মণী।
বন্দনা বন্দনা মুই মা—॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[পালাগান]

চক চন্নী

পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেও যথেষ্ট পালা গানের সন্ধান পাওয়া যায়। তম্মধ্যে মালদহের গম্ভীরা গানের অন্তর্ভুক্ত আলকাপ গানের পালাগুলি, কুচবিহারের "বিষহরি" বা মনসার ভাসান, "কুশানে" (রামায়ণ পালাগান, লবকুশ উপাখ্যান) রংপুর, দিনাজপুরের গোপীচাঁদের গান, গোরক্ষনাথের গান, ময়নামতীর গান, দিনাজপুরের "রূপধন কন্যার" কাহিনী, "মারুচমাতীর গান" এবং জলপাইগুড়ির "চক চন্নী", "রসিয়া", পূর্ববঙ্গের "রূপবান কন্যা" প্রভৃতি পালাগানগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। আমরা এই পরিচ্ছেদে ওই পালাগানগুলি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

জলপাইগুড়ির "চকচন্নী" পালাটি খুবই সংক্ষিপ্ত। ঘটনা বোধহয় তার চাইতেও সংক্ষিপ্ত। অনেকটা মালদহের আলকাপ গানের মতো। সাধারণতঃ একাদশীর সময় এগুলো গীত হয়ে থাকে। পালাটির আরম্ভ হলো, কোনো একটি চোর চুরি করে জেলে গেছে, জেলের মেয়াদ শেষ হলে সে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলো। মাঝে অবশ্য আনুষঙ্গিক দু-একটা ছোটখাট ঘটনা আছে। সারারাত ধরে এ গান চলে। সারারাত ধরেই এই পালাগানগুলি গীত ও অভিনীত হয়ে থাকে। আলোচ্য পালাটির মধ্যে আছে সমাজের একেবারে অপাংক্তেয় ও অবজ্ঞাত কতকটা বা অশ্রদ্ধেয় সমাজের কথা ও কাহিনী। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথা :অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বাস্তব ভাবে ধরা পড়েছে।

জেল থেকে বেরিয়ে চোর তার স্ত্রীকে বলছে—ওগো শোন, থালা, বাটি আর কম্বল, এই হলো মাত্র জেলখানার সম্বল। সেখানে "শালা" (গালাগালি) ছাড়া অন্য কোনো কথা নেই। খাওয়া, বসা এমনকি দাঁড়ানো পর্যন্ত সব কিছুই লাইন দিয়ে (সার দিয়ে) করতে হয়। যে বেটা ধাঙ্গর আমাদের হুকুম দেয়.

তাকে বলেই বা কি হবে বল ? তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি জেলখানায় থাকাকালীন তুমি যেমনি আমার কথা ভুলে অন্য পুরুষের কাছে গিয়েছিলে, তেমনি ও বেটার বউও ওকে ছেড়ে অন্য লোকের কাছে চলে যাবে। এই সবইতো হলো জেলখানার দুঃখ, আর এই সব অসুবিধার জন্যই তো জেলখানার সৃষ্টি হয়েছে। থানার জমিদার (জমাদার) মশাইতো এই সব সাজাই আমাদের দিয়ে থাকেন :

চুন্নী থালি যুড়ি কম্বল
জেহেল (জেল) খানার সম্বল।
শালা ছাড়া গালি নাই,
হালি ছাড়া বেড়ান নাই,
পাকোয়ানী ঝাংগর শালাক্ কহা কি হবে ?
মোর মতন অরহ মাইয়া ভাতার ধরিবে।
শুনগে চুন্নী মোর কাথা,
এইলা ভাইরে চোরের সাজা,
এইলা সাজা দিসে থানার পোদ্দারে ॥

এই "চকচন্নী" জাতীয় গীতিনাট্যকে নাটক বা নাটিকা কোনো পর্যায়েই ফেলা উচিৎ হবে না। জলপাইগুড়ির চলতি কথায় এদের বলে "পালটিয়া" গান অর্থাৎ পালা (অভিনয়) সহকারে গান। একে এক কথায় প্রহসন (ফার্স) আখ্যা দেওয়া চলে। অবশ্য পালটিয়া গানের অন্য নিদর্শনেরও অভাব নেই ; "রসিয়া" নামে যে পালটিয়া (পালা) গানটির কথা আগেই বলেছি, আমাদের মনে হয় এই নাটিকাটি নিয়ে আলোচনা করলেই এ অঞ্চলে প্রচলিত গীতিনাট্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাবে।

রসিয়া

"রসিয়া" গীতিনাট্যটি জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ লোক নাটিকাগুলির মধ্যে অন্যতম। এর কাহিনী হলো রসিয়া (রসিক) নামে এক গয়লার ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসত, তাকে দেখে বাঁশী বাজাত, প্রেম নিবেদন করত। এক কথায় মেয়েটির জন্য সে প্রায় পাগল হয়ে যাবার উপক্রম। কিন্তু মেয়েটি প্রথম প্রথম তাকে তো পাত্তাই দিত না। শেষটায় এই হতাশ প্রেমিক যখন

নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিল নিজের মনোবেদনায়, মেয়েটির মনে এবার সত্যিই দুঃখ উপস্থিত হলো। মেয়েটি সন্ধান নিয়ে চলে গেল সেই নদীর ধারে। নদীর কলতানের সাথে সুর মিলিয়ে সে গেয়ে যেতে লাগল বিলাপ গাথা। কিন্তু বড় দেরিতে ধরা দিল সে।

এ গীতিনাট্যটির ভিতর আগের 'চকচন্নী'র মতোই পাত্রপাত্রীর সংখ্যা বড়ই কম। আগের প্রহসনটিতে আমরা দেখেছিলাম নায়ক বলতে 'চোর' এবং নায়িকা হলো 'চুন্নী' (চোরের স্ত্রী)। এখানে নায়ক হলো রসিয়া আর নায়িকা ঐ যুবতী। তবে এটিকে 'ফার্স' বা প্রহসন আখ্যা দেওয়া চলে না। আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর ভিতর নাট্যরস অক্ষুন্ন রয়েছে। তাই এটিকে সার্থক গীতিনাট্য বলতে আমাদের কোনো বাধা নেই।

ছেলেটি বলছে :

শুন অগে শুনগে আই
হামার ভাঙ্গা ঘরোৎ আলো করেক
আর কী আসিব তুই ?
তোক না দেখিয়া শুনগে আই
বাউড়া হয়্যাছে পরাণ।
পাছা পাড়্যা শাড়ি পরোৎ
তার খাচ্ছরৎ কি খুচ্ছরৎ কি
চটক দেখত মুই।
হামার কাছো ত আসি পরিত পাইত
হাটের বাছাবাছা শাড়ি
কানোৎ দিত সোনার মাকুড়ী।

মেয়েটি উত্তর দিচ্ছে :

লজ্জা করিয়া ক্যামনে জানাই
তোররে রসিয়া,
লজ্জা সরম নাই কি তোর
শুনিস না কি ওরে।
ঘরোৎ ত তোর নাই কি ভাঙ্গা চটি খান
কানোত ক্যামনে দিব মাকুড়ী,
হাল গরুত কিছুই নাই,

শেষেতে যায়া কী খাব ?
নাই খাব পান গুয়া,
ঘরোত যায়া কী খাওয়াব।
এতই যদি হাউস থাকেরে
তিন কুড়ি পণ দিয়া
লজ্জা হররে বেটটা।

রসিয়া : নাই বা থাকিলো টাকা পয়সা
তোক বানালু বাইন্যা
হামি যদু বর,
হামরা দুজনে সকল সময়
নিজের হাতে কাম করিবো
ভরিয়া তুলিবো প্রাণের টানে।
নাইবা থাকিলো টাকা কড়ি
হামি আছি, আর আছে মোর যৌবন !

কন্যা : তুই হলি গোয়ালার ছেইলা
তোর সনে মুই নাই করি পিরীত।

মেয়েটি যখন এত কথা কাটাকাটির পর এক কথায় তাকে নিরাশ করে দিল, ছেলেটি (রসিয়া) মনের দুঃখে এগিয়ে গেল নদীর ধারে। বাঁশী বাজাতে বাজাতে শেষ বারের মতো বলল :

আজ বিধি কি হইলো বাম,
ওরে কান্‌তে কান্‌তে মইলো
তোমার ছওয়াল
ক্যামনে হদিস পায়।

ক্রমে খবর পৌঁছল মেয়েটির কাছেও। হায় হায় করে উঠল সে, খুঁজতে খুঁজতে সেও এসে হাজির হলো নদীর কিনারে। কিন্তু তখন কি আর কিছু বাকি আছে ? অঝোরে ঝরে পড়ল মেয়েটির চোখের জল, মুখ থেকে বেরিয়ে এল বিরহ গীতি :

কোন্‌টে গেল রসিয়া মোর
ওগো রসিয়া না পার মুই থাকত ঘরোৎ

মনটা করছে হরোৎ ফরোৎ।
আগুন জ্বলে হিয়ার মাঝোৎ
কোনটে গেল গে রসিয়া মোর।

কিন্তু তার কান্না কি আর রসিয়ার কানে গিয়ে পৌঁছবে? সে এখন অনেক দূরে। মরলোকের গণ্ডীর বাইরে। তাই স্বপ্নই হলো তার রাজত্ব, এই স্বপ্নের মধ্যেই সে লাভ করতে চায় রসিয়ার সঙ্গ:

স্বপন তু আহায়া যা,
তুই ছাড়া মোর নাই গতি
তোক নিয়া মুই দিন কাটাই।

রূপধন কন্যা

দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলে 'রূপধন কন্যা' ও 'ময়নামতীর' গান নামক কিছু কিছু পালাগানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। আমরা পৃথকভাবে তাদের আলোচনা করছি।

'রূপধন কন্যা' গীতি নাটিকাটির বিষয়বস্তু হলো, ইলিমপুরে আঁটকুড়ে রাজার আর ছেলে হয় না। এই সময় তাঁর মন্ত্রীর একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করল। তার নাম রাখা হলো 'রূপধন'। রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলেন যদি তাঁর কোনো পুত্র সন্তান হয় তা হলে তার সঙ্গে এই মন্ত্রীকন্যার বিয়ে দেবেন। যথাসময়ে ঠিক বারো বছর পর আঁটকুড়ে রাজার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। তার নাম রাখা হলো 'রহিম'। রাজা মন্ত্রীকে সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু মন্ত্রী তো মহা ভাবনায় পড়লেন এই আঁতুড়ে ছেলের সঙ্গে কি করে তাঁর বারো বছরের মেয়ের বিয়ে দেবেন! কিন্তু রাজা সে কথা কিছুতেই শুনলেন না। ঠিক রহিমের আড়াই দিন বয়সের সময় বারো বছরের রূপধনের বিবাহ হয়ে গেল।

রূপধন দেখল এ যেমন উল্টো রাজার দেশ, এখানে কখন কি হয় বলা যায় না। তা ছাড়া তার কোলে যদি এই কচি শিশু দেখে তা হলে নানান জনে নানান কথা বলাবলি করবে. তার চাইতে দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে স্বামীকে বয়স্ক করে রাজপুরীতে ফিরে আসাই ভাল—এই ভেবে সেই বিবাহের রাত্রেই আড়াই দিনের শিশু স্বামীকে বুকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল :এক অনির্দেশের পথে। কিন্তু

কোথায় যাওয়া যায় ? পথে পড়ল এক মালিনীর বাড়ি। মালিনী মাসীর বাগানে অনেক দিন ধরে ফুল ফোটে না, রূপধন শিশু স্বামীকে বুকে করে এসে আশ্রয় নিল সেই মালিনীর বাগানে চাঁপা গাছতলায়। মালিনী বাগানে এসে অবাক! এতো ফুল তো আজ বহুদিন তার বাগানে ফোটে না। তাহলে? খুঁজে দেখে চাঁপা গাছ তলায় বসে রয়েছে রূপধন আর তার স্বামী। রূপধন সব কথা খুলে বলল মালিনীর কাছে। তাকে ডাকতে সুরু করল মালিনী মাসী বলে। বলল— মাসী, তুমি ওকে মানুষ করে তোল। বড হলে পর আমার পরিচয় দেব এর আগে নয়। মালিনী সেই থেকে রহিমকে মানুষ করে তোলে। রূপধন সব সময়ই থাকে কুমারের চোখের আড়ালে আড়ালে। দূর থেকেই সমস্ত তত্ত্ব তালাশ করে। আর অবসর সময় বাস করে চাঁপা গাছের তলায়। ক্রমে রহিমের বয়স হয় সাত বছর। মালিনীর কথায় রহিমকে পাঠশালায় দেওয়া হলো। রহিমের দেখতে দেখতে বয়স হলো ষোল। রূপধনের বয়স এখন আঠাশ। রহিম এদিকে দেখতে দেখতে গুরুর সব বিদ্যাই আয়ত্ত করে ফেলল। এতে গুরুর হলো মহা আক্রোশ। একদিন পাঠশালায় পড়তে গিয়েছে রহিম, গুরুমশাই যাদুমন্ত্র বলে রহিমকে পাঁঠায় রূপান্তরিত করল! ঠিক করে ফেলল পরদিনই তাকে হাটে নিয়ে বেচে ফেলবে কশাইদের কাছে!

এদিকে মালিনী রহিমকে খুঁজতে এসে ঘরের বেড়ার আড়ালে থেকে সব দেখে শুনে তো চক্ষু স্থির !! দৌড়ে ফিরে গিয়ে সব বলল রূপধনের কাছে। রূপধন পাগল হয়ে উঠল খবর শুনে। তখনি মালিনীকে মোটা টাকা দিয়ে পাঠাল সেই পাঁঠাকে কিনে আনবার জন্য। মালিনী সেই পাঁঠা কিনে নিয়ে এলে রূপধন নিজে তো কিছু কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানত, সেই মন্ত্রবলে রহিমকে আবার মানুষ করে তুলল!

রহিম মানুষ হয়েই বলল—মালিনী মাসী, আজ তোমার দয়াতেই আবার আমার জীবন ফিরে পেলুম।

মালিনী বলল—না বাবা, আমার দয়ায় নয়, অন্যলোকের।

—অন্যলোক? কে সে?

—সে তোমার স্ত্রী, ঐ চাঁপা গাছের তলায় লুকিয়ে আছে।

রহিম ছুটে গেল চাঁপা গাছের তলায়, মিলন হলো রূপধনের সঙ্গে।

বাসর ঘর! আজ মনের সুখে শুয়ে আছে দুজনে। কিন্তু সুখ ওদের কপালে নেই। এদিকে সেই শয়তান গুরুমশাই জানতে পেরেছে রহিম আবার মানুষ হয়েছে। তাই ক'জন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ছুটে এল রহিমকে ঘুমন্ত

অবস্থায় খুন করতে। রূপধন সে কথা জানতে পেরে তখনি গুরুমশাইর রক্ষিত ঘোড়াতেই চেপে স্বামীসহ রওনা দিল অনির্দেশের পানে, গুরুও সংগে সংগে ছুটল।

রূপধন ছুটছেতো ছুটছেই, ছোটার যেন আর বিরাম নেই। এদিকে ক্ষিধেয় কাতর হয়ে পড়েছে কুমার। সামনেই দেখা গেল একখানা বাড়ি। রূপধন স্বামীসহ এসে আশ্রয় নিল সেই বাড়িতেই। কিন্তু তারা জানত না ঐটা ছিল এক ডাকাতের বাড়ি। সেই বাড়ির বুড়ির সাতটি ছেলে ডাকাতি করতে বেরিয়ে গেছে। বুড়ি ঠিক করল যতক্ষণ না তার ছেলেরা ফেরে ততক্ষণ এদের কৌশলে আটকে রাখবে। তাই এদের রান্নার জন্য এনে দিল কতকগুলি ভিজে কাঠ, আর শক্ত মাসকলাইয়ের ডাল। মনে মনে ভাবল, এরা সহজে এগুলি সিদ্ধ করতে পারবে না, ততক্ষণে তার ছেলেরাও এসে পড়বেই। কিন্তু রূপধন কৌশলে বুড়ির মতলব বুঝতে পেরে নিজের মন্ত্রগুণে খুব তাড়াতাড়িই রান্নাবান্না শেষ করে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে বুড়ির কাছে বিদায় চাইল, বুড়ি দেখল তার সব জারিজুরিই ভেস্তে গেল। তাই করল কি কৌশলে রাজপুত্রের ঘোড়ার গলায় বেঁধে দিল এক থলিয়া মন্ত্রপূত সরিষা, যাতে ঘোড়া যেখানেই যাক সেই পথে পথে সরষে পড়তে পড়তে যাবে, আর সংগে সংগে গজিয়ে উঠবে সরষে গাছ। আর ওরা রওনা হয়ে যাবার সংগে সংগে নিজের ঘরে লাগিয়ে দিল আগুন। দূর থেকে ডাকাতরা নিজেদের ঘরের বিপদ বুঝে তক্ষুনি ছুটে এল বাড়িতে। সব শুনে ডাকাতরাও সেই সরষে গাছের নিশানা ধরে এগুতে লাগল।

এদিকে রাজপুত্র রহিম তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা অথচ এই বনের মধ্যে কোথাও জলের চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না! রূপধন বাধ্য হয়ে কুমারকে সেইখানে বসিয়ে রেখে গেল জলের সন্ধানে, ইতিমধ্যে সেখানে এসে পৌঁছল ডাকাত দল। ডাকাত দেখে রহিম তো ভয়েই অস্থির। ডাকাতরা সোজা কোনো কথা না বলে এককোপে কেটে ফেলল রহিমকে। তারপর তল্লাসী করে খুঁজে পেল রাজপুত্রের কোমরে দুটি থলিয়া! একটিতে রয়েছে মণিমাণিক্য, অপরটিতে একখণ্ড পাথর। তারা মণিমাণিক্যের থলিয়াটা নিয়ে পাথরের থলিয়াটা ফেলে রেখে চলে গেল।

রূপধন ফিরে এসে এই অবস্থা দেখে তো চক্ষুস্থির। আর বাঁচবার পথ নেই। তাই শুরু করে বিলাপ। এদিকে স্বর্গলোক হতে হর-গৌরী মর্ত্য ভ্রমণে বের হয়েছেন। পার্বতীর কানে গিয়ে পৌঁছল রূপধনের এই করুণ কান্না। পার্বতী মহাদেবকে অনুনয় করে নিয়ে এলেন সেখানে। প্রথমটায় মহাদেব তো কিছুতেই

রাজী নন। অনেকক্ষণ পর পার্বতীর একান্ত অনুরোধে প্রাণ দান করলেন রহিমের। রহিম তো চোখ খুলে দেখল সামনে বসে রয়েছে রূপধন। বলল—রূপধন তুমি সতী নারী, তাই তোমার দয়ায় আবার আমি প্রাণ ফিরে পেলাম।

কিন্তু হলে হবে কি ? তাদের বরাতের দুঃখ তখনও দূর হয়নি। রহিম যখন রূপধনের সাথে কথা বলছে ততক্ষণে দুষ্ট গুরু এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে। এসেই বিকট অট্টহাস্য করে মন্ত্রবলে 'কবুতর' (পায়রা) বানিয়ে ফেলল রহিমকে। রূপধন কান্নাকাটি করে। কিন্তু দুশ্চরিত্র গুরু বলে, ওতো পায়রা হয়ে গেছে, ওর জন্য আর কান্নাকাটি কেন ? তুমি আমার ঘরে চলো, সুখে থাকবে।

রূপধন বলে—তুমি আমার স্বামীর গুরু, আমার পিতার সমান, আমি তোমার কন্যা। আমাকে একথা বলা তোমার অন্যায়, তুমি দয়া করে আমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা দেও।

রূপধনের কথায় মন ভিজে গেল গুরুর। বলল—মা, আমি মানুষকে পশুপক্ষী বানাতে পারি। কিন্তু তাদের তো ফিরে মানুষ করবার মন্ত্র জানি না। তবে কথা দিচ্ছি, যদি তোমার স্বামী কোনো মতে আবার মানুষ হয়, আমি আর কোনো দিন তার পিছু ধাওয়া করব না। এই আমি চললাম। বলে সত্যি সত্যিই ফিরে চলে গেল গুরু।

রূপধন চিন্তা করতে থাকে, কিভাবে স্বামীকে আবার মানুষ করা যায়। হঠাৎ পায়রা বক্ বকুম করে ডেকে উঠল। ইসারায় দেখল তার পায়ের সঙ্গে একটা থলে বাঁধা রয়েছে। রূপধনের মনে পড়ল ঐ থলিয়ায় তো রয়েছে তার সেই যাদু পাথর। রূপধন যাদু পাথরের গুণে স্বামীকে আবার মানুষ করে তুলল।

রূপধন বলল—রাজকুমার, চল এবার তোমার রাজ্যে। তুমি ইলিমপুরের রাজকুমার আর আমি হলাম মন্ত্রীকন্যা। তোমার আড়াই দিনের সময় আমার বারো বছর বয়স। সেই সময় আমাদের বিয়ে হয়। অনেক কষ্টে তোমায় এই পর্যন্ত এনেছি এবার চল তোমার পিতার রাজ্যে।

রাজপুত্র তো একথা শুনে মহাখুশি। এদিকে রাজপুরীর থেকে ঢোল সহরতে ঘোষণা করা হচ্ছে, রাজপুত্র রহিম ও মন্ত্রীকন্যা রূপধনের যে সন্ধান দিতে পারবে তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজপুত্র রহিম ও মন্ত্রীকন্যা রূপধন এগিয়ে এসে নিজেদের পরিচয় দান

করল। রাজবাড়িতে আবার আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। রাজা ফিরে পেলেন তার হারানো পুত্র, আর মন্ত্রী তার কন্যাকে।

এই পালা গানের কাহিনীটির মধ্যে একটা মস্ত বড় জিনিস লক্ষ্য করুন। গল্পের নায়ক নায়িকা সবই মুসলমান সমাজের। নাম ধামও তাই, কিন্তু এর ভিতরকার কাঠামো যেন হিন্দু সমাজেরই। এ কাহিনীর রচয়িতাও একজন মুসলমান। অথচ এর ভিতর হর-গৌরীর কাহিনী যে কী ভাবে ঢুকে পড়ল সেইটাই মস্ত বড় আশ্চর্যের বিষয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষতঃ লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানে যে কোনো ভেদাভেদই ছিল না এই বাংলায়, এই গীতি নাট্যখানাই তার বড় প্রমাণ। হিন্দুদের স্বর্গের শংকর পার্বতী যে মুসলমান সমাজের মধ্যেও কিভাবে স্থান লাভ করেছেন, সগৌরবে একথা ভাববার অবকাশ আছে। অসম্ভব নয় এই গীতি নাট্যের অভিনেতা (অভিনেত্রী কোথাও থাকে বলে শোনা যায় না) এবং এর ব্যবস্থাপনায় যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরই হাত ছিল একথা সুস্পট ভাবেই প্রমাণ পাওয়া যায়! তা নইলে মুসলমান ফকিরের কণ্ঠে হিন্দু দেব-দেবীর গান অতটা জীবন্তভাবে ফুটে উঠতে পারত না।

এইবার গীতিনাট্যের কথায় আসা যাক! কাহিনীটিকে অনেকে হয়তো পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বিখ্যাত 'কাঞ্চন মালার' গল্পের সঙ্গে তুলনা করতে পারবেন তবে, রূপধন কন্যার কাহিনীতে অবাস্তবতা থাকলেও যেন বাস্তবের সঙ্গে অনেকটা তাল রেখে চলতে সক্ষম হয়েছে—যেটা কাঞ্চনমালায় পাওয়া যায় না। কাহিনী হিসাবে কাঞ্চনমালার কাহিনী হয়তো অনেক সুবিন্যস্ত, কিন্তু তা চিরকালই রূপকথাই রয়ে গেছে।

এইবার কাব্যের দিকে এগুনো যাক।

বারো বছরের মন্ত্রীকন্যা রূপধনকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে আড়াই দিন বয়সের রাজকুমার রহিমের সঙ্গে। বেচারী রূপধন কি করবে এই শিশু স্বামী নিয়ে। তাকে নিয়ে পালঙ্কে বসে ঘুম পাড়ানী সুরে গান গাইতে গাইতে মনের আক্ষেপে বলতে শুরু করে:

হায়রে অবুঝ পিতা মোর গুরুজন
কী ভাবিয়া কিবা কৈলা,
বুঝিয়া অবুঝ হইলা,
প্রাণেতে বাঁচেয়া রাখি দিলা বলিদান।

রূপধন এই গান গাইতে গাইতে রাজপুরী পরিত্যাগ করে এসে আশ্রয় নিয়েছে মালিনী মাসীর বাড়িতে। ভোরবেলা মালিনীর ঘুম ভেঙে যায়। বাগানে তার বহুদিন ধরে ফুল ফোটে না। আক্ষেপের অন্ত নেই :

পুবালি বাতাসে আই মোর
মধুয়ার আগাল ঢোলে,
ফুল না দেখি উড়ি গেইচে
কাজল ভোমরারে
ফুল মোর ফোটেনা রে ॥

মালিনীর কাছে নিজের দুঃখের কথা সব বর্ণনা করে রূপধন তার হাতে তুলে দিল তার অন্তরের নিধি স্বামীধনকে মানুষ করে তোলার জন্য। কিন্তু তাতে তার মনের অবস্থা কি রকম হলো শুনুন তার নিজের মুখেই :

ও মোর সোনার পতি
তোকে দিনু মুই অনারে জনার হাতে।
অফুটা শিমুলার নাও,
হাল ধরিলে ধরেনা ভাও (হে)
আজি কিবা কিবা করে আমার গাও ॥
পন্থের ধুলার বালারে যত
মোর সোয়ামীর গুণ তত (রে)
আজি ঘরে থাকি হইলেন তোমরা পর ॥

মালিনীর আশ্রয়ে থেকে রহিমের বয়স বাড়ে। সাত বছর বয়সের সময় মালিনী রূপধনকে বলে, এইবার তোমার স্বামীকে পাঠশালায় ভর্তি করাতে হয়। রূপধন উত্তর দিচ্ছে :

পদ বন্দি বলি মাসী, আমি তোমার কাছে
আমার যতেক শক্তি যত ধন আছে
সকলি পতির বাদে, কহি শোন মন
গুরুর হাতে দেওয়া, শোন আমার বচন।

মালিনী মাসী উত্তর দিচ্ছে :

পতি তব গুণবান্ তাহার সমান
এ তিন ভুবনে নাই কেহ বর্তমান

ভাগ্যে দিল পদধূলি আমার ভবনে
মালঞ্চে ফুটিল ফুল তার দরশনে।

রহিম পাঠশালায় যায়। অতি অল্পদিনেই সমস্ত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে ওঠে। গুরুর হিংসা হয়। ভাবে তার গুরুগিরি বুঝি খস্ল। তাই রহিমকে যাদু মন্ত্রবলে পাঁঠা করে দেবার জন্য আশ্রয় নেয় ডাকিনী মন্ত্রের :

আয়রে পেত্যানি আয় শেওড়া গাছ ছাড়ি
রহিমক্ কর পাঁঠা শত্রু মোর ভারী।
আমার মন্তরে হউক রহিম ছাগল,
মন্তর পড়িয়া তাক্ গায়ে দিনু জল।

একদিকে এই দৃশ্য, অপরদিকে রূপধন বাগানে বসে রয়েছে চাঁপা গাছ তলায়। উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে স্বামীর খবরের জন্য। মালিনী মাসী বাগানে ঢুকে এসে জানায় এই দুঃসংবাদ :

জাগো জাগো কন্যা হে
কন্যা, শোনো সমাচার,
নৌকা আজি হইল কুমীর
কপালে তোমার কন্যা হে॥

রূপধন ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে স্বামীর খবর। মালিনী উত্তর দেয় :

ফুল হয়্যা আছ কন্যা হে
কন্যা ফুলের মায়া ছাড়ো,
দুষ্টা গুরু তোমার স্বামীক্
পাঁঠা করচে আরো কন্যা হে॥

মালিনীর মুখ থেকে এই নিদারুণ সংবাদ শুনে রূপধন ব্যাকুল হয়ে পড়ল স্বামীর জন্য। মালিনীকে তখনি পাঠিয়ে দিল গুরুর কাছে ঐ পাঁঠাকে যত টাকা লাগে তাই দিয়ে কিনে আনবার জন্য।

মালিনী রহিমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে রূপধন মনের দুঃখে গাইতে শুরু করে :

ওকি হায় বিধি, মোর বিধি
কত দুক্ক আমার কপালে!

যে ডালে বাঁধিনু ঘর,
ভাঙি নিল দুষ্টা ঝড়,
কত দুঃক আমার কপালে ॥

ওকি হায় বিধি, মোর বিধি
কত দুঃক আমার কপালে ॥

পিতা মাতা হইল পর
স্বামী লইয়া ছাড়নু ঘর
সেও স্বামী মোর রয়না বাঁধা অঞ্চলে,
মোর বিধি রে ॥

মালিনী নিয়ে এল পাঁঠারূপী রহিমকে। তা দেখে কেঁদে ফেলল রূপধন। কাঁদতে কাঁদতেই মন্ত্র পড়ে নুন জলের ছিটে দিল পাঁঠার গায়ে যাতে সে আবার মানুষ হয়ে ওঠে :

শোন শোন দারুণ বিধি সতী যদি আমি
ছাগল মানুষ কর, সে আমার স্বামী।
মন্ত্র পড়ি স্বামীর গায়ে এইনা দিনু জল,
দুষ্টা গুরু, দেখ আসি আমার যাদুবল।

রূপধনের প্রচেষ্টায় রহিম আবার মনুষ্য জনম ফিরে পেল। তার জানবার ইচ্ছে হলো কে তাকে আবার মানুষ করল এই খবর। মালিনী বলল, সে তোমার স্ত্রী, 'তোমার ভার্যা'। রহিম মালিনীর কথায় গিয়ে উপস্থিত হলো ফুল বাগানে। সেখানে মিলন হলো রূপধনের সঙ্গে। রহিম খুশি হয়ে উঠল। রূপধনকে আলিঙ্গন করে গান গাইতে শুরু করল :

ফুলের মাঝে থাক কন্যা চাঁদের মত চাও
পাখীর মত আমার কানে
রসের গীত গাহ (হে)
ফুলের মাঝে থাক কন্যা (হে)।
ভোমরা হইয়া থাকবো আমি
তোমার প্রাণে প্রাণে
অঞ্চলে রাখেন বোল ঢাকি

পরাণ যেখানে-হে
ফুলের মাঝে থাক কন্যা হে ॥

কিন্তু বিধির লিখন! এ সুখ তাদের কপালে বেশি দিন টিঁকল না। এদিকে সেই শয়তান গুরুমশাই খবর পেয়েছে যে রহিম আবার মানুষ হয়েছে। তাই তাকে রাত্রেই হত্যা করবার উদ্দেশ্যে এগিয়ে এল মালিনীর বাড়িতে। রূপধন তাই জানতে পেরে তখনি গুরুর ঘোড়াতে চেপেই স্বামীকে নিয়ে ছুটে চলল দেশ থেকে দেশান্তরে। পথিমধ্যে ক্ষুধার তাড়নায় এসে আশ্রয় নিল এক ডাকাতের বাড়িতে। ডাকাতেরা তখন বাড়ি ছিল না। ফিরে এসে মায়ের কাছ থেকে সকল সন্ধান জেনে নিয়ে পিছু ধাওয়া করল রহিম ও রূপধনের। বন বাদাড় দিয়ে চলতে চলতে রহিমের পেল ভীষণ তৃষ্ণা। রূপধন তাকে সেই বনেতে অপেক্ষা করতে বলে গেল জল আনতে। হায় হায়!! ফিরে এসে দেখে ডাকাতেরা তার স্বামীকে দ্বিখণ্ডিত করে কেটে রেখে চলে গেছে। রূপধন কান্নায় ভেঙে পড়ল।

যৌবনে বিধুয়া হনু মুইরে
এই মোর কপালের লিখন।
ধুলাতে পড়িয়া মোর সোনার স্বামী ধন,
দুস্ক যে দিলরে বিধি কে করে খণ্ডন রে
ধুলাতে পড়িয়া মোর স্বামী ধন ॥

রূপধনের কান্নায় স্বর্গের দেবতা শঙ্কর-পার্বতীর দয়া হয়। তাঁদের কৃপায় রহিম প্রাণ ফিরে পায়। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই দুস্ট গুরু আবার সেইখানে এসে উপস্থিত। তার জিঘাংসা প্রবৃত্তি তখনও নির্বাপিত হয়নি। তাই এসেই মন্ত্র বলে রহিমকে পরিবর্তিত করল এক কবুতরে (পায়রায়):

আইস আইস রে ডাকিনী
রহিমোক্ ধর,
মন্ত্র বলে রহিমোক্ কবুতর কর ॥

কিন্তু রূপধনেরও মন্ত্রতন্ত্র কিছু যে না জানা ছিল তা নয়। উপরন্তু তার কাছে ছিল এক যাদু পাথর—যার বলে সেও পুনরায় ফিরিয়ে আনতে পারে তার মৃত স্বামীর দেহে প্রাণ:

স্বামী হইচে কবুতর
শোনরে পাথর,
মন্ত্র দিয়া তাক্ তুমি
কর আজি নর।

রূপধনের কৃপায় রহিম আবার মানুষ হয়ে উঠল। তারা ফিরে গেল রাজবাড়িতে। রাজা, রাণী, মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র ও প্রজাপুঞ্জের মনে আবার সুখের বন্যা বয়ে গেল। 'রূপধন্যা কন্যা' নাটিকাও শেষ হলো।

ময়নামতীর গান

রংপুর এবং দিনাজপুর জেলায় এক সময় 'ময়নামতীর গান,' 'গোপীচাঁদের গান' ও 'গোরক্ষনাথের গানে'র খুব প্রচলন ছিল। তা ছাড়া "ময়নামতী" নামে কিছু কিছু পালাগানেরও খবর পাওয়া যায়। মূলতঃ পূর্বোল্লিখিত সব কটি পালাগানেরই বিষয়বস্তু একই, তবে স্থান ভেদে বা দল বিশেষে কোনোটির উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এই পর্যন্ত।

'গোরক্ষনাথের গান' আজকাল প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। 'গোপীচাঁদের গান' ও 'ময়নামতীর গান' এখনও কিছু কিছু শুনতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'ময়নামতীর গান'ই সমধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

'ময়নামতীর গানে' নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা অবশ্য রাণী ময়নামতী ও তার গুরুভাই হাড়িফার ভিতরকার অবৈধ সংসর্গের উপর দেবত্ব আরোপ করে বিষয়টি মহিমান্বিত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু 'গোপীচাঁদের গানে' ঠিক উল্টোটিই দেখা যায়। তারা 'গোপীচাঁদ' বা 'গোবিন্দচন্দ্রকে' ময়নামতী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি বলেই বর্ণনা করেছে।

সে যাই হউক, আমরা এইবার ময়নামতী পালাগানটি সম্পর্কেই আপাততঃ আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

রাণী ময়নামতী ছিলেন রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী বলে প্রসিদ্ধাও ছিলেন। এই ময়নামতীর সঙ্গে ছিল তার গুরুভাই হাড়িফার অবৈধ প্রণয়। শোনা যায় রাণী ময়নামতী ছিলেন মহারাজের বৃদ্ধকালের স্ত্রী। বৃদ্ধ রাজা জীবিতকালেই স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করতেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে কিছুদিনের জন্য দেশান্তরেও পাঠিয়েছিলেন।

রাজার মৃত্যুর পর ময়নামতীই হলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা, গোপীচন্দ্র তখনও নাবালক। এদিকে রাণী দেখলেন পুত্র বড় হয়েছে, সেই হবে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, তার সামনে তাঁদের গুপ্ত প্রণয় বাধা প্রাপ্ত হতে পারে সুতরাং তিনি গুরুভাই হাড়িফার সঙ্গে পরামর্শ করে পুত্রকে দ্বাদশ বর্ষের জন্য যোগী হবার উপদেশ দিলেন :

শোন বাপা গোবিচন্দ্র কহিগো তোমারে
সকল কার্য থুইয়া বাপা যোগে দিও মন।
যোগের কথা শুন বাপা বলিগো তোমায়
ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর সাক্ষী রহু তায়।
তোমারে কহি কত ধর্মের গেয়ান
এক্ষুনি করহ তোহ্মি সত্তর প্রয়াণ,
বারটী বচ্ছর থাকিবে তুহ্মি দেশ নিরন্তর,
ফিরিয়া আসিলে রাজ্য ভোগ করিবে বিস্তর।

রাজপুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র তখন তরুণ যুবা। ঘরে পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রী উদুনা। গোবিন্দচন্দ্র অনেক আপত্তি জানাল, কিন্তু রাণী ময়নামতীর তর্কের জালে পরাজিত হলো রাজকুমার গোবিন্দচন্দ্র। সে তৈরি হয়ে নিল সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য। খবর পেয়ে গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী এসে কান্না শুরু করল সঙ্গে যাবার জন্য। গীতি নাট্যের এই অংশটি বড়ই করুণ।

কিছুতেই যখন রাজকুমারকে সন্ন্যাস যাত্রার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব হলো না, তখন উদুনা ব্যাকুল আবেদন জানাল তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য :

অভাগী উদুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ
দেশান্তরে যাব আহ্মি করহ অনুগ্রহ।
তুহ্মি যুগী হব্যা রাজা আহ্মিত যুগিনী
রান্ধিয়া বিদ্যাশে যোগাইবো অন্ন-পানী।
বসিয়া থাকিয়ো তুমি বনের ভিতরে
আনিব ভিক্ষাত আহ্মি যাইবো ঘরে ঘরে।

গোপীচন্দ্রের মন আবার দোটানায় পড়ে। একেতো নিজের ইচ্ছে নেই মোটেই, তারপর এইভাবে যুবতী স্ত্রীর রোদন ধ্বনিতে মুহূর্তের জন্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার মন :

না শুনিবো মায়ের কথা আম্মিত রাজার ছেইলা
কুথাকার হেন কথা যুগী হয় স্ত্রী ফেল্যা।

কিন্তু রাণী অতিশয় চতুরা। তিনি পুনরায় আরম্ভ করলেন :

নারীর রূপে যেবা ভুলে তুম্মার নাই সাজে,
পুরুষ হয়্যা যোগ ধর্ম যে না করে কেবা তারে পুছে ?
তুমি আমার পুত্র বাপা মোর বাক্য ধর,
শীঘ্র করি বাপা তুমি যাত্রা ত্বরা কর।

গোপীচন্দ্র আর কালবিলম্ব না করে যাত্রার আয়োজন করে। সন্ন্যাসীর বেশে রাজকুমার কৌপীন মাত্র সম্বল করে পরিত্যাগ করে চলে যায় রাজপুরী।

আর এদিকে ? রাজকুমারের স্ত্রী উদুনা, পুরনারী, প্রজাপুঞ্জ তাদের চোখের জলে তারা বিদায় অভিনন্দন জানায় কুমারকে :

হায় হায় কর‍্যা রাণী ধুলাতে লোটায়।
উদুনার রোদনে পাষাণ গল্যা যায় ॥
কান্দয়ে নগরবাসী রাজাপানে চায়্যা।
বাল, বৃদ্ধা, যুবা কান্দে আর শিশু মায়্যা ॥
রাণীর (উদুনা) কান্দনে নদী উথলে সাগর।
পাইশালে কান্দে অশ্ব যতেক কুঞ্জর ॥

বারোটা বছর দেখতে দেখতে চলে গেল। গুরু গোরক্ষনাথের দয়ায় অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে গোপীচন্দ্র ফিরে এল রাজ্যে। অনুগত প্রজাবৃন্দ, ব্যাকুল পুরবাসী সাগ্রহে বরণ করে নিল তাঁকে। গোপীচন্দ্র এখন আর তরুণ কিশোর নয়। বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণ যুবা। রাণীর স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার জন্য সকলেই মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তাই গোপীচন্দ্র সিংহাসনে বসতে না বসতেই তার কানে গিয়ে পেঁ ীছল মায়ের ঐসব জঘন্য কীর্তি কলাপের কথা। গোপীচন্দ্র বুঝল কি কারণে রাণী ময়নামতী তাকে এতদিন রাজপুরী থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাই একদিন স্পষ্ট করেই রাণী ময়নামতীকে বলতে শুরু করল :

হাড়ির খাইছ গুয়া মা হাডির খাইছ পান,
ভাব করি শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গেয়ান।

হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে
জননী একস্ত্রর করিয়া,
আন্ধার পিতাক মারছেন মা
জোহার বিষ খোয়ায়্যা।
কোন রূপ রাজার ছাইলাক সন্ন্যাস পাঠায়্যা
শ্যাষকালে হবে ঘর ঐটা হাড়িক নিয়া।

গোপীচন্দ্র কিন্তু জননী বলে মাকে ক্ষমা করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ করলেন হাড়িফাকে। এইবার মূল গায়েন গাইতে শুরু করল :

বিধবা যে নারী পুত্র রাজরাজেশ্বর,
দৈবগতি হাড়িফা বঞ্চএ তার ঘর॥
তার অত্র গুরু তারে বান্ধিয়া রাখিল,
মাটির করিয়া ঘর তাহাদের থুইল॥
হস্তী যেন বান্ধি রাখে তাহার উপর,
নিরন্তর থাকে সিদ্ধা তাহার উপর॥

গোপীচাঁদের পালাগানে অবশ্য এই পর্যন্তই থাকে। কারণ এ পর্যন্ত গোপীচাঁদের কীর্তি এবং তার গুণপনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি নাথপন্থীগণ রাণী ময়নামতী ও গুরুভাই হাড়িফার সংসর্গকে দেবত্বের প্রলেপ লাগিয়ে মহিমান্বিত করবার চেষ্টা পেয়েছে। তাই তারা পালাটিকে অন্যভাবে সাজায়। তারা প্রমাণ করতে চায়, রাণী ময়নামতী হলেন স্বর্গের দেবী। গুরুভাই হাড়িফাও স্বর্গের দেবতা, মর জগতে লীলা কীর্তন করতেই এসেছেন। তাই তারা পূর্ব ঘটনাটি পূর্বোল্লিখিত মতো করলেও দেখাতে চেষ্টা করে হাড়িফা ও ময়নামতী ঐ কারাগার থেকে উদ্ধার পায় এবং জগতে তাদের মাহাত্ম্য প্রচার করে।

নাথপন্থীরাও সেই অনুসারে পালাগানের উপসংহার করে :

যে শুনিবে ময়নামতীর কথা
রাহু কেতু ছাড়্যা পালায়
ছাড়্যা পালায় শনি॥

গোপীচাঁদের পালা

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ময়নামতী পালাগান এবং গোপীচাঁদের গান কিংবা মানিকচাঁদের গানের বিষয়বস্তু এক। গোপীচাঁদের গানের অনুরূপ গানও দিনাজপুরের নাথসম্প্রদায়ের ভিতর কিছু কিছু শোনা যায়। এর প্রথমেই দেখানো হয়েছে রাজা মানিকচন্দ্রের রাজত্বে প্রজারা কেমন সুখে শান্তিতে বাস করত :

কারো পুকুরির জল কাঁহো না খায়,
ঘিনে বান্দী না পিন্দে পাটের পাছরা,
একতন তেকতন করি রাত্র যায়,
তারও দুয়ারত ঘোড়া
সোনার ভেটা দিয়ে রাইয়ে
তরা ছাওয়ালে খেলায়,
হেন দুঃখিত কাঙাল নাই
যে ধরিয়া পালায় !

এর পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে দেশের বরাতে এত সুখ বেশি দিন স্থায়ী হলো না। দেশে অজম্মা, দুর্ভিক্ষ দেখা দিল :

নাঙল বেচায়, জোয়াল বেচায় আরো বেচায় ফাল,
খাজনার তাপেতে বেচায় দুধের ছাওয়াল।

রাজা মানিকচন্দ্র প্রজাদের অভাব অভিযোগ দুঃখ কষ্ট দূর করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। শেষে এক সময় তাঁরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হলো :

পথম দিবসে রাজার এ জবরি করিল,
দেরজা দিবসে রাজা কাহিল পড়িল।

এই সময় রাজা রাণী ময়নামতীর কাছ থেকে অভিজ্ঞান মন্ত্র শিখবার চেষ্টা করলেন :

আজি তিরির স্ত্রীর গিয়ান যদি নাও শিখিয়া,
কেমনে করি তোক্ ভক্তি করিয়া
গুরু মাও করিয়া।

রাণী ময়নামতী গুরু হাড়িসিদ্ধার কাছ থেকে এই অভিজ্ঞান মন্ত্র শিখে ছিলেন। স্বামীর পীড়াপীড়িতে রাণী ময়নামতী :

চাইরটা মোমের বাতি দিলে ধরাইয়া,
দিনে রাতি ষোড় মন্দিরে রাখে জ্বালাইয়া।

কিন্তু রাজার আসন্ন সময় উপস্থিত। মহারাজা তৃষ্ণা রোগে আক্রান্ত হলেন :

মরণ তিষ্যা বাণ রাজার বুকত মারিলেন ছুরি,
জল জল বলি রাজা উঠিল কাতারি।

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে মহারাজ মানিকচন্দ্রের। তিনি পাটরাণী ময়নামতীকে আদেশ করলেন জল আনবার জন্যে। রাণী জানেন তিনি যদি রাজার এই আসন্ন কালে এই ক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকেন, তা হলে মৃত্যুদূত অবশ্যই এখানে এসে রাজার প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কাজেই তিনি জল আনতে যেতে না চেয়ে অজুহাত দিলেন :

একশো রাণী আছে তোমার মহালের ভিতর,
তার হাতে জল খাও রাজ রাজেশ্বর।

মহারাজ সে কথায় কর্ণপাত না করে উত্তর দিলেন :

একশো রাণীর হাতের জল আন্টানী গোন্ধায়,
তোমার হাতে জল খাইলে বহু ভাগ্য হয়।

একথা বলাই বাহুল্য রাজা রাণী ময়নামতীর চরিত্র সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু নাথপন্থীরা সেই দিকটা পাশ কাটিয়ে গেছেন। এর পরেই দেখা যায় রাণী রাজার জন্যে সুবর্ণের ঝারি হাতে জল আনতে চলে গেলেন নেহাৎই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আর এদিকে রাজার শিয়রে এসে উপস্থিত হলো মৃত্যুদূত :

আকাশ নড়ে, পাতাল নড়ে পাশাপাশি,
সপ্ত হাজার আসন নড়েনি নড়ে কপালখানি।
ভাড়ুয়া যম রাজার বগল ভিড়িয়া
রাজার জিভ বান্দি নিলেন নেংটিত করিয়া,
পাছে পাছে যায় ময়না যমকে খেদাইয়া।

মহারাজ গত হয়েছেন। রাণী ময়নামতী নাবালক গোপীচাঁদ

(গোবিন্দচন্দ্র)-কে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর হয়ে রাজত্ব চালাতে লাগলেন। গোপীচন্দ্র ষোল বছর বয়সে পা দিতেই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা অদুনার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো। গোপীচন্দ্র বিয়ে করল অদুনাকে কিন্তু সেই সঙ্গে লাভ করল তার বোন পদুনাকে ফাউ হিসেবে (মতান্তরে পদুনা হলো অদুনার দূর সম্পর্কীয় বোন)। বিয়েতে খুবই ধুমধাম হলো :

অদুনাকে দিয়া বিয়া পদুনাকে দিল দোনে
তিন শত দাসী দিল ব্যবহার কারণে।

কিন্তু গোপীচাঁদ বেশিদিন সুখে কাল কাটাতে পারলেন না ; রাণী ময়নামতী কৌশলে তাঁকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম পালন করতে অনুপ্রেরণা যোগাতে লাগলেন। বললেন—এই দ্বাদশ বৎসর গোপীচন্দ্রের পক্ষে ভয়ানক খারাপ সময়। দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ খুবই বেশি, তবে এই দোষ খণ্ডাবার একমাত্র উপায় হলো সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন।

গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস যাত্রার প্রাক্কালে অদুনা পদুনার সঙ্গে দেখা করতে এলে অদুনা বলছে :

যখন আছিলাম রাজা বাপ মায়ের ঘরে,
তখন কেনে ধর্মী রাজা নাই যান সন্ন্যাস লইয়ে।

অদুনা পদুনার কথায় গোপীচন্দ্রের মন দ্রবীভূত হয়। সে এসে মার কাছে বলে, সন্ন্যাস যাত্রা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে বলে সন্ন্যাস ধর্ম করে কি হবে? এই দেহ আর এই মনইতো সব, এখানেই সব পাওয়া যাবে :

হিন্দে গয়া হিন্দে গঙ্গা হিন্দে বারাণসী,
মুখে হইল জপ তপ মস্তকে তুলসী।
মনে রান্ধে তপে পরসে আত্মএ বসি খায়,
জিতাত্মরূপে শুইয়্যা থাকে মহত নিদ্রা যায়।
যখন আছিলাম আমি জননীর উদরে,
আমার পিতাক মারছেন মা জোহার বিষ খোয়াইয়ে।

রাণী ময়নামতী বলছেন—বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে তিনি কি আর তার একমাত্র পুত্রকে সন্ন্যাসে পাঠান। সন্তানের জন্য মায়ের যে কি মমতা—যার কোনো সন্তান হয়নি সে কি করে বুঝবে :

মাছ চিনে গহীন গাঙরে পাংখায় চিনে ডাল,
সে জানে ছাওয়ার আদর যার বুকে আছে শাল।

গোপীচন্দ্র উত্তর দিচ্ছে—সবই বুঝলাম, আমাকে সন্ন্যাসী করার অর্থই হলো তুমি তোমার ওই গুরুভাই হাড়িফার সঙ্গে এই সময়ে অবৈধ প্রেমলীলা চালাবে :

হাড়ির খাইছ গুয়া মা হাড়ির খাইছ পান,
ভাব করিয়া শিখিয়া নিছ হাড়ির গেয়ান।
হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে একত্র করিয়া,
শাষ কালে হবে ঘর
ঐটা হাড়িক নিয়া।

রাণী ময়নামতী গোপীচাঁদের ওই কটুক্তিতে কান দিলেন না। বললেন—সন্তানের মঙ্গলের জন্য জননীর যে ব্যাকুলতা সন্তান তা জানবে কোথা থেকে :

আগে ঢালা ভিজে মায়ের গুয়ে আর মুতে,
পাছ ঢালা ভিজে মায়ের মাঘ মাসের শীতে।

গোপীচন্দ্রের সাধ্য কি যে সে রাণী ময়নামতীর সঙ্গে যুক্তিতর্কে পেরে উঠবে? তাই গোপীচাঁদকে একটু গরম হতে দেখেই বলে চলেছেন :

রাজা না হয়্যা আপনা ফোটাল না হয়া মিত,
ঘরের তিনি আপন না হয় যার জন্যে চিত।
এখন না বুঝিবু বাছা বুঝিবু পরিণামে
শুকায় ডুবিবে নৌকা তোর মনের ভরমে।

গোপীচাঁদ সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক সময় বন্দী হলো হীরা নটীর জালে। হীরা তাকে প্রলুব্ধ করল তার রূপ দিয়ে। কিন্তু গোপীচাঁদকে রক্ষা করল তার গুরু গোরক্ষনাথের উপদেশ :

ফুল গুটিক গুটিক দেখিয়া বাছা ফুল না পাড়িব,
পরার বৌ-মানুষ দেখিয়া
মাও ডাক ডাকিব।

তাই সে হীরা নটীর আহ্বানের উত্তরে বলতে শুরু করে :

কি তুঞ্জি নেহালাইস নটী তোর পাঞ্জায় পাঞ্জায় চুল,
দুই তন দেখউ যেন আরা ধুতরার ফুল।

শুধু তাই নয়, উপরন্তু বেশ গর্বের সঙ্গেই উত্তর দেয় :

মোর বান্দীর রূপ নাই
তোর কপালের মাঝে।

গোপীচাঁদের কথায় স্বভাবতই হীরা নটীর ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে :

সোনার খরম হীরা নটী পাঁওতে নাগা,
রাজাবক্ষে গাও ধো এছে দোনা দোনা।

যাই হউক গোপীচাঁদ তো কোনো মতে একদিন উদ্ধার পেল হীরা নটীর হাত থেকে, পুনরায় শুরু হলো তার সন্ন্যাস জীবন। এইবার বারো বছর শেষে সন্ন্যাসীর বেশে এসে হাজির হলো নিজের রাজপুরীর সিংহ দরজায়। প্রায় কেউই চিনতে পারল না তাকে। কিন্তু চিনে ফেলল গোপীচাঁদের দুই স্ত্রীতে। মিলন হলো স্বামী-স্ত্রীর। খবর রটে গেল রাজ্যময়, রাজা রাজত্বে ফিরে এসেছেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা খুশিতে ডগ্ মগ্ করে উঠল। আনন্দোৎসব চলল রাজ্যের সর্বত্র :

চেঙ্গেরা কালের হাসি রাখনে না যায়,
নাকে মুখে ফাকরা খায়া দিলেক পরিচয়।

গোপীচাঁদ পালাগানের এখানেই ইতি, কিন্তু ময়নামতীর পালাগানে এর পরও বহু ঘটনা রয়েছে। যথা—গোপীচাঁদের রাজ্যভার গ্রহণ, সিংহাসনে আরোহণের পর মাতা ময়নামতী এবং তার গুরুভাই হাড়িফাকে শাস্তি প্রদান ইত্যাদি। এ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

মানভূমের পালাগান

পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের পালাগানগুলির সঙ্গে মানভূমের পালাগানের কিছু কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তাই এ অঞ্চলের যাবতীয় পালাগানগুলির পৃথক ভাবে আলোচনার জন্যই প্রচলিত পালাগানগুলি একত্রে আলোচনা করা গেল। এর থেকে অন্যান্য অঞ্চলের পালাগানের সঙ্গে পার্থক্যটুকু ধরা পড়বে।

মানভূমের পালাগানের বৈশিষ্ট্যই হলো এগুলির প্রায় সবই লোক-কবিদের রচনা সাধারণত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করেই এরা পালাগান রচনা করে এবং তা গায় তাদেরই নিজেদের আসরের মাঝে। তা ছাড়া আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো এখানে কাহিনীর অংশ গৌণ—প্রাধান্য লাভ করেছে এদের নিজেদের সৃজনী শক্তির। তাই দেখা যায় এদের পালাগানের আরম্ভের গৌরচন্দ্রিকা বা প্রস্তাবনাগুলি অতি দীর্ঘ। এবং এর ভিতরই সত্যিকারের এদের কবিত্ব শক্তি ধরা পড়েছে। এসব গানের রচয়িতারা সমাজের অতি সাধারণ স্তরের মানুষ। অতি সামান্যই তাদের বিদ্যালয়লব্ধ শিক্ষা। কিন্তু দেখুন কী অপূর্ব তাদের রসবোধ আর শাস্ত্রজ্ঞান। পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন এদের রচনায় অনুপ্রাস ও সুরসঙ্গতি।

এদের পালাগান আরম্ভ হয় সাধারণত গণেশ বন্দনা দিয়ে :

নমঃ গণেশ চরণ হে
কর মম কামনা পূরণ হে
নমঃ গণেশ চরণ ॥
সর্ব দেব অগ্রে পূজ্য বক্ষ সনাতন হে
আগমে নিগমে তত্ত্ব নহে নিরূপণ হে
নমঃ গণেশ চরণ হে ॥
বিনায়ক বিঘ্নরাজ বিঘ্ন বিনাশন হে
হের হে লম্বোদর দৈমাতুর জন হে
নমঃ গণেশ চরণ হে ॥
এক দন্ত স্থূল তনু দেব গজানন হে
সিন্দুর বরণ কিবা ইন্দুর বাহন হে,
সিদ্ধি বুদ্ধিদাতা দেব নিত্য নিরঞ্জন হে
বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর-পার্বতী নন্দন হে ॥

আমাদের শাস্ত্রে আছে, সকল কাজে সিদ্ধিদাতা গণেশেরই পূজা করতে হয় সর্বাগ্রে। মানভূমের লোক-কবিরা এদিকে বেশ হুঁশিয়ার। তাই গণেশ বন্দনা দিয়ে পালা শুরু করবার পরই তারা বন্দনা গাইতে থাকে দেবী সরস্বতীর :

সারদা বরদা বাণী, ছবি শশধর জিনি
মুখরা সুখরা নামে খ্যাতি।

ত্রি-লোক বাঞ্ছিত পদ, পদতলে কোকনদ
তাহাতে নূপুর করে জ্যোতি ॥
স্তন যুগে রত্নহার, শ্বেত বসন কি বাহার
বিমলা বিমল রূপ অতি
কুণ্ডল কর্ণ যুগলে, গলে গজমোতি দোলে
শিরে শ্বেত কিরীটী বিভাতি।

এরপর আসে নারায়ণ বন্দনা। এই নারায়ণ বন্দনার ভিতর একটা মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবেন, কেউ কেউ একে বলেছেন 'অক্ষর বন্দনা'। একবার ভাবুন কতখানি কবিত্বশক্তির অধিকারী হলে এক নারায়ণকে 'ক' থেকে পর্যায়ক্রমে 'ক্ষ' পর্যন্ত অক্ষর ধরে বর্ণনা করা সম্ভব :

ক' এ কৃষ্ণ কানু মন, খ' এ খগেন্দ্র বাহন
গ' এ গিরিপতি শিবের নন্দন
নামের কি জানি বর্ণন!
ঘ' এ ঘন শ্যাম হরি, ঙ' এ ঙয়া কেঁদে মরি
চ' এ চিদানন্দ ময়
ছ' এ ছল বিনাশন ॥
জ' এ জগন্নাথ প্রভু, ঝ' এ ঝুলনে ঝুলেন বিভু
জগতে ইহার বলে
জগৎ জীবন ॥
ট' এ টংকারিয়ে বধু উদ্ধারিলেন রক্ষ তুনু
ঠ' এ ঠগাকার মজাইলে গোপীগণ।
ড' এ ডাগর উদর তব, ঢ' এ ঢামালী স্বভাব বিভু
ন' এ আনন্দময়
আনন্দে মগন ॥ ইত্যাদি।

আসর বন্দনা বা সভা বন্দনা পর্যন্ত সভায় সাজগোজ পরে কোনো লোকের আবির্ভাব ঘটবার কোনো কারণ নেই। অধিকারী (মূল গায়েন) এবং তার সঙ্গী দোহারবৃন্দই এইসব গান গেয়ে থাকে।

এরপর হয় "কনসার্ট" বাজনা। এ কনসার্ট কিন্তু বিলিতি বাদ্যযন্ত্রের বাজনা নয়। ঢোলক (ঢোল নয় কিন্তু), খোল কিংবা মৃদঙ্গ, রসমন্দিরা প্রভৃতি সহযোগে সৃষ্ট এক প্রকার বাজনা। তারপর আরম্ভ হয় সত্যিকারের পালাগান।

মানভূমের পালা গানের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণযাত্রা ও রামযাত্রা এবং পূর্ববঙ্গের কৃষ্ণলীলা ও রামলীলার প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। এখানেও কিশোর বালকরাই পালার নায়ক-নায়িকা সেজে অভিনয় করে। পুরুষই নারীর সাজ-অলঙ্কার পরিধান করে, মাথায় দেয় পরচুলা। নিজেদের ক্ষমতা ও শিক্ষানুসারে শ্রোতৃবৃন্দ ও দর্শকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করে।

লোক-কবি রামচরণ রচিত "অজ্ঞাত পাড়া" নামে যে পালা-গানটির প্রচলন আছে, সেটি পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের সময়কার একটা চিত্র—কিছুটা গান, কিছুটা কথার মাধ্যমে পরিবেশন করবাব চেষ্টা হয়েছে অতি সুন্দরভাবে।

পাণ্ডবগণ তাদের বনবাসের সময় অতিবাহিত করে এইবার তৈরি হচ্ছেন অজ্ঞাতবাসের জন্য। তাঁরা ঠিক করলেন সকলে মিলে গিয়ে উঠবেন বিরাটরাজের আশ্রয়ে। কিন্তু অনুগ্রহ প্রার্থীরূপে তো আর থাকা চলে না। তাই ঠিক হলো সকলেই একটা না একটা কিছু কাজ খুঁজে নেবেন রাজসরকারে। যুধিষ্ঠির হবেন বিরাট রাজের সভাসদ, মধ্যম পাণ্ডব ভীম হবেন রাজবাড়ীর সূপকার। অর্জুন বৃহন্নলা নাম নিয়ে ক্লীববেশে রাজ অন্তঃপুরে নৃত্যগীত শিক্ষকের পদ গ্রহণ করবেন। নকুল ও সহদেবও যথাক্রমে অশ্বপালক এবং গোপালকের কাজ নেবেন। আর দ্রৌপদী? তিনি হবেন রাণী সুদেষ্ণার সহচরী।

সবাই তৈরি হয়ে রওনা হলেন বিরাট রাজপুরীর দিকে। এই সময় তাবা (লোক-কবির দল) মধ্যম পাণ্ডব ভীমের চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে, তাতে একদিকে যেমনি মেলে তাদের রসজ্ঞানের পরিচয়, অপর দিকে তাদের কবিত্ব শক্তির:

> হাতে চাটু পাকে পটু যেন মত্ত করিবর,
> বৃকোদর চলেন বিরাট নগর।
> বর্ণ শ্রেষ্ঠ গিরি শ্রেষ্ঠ যেন হিম ধরাধর,
> বৃকোদর চলেন বিরাট নগর।
> বাল্য রবি তুল্য হবি যেন উদিল উদয়সর (পর),
> বৃকোদর চলেন বিরাট নগর।
> ভুজ দণ্ড গজ শুণ্ড দোলে অতি মনোহর,
> বৃকোদর চলেন বিরাট নগর ॥

এবার আর মূল গায়েন নয়, স্বয়ং অভিনেতারাই কথা বলতে শুরু করেছে শুনুন। বিরাট রাজপুরীতে এসে দ্রৌপদী গেলেন অন্তঃপুরে রাণী সুদেষ্ণার

কাছে। তিনি দ্রৌপদীকে দেখে তো একেবারে বিস্মিতা ও মুগ্ধা! মনের ভাব আর চাপতে না পেরে বলেই ফেললেন :

মরি মরি কী রূপের মাধুরী
অতি সুদীর্ঘ চুল, নাসা যেন তিল ফুল
ওষ্ঠ বিম্ব কণ্ঠ কম্বু তোর বলিহারী ॥

ললাট ললিত অতি, দশন মুকুতা পাতি
সুভ্রি যুগ যেমন কুণ্ডলিত হরি।

কুচ কুম্ভ মনোহর, কিম্বা সুন্দর
কোটি হেন লাজ বনে গেল কিশোরী ॥

মুখ পদ্ম, কর পদ্ম, নেত্র পদ্ম পাদ পদ্ম
পদ্ম মকরন্দে মত্ত ভ্রমরা ভ্রমরি।

মন্থর রব গামিনী, ভাষা কলকণ্ঠ জিনি
রামচরণে বলে আইলে কৃপা করি।
মরি মরি কী রূপের মাধুরী !!

এ অঞ্চলে 'গয়া পাল্লা' নামে যে পালাগানটি প্রচলিত আছে সেখানেও দেখুন শ্রীরামচন্দ্র মিথিলায় এসেছেন বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে হরধনু ভঙ্গ করবার জন্য, তখন রাজপুরীর অলিন্দ থেকে জনক দুহিতা সীতা দেবী তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে এক সখীর কাছে কিভাবে রূপ বর্ণনা করেছেন শ্রীরামচন্দ্রের :

বরণ নীল নীরজ, রাম রূপে মজ ভাই রে
(বার) জিনি শত কাম, রূপের সুঠাম
অবতীর্ণ এ ধরায় রে ॥
নাভি সুগভীর, ললাট প্রসর
ভুরু ভুজঙ্গে ভুলায় রে।
পূর্ণ শশী আসি, শ্রীমুখে বসি
দামিনী দমকায়রে ॥
সুচারু কুণ্ডল, শ্রবণ কুণ্ডল
লোচন ঝলসায়রে।
দশনের দ্যুতি, মুকুতার পাতি
মৃদু হাসি দেখায় রে ॥

মানভূমের পালাগান সম্পর্কে বলতে বসে গানের বাণী ছাড়াও এর সুরগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও বলা প্রয়োজন। বলতে গেলে অধিকাংশ পালাগানের সুরেই ঝুমুরের সুরই বিদ্যমান। তাই ঝুমুর গায়কেরাই বেশির ভাগ এর অভিনেতা। ঝুমুর গানের মূল উৎস যে মানভূম একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাজেই এ অঞ্চলের অধিকাংশ গানেই যে ঝুমুর গানের ছোঁয়াচ থাকবে এ আর একটা বেশি কথা কী ?

আমরা এ অঞ্চলের পালাগান বিষয়ে বলতে বসে প্রথমেই দেখিয়েছি এরা সভা আরম্ভ করে গণেশ বন্দনা দিয়ে। তারপর সরস্বতী বন্দনা এবং পরে নারায়ণ বন্দনা বা অক্ষর বন্দনা। পুরুলিয়ার কোনো কোনো দলে এই সঙ্গে শিব বন্দনাও জুড়ে দেয়। অবশ্য এইরূপ শিব বন্দনা পৃথক ভাবেই কোন শৈব অনুষ্ঠানেও শুনতে পাওয়া যায় :

কে যোগী বৃষ বাহনে,
অর্দ্ধেন্দু ভালে শোভন
চূলন্দু চূলন্দু ত্রিনয়ন
ঊর্ধ্ব নেত্রে হুতাশন অহি শিশু শ্রবণে
কে যোগী বৃষ বাহনে ॥
বামাঙ্গে গিরীন্দ্র সুতা, তারুণ্য লাবণ্য যথা
প্রেমানন্দে ভব পিতা, রাখিবি মা বাম চরণে ॥

পূর্ববঙ্গের পালাগান

পূর্ববঙ্গের পালাগানগুলিকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়—কৃষ্ণ বিষয়ক ও রাম বিষয়ক। এর ভিতর আবার প্রত্যেকটির কিছু কিছু পৃথক ভাগও লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণ বিষয়ক পালাগানগুলি (ক) কৃষ্ণলীলা ও (খ) কৃষ্ণযাত্রায় বিভক্ত। পক্ষান্তরে রাম বিষয়ক পালাগানগুলি (ক) রামলীলা (খ) রাম যাত্রা ও (গ) রামায়নী পালাগান। আমরা সংক্ষেপে পৃথকভাবে এ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

কৃষ্ণ বিষয়ক

পূর্ববঙ্গের কৃষ্ণলীলা আর পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণযাত্রা প্রায় একই বলা চলে, তবে পার্থক্যের মধ্যে কৃষ্ণযাত্রার গান এবং কথা সবই সাধু ভাষায় রচিত, পক্ষান্তরে

কৃষ্ণলীলার সমস্ত গানই লোক-কবিদের নিজেদের ভাষায় রচিত। নাম থেকেই বোঝা যাবে কৃষ্ণযাত্রা স্বভাবতই যাত্রা ঘেঁষা অর্থাৎ এর পালা রচয়িতাগণ একেবারে নিরক্ষর নন—সে কারণে একে খাঁটি লোকসংগীত বলার পথে বাধা অনেক। কিন্তু কৃষ্ণলীলার পালাগান রচয়িতাগণ এককথায় সবাই নিরক্ষর। চাষী-বাসী মানুষ কেউ কাজ করে ক্ষেতে, কেউ বা জনমজুর। দিনের শেষে নিজেরাই বসে মহলা দেয় তাদের নাটকের। আমরা পাশাপাশি কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণযাত্রাকে রেখে দেখাবার চেষ্টা করব কোনটি শ্রেষ্ঠতর।

কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণযাত্রাকে মোটামুটিভাবে (১) নৌকা বিলাস, (২) মান ভঞ্জন (৩) কলঙ্ক ভঞ্জন, (৪) সুবল মিলন, (৫) নিমাই সন্ন্যাস এবং (৬) কংস বধ পালায় ভাগ করা চলে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা সর্বজন বিদিত। একদিন শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন রাধার কুঞ্জে, পথিমধ্যে ধৃত হলেন চন্দ্রাবলী কর্তৃক। কাজেই সে রাত্রে আর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সংগে মিলন সম্ভব হলো না। ভোর বেলা যখন রাধার কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত, গিয়ে দেখেন শ্রীরাধা মান করে বসে আছেন। কাজেই তখন শ্রীকৃষ্ণকে মান ভাঙবার চেষ্টা পেতে হয়:

একদিন শ্যামসখী রাই কমলিনী, এমনি শোকে উন্মাদিনী
বঁধুর শোকে পড়িল ধরায়।
তখন আসিয়া সকল নারী, সদ্য ঘর সহচরী
ক্যান সখী ধুলাতে লোটাও॥

সখী বন্ধুর জ্বালা সয়না প্রাণে, গৃহ ধর্ম নাহি মনে
বন্ধুর জন্য বিষাদে মগন।
বন্ধুর জন্য দিবা নিশি, গলে দিয়া প্রেম ফাঁসী
দ্যাখ সখী নিকটে মরণ॥

বন্ধুর জ্বালা সয় না প্রাণে, গৃহ ধর্ম নাহি মনে
বন্ধুর জন্য কাঁদি অনিবার।
আমার জ্বলে প্রাণ দিবানিশি, গলায় দিয়া প্রেম ফাঁসী
নাহি সখী দুঃখের পারাপার॥

আমি কুলের কুল ছাড়া, প্রেম করিয়ে ঘটল জ্বালা
এই জ্বালা ক্যামন করে সই।

সখী বন্ধু যদি আমার হতো, তবে কি আমায় ছেড়ে যেত
মিছে বন্ধু আমায় পাগল করে তাই ॥
সখী বনের আগুন সবে দ্যাখে, মনের আগুন কেউ না দ্যাখে,
বন্ধুর প্রেমাগুনে মরি আমি পুড়িয়া।
আমি যখন যাইও জলে, কুকিল ডাকে ডালে ডালে
আমার মনের কথা লয় সব কাড়িয়া ॥
যখন সখী কলসী কাঁখে, চলি আমি যমুনার ঘাটে
কলসী আমার ভরে অশ্রুজলে।
সখী বন্ধু যদি আমার হতো, অবশ্যই সে দেখা দিত
আর আসিবে কি আমি মইলে ॥

কিন্তু এতো হলো শ্রীরাধিকার অন্তরের কথা। বাইরে তিনি বসে রইলেন মুখ গম্ভীর করে, অন্যদিকে মুখ ফিরেগে। যেন 'কাল বদন আর হেরব না গো'। শ্রীকৃষ্ণ তখন আর কি করেন, বাধ্য হয়েই শেষ প্রচেষ্টা শ্রীরাধিকার পদযুগল আকর্ষণ করে বসলেন। কিন্তু তাতেও যখন কোনো ফল হলো না, তখন নিতান্তই ব্যথিত হয়ে বলতে লাগলেন :

তবে আমি যাই, যাই গো রাধে
আর ত দেখা হবে না গো।
যাই চলে জন্মেরই মতন
তবে আমি যাই গো যাই।
তোমার সাথে আমার সাথে
দেখার কথা লেখা নাই ॥
আর ত দেখা হবে না গো,
দেখে নেও জন্মেরই মতন ॥

দেশপ্রচলিত বিশ্বাস চৈতন্যদেব হলেন শ্রীকৃষ্ণের আরেক রূপ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার সঙ্গে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার অদ্ভুত সাদৃশ্য। বাল্যকালের নাম তার নিমাই। সব বিষয়েই সে ওস্তাদ। যেমনি লেখাপড়ায় তেমনি দুষ্টুমিতে। তার অত্যাচারে দেশের লোক অস্থির। মাতা শচীমাতাকে যে দিনে কতবার তাঁর এই ছেলের জন্য লোকের কথা শুনতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। দেখতে দেখতে নিমাইয়েরও বয়স বাড়ে—সেও উপনীত হয় যৌবনে। শচীমাতা আর পাঁচজনের মতো ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন রূপসী মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। ভাবলেন

ছেলে সংসারী হবে। কিন্তু নিমাইয়ের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্থির করল সন্ন্যাসে যাবে। অথচ একদিকে দুঃখিনী জননী, অপর দিকে যুবতী-স্ত্রী এদের ফেলেও যেতে পারে না। এমন এক নাটকীয় মুহূর্তে আমাদের পল্লীকবি বিবেকের মারফত সমস্ত ঘটনাটা শ্রোতা ও দর্শক জনের কাছে উন্মুক্ত করে দিল :

এক দিনেতে নিমাই চাঁদ, বলে শচী
শুন মাগো আমারি বচন।
মাগো আমি যাব সন্ন্যাসেতে,
বিদায় দ্যাও গো ভাল চিত্তে
আমার মনে এই আছে আকিঞ্চন ॥

তখন ইহা শুনি শচীরাণী, হইলেন যেন পাগলিনী
আঁচল দিয়ে মুছে দু নয়ন।
বাছা তোমারে বিদায় দিয়া, ক্যামনে ধরিব হিয়া
তুইরে আমার জীবনেরই জীবন ॥
(ওগো) একদিনেতে রজনীতে, নিমাই চলে সন্ন্যাসেতে
খুলিল সব অঙ্গের আভরণ।
তখন রাখিয়া সব বসনগুলি, মাথায় বেঁধে নামাবলী
মনের সুখে করিল গমন ॥
(ওগো) নিমাই যখন বাহির হল, বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমে ছিল,
উঠে প্রিয়ে করে হাহাকার।
প্রিয়ে শিরে হানে করাঘাত, কোথা গেল প্রাণনাথ,
সোনার নদে করে অন্ধকার ॥
(ওলো) তোরে আমায় অনাথিনী, ছেড়ে গেছে বনমালী
মম ভাগ্যে এই ছিল বিধাতা।
শিরে হানে করাঘাত, কোথা গেল প্রাণনাথ
শচীমাতা বুঝায় কত কথা ॥
তখন বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা, কাঁদিয়ে ভাঙ্গয়ে মাথা
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাগত হয়।

ডাকে রাণী নিমাই নিমাই, প্রতিধ্বনি করে নাই নাই
ইহা শুনে পড়িল ধরায় ॥

বিবেকের গানের পরই দর্শকদের সংগে অভিনেতাদের সাক্ষাৎ। গীতিনাট্যের এই জায়গাই বোধ হয় চরম মুহূর্ত। বড়ই করুণ। বিষ্ণুপ্রিয়াসহ নিমাই ঘুমিয়ে আছে পালংকের উপর। এমন সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় নিমাইয়ের। কিসের অজ্ঞাত ডাকে যুবতী স্ত্রী, আবাল্যের বাসভূমি পরিত্যাগ করে নিমাই বেরিয়ে আসতে চায় বাইরে। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে যে মানসিক দ্বন্দ্বের সংগে লড়াই করতে হয় তাকে, পল্লী কবি অপূর্ব দক্ষতার সংগে বর্ণনা করেছে সেই জায়গাটা।

নিমাই সবকিছু ছেড়ে একবার বাইরে যাবার জন্য দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছে, পুনরায় ফিরে আসছে প্রেয়সীর শয্যাপাশে। এই পরিবেশকে মনে করেই তাই বিবেক বলে উঠছে :

আমি যাই যাই করি মনে যাইতে না পারি,
মায়া মোহরূপ মোর পিছনেতে ধায়।

কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বে জয় হয় গুরুরই। নিমাই আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে বেরিয়ে আসে বাইরে। বাইরের আকাশ, বাতাস অভ্যর্থনা জানায় তাদের সম্মিলিত কল-কাকলীতে।

ভোর হয়। বাড়িতে উঠে কান্নার রোল, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার কান্নায় পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গেছে। প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দেয় উভয়কেই নানাভাবে। শচীমাতা বধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে চলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধ দেন শচীমাতাকে :

শচীমাতা গো, আমি চারিযুগে হই জনম দুঃখিনী।
আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল কভু না হইলাম সুখিনী ॥
সত্যযুগে ছিলাম আমি মাগো সত্য নারায়ণী,
দুর্বাসার অভিশাপে আমি হইলাম মর্ত্যবাসিনী ॥
(শচীমাতা গো.........)
ত্রেতাযুগে ছিলাম আমি মাগো রামের ঘরণী।
বাদী হইল কৈকেয়ী মাতা আমায় করল বনবাসিনী ॥
(শচীমাতা গো.........)

দ্বাপরেতে ছিলাম আমি মাগো আয়ান ঘরনী।
শাশুড়ী ননদী বাদী, আমায় করল কৃষ্ণ-কলঙ্কিণী॥
(শচীমাতা গো.........)
কলিযুগেতে হইলাম আমি মাগো গৌরাঙ্গ ঘরনী।
অকালে ছাড়িল পতি, মাগো, আমি বড় মন্দভাগিনী॥
(শচীমাতা গো.........)

এই অপূর্ব অতি সাধারণ ছন্দে গাঁথা পল্লীকবির গীতি ও দরদী কণ্ঠস্বরের গান শুনে আসরে এমন কোনো লোক থাকে না যে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে সমবেদনা না জানায়।

আমরা দেবতাদের লীলাখেলা বলতে বলতে হঠাৎ এক দৌড়ে একেবারে মর্ত্যলোকে চলে এসেছিলাম। তার কারণ, আমরা পূর্ববঙ্গের চলিত 'কৃষ্ণলীলা' ও 'কৃষ্ণযাত্রার' পালা গানগুলির জনপ্রিয়তার উপর লক্ষ্য রেখেই এইভাবে এগিয়ে চলেছি।

কুলের কুলবধূ শ্রীরাধিকা, ঘরের শাশুড়ী, ননদীর চোখে ধুলো দিয়ে শ্রীকৃষ্ণসখা সুবলের সহায়তায় কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এই নিয়েই হলো 'সুবল মিলন' পালা—পক্ষান্তরে বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের উপকারার্থে সুবল কিভাবে রাধা সেজে আয়ান কুটীরে থেকে গেল এবং পরে আবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলো এই হলো, এ পালার মূল ঘটনা।

শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত। এমনি সময় একদিন নজরে আসে রাধিকাসুন্দরী সুবর্ণ কলসী কাঁখে নিয়ে চলেছেন যমুনার ঘাটে। তাই দেখে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে ডেকে বলছেন:

চেয়ে দেখ, দেখরে সুবল
কার বা কুলের কুল বউ,
কলসী লয়ে যায় যমুনায় (রে)।
কোন্ নিঠুর পাঠায়েছে হেথায়,
দয়া নাই কি তার হিয়ায়
ও তার রূপ সায়রে উজান বয়ে যায় (রে)॥
ও সে কলসী কাঁখে চলে যখন
বৃক্ষের তলে বসে তখন

বাজাই আমার সাধের বাঁশী।
রাধা আমার প্রাণ প্রেয়সী ৷৷

শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধিকার জন্য এতটা উতলা তখন 'বিবেক' (বিবেকের ভূমিকা অনেকটা আধুনিক গীতি-নাট্যের সূত্রধারের মতো। 'কৃষ্ণলীলায়' বিবেকের হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। 'বিবেক' ছাড়া কোনো পালাই নেই।) সমস্ত ঘটনাটা নিজের কথায় প্রকাশ করে শ্রোতৃমণ্ডলীর কাজের খানিকটা সুবিধা করে দিল:

গহন কাননে, সুবলেরই সনে
করিত বিনোদ খেলা।
আনিয়া সুবল, চম্পকেরই দল
মনোহরে গাঁথে মালা।
মালা করি করে, কহে গিরিধরে
নেরে নেরে ফুল মালা।
অতি অনুপম, চম্পকেরই দাম
পররে কানু গলে ৷৷
গহন কাননে, সুবলেরই সনে
করিত বিনোদ খেলা।
ওগো তুষেরই অনল, জ্বালালি সুবল
ব্যথা জাগাইলি মনে ৷৷
একবার তারে এনে দে ভাই
রাধা বিনে প্রাণ যায় গো
একবার তারে এনে দে ভাই ৷৷
আমি চিরদাস হব
একবার তারে এনে দে ভাই ৷৷

শ্রীকৃষ্ণের যখন এই রকম অবস্থা, তখন সুবল ভেবে ভেবে এক ফন্দি ঠিক করে ফেলল। সে চট্‌ করে একটা বাছুর নিয়ে সোজা আয়ান ঘোষের বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল। ভাবখানা যেন, তার বাছুরটা এ-বাড়িতে ঢুকে পড়েছে, সে ও-টাকে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু তাতে ফল কী হলো, শুনুন:

সুবল ভাবিয়া ভাবিয়া, বৎস কোলে নিয়া
মহাল ভিতরে চলে।

দেখিল তখনি, আছে সুবদনী
বসিয়া রন্ধনশালে ॥
ওগো কুটিলা তখন, কে-রে, কে-রে করি
ধাইল সুবল পানে,
'ও তুই কে রে?'
মোদের বউকে, নিতে এলি বুঝি
'ও তুই কে রে?'
দূরে চলে যা—
দূরে চলে যা ॥

কুটিলা এই বলে যেই গেল মা জটিলাকে ডাকতে এই ফাঁকে সুবল আর শ্রীরাধিকা পরস্পর কাপড় পাল্টাপাল্টি করে রাধা চলে গেল বাড়ির বাইরে, আর সুবল মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে রইল রন্ধনশালায়। মায়ে ঝিয়ে ফিরে ব্যাপার দেখে তাজ্জব! তখন মা দেয় ঝিয়ের দোষ, ঝি দেয় মায়ের দোষ! এই সময় আসরে পুনরায় আবির্ভাব ঘটে বিবেকের। সে উভয়কে উদ্দেশ্য করেই বলতে থাকে :

ও তোর কুটিলতা ছাড় কুটিলে
কুটিলতা ছাড়।
তুই কুটিলে জানিস ফন্দি
তার চেয়ে যে ওর বিষম সন্ধি।
(ও তুই কুটিলতা ছাড়) ॥
সুবল সেজে রাধা গেল
কী করলি তার?
ও তুই কী করলি তার?
(ও তুই কুটিলতা ছাড়) ॥

এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। আয়ান ঘোষ বাড়ি ফিরে এসেছে। রাধাও অন্যদিক দিয়ে ঘরে পেঁৗছে গেছে। আর সুবলও এই হট্টগোলের মধ্যে একদৌড়ে পেঁৗছে যায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

শ্রীরাধিকা হলেন কুলের কুলবধূ। যার ঘরে এই রকম শাশুড়ী ননদী বিদ্যমান, তার কপালে যে সুখ, শান্তি কতখানি তাতো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। এই

সময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছে হলো শ্রীরাধিকার সঙ্গে জলকেলি করবেন। কিন্তু সুযোগ আর মেলে না। প্রথম প্রথম তো যমুনার ঘাটে শ্রীরাধিকা অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে স্নান করতে যেতেন, সেইখানের এক কদম গাছের ডালে শ্রীকৃষ্ণ বসে বাঁশী বাজাতেন। কিন্তু ব্যাপারটা কুটিলার নজর এড়াল না। সে বাড়ি ফিরে রাধাকে ভয় দেখালো যমুনার ঘাটে যেন সে আর নাইতে না যায়। কারণ জলে নাকি কুমীর এসেছে। ওটা যুবতী স্ত্রী দেখলেই জলের ভিতর টেনে নিয়ে চলে যায় ঃ

একদিন শ্যাম নীল জলে, রাধা বদন হেরব বলে
ধীরে ধীরে চলে শ্যাম রায়।
গিয়ে যমুনার কদম্বমূলে, দাঁড়াইল কুতুহলে
কুটিলা তাই দেখিবারে পায় ॥
কুটিলা কয় শোনলো বউ, জল আনিতে যাইসনা লো কেউ
ব্রজের যত আছে ব্রজাঙ্গনা।
কাল কুম্ভীর এল যমুনাতে, দেখে এলাম স্বচক্ষেতে
তাইতে তোদের যেতে করি মানা ॥
কে দেইখ্যাছে কোন কালে, কুম্ভীরেতে মানুষ গেলে
কখনও কি কেউরে ছেড়ে দেয়।
সে যে বাইছা বাইছা করে আহার, তাই দেখে লাগে চমৎকার
বাল্য বৃদ্ধ কিছু নাহি খায় ॥
পুরুষ যদি যায় যমুনায়, অমনি কুমীর ভয়েতে পালায়
আড়ালে থাকিয়া লক্ষ্য করে।
যায় যখন যুবতী বালা, অমনি এসে ধরে গলা,
নিয়ে যায় সে হরিষ অন্তরে ॥
তোরে নিত্য নিত্য করি মানা, জলের ঘাটে মোটেই যাইস না
আমার কথা শুনিস না বউ মোটে।
তোরা নয় জনাতে যুক্তি করে, সন্ধ্যাকালে যমুনাতে
জল আনতে যাস কদম তলার ঘাটে ॥
আছে ওই পাড়ার ঐ কতকগুলি, কুলে মানে দিচ্ছে কালি
সেই দলে বউ করিস আনা গোনা।

কত ছেদার গোদার বেতাল দলে, লেংটা হয়ে নামে জলে
ও বউ চোখ থাকতে হস কেন কানা ॥
বশীকরণ মন্ত্রের জোরে, ভুলাযে আমার দাদারে
আমারে ভুলান বড় দায়।
ভেবে নলিনী কয় যুক্ত করে, রাধারূপে জগৎ ভরে
গঙ্গার জলে শুষে লোহায় ॥

শ্রীরাধিকার আর সেদিন যমুনায় যাওয়া হলো না। কদিন পর শ্রীরাধিকা নব সখী সহ চলেছেন মথুরার হাটে দই বিক্রি করতে। কিন্তু যমুনার ঘাটে এসে দেখেন, সেখানে রয়েছে মাত্র একখানা ভাঙা নৌকা। ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ হলেন সেই নৌকার মাঝি। শ্রীরাধিকা বাধ্য হয়ে সখী এবং দধির ভাণ্ড নিয়ে সেই ভাঙা নৌকাতেই গিয়ে উঠতে বাধ্য হলেন। এর পরের ঘটনা পল্লী কবিদের মুখ থেকে "নৌকা-বিলাস" পালার মাধ্যমে শুনুন :

একদিন সখীসঙ্গে বিনোদিনী, করতে সাধের বিকি কিনি
চল্‌ল ধনী মথুরার হাটে।
নিয়ে সঙ্গেতে দধির পসারী, পরে নীলাম্বরী শাড়ি
তারা উদয় হইল যবুনারই ঘাটে ॥
শ্রীকৃষ্ণ তাই জানতে পেরে, নবীন নাবিক হয়ে
খেয়াতরী করিল সৃজন।
গিয়ে যবুনার জলে, বাহেন তরী কুতুহলে
তরী দেখতে পেল সখীগণ ॥
সখীগণে নাবিকে দেখে, ডেকে বলে ও নাবিকে
কেগো তুমি তরী বেয়ে যাও।
আমরা চলেছি মথুরার হাটে, ঠেকেছি যবুনার ঘাটে
মাঝি ত্বরায় মোদের পার করিয়া দাও ॥
ডেকে বলে নন্দের কালা, কেগো তোমরা কুলবালা
বসে আছ যবুনারই কূলে ॥
তোমাদের ঐ মধুর ডাকে, পড়ল তরী বিপাকে
তরী ডুবে বুঝে যবুনারই জলে ॥
একে আমার ভাঙ্গা নাও, তোমরা ত পার হতে চাও
মনে মনে করি অনুমান।

তোমাদের বক্ষে আছে কুচ-গিরি, ঐ গিরিতে হবে ভারী
এক জনের ভার দুই জনের সমান ॥
তখন ললিতা কয় ওগো নেয়ে, আমরা যুবতী মেয়ে
উপহাস তোমার উচিত নয়।
তোদের পুরুষের যাই বলিহারি দেখলে পরে পরের নারী
রঙ্গ করতে কতই কথা কয় ॥
নাবিক কথায় কথায় বেলা যায়, উপহাসের সময় নয়
ত্বরায় আন হে খেয়া তরী।
দ্বিজ নলিনী কয় বংশীধারী, আর কেন কর দেরি
ঘাটে সখীসহ এসেছে কিশোরী ॥

একবার শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে শ্রীরাধিকার কলঙ্ক মোচন করেছিলেন এই নিয়েই হলো 'কলঙ্ক-ভঞ্জন' পালা। এই পালায় গীতিকার দেখাবার চেষ্টা করেছেন, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণগত প্রাণ হলেও (পর পুরুষ) জগতে সেই হলো সর্বশ্রেষ্ঠা সতী।

শ্রীকৃষ্ণ একদিন কপট পীড়ার ভান করে পড়ে রইলেন ঘরে। পাড়া শুদ্ধ লোক ছুটে এল দেখতে, সবাই হায় হায় করে। নন্দরাণীর কান্নায় বনের পশু-পাখীরও বুঝি দয়া হয়। রোজা-বৈদ্য আসে, কিন্তু কোনো ফল হয় না। এমন সময় ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন এক নবীন বৈদ্য। তিনি অসুখের বিবরণ শুনে বললেন, সহস্রাধিক ছিদ্রযুক্ত কোনো কলসী করে যমুনার ঘাট থেকে যদি কোনো সতী-নারী জল নিয়ে আসতে পারে তবে সেই জলে স্নান করে শ্রীকৃষ্ণ রোগ মুক্ত হবেন।

প্রথমটায় কেউ-ই রাজী হয় না। তখন ডাক পড়ে পাড়ার ডাকসাইটে সতী জটিলা-কুটিলার। কিন্তু তারাও হার মানে। তখন সবাই বলাবলি করে বৈদ্যের এই অসম্ভব প্রস্তাব সম্পর্কে। বৈদ্য দৈবজ্ঞ। তিনি গণনা করে বলেন,—যদি এদেশে 'রাধা' নামে কোনো নারী থাকে তা হলে তিনিই শুধু এ-কাজ পারবেন।

দৈবজ্ঞের কথায় সবচেয়ে অসন্তুষ্ট হলো রাধার শাশুড়ী-ননদী। তবু দৈবজ্ঞের কথায় ডাকতে হলো তাকে। খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন শ্রীরাধিকা ঘটনা স্থলে। দৈবজ্ঞের কথা শুনে নীরবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে চলেছেন তিনি যমুনার ঘাটে। এমন অসম্ভব ব্যাপার কি কখনও সম্ভব হয়? তাই ঘাটের কিনারায় দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন শ্রীরাধিকা:

আমি বইস্যা রইলাম,

যমুনার কিনারে কানাইরে।

পার কর অবলা রাধারে ॥

আমি ছিদ্র কলসী নিয়া আইলাম

তোমারই ভরসাতে,

আমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর

বাঁচুক প্রাণ নাথে ॥

সবই শ্রীকৃষ্ণের লীলা। তারই কৃপায় শ্রীরাধিকা সত্যিই ছিদ্র কলসীতে জল নিয়ে আসতে সক্ষম হন, এবং সেই জলে স্নান করে শ্রীকৃষ্ণ ভাল হয়ে উঠেন। প্রমাণিত হয় জগতে শ্রীরাধিকাই শ্রেষ্ঠা সতী।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত প্রায়। দৈত্যরাজ কংসকে বধ করবার জন্যই তার মর্ত্যে আগমন। সে সুযোগও প্রায় উপস্থিত।

দৈত্যরাজ কংস, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকেই তার প্রাণ সংহারের চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টাই একে একে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সভায় বসে চিন্তিত হয়ে পড়েছে কংস—কী ভাবে তাকে শেষ করা যায়? এই চরম মুহূর্তে আসরে আবির্ভাব ঘটে বিবেকের। সে এসেই গান ধরে :

আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার

তুমি যা ভেবেছ, তাই হয়েছে

চমৎকার ব্যাপার।

আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার ॥

প্রাণের ভয়ে ভীত হয়ে

হৃদয় ভরা হিংসা লয়ে

জাল দেবকীর পুত্র লয়ে

তবু বাঁচিল অষ্টম সন্তান।

তোমারে বধিবে যিনি

গোকুলেতে আছেন তিনি

শুধু প্রাণটুকু নিয়ে তিনি

যাবেন স্বর্গদ্বার।

আমি বলতে পারি ব্রজের সমাচার ॥

কংস তো রেগেই আগুন, তখনি দূত পাঠালেন নন্দ ঘোষের পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে

রাজধানীতে নিয়ে আসবার জন্য। ঠিক হলো শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন মল্লযুদ্ধে ডাকসাইটে মল্লবীর চানুর এবং মুষ্টিকের সঙ্গে। তাদের বলে দেওয়া হবে এই আসরে যেন তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সংহার করে।

মহামুনি অক্রুর এসেছেন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যাবার জন্য। এই খবর গিয়ে পৌঁছল ব্রজগোপীগণের কাছে। দেশ শুদ্ধু লোক ছুটে এল শ্রীকৃষ্ণকে শেষবারের দেখা দেখতে। সবচাইতে করুণ দৃশ্য যখন শ্রীরাধিকার কানে গিয়ে পৌঁছল এই বার্তা। তখন তার মনের অবস্থা কী রকম তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব কিনা জানি না। কিন্তু পূর্ববাংলার লোক-কবি তার 'সরল সহজ' কাব্য শৈলীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে এই রসঘন করুণ দৃশ্য :

একদিন অক্রুরের রথে চড়ি, শ্রীকৃষ্ণ যায় মধুপুরী
বৃন্দাদূতী বলিছে রাধায়।
রাই গো তোমার প্রাণের বন্ধু, গোপীশ্বর জগবন্ধু
(আজি) রথে চড়ে গেল মথুরায় ॥
পেয়ে খবর কমলিনী, সঙ্গে নিয়ে সব গোপিনী
উদয় হলো যথা দয়াময় !
গিয়ে রাধিকা কয় বিনয় করি, যাও যদি শ্যাম মধুপুরী
(ব্রজ) গোপিনীর কী হবে উপায় ॥
সব গোপিনী করজোড়ে, বলে সারথি অক্রুরেরে
ব্রজের জীবন নিও না, নিও না।
মুনি এখানেতে রথে বসি, দেখাও মোদের জীবন পাখি
প্রাণের পাখি বিনে প্রাণ ত বাঁচে না ॥
ব্রজে আমরা যত গোপনারী, সবাই ঐ পদের ভিখারী
পূজি মোরা ঐ যুগল চরণ।
আমরা ফুল চন্দনে সাজাইব, হিয়ার মাঝে বসাইব
দেখব বঁধুর ও চন্দ্র-বদন ॥
বলতে বলতে গোপীগণে, ধরে রথের চাকা টেনে
রথের অশ্ব ধরে কমলিনী।
বলে বন্ধু তোমার বাঁশীর সুরে, রমণীর মন হরণ করে
বঁধু জন্মের মতো বাজাও একবার শুনি ॥

সব শেষ। বৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন মথুরায়।

গোপীগণসহ শ্রীরাধিকা অচৈতন্য হয়ে পড়লেন মাটিতে। বনানী শান্ত, আকাশ বাতাস সব ব্যথিত, দুঃখে ভারাক্রান্ত।

রাম বিষয়ক

রামযাত্রা এবং রামলীলা উভয়েই নটেরা কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণযাত্রার মতো সাজ পোশাক পরেই অভিনয়ের মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী পরিবেশন করে থাকে। কিন্তু রামায়ণী পালাগান তা নয়। এর একজন কথক ঠাকুর থাকে—কোথাও কোথাও বলে অধিকারী। তাদের রচিত গানের মাধ্যমে তারা পরিবেশন করে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী। তাদের কোনো স্বতন্ত্র সাজ পোশাক লাগে না। সস্তা ধুতি চাদর পরেই হাতে চামর নিয়ে এসে ঢোকে আসরে, তারপর কখনও কবিতা, কখনও বা গানের মতো করেই বর্ণনা করতে থাকে কাহিনী।

রামায়ণী পালাগান, রামযাত্রা ও রামলীলার প্রত্যেকটিতেই কতকগুলি করে পালা থাকে, যেমন—(১) সীতার বিবাহ, (২) শক্তি শেল, (৩) রাবণ বধ, (৪) পিতাপুত্র এবং (৫) লক্ষ্মণ বর্জন।

শ্রীরামচন্দ্র বাল্য, কৈশোর অতিক্রম করে পা দিয়েছেন যৌবনে। এমন সময় বিশ্বামিত্র মুনি এসে রাজা দশরথের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন রাম লক্ষ্মণকে তাঁদের যজ্ঞ রক্ষার্থে:

বিশ্বামিত্র মুনিবর গাধির নন্দন।
অযোধ্যা নগরীতে এসে দিলেন দরশন॥
রাজারে চাহিয়া মুনি লইলেন রাম লক্ষ্মণ।
সন্দেহ উদিল মনে জিজ্ঞাসে যখন॥
কোন্ পথে যাবে বল দাশরথি শূর।
বিনা বাধায় সাত দিন সহজে বিপদ দূর॥
এতেক শুনিয়া কুমার উত্তরিলা যবে।
বিলম্বে কার্য হইলে বিপদে কে পড়ে?
বচন শুনিয়া মুনির সন্দেহ গেল দূর
রাম লক্ষ্মণ কভু নহে এই দুই বীর।
ত্বরা করি যায় মুনি ফিরি রাজা পাশে,
ক্রোধেতে অধীর হয়ে ভয় দেখায় শাপে।

ক্রোধ প্রশমিতে রাজা পাঠায় সত্ত্বর
রাম লক্ষ্মণ যুগল আসে অতঃপর।
রাম লক্ষ্মণ নিয়ে মুনি চলিলেন বনে
নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন হলো অরণ্য ভিতরে। [পালা গান]

এরপর বিশ্বামিত্র মুনি দুই ভাইকে সঙ্গে করে এসে হাজির হলেন জনক রাজসভায়।

রাজা জনক প্রচার করেছেন, যে হরধনুতে জ্যা রোপন করতে পারবেন তিনিই সীতাকে পত্নীরূপে লাভ করতে পারবেন :

অগুণতি লোকের শোভা ভারতব্যাপি খ্যাতি,
সভায় আসিছেন দেখ মালা হাতে নন্দিনী।
কিবা শোভা অপরূপ বর্ণিবারে নাই পারি,
মা-কমলা আসিয়াছেন সীতারূপ ধরি।
বীরবর রামচন্দ্র স্মরিয়া শ্রীহরি,
মুহূর্ত মধ্যে দেখ তুলিল ধনুকী।
দেখিয়া সভার লোক বিস্ময় মানিলা,
বিস্ফারিত নেত্রে চাহে জনকের বালা।
করজোড়ে মাল্য হস্তে ডাকিছে নারায়ণে,
এত দিনে ভগবান দরশন দিলে।
অভাগী সীতার কথা মনে যদি পড়ে,
আমার প্রার্থনায় প্রভু যেন পরীক্ষা উতরে।
জয় জয় বলে রাম ধনুকে জোড়ে তীর
মড় মড় শব্দ করি ধনু ভাঙে
পড়ে যেন মহাবীর।
এইরূপে সভাজন হরষিত মন,
সীতার যোগ্যপাত্র পাইল তখন। [রাম লীলা]

শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বিয়ে করে বেশ কিছুদিন সুখে শান্তিতে কাটালেন, এমন সময় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার পূর্ব মুহূর্তে পিতৃসত্য পালনার্থে চলে গেলেন বনে, সঙ্গে রইল সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণ। এই বনে বসে রাক্ষসরাজ রাবণের সঙ্গে বিরোধ বাধল সীতা হরণ উপলক্ষে।

যুদ্ধ শুরু হলো। এক পক্ষে ত্রিভুবন বিজয়ী দশানন অপর দিকে দীনহীন

জটা বল্কলধারী শ্রীরামচন্দ্র এবং তার কপি সেনার দল। এই সময় হঠাৎ রাবণ নন্দন ইন্দ্রজিতের বাণে ঘায়েল হলেন লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ অচৈতন্য। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের অচৈতন্য দেহ কোলে নিয়ে বালকের মতো বিলাপ শুরু করে দিয়েছেন :

মাতা গেলে মাতা পাব, কন্যা কোলে করি,
পিতা গেলে পিতা পাব, পুত্র কোলে করি।
সীতা গেলে সীতা পাব, বিবাহ করিয়া,
(কিন্তু) ভাই গেলে ভাই আর না আসে ফিরিয়া ॥ [পালাগান]

শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ বন্ধ করে জোর করে টেনে তুলে দেখতে চাইলেন লক্ষ্মণের বুকে বিদ্ধ শেল। কিন্তু রামচন্দ্রের টানাটানিতে তীরটি চার খণ্ড হয়ে বেরিয়ে এল। ক্রমে সেই এক একটি টুকরো পরিণত হলো এক একটি নারী মূর্তিতে। এই নারীবৃন্দ তখন করজোড়ে শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রভু তুমিতো আমাদের তুলে ফেললে কিন্তু এখন আমরা থাকব কোথায় ?

তথা হতে বাহির হইল চতুর্দশী চার নারী,
কোন্ খানে বা রাখবা ঠাকুর তব পদে ধরি। [পালাগান]

শ্রীরামচন্দ্র উত্তর দিচ্ছেন :

প্রথম শেল রবে তুমি পিতৃ শোকের গায়,
দ্বিতীয় শেল রবে তুমি পত্নী শোকের গায়,
তৃতীয় শেল পাবে লোকে অন্য শোক পাইয়্যা,
চতুর্থ বিষম শেল, রবে তুমি আমার বুক জুড়িয়া। [পালাগান]

আজ রাম রাবণে যুদ্ধ। রাবণ আজ রণসজ্জায় সজ্জিত। দশমাথা, কুড়ি হাত নিয়ে চলেছেন রণক্ষেত্রে, কিন্তু যে মুহূর্তে রথে পা দিতে গেছেন ঠিক সেই সময় চারদিকে দেখা যেতে থাকে যত সব অমঙ্গল চিহ্ন :

যাত্রা করে যখন রাবণ রথে দিল পা,
চতুর্দিকে অমঙ্গল ঘনায় আসে তা।
দক্ষিণেতে শৃগাল চলে, বামে কালো সাপ,
শকুনি গৃধিনী ওড়ে, চূড়ায় বসে কালো পেঁচা

মটুক (মুকুট) খসিয়া পড়ে, রথে উঠ্‌তে পড়ে (হোঁচট্‌ খাইয়া)
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত কাঁপে থরে থরে,
তরাসে চাইয়া দেখে, দেখে চতুর্দিকে। [পালাগান]

এমন কি রাণী মন্দোদরী পর্যন্ত রাবণকে রণে যেতে নিষেধ করেন:

যেওনা যেওনা রাজা বিদ্রোহী হইতে রণে.
শুকাইবে সুখ-সাগর, হারা হইবে ধনে প্রাণে।
হারাইবে শতপুত্র, সওয়া লক্ষ নাতি,
কেহ না রহিবে তোমার বংশে দিতে বাতি।
যত সধবা, অধবা, বিধবা সতী,
শ্মশানেতে যাবে গড়াগড়ি। [রাম যাত্রা]

কিন্তু রাবণ তা শোনেননি। হলো রাম রাবণে যুদ্ধ। পরিণামে হলো রাবণের পরাজয়।

অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন শ্রীরামচন্দ্র। প্রজানুরঞ্জন রাঘব। তাঁর অভিষেক সমাগত। হঠাৎ এই সময় কুৎসা উঠল সীতার চরিত্র সম্পর্কে। শ্রীরামচন্দ্র বাধ্য হয়ে লক্ষ্মণের মারফৎ আবার সীতাকে পাঠিয়ে দিলেন বাল্মিকীর তপোবনে—নির্বাসনে।

লক্ষ্মণ সীতাকে বনে রেখে ফিরে চলে গেছেন অযোধ্যায়। সীতাদেবী মনের আক্ষেপে বলতে থাকেন:

(ও) সীতা বলেরে বলেরে বলে
(ও) গুণের দেওর লক্ষ্মণরে
তাহার ত নাই কোন দায়।
কোন্‌ অপরাধে আমায় দিলি বনেতে।
বনে দিলেরে দিলেরে দিলে সেও ছিল ভালো,
পঞ্চমাসের অন্তঃবতী, কী হবে উপায় লো?
নারী অবলা, সরলা, এ দুঃখেতে প্রাণ বাঁচে না
দুঃখের সময় যে ডাল ধরি, ভাঙ্গে সেই ডাল।
জন্মে মরিতাম, মরিতাম সেও ছিল ভাল,
দীনহীন পতি পেয়ে, কাঁদিতে জনম গেল। [পালাগান]

সীতা লব-কুশ দুই ছেলে নিয়ে রয়েছেন বাল্মিকীর আশ্রমে। তারা আশ্রমে

ঋষির কাছে শোনে রাম রাজার গল্প, আর ঋষি কুমারদের সঙ্গে করে খেলাধুলা। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটে চলেছে দেশ হতে দেশান্তরে। অপরাজেয় অশ্ব শেষটায় বাধা পায় এসে লব-কুশের কাছে।

অশ্বকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য প্রথমে শত্রুঘ্ন, তারপর ভরত প্রাণ হারালেন। খবর পেয়ে অযোধ্যা থেকে এলেন বীরবর লক্ষণ—কিন্তু তাঁরও হার হলো এই বালকদের কাছে। এইবার যুদ্ধযাত্রা করলেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র।

শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ পর্ব চলেছে। দেশ বিদেশে খবর পাঠানো হয়েছে শ্রীরামের বিপদের বারতা নিয়ে। খবর শুনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসেন অনার্য রাজ—শ্রীরাম বন্ধু গোবর্ধন।

শুধু কি রাজা গোবর্ধন? সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে নিল তার মা, বৌ এবং বোনেরাও :

শ্রীরামের বার্তা পাইয়া, গোবর্ধন চলে ধাইয়া,
সৈন্য সামন্ত সকল পাঠাইল ডাকিয়া।
(তখন) নাচে গোদা, নাচে গুদি, নাচে গোদার মা,
(আবার) গোদার মাইয়্যা নাচে ওযে হাতে তালি দিয়া।
সাজিল সাজিল সৈন্য, বাজে ঢাক ঢোল,
জগঝম্প বাজে সঙ্গে সেতার সানাই খোল। [পালাগান]

শুরু হয় যুদ্ধ। রামচন্দ্রের বাহিনীর সবাই প্রায় শেষ। এইবার শ্রীরাম এসে উপস্থিত লব-কুশের সম্মুখে। ·শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ কেঁদে উঠে তাদের দেখে :

সত্য করে বলরে কুশী সীতা কি তোর মাতা,
(ওরে) সীতা যদি তোর মা হয় তবে, আমি যে তোর পিতা।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রেরও বাৎসল্য রসের উৎস শুকিয়ে গেল। ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষার্থে দুই পক্ষই শক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করল অস্ত্র মারফত :

পাশুপাত বাণ কুশী জুড়িল ধনুকে,
বাণ মুখে অগ্নি উঠে ঝলকে ঝলকে।
বাণ দেখে লক্ষ্মণবীরের ভয়ে ওড়ে প্রাণ,
ভাবে এই বাণেতে এই রণেতে যাবে মম প্রাণ।। [পালাগান]

শেষ হয় যুদ্ধ। ত্রিভুবনবিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র পরাজয় স্বীকার করেন নিজের ছেলের কাছে—শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও।

পরে অবশ্য বাল্মীকির দয়ায় সবাই আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। পরদিন রাজসভায় পিতাপুত্রে পরিচয়ও হয়েছিল, কিন্তু সেদিকে গানের অংশ না থাকায় এ-প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করলুম।

রূপবান কন্যা

বঙ্গবিভাগ তথা স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে একটি নতুন বহুল প্রচলিত লোক-নাটিকা হলো "রূপবান কন্যা"। পালাটির পুরোনাম হলো "রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা"। এ কথা বলাই বাহুল্য ১৯৪৭ সনের পূর্বে এই নাটকের কোনো অস্তিত্বই ছিল না পূর্ববঙ্গের কোনো অঞ্চলেই। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে এ পালাটি উত্তরবঙ্গের "রূপধন কন্যা" পালাটিরই হুবহু অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো গায়ক বা অভিনেতার দৌলতেই এটি পূর্ববঙ্গের মাটিতে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু এর ভিতর কোনো বিদেশী মাল নেই বরং বলা চলে উত্তরবঙ্গের বাহে দেশের 'রূপধন কন্যা' পূর্ববঙ্গের জলাভূমিতে এসে 'রূপবান কন্যা' নাম পরিগ্রহ করে এদেশের জলবায়ুর সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে গেছে। তাকে যেন আর পৃথকভাবে কোনোমতেই ভাবা চলে না। তাই পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণলীলা, গাজীর গানের দলের মতোই গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট বড় 'রূপবান কন্যা' লোকযাত্রা দলের।

এই পালাটিও পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত, তাই আমরা সংক্ষেপে অপরাপর পালা গানগুলির মতোই এটিকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করছি।

কাহিনীর প্রথমেই দেখা যাচ্ছে রাজা ও উজিরে কথোপকথন হচ্ছে। রাজা একাব্বর বাদশা ছিলেন নিঃসন্তান। তাই দেশের লোক বলত আঁটকুড়ো রাজা। উজির এ খবর দেওয়ায় বাদশা চটে গিয়ে উজিরকে দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাড়িয়ে দেবার পরক্ষণেই নিজের মনে অনুশোচনা এল—কেন তিনি তাকে তাড়ালেন। এমন সময় সেখানে বিবেকের প্রবেশ। এই বিবেকের প্রবেশ ও প্রস্থান লোকনাটিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের লোকনাটিকাগুলির। বিবেক এসেই গান ধরল :

বৃথা চিন্তা করো না রাজা,
রেখ ভক্তি ভগবানে অশান্তি থাকবে না প্রাণে,
সার কর গুরুর চরণ, মনের আশা হবে পূরণ ॥
কর্মফলে এ সংসারে আসে দুঃখ বারে বারে
কর্মখণ্ডন পরে তব ক্রন্দন মোচন ॥

বিবেকের গান শুনে রাজার মনে বৈরাগ্য উদয় হয়। রাজা তাঁর রাজমুকুট সিংহাসনে রেখে একাকী চুপিচুপি রাজধানী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন বনপথ ধরে। বনপথ পার হবার পরই সম্মুখে এক নদী। নদী দিয়ে বেয়ে চলেছে একখানা নৌকা। নৌকার মাঝি গান ধরেছে :

ক্যামনে পাড়ি দিবরে ঢেউ উঠ্‌ছে সাগরে রে
দিবা নিশি কান্দিরে নদীর কূলে বইয়া ॥
মনরে যারা ছিল চতুর নাইয়া,
তারা গেল আগে বাইয়া রে ॥
আমি অধম রইলাম বসি ভাঙ্গা তরী লইয়া রে ॥

বাদশা বলেন—মাঝি ভাই, আমাকে পার করে দেবে ?

মাঝি তাঁকে চিনতে পারে। সম্মত হয় পার করে দিতে। নৌকা খুলে দিয়ে মাঝি আবার গান ধরে :

মাঝি বাইয়া যাও রে
অকুল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙ্গা নাওরে
মাঝি বাইয়া যাও রে ॥
ওরে ভেন্না কাষ্ঠের নৌকাখানি মাঝখানে তার গুড়া
নৌকা আগার থাইকা পাছায় গ্যালে
গলুই যাবে খইয়া
মাঝি বাইয়া যাও রে ॥
ওরে দীক্ষা শিক্ষা না হইতে আগে করছ বিয়া
এখন বিনা খতে গোলাম হইলে গাঁইটের টাকা দিয়া।
বিদ্যাশে বিপাকে যারো ব্যাটা মারা যায়
পাড়া পড়শী না জানিলেও আগে জানে তার মায় ॥
মাঝি বাইয়া যাও রে ॥

বাদশা নদী পার হয়ে প্রবেশ করলেন আর এক নির্জন বনে। সেখানে বসে ধ্যান করছিলেন এক মুনি। বাদশা হঠাৎ এসে পড়লেন তার সামনে। বাদশা তাঁকে এই নির্জন স্থানে একাকী বসে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন--কে? কে এখানে বসে? কথা কও, সাড়া দাও।

বাদশার হাঁকডাকে মুনির ধ্যান ভেঙে গেল। চোখ মেলেই রাজাকে (বাদশা) অভিশাপ দিলেন—কে রে মূর্খ! আমার ধ্যান ভংগ করলি, তোকে দিলাম আমি এই অভিশাপ, ছেলের জন্য বারো বৎসর করবি অনুতাপ।

বাদশা অট্টহাসি হেসে বললেন—আমার ছেলেই নেই, তাই এখানে এসেছি প্রাণ বিসর্জন দিতে।

মুনি বললেন, তোর ছেলে হবে। তবে তার পরমায়ু মাত্র বারো দিন। তবে এরও একটা ব্যবস্থা আছে, যদি ঐ বারো দিনের ছেলেকে বারো বছরের কোনো মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে পারিস তা হলেই ওরা দুজনেই বাঁচবে। তবে হ্যাঁ ঐ বারো দিনের ছেলে আর ছেলের বৌকে কিন্তু বিয়ের রাত্রেই বারো বছরের জন্য নির্বাসন দিতে হবে।

মুনি তো এই বলেই সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন রাজার রাণী জাহানারা। মহারাজের অদর্শনে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এগিয়ে এসেছেন। তাঁকে দেখেই রাজা সব বৃত্তান্ত বলে কেঁদে ফেললেন।

যা হউক দুজনে অনেক পরামর্শ করে ফিরে এলেন রাজ্যে। এমন সময় এক শুভদিনে সত্যসত্যই জাহানারা প্রসব করলেন এক পুত্র সন্তান। রাজার আঁটকুড়ো নাম ঘুচল। রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এলো।

এদিকে রাজা রাজ্যে চর পাঠিয়েছেন, ঘটক পাঠিয়েছেন তাঁর বারো দিনের ছেলে রহিমের জন্য বারো বছরের মেয়ের সন্ধানে। কিন্তু না কোথাও পাওয়া গেল না। এমন সময় রাজা এলেন উজিরের বাড়িতে। এসেই বলে বসলেন—দেখ উজির আমি আমার বারো দিনের ছেলে রহিমের সাথে তোমার বারো বছরের মেয়ে রূপবানের বিবাহের প্রস্তাব করছি। আজই রাত্রে তাদের বিবাহ হবে।

উজির তো এই অসম্ভব কথা শুনে কিছুতেই রাজী হন না। রাজাও রাগ করে উজিরকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন। আর সেই সময়ই সেইস্থানে এসে হাজির হলেন রাণী জাহানারা এবং উজিরপত্নী রাহেলা। জাহানারাও রাহেলার কাছে এই একই প্রস্তাব করলেন। বললেন—দেখ বোন, যদি তোমার রূপবানকে আমার রহিমের সংগে বিয়ে না দাও তা হলে সেও আব বাঁচবে না।

সব শুনে রাহেলা বললেন, দেখ বোন, এ বিষয়ে তো আমি কিছু বলতে পারি না, তবে মা রূপবান যদি স্বেচ্ছায় এই বিবাহে সম্মতি দেয় তা হলেই এই বিবাহ হতে পারে, নচেৎ নয়। এই বলে তাঁরা চলল রূপবানের উদ্দেশ্যে।

রূপবান রাহেলার সতীন কন্যা। শৈশবেই সে মাতৃহারা। তা হলে রাহেলা তাকে কোনোদিনই নিজের মেয়ের চাইতে কম দেখেননি। রূপবান শৈশব থেকেই ধাইমার কাছে মানুষ। বিয়ের কথা তারও কানে আসে। সে ধাইমাকে জিজ্ঞেস করে :

কী জানি কি শুনি দাইমা গো,
ও দাইমা কি শুনিলাম কানে গো,
আমার দাইমা, দাইমা গো,
পাড়ার লোকে সবে বলে গো,
ও রূপবান তোমার হবে বলি গো,
আমার দাইমা দাইমা গো।

দাইমা বলছে—রূপবান বিয়ের অপর নাম বলি। এই বলি প্রত্যেক নারীর জীবনেই একবার করে আসে। এর জন্য দুঃখ করবার কিছুই নেই।

রূপবান বলছে :

আমার বাড়ির দক্ষিণ পাশে গো
ও দাইমা কিসের বাদ্য বাজে গো
আমার দাইমা দাইমা গো।
ঢোল বাজে কাঁসর বাজে গো
ও দাইমা আর বাজে গো
আমার দাইমা দাইমা গো ॥
বাজাইতে বাজাইতে আসে গো
ও দাইমা আসে মোদের বাড়ি গো
আমার দাইমা দাইমা গো ॥

দাইমা বলছে :

শোন শোন রূপবান গো ও রূপবান
বলি যে তোমারে গো
শোন রূপবান রূপবান গো ॥

এই সময় আসরে এসে হাজির হলো ঘটক বুড়ো। সে রূপবানের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে রহিমের সাথে।

ঘটক বুড়ো—যাকে গাঁয়ের ছোটরা দাদু বলে, সে রূপবানের কাছে বিয়ের প্রস্তাব রাখলে রূপবান উত্তর দিচ্ছে :

শোনেন শোনেন শোনেন দাদু গো
ও দাদু বলি যে আপনারে গো
শোনেন দাদু দাদু গো ॥
বারো দিনের ছেলের সঙ্গে গো
ও দাদু কোন্ দেশে বিয়া গো
শোনেন দাদু দাদু গো ॥

দাইমা বলছে :

শোন শোন শোন রূপবান গো
ও রূপবান বলি যে তোমারে গো
শোন রূপবান রূপবান গো ॥
দাদু আইছে ঘটক হইয়্যা গো
ও রূপবান কবুল কর তুমি গো
শোন রূপবান রূপবান গো ॥

রূপবান উত্তর দিচ্ছে :

জোয়ার যৌবন আমার গো
ও দাইমা যাবে গাঙের ভাটি গো ;
আমার দাইমা দাইমা গো ॥
ভাতের ক্ষুধা লাগলে দাইমা গো
ও দাইমা পানিতে কি সারে গো
আমার দাইমা দাইমা গো ॥
জোয়ার যখন আসে দাইমা গো
ও দাইমা নদী থাকে ভরা গো
আমার দাইমা দাইমা গো ॥
ভ্রমর বিনে ফুলের মধু গো
ও দাইমা যাবে শুকাইয়্যা গো।

আমার দাইমা দাইমা গো ॥

আমার যৌবন বৃথা যাবে গো
ও দাইমা একি বিধির লিখন গো
আমার দাইমা দাইমা গো ॥

দাদু বলছে—দেখ রূপবান তুমি যদি রহিমকে স্বামী কবুল না কর তাহলে তোমার পিতার প্রাণ যাবে।

রূপবান বলছে :

আমার পিতা কোথায় আছেন গো
ও দাদু বলে দেন আমারে গো
শোনেন দাদু দাদু গো ॥

দাদু বলছে—তোমার পিতা একাব্বর বাদশার কারাগারে বন্দী আছেন।

রূপবান বলছে :

হাতে ধরি পায়ে ধরি গো
ও দাদু মুক্তি করেন পিতারে
আমার দাদু দাদু গো ॥

দাদু বলছে—তোমার পিতাকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই, তবে যদি তোমার পিতাকে দেখবার ইচ্ছা থাকে তা হলে আমার সঙ্গে এসো—এই বলে উভয়ে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়, আর সেইখানে [আসরে] এসে হাজির হয় প্রহরী ও বন্দী অবস্থায় উজির।

প্রহরী উজিরকে অনেক অনুনয় করল তাঁর মত পরিবর্তন করবার জন্য, উজির কিছুতেই রাজী হন না। জল্লাদও প্রস্তুত হলো উজিরকে হত্যা করবার জন্য। এমন সময় সেখানে এসে হাজির রূপবান :

মেরো না মেরো না জল্লাদ গো
ও জল্লাদ মেরো না মোর পিতারে
দারুণ জল্লাদ জল্লাদ রে—
কী অপরাধ করেছে পিতায় রে—
ও জল্লাদ বল আমার কাছে রে—
শোন জল্লাদ জল্লাদ রে ॥

উজির বলছেন—মা রূপবান, তুই আবার এখানে এ অসময় এলি কেন? পালিয়ে যা।

রূপবান বলছে—তা হলে চলুন আমরা দুজনেই পালিয়ে যাই।

এমন সময় সেখানে এসে হাজির বাদশা স্বয়ং। বাদশা এসেই হুংকার ছাড়লেন—কোথায় পালাবি তোরা? পরে জল্লাদকে আদেশ দিলেন—জল্লাদ, তোমার কাজ সেরে ফেল!

রূপবান বলছে:

কী অপরাধ করেছেন পিতায় গো
ও বাদশা বলে দেন আমারে গো
আমার বাদশা বাদশা গো॥

উজির বলছেন—মা রূপবান, আমি কোনো অপরাধ করিনি। তুই এখান থেকে চলে যা।

রূপবান বলছে:

হাতে ধরি পায়ে ধরি গো
ও বাদশা মুক্তি করেন গো তারে
আমার বাদশা বাদশা গো॥
আমায় আপনি প্রাণে মারেন গো।
ও বাদশা মুক্তি করেন পিতারে॥

বাদশা বলছেন—যদি আমার পুত্র রহিমকে স্বামী কবুল কর তা হলেই তোমার পিতার মুক্তি, তা না হলে নয়।

রূপবান বাদশার কথায় রাজী হয়, উজিরও মুক্তি পান। সকলে মিলে ফিরে চলে উজিরের গৃহে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য।

এই খানেই নাটিকার প্রথম অংক শেষ। দ্বিতীয় অংকের প্রথমে দেখানো হচ্ছে—উজিরের বাড়িতে বিবাহ-উৎসব। নদীর ঘাটে স্নান করছে রূপবান ও সখীরা। পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে এক ফকির গান গাইতে গাইতে:

মহরমের দশ তারিখে কী ঘটাইলে রাব্বানা,
কলিজা ফাটিয়া যায় গো কহিতে তার ঘটনা।
হাসেন মরে জহরতে হোসেন শহীদ কারবালায়,
জয়নাল আবেদিন বন্দী গো এজিদের জেলখানায়।

মইর‍্যা মরে না গো জয়নাল, জয়নাল তুমি মইর না,
তুমি জয়নাল মইর‍্যা গ্যালে নবীর বংশ রবে না।

মাও রাঁড়ি, ঝিও গো রাঁড়ি, আরও রাঁড়ি সাকিনা,
একই ঘরে তিনজন গো রাঁড়ি, খালি সোনার মদিনা।

একটি পয়সা দাও মিঞা ভাই আমাকে,
একটি পয়সা না দিলে ভাই আমাকে,
চৌদ্দ গোষ্টি টাইন্যা নিব দোজখে।

রূপবান স্নান সমাপনান্তে ঘরে যায়। ওদিকে তার অপেক্ষায় তাদের ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাদশা, উজির, জাহানারা, রাহেলা, কাজী ও শিশু রহিম। রহিমের সাথে কাজী রূপবানের সাদি করিয়ে দিল। জাহানারা রূপবানকে বলল—মা, এইবার চল আমরা আমাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করি, তুমি তোমার পিতামাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসো।

রূপবান স্বেচ্ছায়ই রহিমকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে তার পিতার প্রাণের জন্য। সে যা হউক এখন তো আর করবার কিছু নেই। তাই পিতামাতার কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে রূপবান তার স্বামীর ঘর করতে:

বিদায় দেন, বিদায় দেন পিতা গো
ও পিতা বিদায় দেন আমারে গো
আমার পিতা পিতা গো।

বিদায় দেন, বিদায় দেন মাতা গো
অ মাতা বিদায় দেন আমারে গো
আমার মাতা মাতা গো।

বারো দিনের স্বামী লয়ে গো
অ পিতা চললেম শ্বশুর বাড়ি গো
আমার পিতা পিতা গো।

বারো দিনের স্বামী লয়ে গো
অ মাতা চললেম শ্বশুর বাড়ি গো
আমার মাতা মাতা গো ।।

রূপবানের করুণ গানে সকলেই ব্যথিত। উজির এসে পরিয়ে দিলেন

বিদায়ের মালা রূপবানের কণ্ঠে। হায় হায় করে উঠ্‌ল রাহেলা। রূপবানের চোখে জল। কাঁদতে কাঁদতে যাত্রা করে স্বামীর ঘরের দিকে :

মাতা ছেড়ে, পিতা ছেড়ে গো
অ আল্লা চললেম শ্বশুর বাড়ি গো,
আমার আল্লা আল্লা গো।
তোমরা সবে দেখে রেখ গো
অ আল্লা আমার প্রাণের পিতারে
আমার আল্লা আল্লা গো।
তোমরা সবে দেখে রেখ গো
অ আল্লা আমার প্রাণের মাতারে
আমার আল্লা আল্লা রে!
ক্ষুধা লাগলে খেতে দিও গো
অ আল্লা আমার প্রাণের পিতারে
আমার আল্লা আল্লা রে॥
ক্ষুধা লাগলে খেতে দিও গো
অ আল্লা আমার প্রাণের মাতারে
আমার আল্লা আল্লা রে॥
আহা রে দারুণ বিধি রে
অ বিধি এই ছিল মোর কর্মে রে
আমার বিধি বিধি রে।

রূপবান পতিগৃহে এসেছে। বাসরে বসে মাত্র বারো দিনের শিশু স্বামীকে নিয়ে বসে রয়েছে। কী করেই বা এই শিশুকে সে মানুষ করে তুলবে এই এখন তার প্রধান চিন্তা :

বাসর ঘরে থাক পতি গো
অ পতি খেল নানা ছলে গো
আমার পতি পতি গো।
কে পড়াইবে তৈল কাজল রে
অ আল্লা কে খাওয়াবে দুগ্ধ রে
আমার আল্লা আল্লা রে॥

ভাবতে ভাবতে হয়তো বা একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল রূপবান। এমন সময় ঘটনা স্থলে আবির্ভাব ঘটল বিবেকের। সে এসেই গান ধরল:

ওরে নূতন পথে চল।
তোর বুক দেখি পাষাণ চাপা,
ফেলিস্‌না রে অশ্রুজল ॥
ন্যায় পথে গেছ বলে
মুনিগণে বিচার করলে,
সেই কারণে নির্বাসনে চল্‌ ॥
কর্মযোগ ছিল বলে,
বার দিনের স্বামী ফেলে,
ঐ চরণের ধূলি চল্‌ ॥

বিবেকের গান শেষ হতে না হতেই রূপবান জেগে উঠল। সে বুঝল তার আর এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়, এই মুহূর্তেই শিশু রহিমকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া উচিত। এই চিন্তা করেই সে শিশু স্বামীকে কোলে নিয়ে চুপিসারে রাজপুরী ছেড়ে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। যাবার পূর্ব মুহূর্তটি বড়ই করুণ। এর সঙ্গে "মালঞ্চ মালার" এবং "রূপধন কন্যার" তুলনা করা চলে।

যা হউক রূপবান এইবার সত্য সত্যই বাদশা ও বেগম সকলকে প্রণাম করে যাত্রা করল অনির্দেশের পথে:

বিদায় দেন, বিদায় দেন আব্বা গো
অ আব্বা বিদায় দেন আমারে গো
আমার আব্বা আব্বা গো ॥
বিদায় দেন, বিদায় দেন আম্মা গো
অ আম্মা বিদায় দেন আমারে গো
আমার আম্মা আম্মা গো।
বারো দিনের স্বামী লয়ে গো
অ আব্বা চল্‌লেম নির্বাসনে গো,
বার দিনের স্বামী লয়ে গো
অ আম্মা চললেম নির্বাসনে গো,
আমার আম্মা আম্মা গো ॥

এই আশীর্বাদ করেন আব্বা গো
আমি যেন ফিরি গো,
আমার আব্বা আব্বা গো।
এই আশীর্বাদ করেন আম্মা গো
অ আম্মা আমি যেন ফিরি গো
আমার আম্মা আম্মা গো ॥
শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা
অ আল্লা আমার হল না
আমার আল্লা আল্লা রে !
তোমরা সবে দেখে রেখ রে
অ আল্লা আমার প্রাণের আব্বারে
আমার আল্লা আল্লা রে ॥

রূপবান রহিমকে নিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে এল রাজপুরী থেকে। সিংহদরজায় দারোয়ান পথ আটকে দাঁড়াল। রূপবান কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগল :

শোন শোন শোন দাওরান গো
অ দাওরান বলি যে তোমারে গো
শোন দাওরান দাওরান গো।
তুমি আমার ধর্মের ভাই অরে
অ দাওরান ধর্মের কাজ কর রে
গেটের দাওরান ভাই অরে ॥
দ্বার ছাড় দ্বার ছাড় দাওরান রে
অ দাওরান চলছি গহন বনে রে
গেটের দাওরান ভাই অরে ॥

দারোয়ান বলল—দরজা সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। তা হলে আর তার চাকুরি থাকবে না। তাই শুনে রূপবান বলছে :

বারদিনের স্বামী লইয়্যা রে
অ দাওরান চল্‌ছি নির্বাসনে রে
গেটের দাওরান ভাই অরে।

মাত্র বারোদিন বয়সের স্বামী শুনে দারোয়ান আশ্চর্য হয়ে যায়! রূপবান তখন আবার বলছে :

বিধির কলমের লেখা রে—
অ দাওয়ান কে খণ্ডাইতে পারে রে—
গেটের দাওয়ান ভাই অরে।

শোন শোন শোন রূপবান
বলি যে তোমারে গো
শোন রূপবান রূপবান গো॥
রাত পোহালে চলে যেয়ো গো
অ রূপবান কানন বনেতে গো
শোন রূপবান রূপবান গো॥

রূপবান বলছে :

রাত পোহালে লোকে বলবে রে—
অ রূপবান ছেলে পেলে কোথায় রে
গেটের দাওয়ান ভাই অরে॥

রূপবানের কথায় দারোযান দরজা ছেড়ে দেয়। রূপবান অন্ধকারে পথ চলতে শুরু করে দেয়। ভগবানের কাছে জিজ্ঞাসা করে এই ঘোর অন্ধকারে কোন্ পথেই বা সে যাবে। এমন সময় আসরে গান গাইতে গাইতে এসে প্রবেশ করে বিবেক :

ঐ অদূরে জ্বলিছে অনল ঘুচিয়ে যাবে অন্ধকার
ভক্ত আমার
ফেলিওনা আর অশ্রুধার॥
প্রলয়ে তুফানে করিব পার
ঘুচিয়ে যাবে অন্ধকার
হাত ধরে তোকে অকূল সাগর
করিয়ে দিব পার॥

বিবেকের হাত ধরে রূপবান এগিয়ে এল নদীর ঘাট পর্যন্ত। বিবেক তাকে ওখানে রেখেই অদৃশ্য হয়ে গেল। রূপবান চিন্তা করছে কী করেই বা নদী পার

হবে। এমন সময় দেখে দূর থেকে একখানা নৌকা এগিয়ে আসছে সেই দিকেই। নৌকার ভিতর থেকে ভেসে আসছে একটা গান :

আমার হাড় কালা করলাম রে—
আরে আমার দেহ কালার লাইগ্যারে
অন্তর কালা করলাম রে
দুরন্ত পরবাসে ॥

(মন রে) হাইল্যা লোকের লাঙল্ বাঁকা
জনম বাঁকা চাঁদ,
তাহার চাইতে অধিক বাঁকা
যারে দিছি প্রাণ।

(মন রে) কূল বাঁকা গাঙ বাঁকা
বাঁকা গাঙের পানি ;
সকল বাঁকায় বাইলাম নৌকা
তবু বাঁকারে না জানি।

(মন রে) হাড় হইল জার জার
অন্তর হইল গুড়া (রে আমার)
পিরীতি ভাঙিয়া গেলে হায় হায়
নাহি লাগে জোড়া ॥

দেখতে দেখতে নৌকা এগিয়ে আসে নদীর কিনারে। রূপবান তাকে নদী পার করে দেবার জন্য ব্যাকুল আহবান জানায় :

পার কর পার কর মাঝি রে
অ মাঝি পার কর আমারে
ঘাটের মাঝি মাঝি রে।
তোমরা যদি পার না করবে রে
অ মাঝি কী হবে উপায় রে
ঘাটের মাঝি মাঝি রে।
তোমরা আমার ধর্মের ভাই অরে
অ মাঝি ধর্মের কাজ কর রে
ঘাটের মাঝি ভাই অরে।

মাঝিরা রূপবানের কথায় ব্যথিত হয়ে তাকে নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে দেবার জন্যে নৌকা খুলে গান ধরে :

মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
অপর বেলায় ধরলাম পাড়ি
নদীর কূল কিনারা পাইলাম না ॥
ছিঁড়া দড়ি আর ভাংগা বৈঠারে
হাইলেত মানেনা রে
আমি জনম ভইর‍্যা বাইলাম তরী রে
ও তরী ভাইট্যাল ছাড়া উজায় না।

নদী পার হবার পর মাঝি খেয়া পারাপারের পয়সা চাইল। কিন্তু পয়সা তো তার কাছে নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল আসবার সময় তার শাশুড়ী তার পথের সম্বল স্বরূপ কি যেন বেঁধে দিয়েছিল। রূপবান আঁচল খুলে তাই দিয়ে দেয় —দেখে এক টুকরা সোনা। কিন্তু হলে হবে কি, মাঝিরা ভাবল এ মেয়েটা তাদের সংগে চালাকী করছে—এক টুকরা পিতল দিয়ে তাদের ঠকিয়েছে। এখন আর কি—পিতলের টুকরাটা ফেলেই দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় সেখানে এসে হাজির এক পথিক। সে দূর থেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। এগিয়ে এসে বলে—ওই পেতলের টুকরাটা আমায় দিয়ে দাও আমি তোমাদের দু আনা পয়সা দিচ্ছি।

মাঝিরা সে কথায় রাজী হয়ে দু আনা পয়সার বিনিময়ে সোনার টুকরাটা দিয়ে দিল। তাই দেখে রূপবান বলতে থাকে :

চিনলিনা, চিনলিনা মাঝি রে
ও মাঝি অমূল্য রতন রে—
ঘাটের বোকা মাঝি রে।
যে চিনেছে সে নিয়েছে রে
ও মাঝি সাত রাজার ধন রে,
ঘাটের বোকা মাঝি রে ॥
চার পয়সার ভিখারী মাঝিরে
অ মাঝি থাক ঘাটে রে
ঘাটের বোকা মাঝি রে,

জহুরী না হলে মাঝি রে
অ মাঝি জহর কি তাই চিনে রে
ঘাটের বোকা মাঝি রে ॥

শুনে তো মাঝিরা হতবাক। কিন্তু তখন আর করবার কিছু নেই। নৌকা নিয়ে তারা ফিরে চলে। রূপবান শিশু স্বামীকে নিয়ে এগিয়ে চলে অনির্দেশের পথে।

চলতে চলতে হঠাৎ দুই দস্যু এসে হাজির রূপবানের সম্মুখে। রূপবান চেঁচিয়ে ওঠে—কে কোথায় আছ রক্ষা কর।

এদিকে বনের অপর প্রান্তে জংলীদের রাজা শিকার না পেয়ে বসে বিশ্রাম করছিল, রূপবানের ডাকে ছুটে এল সেখানে। তাকে দেখেই দস্যুরা পালিয়ে গেল। জংলীরাজও মহাসমাদরে রূপবান ও রহিমকে প্রথমে তার ঘরে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু রূপবান রাজী না হওয়ায় সেই বনেই তাদের জন্য কুটীর বানিয়ে দিল এবং নিজে সর্বদা দেখাশোনা করতে লাগল।

রূপবান শিশু স্বামী রহিমকে নিয়ে সেই বনেই থাকে। কখনও বা আপন মনে গানও গায় :

(১) নিদারুণ শ্যাম, তোমায় লয়ে বনে আসিলাম
সন্ধ্যা হল বনমাঝে পথ হারায়ে রইলাম বসে রে
আমি নয়ন জলে মালা গাঁথিলাম ॥
হৃদয়-বন্ধু কয়না কথা, এই ছিল মোর কর্মের লেখা রে
আমি কলংকের হার গলায় পরিলাম ॥

(২) মনের দুঃখ কইনা রে দুঃখ রেখেছে অন্তরে রে
তোমারে লয়ে ঘুরি হে বন্ধু দেশ-দেশান্তরে।
ও মন রে নদীর কাছে কইলে দুঃখ, জল যায় উজাইয়্যা
বৃক্ষের কাছে কইলে দুঃখ, পত্র যায় ঝরিয়ারে।
দেশ-দেশান্তরে রে ॥

(৩) ও প্রাণের পতি গো—
আমি কোন্ বা প্রাণে তোমায় ছেড়ে যাব।
এ দুঃখিনীর মন-প্রাণ, সকলি করেছি দান
তুমি বিনে কে আছে আমার।

তোমাকে শিশু লয়ে ঘুরি বনে বনে
ফিরে এসে পাই কি না পাই মনে ভাবি তাই ॥

এই বলে রূপবান কলসী নিয়ে জল আনতে যায় ফিরে এসে দেখে কোথা থেকে একটা বাঘ এসে রহিমকে আক্রমণ করবার উপক্রম করেছে। রূপবান তো দেখেই চিৎকার করে ওঠে,—কে, কোথায় আছ তোমরা এসে আমার স্বামীকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা কর। তারপরই বাঘের কাছে মিনতি জানায়:

খেও না খেও না বাঘ রে
অ বাঘ খেও না মোর পতিরে
বনের বাঘ বাঘ রে।
হাতে ধরি পায়ে ধরি রে
অ বাঘ ছেড়ে দাও মোর পতিরে
বনের বাঘ, বাঘ রে ॥
আমার পতি খাইলে বাঘ রে
অ বাঘরে ঠেক্‌বে খোদার কাছে
বনের বাঘ বাঘ রে ॥
আগে খেও মোরে বাঘ রে
অ বাঘ রে পিছে খাও মোর পতিরে
বনের বাঘ বাঘরে ॥

এদিকে রূপবানের চিৎকার ও কান্না গিয়ে পেঁছায় জংলী রাজার কানে। মুহূর্তে মধ্যে বর্শা হাতে এগিয়ে এসে বাঘকে ঘায়েল করে দেয় জংলী রাজা। তারিফ করে রূপবানের সাহসের।

এর পরেই ঘটনাস্থলে বিবেকের প্রবেশ ও গান:

ধন্য ধন্য ধন্য রে মা, ধন্য রে তোর চরণে
ধন্য রে তোর মাতা-পিতা, ধন্য রে তোর সৃষ্টিকর্তা
ধন্য রে তোর স্বজনের,
নিজের জীবন তুচ্ছ করে ধরেছিস তুই বাঘের গলে
ভয় কি রে তোর মরণে ॥
অগতির গতি পতি, ঐ চরণে রেখ মতি
ভয় কি রে শমনে ॥

এই ঘটনার পর রূপবান রহিমকে নিয়ে আবার যাত্রা করে অনির্দেশের পথে। হঠাৎ দেখে কাছেই এক মালিনীর বাড়ি। রূপবান সেই বাড়িতে মাসী মাসী বলে ডাক দিয়ে বলতে থাকে :

শোন, শোন, মাসী মাগো
ও মাসী বলি যে তোমারে গো
শোন মাসী! মাসী গো॥
নিরাশ্রয় হইয়া মাসী গো
অ মাসী এলেম তোমার বাড়ি গো
আমার মাসী মাসী গো॥

রূপবানের ডাকে মালিনী এগিয়ে এসে রূপবানকে দেখে এবং তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। তার বাড়িতেই রহিম এবং রূপবানের থাকার ব্যবস্থা হলো।

দিন যায়। রহিম মালিনীর বাড়িতে রূপবানের পরিচর্যায় বড় হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে তাকে পাঠশালেও ভর্তি করে দেওয়া হয়। পাঠশালে সে সেরা ছাত্ররূপে পরিণত হয়। তার সঙ্গেই পড়ত সেই দেশের বাদশা ছায়েদের মেয়ে তাজেল। সে কিছুতেই রহিমের সমকক্ষ হতে পারছিল না। তাতে বাদশা ক্রমশই কুপিত হয়ে পড়ছিলেন রহিমের উপর। কি ভাবে জব্দ করা যায় সেই ফন্দিই আঁটছিলেন দিনের পর দিন। স্কুলের পণ্ডিতমশাই ছিলেন বাদশার অনুগৃহীত, তাই তিনিও প্রকারান্তরে রহিমের উপর নির্যাতন করতে ছাড়তেন না।

দিনে দিনে রহিমের বয়স বাড়ে। সে একদিন প্রশ্ন করে, রূপবান, তুমি আমার কে?

রূপবান সেদিনের মতো উত্তর দেয়—তুমি দাদা, আমি বোন—আমি দিদি তুমি ভাই। এইভাবে নানা কথায় ভুলিয়ে রহিমকে পাঠশালে পাঠিয়ে দেয়। হঠাৎ ফিরে এসে বলে—দিদি তোমার নাম কি?

রূপবান অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—কেন, কে জিজ্ঞেস করেছে?

রহিম বলে—গুরুমশাই। আজ আমার দশটা টাকা লাগবে স্কুলে।

রূপবান বুঝতে পারে কোনো একটা ষড়যন্ত্র চলেছে তাকে এবং রহিমকে নিয়ে। তাই মুখে কিছু না বলে রহিমের হাতে দশটা টাকা দিয়ে স্কুলের পথে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে ঘরে।

এদিকে ছায়েদ বাদশা শুনেছে রূপবানের রূপের খবর। তার মন লালসায় উগ্র হয়ে উঠল একাধারে রহিমকে শায়েস্তা করতে অপর দিকে রূপবানকে লাভ

করতে। মাস্টারকে ডেকে হুকুম দিলেন—দেখুন মাস্টার সাহেব, রহিমকে বলে দেবেন, কাল যদি সে জরির জামা এবং উড়িয়াবাজ ঘোড়ায় চড়ে স্কুলে না আসে, তাহলে তাকে স্কুলে ঢুকতে দেবেন না।

মাস্টার সাহেবও যথারীতি বাদশার আদেশ জানিয়ে দিলেন রহিমকে।

রহিম বরাবরই লেখাপড়ায় ভাল এবং স্কুলের সেরা ছাত্র। বাদশা-কন্যা তাজেল তার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও মনে মনে সে রহিমকে ভালবাসে তার রূপের জন্য, তার বিদ্যা ও বুদ্ধির জন্য।

রহিমের উপর বাদশার এই আদেশ শুনে ক্লাসের অন্যান্য ছাত্ররা মহাখুসি, রহিম কাল খুব জব্দ হবে—এই ভেবে। রহিম চিন্তিত হয় তারা গরিব, এত টাকা কোথায়। রহিমের চিন্তা দেখে তাজেলও ব্যথিত হয়। তাই যখন অন্যান্য বালকেরা তাকে খেপাতে থাকে তখন রূপবান তাকে সান্ত্বনা দেয়।

রহিম : ছিঁড়া জামা ছিঁড়া ধুতি রে
অ আল্লা আমার ভাগ্যে হল রে
আমার আল্লা আল্লা রে ॥
কোথায় পাব টাকা পয়সা রে
অ আল্লা কোথায় পাব জামা রে
আমার আল্লা আল্লা রে।
কেবা প্রাণের বান্ধব হয়ে গো
অ আল্লা দিবে কিন্যা ঘোড়ারে
আমার আল্লা আল্লা রে ॥

তাজেল : আমি তোমার বান্ধব হয়ে গো
অ রহিম দিব কিন্যা ঘোড়া গো
শোন রহিম রহিম গো ॥

রহিম : চাইনা তোমার ভালবাসা গো
অ তাজেল চাইনা তোমার জামা গো
শোন তাজেল, তাজেল গো ॥
আমার দিদি শুনলে তাজেল গো,
অ তাজেল দিবে কিন্যা ঘোড়া গো,
শোন তাজেল, তাজেল গো ॥

এই কথা বলে রহিম ও তাজেল চলে যাবার জন্যে তৈরি হয়; ঠিক সেই মুহূর্তেই সেখানে এসে হাজির হয় রূপবান। আড়ালে দাঁড়িয়ে সে সবই স্বকর্ণে শুনছিল। তার হৃদয়ের ধন আজ অন্যে ছিনিয়ে নিতে চায় দেখে তারও অন্তরের মাঝে হাহাকার করে ওঠে। সে রহিমকে ছেড়ে দিয়ে তাজেলকেই বলে:

প্রাণ সখীরে, মন না জেনে প্রেমে মইজা না।
আগে না জানিলে গো তারে,
প্রেম করিলে পরবে ফেরে
শেষে কাঁদলে আরও সারবে না॥

পিরীতে এমনি গো ধারা,
এক প্রেমেতে দুইজন মরা—
নইলে প্রেম আর দুইদিন রবে না॥
আমি করি বন্ধুর গো আশা,
ওকি তাজেল সর্বনাশা,
এত জ্বালা প্রাণে সহে না।
এত দুঃখ প্রাণে সহে না॥
শোন তাজেল গো,
মন না জেনে প্রেমে মইজ্য না॥

রূপবান তো তাজেলের সাথে কথা বলতে বলতে চলে গেল। রহিম এদিকে দেরি করে ঘরে ফিরে এসেছে। রূপবান যে সব খবরই আগে থাকতে নিয়ে রেখেছে, রহিম তা জানে না। রূপবান ঘরে ফিরে এসে রহিমকে দেখতে না পেয়ে মাসীকে জিজ্ঞেস করছে:

আর আর দিনে আসে দাদায় গো,
ও মাসী হাসিতে খেলিতে গো,
আমার মাসী মাসী গো॥

আজি কেন আসে দাদায় গো,
ও মাসী কাঁদিতে কাঁদিতে গো॥

এই সময় রহিমকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে রূপবান ঘরের অপর কোনায় গিয়ে লুকিয়ে রইল। রহিম আপন মনেই বলতে থাকে:

কোথায় মাতা, কোথায় পিতারে
অ আল্লা পাইলাম না সন্ধান রে।

মাসীর কাছে সব খুলে বলে রহিম। মাসী তাকে শান্ত করে,—তুমি কিছু চিন্তা কোর না, তোমার দিদি (রূপবান) তোমাকে উড়িয়াবাজ ঘোড়া আর জরির জামা কিনে দেবে।

মাসীর কথা শুনে রহিম কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে স্থানান্তর গমন করলে সেখানে এসে হাজির হয় রূপবান।

রূপবান সবই শুনেছে আড়াল থেকে। এইবার স্মরণ করে জংলী রাজাকে:

কোথায় রইলেন প্রাণের আব্বা গো,
অ আব্বা দেখেন আসিয়া গো
আমার আব্বা আব্বা গো॥

রূপবানের আকুল আহ্বান গিয়ে পেঁছায় জংলী রাজার কাছে। সেই দণ্ডেই সে ছুটে আসে রূপবানের কাছে। সে-ই জোগাড় করে দেয় উড়িয়াবাজ ঘোড়া।

পরদিন রহিম স্কুলে যায় জরির জামা পরে এবং উড়িয়াবাজ ঘোড়ায় চেপে। তাকে দেখেই পণ্ডিতমশাই বলে উঠলেন,—দেখ রহিম তোমার উপর বাদশা আবার আদেশ করেছেন, কালকে তোমাকে হাতীর পিঠে চেপে স্কুলে আসতে হবে, তা না হলে তোমাকে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আর তা ছাড়া তোমার আসল পরিচয়টাও কালকে জেনে আসবে। কালকে যখন তোমাকে তোমার দিদি বাইরের ঘরে বসিয়ে ভাত খেতে দেবে তখন তুমি বলবে যে,—তুমি রান্না ঘরে বসে খাবে, আর যখন তোমার দিদি ভাত দিতে আসবে তখনই তাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে তাহলেই জানতে পারবে সে তোমার কী হয়।

গুরুমশাইতো এই বলে রহিমকে বিদায় দিয়ে স্কুল ছুটি করে দিলেন, রহিম আবার ভাবনায় পড়ল:

কোথায় পাব টাকা পয়সা রে,
অ আল্লা কোথায় পাব হাতী রে
আমার আল্লা আল্লা রে॥
কেবা প্রাণের বান্ধব হইয়্যারে
অ আল্লা দিবে হাতী কিন্যারে,
আমার আল্লা আল্লা রে॥

রহিমের জন্য তাজেল সর্বদাই চিন্তিত, ব্যথিত। রহিমের কথা শুনে সে উত্তর দিচ্ছে :

আমি তোমার বান্ধব হইয়্যা গো
অ রহিম দিব হাতী কিন্যা গো
শোন রহিম, রহিম গো।
আমার সাধের যৌবন গো
অ রহিম তোমার লাইগ্যা গো,
শোন রহিম, রহিম গো।
আমায় যদি ভালবাস গো
অ রহিম যৌবন করব দান গো
শোন রহিম, রহিম গো।।

রহিম বলছে :

চাইনা তোমার ভালবাসা গো
অ তাজেল চাইনা তোমার যৌবন গো
শোন তাজেল তাজেল গো।।
আমার দিদি শুনলে তাজেল গো
অ তাজেল পাগলিনী হবে গো,
শোন তাজেল, তাজেল গো।।
তোমায় যদি ভালবাসি গো
অ তাজেল লোকে মন্দ বলবে গো।

তাজেল : লোকের মন্দ পুষ্প চন্দন গো
অ রহিম পইর‍্যাছি মোর গলে গো
শোন রহিম রহিম গো।
হাতে ধরি পায়ে ধরি গো
অ রহিম চল আমার বাড়ি গো।
শোন রহিম, রহিম গো।।

রহিম : তোমার পিতা শুনলে তাজেল গো
অ তাজেল মাথা নিবে আমার গো,
শোন তাজেল তাজেল গো।।

রহিম জিজ্ঞাসা করে—তাজেল তুমি কি সত্যি সত্যিই আমায় হাতী কিনে দেবে ?

তাজেল বলে—হাঁ, নিশ্চয়ই। তুমি এখানে একটু বোস—এই বলে সে গান ধরে :

শুন বন্ধু রে, তোমায় আমি ফাঁকি দিব না,
তোমায় আমি ফাঁকি দিব না ॥
বানাইয়্যা হাতের গো বয়লা,
খাইতে দিব মাখন ছানা,
শুইতে দিব ফুলের বিছানা।
এই দেহ সোনার গো যৌবন,
তোমায় আমি করব দান
তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।
তুমি আমায় ভুলে যেও না ॥

তাজেল রহিমকে এগিয়ে দিয়ে নিজেও যাচ্ছিল তার পিছু পিছু এমন সময় সেখানে এসে হাজির রূপবান। তাজেলকে দেখেই বলে বসে :

সাগর কুলের নাইয়্যারে
অপর বেলায় মাঝি,
তুমি কোথায় চলছ বাইয়্যা ॥
বার বছর বাইলাম মাঝি
পার ঘাটায় বসিয়া,
বেলা গ্যাল সন্ধ্যা হলো
মাঝি তোমার পানে চাইয়্যা ॥
তোমার অভাগিনী দাসী কান্দেরে মাঝি
ও মাঝি আমারে যাইও লইয়্যা রে ॥
রঙের মাস্তুল, রঙের বৈঠা, রঙের বাদাম দিয়া,
ঢেউয়ের তালে নেচে নেচে মাঝি
কোথায় চলছ বাইয়্যা ॥
তুমি কারে হাসাও, কারে কান্দাও মাঝি
(ও) মাঝি কারে যাও কান্দাইয়্যা রে ॥

কাওরে ডেকে বলছ ওরে মাঝি
আয়রে আমার নায়,
আমায় দেখে বলছ ওরে মাঝি
জায়গা নাই মোর নায় ॥
যখন তোমার কেও ছিল না
তখন ছিলাম আমি,
এখন তোমার সব হইয়্যাছে
পর হইয়্যাছি আমি ॥

এই বলে রূপবান রহিমকে নিয়ে চলে যায়। পরদিন সকালে রহিম মাসীকে ডেকে বলে—মাসী, আমি আর বাইরের ঘরে বসে ভাত খাব না। দিদি কোথায় গেছে ?

মাসী বলে—রান্নাঘরে, তুমি সেখানে যাও। এই বলে মালিনী মাসী প্রস্থান করে সেখান থেকে আর সেই সঙ্গেই রূপবান প্রবেশ করে খাবারের থালা হাতে নিয়ে। রহিম তাকে দেখেই বলে ওঠে—আমি তোমার হাতে খাব না, আগে সত্য করে বল তুমি কে ?

রূপবান বলে—সে অন্যদিন শুনো।

রহিম রেগে গিয়ে বলে—তাহলে তুমি আমার চোখের সম্মুখ থেকে চলে যাও।

রূপবান বলে :

হাতে ধরি পায়ে পড়ি রে
অ ছোক্‌রা ক্ষমা কর আমারে,
আমার ছোক্‌রা বন্ধু বন্ধু রে ॥
অসময় নিদান কালে রে
অ ছোক্‌রা পাই যেন তোমারে
আমার ছোক্‌রা বন্ধু বন্ধু রে ॥

রহিম বলে—হয় তুমি এখান থেকে দূর হও, না হলে আমি চলে যাচ্ছি।

রূপবান বলে—না দাদা, তুমি কেন যাবে, এ দাসীই জম্মের মতো চলে যাচ্ছে, এই বলে গান ধরে :

দাসী বিদায় হল বন্ধু রে
অ বন্ধু এ-জনমের তরে রে
আমার ছোক্‌রা বন্ধু রে।

বার দিনের শিশু লইয়্যা রে
অ ছোক্‌রা ঘুরছি বনে বনে রে
আমার ছোক্‌রা বন্ধু রে ॥
আগে যদি জানতাম বন্ধু রে—
যাইবারে ছাড়িয়া রে
আমার ছোক্‌রা বন্ধু রে ॥
ফেলিয়া দিতাম বন্ধু রে
অ বন্ধু বাঘের সম্মুখে রে
আমার ছোক্‌রা বন্ধু রে ॥

রহিম প্রশ্ন করে—ও কথার অর্থ কী?

রূপবান কৌশলে সমস্ত কথাই বলে, শুধু বাকি রাখে উভয়ের আদত পরিচয়টা দিতে। রহিম বলে, সে যাবে তার দুলাভাই (ভগ্নীপতি)-কে খুঁজে আনতে। তার জন্যই তো দিদির এত কষ্ট! রূপবান শুনে মনে মনে হাসে। রহিম তখনকার মতো স্থানান্তরে গেলে রূপবান গান ধরে:

প্রাণ বন্ধু রে দুঃখিনীরে আর কাঁদাইও না।
আমি করি বন্ধুর গো আশা
সে আশা মোর হয় নিরাশা,
এত জ্বালা প্রাণে সহে না ॥
মাতা পিতা ত্যাজ্য গো করি
এলেম বন্ধু তোমার গো কাছে,
তুমি মোরে ছেড়ে যেও না।
রাত্র যে নিশির কালে
কুকিল ডাকে কদম ডালে
আমি কেঁদে ভিজাই বিছানা ॥

রহিম রূপবানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে এল। এসে শোনে ছায়েদ বাদশা প্রচার করেছে রহিমকে তার ঘোড়ার সঙ্গে রেস খেলে জিততে হবে। যদি সে জেতে তাহলে প্রচুর পুরস্কার দেবে—না হলে তাকে আর স্কুলে ঢুকতেই দেওয়া হবে না।

এই কথা শুনে রহিম বাদশার ঘোড়ার সঙ্গে রেস দিল এবং জিতল। কিন্তু পুরস্কার চাইতে গেলেই ছায়েদ তাকে বন্দী করে রেখে দিল কারাগারের ভিতর।

হুকুম হলো প্রহরী কাল রহিমকে বেত্রাঘাত করবে। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলো বিবেক :

মারিস না রে মারিস না রে মিনতি তোরে
মারতে যদি ইচ্ছা হয় রে মার আমারে।
এমন কোমল অংগে বেত্রাঘাত সহে না প্রাণে।
ওযে হলো অবোঝ ছেলে বুঝ নাই অন্তরে।

বিবেককে দেখতে অনেকটা পাগলের আকৃতি। দারোয়ান তাকে দেখেই পাগল মনে করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। বিবেক তখন আবার গান ধরল :

পাগল বলে অবহেলা কোরোনা মোরে
পাগল বিহনে পড়বি ঘোর আঁধারে।
মিছে গৌরব করিস কেন রে ভব সংসারে।
টাকা পয়সা দালান কোঠা সব রবে পড়ে।

এদিকে রহিম এইভাবে কারাগারে বন্দী, অপর দিকে রূপবান চিন্তিত—আজ এত দেরি হচ্ছে—এখনও কেন তার প্রাণের রহিম ঘরে ফিরে এলো না। এমন সময় রাজবাড়ির দারোয়ান এসে খবর দিল রহিম ছায়েদ বাদশার কারাগারে বন্দী।

খবর শুনেই তো রূপবান কেঁদে আকুল :

কোথায় রইলেন প্রাণের মাসী গো
ও মাসী দেখেন আসিয়া গো।
আমার মাসী মাসী গো।

রূপবানের ডাকে মাসী কাছে এগিয়ে এলে, রূপবান তার হাতে একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিল জংলী রাজার কাছে—যাকে সে মনে করত সকল বিপদের বন্ধু বলে :

কোথায় রইলেন প্রাণের আব্বা গো
ও আব্বা দেখেন আসিয়া গো
আমার আব্বা আব্বা গো!

রূপবানের কাছ থেকে খবর পেয়ে সেই মুহূর্তেই সেখানে এসে হাজির হলো জংলীরাজ। রূপবানকে কথা দিল যে করেই হউক সে ছায়েদ বাদশাকে পরাস্ত

করে রহিমকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এই বলে সে বিদায় নিতেই রূপবান ভারাক্রান্ত মনে গান ধরে :

দুঃখ যে মনের মাঝে আনিল আমার
তারেনি ভাল রাখিবে খোদায়
অতি বেদনার পরে হৃদয় মন্দিরে আসি
পেয়েছি তারে।
যার নামের মালা আমি পরেছি গলায়
তারেনি ভাল রাখিবে খোদায়।
সখা কোথায় রহিলে, তোমারি অবলা দাসী
পুড়ে অনলে
তসবি জপি আমি বিরহ জ্বালায়
তারেনি ভাল রাখিবে খোদায়।
রাত্রি প্রভাত কালে কাক ও কুকিল ডাকে
ঐ কদম্ব ডালে,
নামাজ পড়ি আমি বসি নিরালায়
তারেনি ভাল রাখিবে খোদায়।
নামাজ পড়ি আমি করি মোনাজাত
তারেনি ভাল রাখিবে খোদায়!

জংলীরাজা বিদায় হতেই সেখানে এসে হাজির ছায়েদ বাদশা। ছায়েদ চেষ্টা করল রূপবানকে হরণ করে নিয়ে যেতে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সেইখানে তাজেলের প্রবেশ। ছায়েদ প্রথমটায় বাধা পায়। কিন্তু ছায়েদ তাদের দুজনকেই পরাস্ত করে রূপবানকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তখন রূপবান 'আব্বা, আব্বা' করে কাতরকণ্ঠে জংলীরাজকে ডাকতে থাকে। তার ডাকে জংলীরাজ এসে হাজির হয় এবং ছায়েদকে পরাজিত করে রূপবান ও তাজেলকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে তাজেল কৌশলে কারাগার থেকে রহিমকে উদ্ধার করে মুক্তি দেয়।

রহিম মুক্তি পেয়ে হাঁটতে থাকে। পথ চেনে না—কোন্ পথে যাবে সে। এই সময় পথে দেখা হয় মাষ্টার মশাইয়ের সংগে। মাষ্টার তাকে বাড়ি নিয়ে পরামর্শ দেয় কিভাবে 'রূপবান তার কে হয়' তা জানবার কৌশল সম্পর্কে। রহিমও গুরুর উপদেশ পালন করতে থাকে।

রহিম নিরুদ্দেশ। কে জানে সে কোথায় আছে রূপবান আপনার মনে বসে গান গাইছে :

আমার বন্ধু বিনোদিয়ারে
প্রাণ বিনোদিয়া,
আমি আর কতকাল রাখব যৌবন
নিজেরে বুঝাইয়া রে।
আমি আর কতকাল রাখব
যৌবন প্রদীপ জ্বালাইয়া রে।
আগে যদি জানতাম বন্ধু
যাইবারে ছাড়িয়া,
আমি দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম
মাথার ক্যাশ দিয়ারে।

এই সময় বৈরাগী ঠাকুরের ছদ্মবেশে রহিমের সেখানে উপস্থিতি ঘটে রূপবানকে ঐভাবে বিরস বদনে বসে থাকতে দেখে ছদ্মবেশী রহিম বলে :

শোন শোন শোন সখি গো
ও সখি বলি যে তোমারে গো
শোন সখি, সখি গো
সারা দিনের উপবাসী গো
ও সখি বলি যে তোমারে গো
শোন সখি সখি গো।

রূপবান : তোমার সখি যেথায় আছে গো
ও ঠাকুর সেথায় যাও চলিয়া গো
শোন ঠাকুর ঠাকুর গো।

ঠাকুর : তুমি আমার ঘাটের তরী গো
ও সখি আমি তোমার মাঝি গো
শোন সখি সখি গো।

রূপবান : আমার মাঝি রহিম বাদশা গো
ও ঠাকুর তোমায় মারব ঝাড়ু গো
শোন ঠাকুর ঠাকুর গো।

ঠাকুর : আমার পিতা তোমার শ্বশুর গো
ও সখি আমি তোমার দাদা গো
শোন সখি সখি গো।

রূপবান : আমার শ্বশুর নিরাশপুরে গো
ও ঠাকুর তোমায় রাখবো গোলাম গো
শোন ঠাকুর ঠাকুর গো।

ঠাকুর : আমারি ভাইস্তার খুড়ী তুমি গো
অ সখি আমি তোমার দাদা গো
শোন সখি সখি গো।

ছদ্মবেশী রহিমের সঙ্গে কথাবার্তায় রূপবানের কেমন যেন সন্দেহ জাগে মনে, "ঠাকুরকে যতই তাড়িয়ে দিচ্ছি আমার মন যেন কেমন করছে"—এই ভেবে ঠাকুরকে প্রশ্ন করে,—আচ্ছা ঠাকুর তোমার নাম কি ?

ঠাকুর উত্তর দিচ্ছে : রামের বামে থাকি আমি গো
অ সখি রহিম আমার মিতাজী
শোন সখি সখি গো॥

এই সময় ঠাকুর বলে, তোমার হাতখানা আমার হাতে দেও আমি গণনা করে বলে দিচ্ছি—এই বলে রূপবানের হাত ধরতে যেতেই রূপবান রাগত ভাবে তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে. আর এই টানাটানিতে রহিমের ছদ্মবেশও খুলে পড়ে। মিলন হয় দুজনের মধ্যে। ঘটনা স্থলে এসে পৌঁছয় তাজেল। সে বলে—আজ হতে দিদি আমি তোমার দাসী হয়ে রইলুম।

এসে পৌঁছয় ছায়েদ বাদশা। তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায় রহিম ও রূপবানের কাছে। জংলী রাজা এসে বলে—মা রূপবান, তোমাদের অজ্ঞাতবাসের দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে চল এবার তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাদের নিজ রাজ্যে। এই বলে জংলীরাজ তাদের নিয়ে চলে এল রহিমের পিতৃরাজ্যে একাব্বর বাদশার সামনে।

খবর পেয়ে রাজসভায় পাগলিনীর ন্যায় এসে পৌঁছেন রহিমের মাতা জাহানারা। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন রহিম আর রূপবানকে। এসে যান উজীর সাহেবও।

সভাস্থ সকলের সম্মুখে একাব্বর বাদশা নিজের তাজ খুলে পরিয়ে দেন রহিমের মাথায়। বলেন—আজ হতে তুমিই হলে এ রাজ্যের রাজা, আর মা রূপবান হলো রাণী।

আনন্দে মেতে উঠ্‌ল পুরবাসীরাও। সাত দিন, সাত রাত ধরে চল্‌ল, খানা পিনা, আমোদ আহ্লাদ, হৈ চৈ। যবনিকা পতন হলো, "রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা" গীতি নাট্যেরও।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রয়াণী বা ভাসান গান

রয়াণী বা ভাসান গান মূলত চাঁদ সদাগর তথা বেউলা (বেহুলা) লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী ও মনসা দেবীর মাহাত্ম্য নিয়েই রচিত। পূর্ববঙ্গ সর্পবহুল দেশ। তাই সর্পদেবী মনসা পূজার ঘটাও এখানে একটু বেশি রকমের। শ্রাবণ মাসের পহেলা থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি ঘরে দেখা যায় সুর করে মনসা-মঙ্গলের পুঁথি পড়তে, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে করে পূজা—কেউবা ঘটে, কেউবা পটে, কেউবা মূর্তিতে। এর জন্য কুমারদের এক বিশিষ্ট ধরনের ঘট বানাতে হয়—একেই বলে 'মনসা-ঘট'। ঘটের মূর্তিটাও একটু অদ্ভুত ধরনের। এর দুপাশে থাকে দুটো সাপ, মাথায় সাপের মুকুট আর মাঝখানটা জুড়ে নথপরিহিতা মনসাদেবীর মুখাবয়ব। অবশ্য সব অঞ্চলে যে একই ধরনের মনসার মূর্তি বা ঘট হয়ে থাকে তা নয়। অঞ্চল ভেদে মূর্তি এবং ঘটেরও চেহারা বদলে যায়।

সাধারণত কোনো লোক মনসার কাছে কিছু মানত করে সফলকাম হলে তার বাড়িতে আয়োজন করে রয়াণী বা ভাসান গানের। পশ্চিমবঙ্গে যাকে বলে ভাসান, পূর্ববঙ্গে তাকেই বলে রয়াণী। রয়াণী গানের বৈশিষ্ট্য হলো রামায়ণী গান বা কৃষ্ণলীলার মতো এর পৃথক পৃথক পালা নেই। এ-গাণের আসর যেখানেই বসে, সেখানেই এর আদ্যোপান্ত শেষও হয়। কোনো কোনো জায়গায় সাত বা পনের দিন বা একমাস পর্যন্ত এ-গান হয়ে থাকে। তবে একটু ব্যয়বহুল, তাই এর আবির্ভাবও খুব ঘন ঘন দেখা যায় না।

মনে করুন, রয়াণী গানের আসর বসেছে। বিরাট মণ্ডপ। যাদের স্থায়ী মণ্ডপ নেই তারা অন্তত: এই উপলক্ষ্যে সাময়িকভাবে তৈরি করায় এক অস্থায়ী মণ্ডপ। তার ভিতর বেশ মিছিল করে সাজান রয়েছে বিভিন্ন সাজ পোশাকের পুতুল—চাঁদসদাগর, বেউলা, লক্ষ্মীন্দর, ধন্বন্তরী ওঝা, নেতা ধোপানী, হর-পার্বতী ইত্যাদি। এদের মাঝখানে রয়েছে শ্রীমনসার বিরাট মূর্তি। মূল গায়ক আসরে দাঁড়িয়ে চামর ব্যজন করতে করতে সুর করে সভা বন্দনা গাইতে থাকে:

ওগো আমার মা, বন্দিলাম, বন্দিলাম, চরণঃতোমার,
স্বর্গ হইতে বন্দিলাম দেবের প্রধান
সীমান্ত হইতে বন্দিলাম তোমায়
ওগো তোমারও চরণেতে মতি পাইলেন
আমি 'নারায়ণ' যেন তব চরণে পাই স্থান।
তবে সে বলিতে পারি মহিমা তোমার,
সরস্বতী দেবী তোমায় করি গো বন্দনা
যাহার প্রসাদে পাব দুঃখহরির মন্ত্র
তাহার প্রসাদে জ্ঞান হইল আমার।
শিক্ষাগুরুর চরণ বন্দি শিক্ষাগুরুর পায়
ঐ যার দয়াতে আমার সকল শিক্ষা হয়।
পূর্বে বন্দি ভানুরে—পশ্চিমেতে চাঁদ
উত্তরে বন্দি হিমালয়—দক্ষিণে সাগর
স্বর্গ মর্ত্য বন্দি আমি, বন্দি গো পাতাল।

রয়াণীকার এরপর একে একে বর্ণনা করে যায় পদ্মার জন্ম বৃত্তান্ত, তাঁর কৈশোর, যৌবন, বিবাহ ইত্যাদি। কিন্তু হলে হবে কী, পদ্মা (মনসা) দেবী হলেও তাঁকে তখনও কেউ পূজা করে না। পদ্মা দেখলেন, মর্ত্যে চাঁদসদাগর হলো পরম ধার্মিক শিবভক্ত, সে যদি তাঁর পূজা করে তবেই তাঁর পূজা জগতে প্রচারিত হতে পারে। তিনি প্রথমটায় চাঁদকে অনুরোধ করলেন, প্রলোভন দেখালেন ধনরত্নের, কিন্তু চাঁদ কিছুতেই তাঁকে দেবী বলে স্বীকার করল না। চাঁদসদাগরের ইতিপূর্বে ছয় পুত্র মারা গেছে বাণিজ্য করতে গিয়ে, চাঁদ তাতেও কিছুমাত্র দমেনি। এইবার সে নিজে যাত্রা করল বাণিজ্যের দিকে। চৌদ্দ ডিঙা মধুকর পরপর সাজান রয়েছে ঘাটে। প্রত্যেক নৌকার শোভাই বা কী চমৎকার। ময়ূরপঙ্খী ধরনের সব বজরা। নৌকার গলুই পিতলে মোড়া। মাজা ঘষার জন্য সেগুলি ঠিক সোনার মতোই চক্‌চক্‌ করছে। নৌকায় বোঝাই সব পণ্য সামগ্রী। চাঁদ যেন উমাপতির মতো স্থির সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছে তার সর্বশ্রেষ্ঠ বজরা মধুকরের উপর। রয়াণীকার বর্ণনা করতে থাকে :

ডিঙাতে উঠিল চাঁদ মহাদেবকে ভাবি
কতদূর গিয়ে চাঁদ পূজে গঙ্গাদেবী!
একে একে দেবগণে চাঁদ তখন পূজিল সকল

গংগা পূজা করে দিয়া লক্ষ ছাগল।
একে একে দেবগণে চাঁদ তখন পূজিল সকল
কেবল পদ্মাদেবীর নামে না দিল ফুলজল।
তেত্রিশ কোটি দেব পূজা করিলেন চাঁদে
না দিল কেবল ফুল পদ্মার নামে।
যদি ব্রাহ্মণী বেশে এবে ভিক্ষা মাগে এবার
যদি ভ্রমে পূজে আমারে চাঁদ বিনয় দিয়া
বলা মাত্র পদ্মাবতী যদি ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে (হে)
আমার যাত্রাকালে বিধবা কন্যা এলি আমার ঠাঁই
আমার ইচ্ছা করে তোর হেতালের বাড়ি দিয়া করি শেষ।
পদ্মা বলে ক্যান ত্যাজ সাধু সজ্জন
আমি শিবের কন্যা পদ্মাবতী নাম মনসা।
আমায় পূজে ফিরে যাও যেখানে যে দেশে
আমি নিজে কান্ডারী হইয়া বাইয়া দেই নাও।
আমি আসিবার কালে তোমার হইলাম কাঙাল
আমি কপটে লুটিয়া দিলাম পদ্মার ভান্ডার।
এখন আমারে দেও পুষ্পগতি তুলে
ও তোর ছয় পুত্র জিয়াইয়া দিব না করিব আন।
চাঁদ বলে মরা যদি তুমি জিয়াইতে পার
তবে ক্যান ভাংগা মাজা, কানা চক্ষের
অষুধ ক্যান না কর।
তারপর সদাগর হেতাল গণিয়া হাতে
কলারচক্রে মাথা লাগে পদ্মাবতীর কাছে।
দৌড় দিল পদ্মাবতী আলু থালু চুলে
পাছে পাছে যায় চাঁদ ধর্ ধর্ বলে।

চাঁদ মনসাকে ভাগিয়ে দিয়ে আবার চলতে থাকে:

তথা হতে যাত্রা করে চাঁদ সদাগর
হেথায় চম্পক নগরের কিছু শোনেন খবর।
একমাস দুইমাস কিছুই না জানি
ওরে পাঁচ মাসের গর্ভ ধরে সেনকা সৌদামিনী।

ছয়মাসে হল সনকার গর্ভের প্রচার
সাতমাসে তখন হইল সেই গর্ভের প্রসার।

চাঁদ সদাগর শিবভক্ত হলেও রাণী সনকা ছিলেন মনসার উপাসিকা। কাজেই এইবার চললেন মনসার পূজা দিতে—সনকার পরপর ছয় ছয় জন উপযুক্ত পুত্র বাণিজ্যে গিয়ে মারা গেছে। চাঁদ সদাগরের বংশে বাতি দিতে আর কেউ নেই। রাণী গর্ভবতী—তিনি জানেন না তাঁর গর্ভে কী আছে। তিনি মনসার কাছে পুত্র বর চাইলেন। মনসাও রাজী হলেন তাঁর প্রার্থনা পূরণ করতে, কিন্তু সর্তসাপেক্ষে :

দিলাম দিলাম পুত্রবর, নাম রাখিও লক্ষ্মীন্দর
হইবা মাত্র আনিব হরিয়া।
সেনোকা বলে হরের ঝি, ও ছার বরে কার্য কী,
না দেও বর যাইগো ফিরিয়া॥
দিলাম দিলাম পুত্র বর, নাম রাখিও লক্ষ্মীন্দর
উঠানীর দিন আনিব হরিয়া।
সেনোকা বলে হরের ঝি, ও ছার বরে কার্য কী
না দেও বর যাইগো ফিরিয়া॥
দিলাম দিলাম পুত্র বর, নাম রাখিও লক্ষ্মীন্দর
বিয়ার রাত্রে আনিব হরিয়া।
(তখন) ছয় বধূ বলে রাণী, শোন ওগো ঠাকুরাণী
হলে লখাই না করাব বিয়া॥

শেষ পর্যন্ত মনসার ঐ কথাতেই রাজী হয়ে ফিরে গেলেন সনকা রাণী :

দশমাস দশদিন হইল যখন
জন্মিলেন লক্ষ্মীন্দর দেব সুলক্ষণ।
ওগো নখাইর জন্মের কথা অতি সে বৃত্তান্ত
দিনে দিনে এল এইসব বৃত্তান্ত।
ছয়মাসে করে নখাইর অন্নপ্রাশন
ওগো জ্ঞাতিগণ লয়ে করে নামকরণ।
ওগো এই মতে আছে কথা কুমার লক্ষ্মীন্দর।
ওগো বেহুলার জন্ম হল উজানী নগর।

ওগো এই মতে আছে হেথা শাহের দুহিতা,
ওগো পশ্চিমে গিয়াছে চাঁদ শোন তারই কথা।

আমরা চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা বলতে বলতে হঠাৎ লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার জন্ম-বৃত্তান্ত বলে নিলুম। কিন্তু এদিকে সমুদ্র পথে চাঁদ কী রকম বিপদের সম্মুখীন হলো সে বিষয় কিছু শোনা দরকার। সদাগর কিছুতেই মনসাকে দেবী বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। কাকুতি মিনতি, প্রলোভনেও যখন কোনো কাজ হলো না তখন মনসা শুরু করলেন চাঁদের ক্ষতি করতে:

বাহিরে থাকিয়া দুলাই তখন ঊর্ধ্বদিকে চায়
মেঘের লক্ষণ দেখি করে হায় হায়।

সঙ্গে সঙ্গে চড়াও হয়ে এল প্রভঞ্জন,
চাঁদ বলে রক্ষা কর দেব পঞ্চানন।
রাত্রিভাগে যেখানে নোঙ্গর করেছিল সদাগর
দেখিতে দেখিতে হল আসি ঝড় ও বাদল।
সমুদ্রের গর্জন শোন মেঘে ধরে তান
চাঁদ বলে রক্ষা কর জয় মা দুর্গা।

হেথা লাঠি দিয়ে চাঁদ মৃতের কায়া ধরে
এমনি মায়ার খেলা ডুবিল অতলে।

শিবদুর্গা বলে চাঁদ কান্দি কহে
দুলাই আর কিবা চাও,
প্রাণ রক্ষা পার যদি এখন নোঙ্গর ফেলে দাও।

ওগো বলাবলি করে সবাই
এইবার তরাও ধর হরি লও নাও।
মনসা বলে ওহে চাঁদ শুন আমার বাণী
এখনও দেও তুমি আমায় পুষ্পাঞ্জলি।
ছয় পুত্র জিয়াইয়া দিব ডিঙা চৌদ্দখানি।

কিন্তু মনসার আবেদন বিফলেই গেল। গর্বিত চাঁদ মনসার প্রভাবের কাছে মাথা হেঁট করতে রাজী নয়। এত বিপদ, এত দৈন্য, আসন্ন বিপর্যয় এমনকি মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে মনসার কাছে পরাভব মানল না। গোটা রয়াণী বা ভাসান কিংবা মনসামঙ্গলের পুঁথির মধ্যে এত বড় বলিষ্ঠ চরিত্র আর

নেই। মানুষ হয়ে দেবতার সঙ্গে এইভাবে পাল্লা দিয়ে চলার কথা তৎকালীন 'মঙ্গলকাব্যে' একটু ব্যতিক্রম বইকি। তাই রয়াণীকারের ভাষায়:

চাঁদ বলে পার যদি মরা জিয়াইতে
তোমার ভাঙ্গা মাজা, কানা চক্ষে
দোসর কেন না হয়।
এত শক্তি যদি বামা ধর তুমি
বিবাহের রাত্রে কেন ছেড়ে গেল স্বামী।
এতেক শুনিয়া পদমা ছাড়ে হুহুংকার
চাঁদের চৌদ্দ ডিঙা ঘোরে যেন কুমারের চাক।
প্রথমে ডুবিল ডিঙানাম গুয়াঠুঁটী
(ওগো) তার মধ্যে আছে যেন রাবণের:লঙ্কাপুরী।
তারপরে ডুবিল ডিঙা নামেতে খালই,
টোপে গণেনা তার ভরা তাতিয়ে উঠায় মাটি।
তারপরে ডুবিল ডিঙা নামেতে মকরা
(ওগো) সাত শত বাড়ুইতে যার গড়েছে এক গুড়া।
তারপরে ডুবিল ডিঙা নামে শঙ্খবার
(ওগো) আশি হাত জল ভাঙ্গে যায় সমুদ্র।
তারপরে ডুবিল ডিঙা নামেতে নশুন
তার ভিতরে ভুবনের অসংখ্য মাণিক্য।
তারপরে ডুবিল ডিঙা জলেতে ব্রহ্মাণ্ডি
(ওগো) সাতশত বাইছাতে যার চালাইত দাড়ী।
(তখন) তের ডিঙার লোক গিয়া মধুকরে চড়ে
এই ডিঙায় যাবে সবে চম্পক নগরে।

চাঁদের চৌদ্দ-ডিঙার ভিতর তেরখানাই জলে ডুবল। এখন বাকি মাত্র চাঁদের বজরাখানা। তাও টলমল অবস্থায়। চরম মুহূর্তে আসন্ন সর্বনাশ জেনে চাঁদ শুরু করে চন্ডীর স্তব-স্তুতি:

শুন গো মা দেহ গো মা বিষাদে পদচ্ছায়া,
প্রাণ হারা হইলাম গো মা তারা,
মাগো তুমি আদ্যাশক্তি শুনেছি মা স্মরণে
সুজনে জানে কী আছে তব শক্তি না দিলে।

মাগো দূরেতে থাকিয়া পবন কুমার,
ওগো লম্ফ দিয়া পড়ল গিয়া ডিঙার উপর।
ওগো হনুমানের গায়ে আছে পর্বতের ভার
ওগো ঝলকে ঝলকে পানি উঠে ডিঙার পর।
ওগো না জানি মারে কত পাথারে ফেলিয়া,
ওগো জলের মধ্যে চাঁদকে ফেলাইল ঠেলিয়া।
চৌদ্দ ডিঙা ডুবিল চাঁদের জয় ব্রাহ্মণী,
জলের মধ্যে সদাগর ভাসে হইয়্যা পাড়ি।

চাঁদের চৌদ্দ-ডিঙা-মধুকর এখন জলের তলায়। সমস্ত ধনরত্ন এখন গঙ্গা গর্ভে, সে ভেসে চলেছে স্রোতের উপর গা ভাসিয়ে দিয়ে। ভাসতে ভাসতে শুরু করে বিলাপ :

ওগো কাশীনাথ রক্ষা কর মোরে—।
ওগো সংকটে পড়িয়া চাঁদ চতুর্দিকে চায়
এমন সময় কাশীনাথ রহিলে কোথায়।
বণিককুলে জন্ম আমার বণিকি আমার মতি
আমি কি জানিব তোমার চরণের ভকতি।
বণিককুলে জন্ম আমার বণিকি আমার মা,
বণিককুলে জন্ম ভালো সাধন করলাম না।
বণিককুলে জন্ম আমার বণিকের নন্দন,
আমি কি জানিব তোমার সাধন ভজন।

শুরু হয় চাঁদের দুঃখ-দুর্দশা, একটার পর একটা :

বোয়াল মাছে নিয়ে চাঁদের হেতাখানি—।
সমুদ্রের মধ্যে চাঁদ হাবুডুবু খায়,
কূলে থেকে পদ্মাবতী দেখিবারে পায়।
এত বলি পদ্মাবতী শোন আমার বাণী
চাঁদবেনে দিলে মোরে পুষ্পাঞ্জলি,
চক্রবর্তী বলে (রয়াণীকার) পদ্মা, ওগো আমার কথা ধর,
চাঁদের যাতে রক্ষা হয় তার উপায় কর।
পদ্ম ভেলা দেখে চাঁদ তখন মারিলেন ঠেলা
থুঃ থুঃ করিয়া চাঁদ দিল ফুল মালা।

শতাধিক বারে তীরে এল সদাগর
চরের উপরে চাঁদ হাঁটিয়া বেড়ায়।
মরা মানুষের দড়ি কাছি চরের উপর পায়।
মরা মানুষের দড়ি কাছি চরের উপর পাইয়্যা
চাঁত নেতি (তেনি) নিল হাতে।
মনসার বিষাদে চাঁদের হলো দুর্গতি
শেষে কচুর পাতায় করে লজ্জা নিবারণ।

দিন যায়। যতদূর দুর্ভোগে ভুগবার ভুগে চাঁদ এক সময় এসে পেঁছায় তার নিজ রাজ্যে—চম্পক নগরে। কিন্তু এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে না পুরবাসী না রাজবাড়ির কেউই তাকে চিনতে পারে। চাঁদ শেষটায় বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলে কেবল রাণী সনকা তাকে চিনতে পেরে তার ঐ ভিখারীর বেশবাশ দেখেতো কেঁদেই অস্থির :

প্রাণ বঁধুয়ারে ভাল করি তুমি পরিচয় দাও।
কী কারণে প্রভু তোমার এত লড়িদড়ি,
চৌদ্দখানা ডিঙা প্রভু তুমি কারে দিলা ভাসি।
সঙ্গে নিয়াছিলা প্রভু চৌদ্দশ বাইছারু
তাদের যত স্ত্রী-পুত্র আসিবে এখনি
কারো বাপ, কারো ভাই, কারো নিজ পতি
কোথায় রাখিয়া এলে ঠাকুর মহামতি।
এমন সময় সেনকা লখাইরে কোলে করি
চাঁদের নিকটে এল সেনকা সুন্দরী।
লখাইকে দেখে চাঁদ ভাবে মনে মনে
কার পুত্র নিয়ে তুমি এসেছ এখানে।
অন্য পুরুষ সঙ্গ করলি গৃহে বাস,
সেই কারণে চৌদ্দডিঙা সমুদ্রে হল নাশ।
এতেক সেনকা তখন ভাবে মনে মন
চাঁদকে আনিয়া দিল গর্ভের লিখন।
সত্য, সত্য, ওগো সত্য কইছ তুমি
আমার সাধ ধন দিয়া ছিলেন তোমারে অর্পিয়া
বার বছরের লখাইরে না করালা বিয়া।

যজ্ঞস্থানে যাইয়া বিয়া করাইও তুমি
তোমার চরণে ধরিলে দেবী হউক সদয়।
এতেক শুনিয়া চাঁদ বলিল তখন,
উজানী নগরে গিয়া পাত্রী আনিব এখন ॥

চাঁদ ফিরে পেয়েছে তার রাজ্য-রাজধানী। এইবার তার প্রধান কাজ হলো লক্ষ্মীন্দরের বিয়ে দেওয়া। কাজেই এবার শুরু হলো লক্ষ্মীন্দরের জন্য পাত্রী খুঁজে বার করা।

চাঁদ পাত্রী খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির বন্ধুবর শায় বেনের বাড়ি। এদিকে বেউলা সুন্দরী দৈবজ্ঞের গণনানুসারে তোলা জলে স্নান করতে হয় বলে বড়ই কান্নাকাটি শুরু করে:

শয়ন মন্দিরে বেউলা করিছে রোদন
ওগো তাই শুনে সুমিত্রা রাণী দিল দরশন।
সুমিত্রা বলেন বেউলা করে নিবেদন
বেউলা বলে ওগো মাতা আমার বড়ই দুঃখ
ওগো তোলা জলে স্নান করিতে চিত্তে না ছিল সুখ।

তাই বেউলা একদিন বাড়ির সকলের অজান্তে সখীসঙ্গে গিয়ে হাজির হয় নদীর ঘাটে:

চল চল ওগো বেউলা চলগো সত্বর
ওগো ত্বরিতে আসিও যেন না জানে সদাগর।
তখন সখী সঙ্গে চলে বেউলা শিব শিব জয়
মুক্ত বীরের ঘাটে গিয়া হইল উদয়।
(ওগো) ঘাট না পেয়ে বেউলা নামে পাশ দিয়ে
কাণী মনসা বইস্যা ছিল সেই ঘাটের পারে।
কী করিলি ওগো মাগো তোর হউক মাথায় বজ্রপাত
বাসী বিয়ার রাত্রে খাবি স্বামী না হইবে আন
তুই চাইর দিনের মধ্যে পাবি এই কথার প্রমাণ।
বেউলা বলে তোমার শাপে হবে কী
আমার মায় আছে দেবী লক্ষ্মীবতী।
এই বলিয়া ডুব দিল বেউলা জলের ভিতরে
সাজ সজ্জা নিয়া বেউলা উঠিল সত্বরে।

বেউলা স্নান করছে, দূর থেকে চাঁদ সদাগর তা লক্ষ্য করছে :

এই কন্যা পাইলে লখাইর লগে অবশ্য দিব বিয়া,
মইলে মরা এই বধূ আনবো জিয়াইয়্যা।
স্নান করিয়া বেউলা রমা চলিল সত্বর
আপনার গৃহে গিয়া করিল প্রবেশ।

এরপর চাঁদের কথা শুরু হয় বন্ধুবর শায় (শাহ) বেনের সংগে। শায় বেনে বলে :

আমার ভালো কন্যা আছে বিয়া দিতে চাই
যোগ্য পাত্র পেলে তবেই আমি দিব বিয়ে।

চলে দুপক্ষের কথাবার্তা। বেউলার গুণপনার সহস্র পরীক্ষা সাংগ হয়। বিবাহের দিন এগিয়ে আসে। বৈচিত্র্যের কিছু নেই এখানে। দুপক্ষই সমান ওজনের ধনী ও সম্ভ্রান্ত। কাজেই নিরাপদে নির্বিঘ্নে লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ পর্ব সমাধা হলো। লক্ষ্মীন্দর বিয়ের পরদিনই দোলায় চেপে চল্‌লো নিজের দেশে। ঠিক হলো বাসীবিয়ে তথা কুশণ্ডিকা বরের বাড়িতেই সারা হবে :

তথা হতে চলিল মানিক লক্ষ্মীন্দর
ত্বরিতে চলিতে গেল চম্পক নগর।
দোলার কাপড় তুলিয়া বেউলা শ্বশুরের রাজ্য দেখে
দ্বাদশজন বিধবা নারী দেখিল সম্মুখে।
দক্ষিণেতে শিয়াল দেখে, বামে দেখে সাপ
তাহা দেখে বেউলার নয়নে এল জ্বালা।
তখন এমন নানা মতে, এমন দেখিলাম বটে
দুই মাসে চম্পক নগরে হল উপস্থিত।
চম্পক নগরে এলেন লখাই বেউলা দুই জন
জয় জোকার দিল এসে যত নারীগণ।
তখন বেউলার কনিষ্ঠ অংগুলী ধরিয়া লখাই
অমনি চলিয়া গেল লোহার বাসরে।
চাঁদ বেড়িল লোহার ঘর ঘিরে নানা অস্ত্র রাজি
ওগো শত শত ময়ূর থুইল, শতে শতে বেজী।

উপরে তরুয়া তলা নামে প্রহারি
প্রহরে প্রহরে বেড়ে শাঁখে ভরি।
এখানে কাশী তৈয়ার—শিব আলপনা
লোহার গৃহে রাখি আইল লখাই বেউলা।
প্রহরিয়া ঘরে গেল চাঁদ সদাগর
লখাই বলে ওগো বেউলা আমার প্রাণ রক্ষা কর।
লখাই বলে ওগো বেউলা শাহের কুমারী
কাল রাত্রে না খেলাম তোমার বাপের বাড়ি।
আমার ক্ষুধায় প্রাণ যায় লোহার বাসরে
দেহ রেঁধে শীঘ্র করে।

এইবার নাটকের চরম মুহূর্ত। নব দম্পতি নতুন সুখের চিন্তায় ঘুমে বিভোর। এমন সময় ক্ষুধা পায় কুমার লক্ষ্মীন্দরের। কিন্তু ওখানে না আছে চাল, না আছে চুলো। এমন অবস্থার বেউলা কীই বা করে ?—

নাহি লবণ নাহি তেল ভাবিল তখন
বিষাদে ভাবিয়া বেউলা জুড়িল ক্রন্দন।
ভাবিতে চিন্তিতে বেউলা গো
ওগো বেউলা গো হল বড় জ্বালা
তখন মঙ্গল ঘটে ছিল কিছু চাল
তখন মাজ কাটাই ছিঁড়ে বেউলা গো
ওগো বেউলা গো কাটিল ত্রিহারী
অবলারে স্মরিয়া মনসার পদে নামাইয়া দিল হাঁড়ী।
উঠিয়া রন্ধন করে বেউলা সুন্দরী
রন্ধন করে বেউলা রমা গো,
উনানেতে লয়ে জ্বাল ঘৃতেতে ভাজিয়া লইল সওয়া পরিমাণ।
জল হাতে নিয়ে লখাইর চক্ষে দিয়া বলে গো
বেউলা বলে উঠ প্রাণেশ্বর—
আমি সুধা অন্ন রেঁধে থুইলাম হইল কড়্ কড়্।
অন্ন দেখিয়া লখাই গো, মনে মনে ভাবে,
তখন ভোজন করিল যেন মাস উপবাসী।
ভোজন করিয়া লখাই করে আচায়ন
কর্পূরে তাম্বুলে করে মুখ শোধন।

লখাই বলে ওগো বেউলা আমায় পাখার বাতাস কর
শোন গো নাড়িলে পাখা বেউলা আসিয়াছে
পায়ে ধরিয়া বেউলা লখাইকে বুঝায়
ও মনেতে প্রবোধ পেয়ে লখাই সুখে নিদ্রা যায়।

লক্ষ্মীন্দর ভোজন শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছে। বেউলা বসে তার পা টিপে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে তারও ঝিমুনি এসে যাচ্ছে। ঘরের বাইরে চাঁদ সদাগর নিজে হেতালের লাঠি নিয়ে বাসর ঘরের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। তাছাড়া ময়ূর, নেউল যে কত আছে এবং ঘরের অন্ততঃ পক্ষে আধ মাইলের মধ্যে সিপাহী, শাস্ত্রীরা সব মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। সাপ আটকাবার ব্যবস্থার কোনোই ত্রুটি নেই।

এদিকে মেঘলোকে পাষাণের ঘরে, পাথরের সিংহাসনে বসে আছেন দেবী মনসা। চাঁদের এইসব আয়োজন দেখে তিনি ক্রমান্বয়েই কুপিত হয়ে উঠ্‌ছেন। এই সময় সেখানে এসে হাজির হয় তাঁর সহচরী নেতা-ধোপানী। সে এসেই স্মরণ করিয়ে দিল—আজই হলো 'কাল-রাত্রি'—এই রাত্রের মধ্যে যদি লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ সংহার না করা যায় তা হলে আর তা করা যাবে না কোনো দিনই :

প্রবোধ পেযে লক্ষ্মীন্দর সুখে নিদ্রা যায়
নেতের সঙ্গে যুক্তি করে শ্রীমনসায়।
নেতা বলে পদ্মাবতী এইত সু-সময়
বাসী বিয়ের রাত্রে হবে লখাই নিধন।
এ কথা শুনিযা জুড়িল সকল
ঊনকোটি নাগকে গুয়া পান দিয়া পদ্মা
ঘন ঘন ডাকে।
চাঁদের সাথে বিবাদ আমার বাধিল দেবী নামে।
আমি ছয় পুত্র মারিলাম বেটার কিছু নাহি চিৎ
কোন মতে না পারিলাম চাঁদকে পরাজিতে
লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করে তোমরা কর হে নির্মূল
তবে সে তোমরা আমার প্রাণ সমতুল।
অসময়ে কালিয়া নাগ তোমার করিবে উদ্ধার
তোমার ধামা ধোরা চলে যায় কালীকে আনিবার।

এইবার নাটকের চরম মুহূর্ত। মনসার আজ্ঞায় কালিয়া নাগ এসে লোহার বাসর ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করল :

বাসর ঘরের কথা পদ্মা তখন কহিল সকল
অমনি তুনিতে জুড়িয়া দিল বিষ অন্টপণ।
ছয় থলি বিষ রেখো নিজ লহরে
দুই থলি বিষ ঢেলো লক্ষ্মীন্দরে।
বিষ খেয়ে কালনাগিণী বিষের তেজে ঢোলে
শতে শতে যেন তার মুখে আগুন জবলে।
লেজ বাড়িয়া পাক্ দিল কালীনাগ
কন্ঠগস্ত বিষ হল এক আই।
দক্ষিণ ধারেতে গিয়া তখন মোমের গন্ধ পায়
সুতা প্রমাণ হয়ে কালীনাগ ঘরে প্রবেশ যায়।
চিন্তা করে কালীনাগ লখাইর দিকে চাইয়্যা
ক্যামন করে দংশিব আমি এ শিশুপ্রাণ।
ক্রোধ করি কালীনাগ উঠিল জবলিয়া
অমনি রাখিলেক কালীনাগ চিন্তা প্রচারিয়া।
আর বার কালীনাগ লখাইর দিকে ফিরে চায়
আর বার কালীনাগ লখাইর যৌবন ফিরে চায়॥
এরপর লক্ষ্মীন্দরের পাও লাগল নাগের মাথায়,
আর কালী বলে লখাই তুমি দুঃখ দিও কেনে
আমি এ দোষ ক্ষমিলাম মন্ত্র পুরে লোচনে।
আর বার কালীনাগ শিথান দিকে যায়,
লক্ষ্মীন্দরের হাত লাগল নাগের মাথায়।
এই না দোষ পেয়ে লখাই তোমাকে জানাই
আমার কোন দোষ নাই।
ধর্ম তুমি সাক্ষী থাক যত দেবগণ,
চন্দ্রাদেবী সাক্ষী থাকে অনলের কারণ।
অনল অর্পিল সাপ যত যাহা ছিল
শয্যা থেকে যেতে যেতে বলে 'সাক্ষী থেকো পদ্মা'
সু-বুদ্ধি ঘটে নাগের মাথায়।

(তখন) চৈতন্য পাইয়্যা লখাই বেউলাকে সুধায়,—
ওঠো ওঠো প্রাণ বেউলা সুন্দরী,
এখন আমি কাল বিষে এলাই ওগো জ্বালায় মরি।
কোথায় রইল মাতা পিতা কোথায় প্রহরী,
ওগো এখন কী বলিব মায়ের কাছে পোহাইলে রজনী।
সাধেতে করলাম বিয়া বিষম ঝকমারি
ওগো আমায় জন্মের মত বিদায় দাও শেষ করিল বিষহরী।
এক দিবসের লাগি হলেম তোমার বধের ভাগী
ওগো আমায় দুঃখের জ্বালা দিওনাকো
ওগো শাহের দুলারী।
না জানি কামড়াল কোন্ সাপে গো
উঠ প্রিয়া শশীমুখী, জীবন্তে তোমারে দেখা
শোন গো আর না হইবে দরশন গো।
উঠ প্রিয়া মোর কাছে, যাবৎ চৈতন্য আছে
বেউলাগো—থাকে যেন কাল সদাগরও।
আমার কনিষ্ঠ আঙ্গুলে ঘা, নড়িতে না পারি গো
কাল-নিদ্রা যাও কী কারণ।
(তখন) ঠেলে ফেলে লক্ষ্মীন্দর উত্তর শিয়র
বেউলা তখন পাইল চৈতন্য।

সব শেষ। লক্ষ্মীন্দর আর ইহলোকে নেই। বেউলা হয়ত বা একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। চলিত প্রবাদ অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রীর চোখে হয়ত এই রকমই গাঢ় ঘুম আসে। কালিয়া নাগ যে কখন এসে লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করে চলে গেছে তা সে টেরও পায়নি, লক্ষ্মীন্দরের ধাক্কায় যখন সে জেগে উঠল তখন দেখে আর বাকি কিছুই নেই। লক্ষ্মীন্দরের সোনার বর্ণ গেছে কালো হয়ে। পদ্মের মতো নরম গা আস্তে আস্তে হয়ে উঠছে কাঠ। এইবার তাই শুরু হয় বেউলার বিলাপ:

ওগো জীবন থাকতে কেন ডাক দিলে না ওগো প্রাণনাথ
ওগো হায়রে আমার প্রভু মইল কেন ডাক দিলে না।
জাগো, জাগো, জাগো তোমরা ওগো কেন নিদ্রা যাও
বিষেতে ঢলিয়া পড়িল গো তোমরা কেন জাগো না।

বিষেতে ঢলিয়া মরিল চম্পকের রাজা কেন দেখা দিলে না
বেউলা বলে শ্বশুর শাশুড়ী তোমরা সবাই জাগো।
বেউলা বলে চন্দ্রসূর্য তোমরা জাগো।
বেউলা বলে দিবা রাত্র তোমরা জাগো
বেউলা বলে অভাগিনী, প্রভুরে কামড়াল কোন্ সাপে?
হায় রে বলিয়া বেউলার বাড়ে কান্নার ধ্বনি,
ঘর হতে শোনে সেনকা শাউকালী।

সেনকা বলে ওরে প্রভু শোন বিপরীত
লোহার ঘরে ক্রন্দন কেন শোন আচম্বিত।

মায়ের প্রাণেতে এল কালদূত
বুকে ঘা দিয়া সেনকা বলে ভগবান,
লাথি মারিয়া কপাট ফেলাল দূরে
সোনা কান্দিতে কান্দিতে গেল লোহার বাসরে।

ছেলে সুখের পড়ল লখাই পইড়্যাছে বধিয়া
কান্দিতে লাগিল সোনা পুত্র কোলে নিয়া।

ওমা বলে কে ডাকে মোরে—
তুমি একবার কোলে এসো আমার লখাইরে।
পূর্বে মোর ছয় পুত্র মৈল, সোনার রত্ন ছিলি,
পূর্বে ছয় পুত্র মৈল রূপেতে পরশমণি।
ছয় বধূ জুড়িয়া কান্দে থাকিতে না পারি
তুমি একবার কোলে এসো পাণ (প্রাণ) লখাইরে।
আমি কার বা করলাম চুরি সোনার পুতুলী,
ওগো পুত্রচোরা বলে আমায় কেবা দিল গালি,
তুই এসো আমার লখাইরে।
খেলাইতে গেছে সে পাচনী হাতে লইয়্যা
তুমি বিজয় করিতে গেছ ঘোড়ায় চড়িয়া।
ভোজন করিতে গেছ ভান্ডারের ঘরে
তুমি বিবাহ করিতে গেছ উজানী নগরে।
লখাইর হাতের বাঁশী কার হাতে দিব
ওগো চন্দন কাজল দিয়ে কার মুখে চাব।

কান্দিতে কান্দিতে হল দুই প্রহর বেলা
চাঁদ বলে কেন কাঁদ অভাগী সেনকা।
কাল আমি শায়ের বাড়ি খবর দিয়াছি,
সুখে অন্ন খেতে আমায় দিবে না বিধাতা।

যা হবার তা হয়েছে। সবাই ব্যস্ত লখাইর সৎকারের জন্য। বেউলা বেঁকে বসল। বলল, আমি যদি সতী নারী হই তা হলে সাবিত্রীর মতো আমিও আমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনব। তোমরা ভেলা বানিয়ে দাও আমি তাতে করে আমার মরা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেসে চলব।

বেউলার কথায় নাগেশ্বর মালী কলা গাছ কেটে ভেলা তৈরি করে দিল:

ষোল গাছি কলার বাছিয়া লইল খোল
তার দুই পার্শ্বে লাগাইল বাঁশের খিল।
চার পাশ ছাউনী উপরে বাঁধে ম্যারাপ
শুধু পুষ্প দিল নাই দিল খড
সহস্র প্রদীপ দিয়ে তুলিল ভেলাতে
খাট এক অতি অনুপম, ভেলা ভাসে নদীতে।
ছয় পুত্রবধু এসে দিল দরশন
পিছন হতে কেহ কেহ করে নিবারণ।
কেহ ধরে বেউলার হাত, কেহ ধরে পাও
এ বয়সে পরবাসে যাইবা একেলা,
বেউলা তখন ডেকে কয়—দিদি,
আমায় তোমরা বারণ কোর না।
আমি এই প্রভুর সনে চলিব এখনে
মনে করেছি বাসনা।

এইবার বেউলার যাত্রা হলো শুরু—অনির্দেশের পথে। দিন যায় রাত যায় মাসের পর মাস। পথের কষ্ট বড়ই করুণ। বেউলার পিত্রালয়ে খবর পৌঁছাতেই ভাইরা এগিয়ে আসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। বেউলা তাদের বুঝিয়ে বিদায় করে। এরপর আসে ধোনা মোনা, সারিদা গোদা—চোর ডাকাত—জীবজন্তু অনেক কিছু। কিন্তু বেউলা তাদেরও জয় করে চলতে থাকে নেত্রাবতীর বাঁক (মতান্তরে নেতা-ধোপানীর ঘাট) পর্যন্ত। সেখানে পায় নেতা পর্যন্ত। সেখানে পায় নেতা ধোপানীর সাক্ষাৎ:

বেউলাকে দেখিয়া নেতের দুঃখে বুক ফাটে
দুইজনে কয় কথা সব কিছু তার।
রাত পোহালে বস্ত্র নিয়ে চলে কাচিতে
নেতা হতে বেউলার ছিল অনেক গুণ
তার জন্যে দিল খুলে চুল।
মল পাড় শাড়ির মধ্যে দিল সব পরিচয়
মরা পতি নিয়ে স্বর্গে এসেছে আজ উষা
পরীক্ষার জন্য আজ প্রস্তুত হইও মা মনসা।

শাড়ি খুলে পদ্মাবতী নিরখিয়া চায়
শাড়ির ভাজে বেউলার লেখা পত্র
দেখিবারে পায়।

পদ্মা বলে এত তুমি কেন কর মিছি
আমার শত্রুরে রাখিলা ঘরে মিতী।

পদ্মাবতী বলে মোর বোল ধর
তোর ঘর হতে এখনই বেউলাকে দূর কর।

এ-কথা শুনিয়া নেতা নিল পদধূলি
দূর হতে ডাকে নেতা বেউলা বেউলা বলি।

নেতা বলে বেউলা তুমি অন্য স্থানে চল
তোর জন্যে আজ আমি না পেলেম দেবকুলে স্থান।

বেউলা স্বর্গে গিয়ে পেঁৗছেছে। কিন্তু যত সহজে কার্য উদ্ধার **হবে ভেবেছিল** তা হলোনা। মনসা তো রেগেই কাঁই। বেউলা দুঃখ করতে থাকে **নেতার কাছে :**

মাসী আমার প্রভুর প্রাণ দিয়ে যাও গো
প্রভুর লইগ্যা ছয়মাস ধইর‍্যা গো অন্ন নাই খাই,
প্রভুর লইগ্যা ছয় মাস ধইর‍্যা গো নিদ্রা নাই যাই।
তোমার ধোপা হয়ে গো—কাপড় কাচিলাম গো
তোমার দাসী হয়ে গো—বাট্‌না বাট্‌লাম,
প্রতিজ্ঞা প্রভুর জন্য করিয়া করেছি সবখানি
আমার প্রভুর প্রাণ দিলে খাব অন্নপানি।

বেউলার জন্য নেতার সহানুভূতির অন্ত নেই, কিন্তু তার পক্ষে করবারও কিছু নেই। শেষে এক মতলব ঠিক করল; মহাদেব হলেন মনসারও গুরু, কাজেই যদি একবার তাঁকে ধরা যায় তাহলে হয়তো কার্যসিদ্ধি হতে পারে। তাই বেউলাকে উপদেশ দিল, 'মহাদেব নৃত্যগীতের বড়ই সমঝদার, কাজেই তাঁকে যদি নাচে গানে তুষ্ট করতে পার তবেই তোমার কার্যসিদ্ধি হবে।' বেউলা তাতেই রাজী হয়ে স্বর্গের সভাগৃহে প্রবেশ করে :

নৃত্য করে বেউলা রমা ঘন নাড়ে হাত
নৃত্যেতে মোহিত হৈল ত্রৈলক্ষ্যের নাথ।
কোন্ গাইনে গান করে তারে ডাক দিয়া আন
বহিঃদ্বারে করে গান শুনিতে না পারি আমি তান।
লক্ষ কোটি স্বর্গনর্তকী বস্তুত না লাগে ভালো শিবের
বৈকালী দেখিতে নৃত্য এখন শিবের এমনিতর তানে।
বেউলার মন হয় আনন্দিত
নৃত্যেতে মোহিত হলো মহাদেব।
শিব বলে নর্তকী নৃত্য বন্ধ কর
মানা শুন যা চাবি তাই দিব বর।
বেউলা বলে ঠাকুর, অমন আলগা বরের কাজ নাই।
একবারে চাই, দিবে কিনা বল সত্য করে।
মহাদেব বলে এবে করিলাম সত্য।
আঁচল পাতিয়া বেউলা মাগে স্বামী বর
মহাদেব তথাস্তু তথাস্তু বলে দিলেন স্বামী বর।
আমি বুঝিতে না পারি কাশীনাথ তোমার লীলাখেলা
হরিয়েছেন মহাকাল লখাইরে, বুঝি সর্বনাশ
এই বুঝি প্রাণের কুমারী ঊষা হে।

এইবার বেউলার নিজের পরিচয় দিয়ে স্বামীর প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবার পালা :

বেউলা বলে ঠাকুর শাপের ফলে
জন্মিয়াছি ক্ষিতিতলে,
মনসা করেছে আমার হেন দশা হে।

শিব বলে শোন ওহে নন্দী মহিয়া
চট্ করে মনসারে আমার পুরে আন।
হেথা হতে নন্দী তখন করিল গমন
পদ্মার নিকটে গিয়া দিল দরশন।
নন্দীকে দেখিয়া পদ্মার চমকিত মন
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসন।
নন্দী বলে পদ্মা আমার বসবার কাজ নাই
তোমাকে নিতে মোরে পাঠালেন গোসাঁই।
তথা হতে নন্দী তখন করিল গমন
শিবপুরে গিয়ে দুজন দিল দরশন।

এইবার উপসংহার। মনসা কর্তৃক লক্ষ্মীন্দরের প্রাণদান ও বেউলার শ্বশুর গৃহে প্রত্যাবর্তন :

শিবের আজ্ঞায় পদ্মাবতী তখন জীয়াইতে বসে
লখাই জীয়াইতে পদ্মার কত মন্ত্র লাগে।
(লখাই, জীয়াও জীয়াও রে)
একে একে থুইল হাড় বস্ত্র প্রমাণ করি
শিব শিব বলি পদ্মা মন্ত্র দিল পড়ি।
(লখাই, জীয়াও জীয়াও রে)
পদ্মার মন্ত্রের জোরে হাড়ে লাগে মাস
ব্রহ্মা, বিষ্ণু দেবতায় দিল কটি বাস।
(লখাই, জীয়াও জীয়াও রে)
ওঠ ওঠ লখাই এবার কেন নিদ্রা যাও
তোমার শরীরে আর কালবিষ নাই
আর যদি শোন কথা শিবের দোহাই
ভূমেতে উঠিয়া দাঁড়াও সুন্দর লখাই।
(লখাই, জীয়াও জীয়াও রে)
বুকে হস্ত দিয়া পদ্মা মহামন্ত্র জপে
পিঠে চাপড় দিয়া পদ্মা হস্ত ধরি তোলে।
(লখাই জীয়াইলো রে)।

লক্ষ্মীন্দরের প্রাণলাভের সাথে সাথেই রয়াণী পালা গান সাঙ্গ হয়। কিন্তু

এখনও তার গৃহে প্রত্যাবর্তন বাকি আছে। রয়াণীকার অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করে:

মনসা দেবীর দয়ায় লক্ষ্মীন্দর পায় প্রাণ
দেবগণে প্রণমিয়া বেউলা ঘরে যান।
ছয় মাস পরে যখন লখাইর শ্রাদ্ধ উপস্থিত
হেন কালে লখাই সহ বেউলা আসে আচম্বিত।
মরাপুত্র ফিরে আসে শুনেছ কি কোথাও
ছুটে আসে রাজা রাণী, আসে লোকজন।
বেউলা বলে ঠাকুর তুমি মোর বাক্য ধর
মর্ত্যলোকে তুমি দেবী মনসার পূজা কর।
এত শুনি চাঁদ বেনে বলে আক্ষেপে,
যে হস্তে পূজিয়াছি শিব শূলপাণি
ক্যামনে পূজিব আমি চাঙমুই কানী?
আকাশ হইতে দৈববাণী তখন বুঝি হয়
বাম হস্তে কর পূজা সন্তুষ্ট নিশ্চয়।
এত শুনি বাম হস্তে চাঁদ দিল পুষ্পাঞ্জলি—
আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি আইল সকলি।
চাঁদের চৌদ্দ ডিঙা মধুকর আর মাঝিমাল্লা যত
আসিল নিমেষে তারা ভোজবাজীর মত।
একে একে আসিলেক আরও পুত্র ছয় জন
আনন্দের ফোয়ারা তখন ছোটে ত্রিভুবন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[কবি, তরজা ঢপ]

কবিগান

কবিগান বাংলার নিজস্ব সম্পদ—দেশের অগণিত নরনারীর শিক্ষার ও জ্ঞান প্রসারের যন্ত্র। সাধারণতঃ কবি গায়করা সাধারণ ঘরেরই লোক। কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরদত্ত কবিত্ব শক্তির অধিকারী।* কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সর্ব স্তরের মানুষই কবি গানের প্রতি আগ্রহশীল। একদিন এই পশ্চিমবাংলার বুকেই জন্মেছিলেন হরু ঠাকুর (হরেকৃষ্ণ, দীর্ঘাংগী), রাম বসু, ভোলা ময়রা, গোপাল উড়ে, এন্টনী ফিরিংগী ইত্যাদি বিখ্যাত কবিয়াল। শুধুমাত্র এন্টনী ফিরিঙ্গীর কবিয়াল হওয়ার কথা চিন্তা করলেই বোঝা যাবে কিভাবে সেই ব্রিটিশ যুগের প্রারম্ভে কার্যব্যপদেশে এক পর্তুগীজ তনয় এদেশে এসে এদেশের মাটির সংগে একাত্ম হয়ে গেলেন। অবাক হতে হয় কিভাবে এইসব অল্পশিক্ষিত লোক সভায় দাঁড়িয়ে বিনা প্রস্তুতিতে মুখে মুখে ছন্দের ও সুরের মিল রেখে কবিতা আউড়ে যান। শুধু কি কবিতাই? এর ভিতর একাধারে যেমন মেলে ধর্মের উপাখ্যান, দর্শনের দুরূহ ও গূঢ়তত্ত্ব, উপস্থিত ও সাময়িক কথা, অপর দিকে তেমনি পরিচয় মেলে এইসব পল্লীকবিদের সহজাত কবিত্ব শক্তির। বিদেশী এন্টনী সেই থেকেই ভিড়ে গেলেন কবির দলে। বিয়ে করলেন এক ভারতীয়া নারী। চিরদিনের মতো রয়ে গেলেন ভারতের মাটিতে।

এই কবির দলে সাধারণত একজন থাকেন মূল গায়েন, চলতি কথায় বলো কবিয়াল। পূর্ববংগের কোনো কোনো অঞ্চলে একে বলে 'সরকার'। তাছাড় দলে থাকে তাঁর দোহার ও বাদকবৃন্দ। বাজনা বলতে ঢোল ও কাঁসিই প্রধান। আবহ সংগীত সৃষ্টির জন্য বেহালার চলন আছে অনেক দিন থেকেই, আজকালকার কবির দলে অবশ্য ক্লারিওনেট ও ফ্লুট বাঁশীও দেখা যায়। কিন্তু

---

* পূর্ববংগের কবিগান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্য এই গ্রন্থাকারের "পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এগুলি গৌণ। কবির দলের আদত সংগীত যন্ত্র বলতে ঢোল এবং কাঁসি। এককালে কবির দলে সাধারণত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনীর উপরেই ভিত্তি করে গীতি রচিত হতো। আসরে সাধারণত একজন কবিতার মাধ্যমেই প্রশ্ন করেন, অপরজনকে সে বিষয়ে উত্তর দিতে হয়। এইসব কবির গানকে বলে একক কবি। এতে ঠিক কবিগান বলতে যে জিনিসটি পাঠকের মনে উদয় হয় সে জিনিসটি পাওয়া যায় না। কারণ কবিগান শোনার প্রধান আগ্রহই হলো কবিদের কবিত্ব শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করা। কাজেই একই কবির কবিতা শুনে কবিত্ব শক্তির যাচাই করা চলে না। তাই কবির আসরে সাধারণত অন্ততপক্ষে দুই, সময় বুঝে তিন বা চার দলেরও বায়না হয়ে থাকে। তখনই সত্যিকারের কবির আসর বসে। এবং এই জায়গায়ই সত্যিকারের কবিদের কবিত্ব শক্তির পরীক্ষা হয়।

তৎকালীন প্রাচীন কবিয়ালদের কথা ছেড়ে দিলেও আজও পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে কিছু কিছু কবিয়ালের সন্ধান পাওয়া যায়। তম্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের সেখ গুমানী দেওয়ান ও বীরভূমের লম্বোদর চক্রবর্তী এবং পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের রামুমালী, হরিচরণ আচার্য, কুঞ্জ দত্ত, শরৎ বৈরাগী, চট্টগ্রামের রমেশ শীল, বরিশালের নকুলেশ্বর সরকার এবং ফরিদপুরের নারায়ণ বালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবিগানের কোনো নির্দিষ্ট পালাগান নেই। আসর বুঝে একপক্ষের কবিয়াল যে কোনো বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতে পারেন। ধর্ম, দর্শন, পুরাণ, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনৈতিক কি সামাজিক যে কোনো বিষয়েরই হোক না কেন, অপরপক্ষকে ঠিক তার উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। নইলে পরাজয় বরণ করতে হয়। প্রশ্ন কর্তাকেই শেষটায় তার উত্তর দিতে হয়। এইসব কবিগানের আসরে অনেক সময় প্রতিযোগিতা হয় ও বিজয়ীকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এক কথায় কবিগানের বিষয়বস্তু সমুদ্রের জলের মতোই অনন্ত প্রসারী। দুই দলে পাল্লা বাধলে অনেক সময় তা দু তিন দিন ধরেও চলতে থাকে। কোনো কোনো সময় সভাস্থ লোকেরা শেষটায় 'যোটক' (দুই দলের মিলন করিয়ে দেওয়াকে বলে) করিয়ে সভা ভঙ্গ ঘোষণা করেন।

কবিগানের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো একপক্ষ যাকে খারাপ বলে বর্ণনা করেন অপরপক্ষ তাকেই ভাল বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। এরই ফলে জমে উঠে কবির আসর, প্রকাশ হয়ে পড়ে যাঁর যাঁর কবিত্ব শক্তির।

কবির আসর বসেছে। প্রথমে শুরু হলো সভা বন্দনা বা আসর বন্দনা। একপক্ষ উঠেই বলতে শুরু করেন :

শুন সভাজন করি নিবেদন
কেমনে করিব আমি সে রূপ বর্ণন।
যাঁহার প্রসাদে প্রসাদী হে গুণবান,
আমি ভক্তিমাল্য করে, শ্রীপাদ পংকজে
তাই হই আগুয়ান।
তোমা সবাকারে প্রণাম জানাই
দোষত্রুটি মোর ক্ষমিও সদাই,
আমি জ্ঞানহীন, অজ্ঞান অক্ষম
সে রূপ বর্ণিতে নহি সম্পূর্ণ সক্ষম
যে দেশের ঘরে জন্ম লভিল
জয়দেব মহাকবি,
তাহাদেরই সুরে বীনাটি সাধিল
নতুন দিনের রবি।
সেই আসরে আমি অতি দীন
সাগর মাঝারে যেমতি মীন।

সভা বন্দনার পর আসর বন্দনা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই সঙ্গে এ দুটি বস্তু সংঘটিত হয়ে থাকে। কোথাও বা অপর পক্ষের কবিয়ালও সভা বন্দনার পদটুকু বাদ দিয়ে আসর বন্দনার সুযোগ নিয়ে বলতে থাকেন :

প্রেম-মন্দিরে
আছে সর্ব বিশ্ব বন্দীরে।
ঘরের কপাট খুলে
ঘরকে গেলে
জীবের পুরে অভিসন্ধিরে।
তোমার যাহা প্রয়োজন
আছে সকল আয়োজন
অবারিত দ্বারে বাধা দেয়না কোনজন।
যত যত ইচ্ছা তার নাইরে ওজন
সেথা বদ্ধ ও মুক্তি সন্ধিরে প্রেম-মন্দিরে।

এই আসর বন্দনাটি মুর্শিদাবাদের কবিয়াল সেখ গুমানী দেওয়ানের রচিত। কবিয়ালরা যে কত অসাম্প্রদায়িক এই গানটি অনুধাবন করলেই যথেষ্ট হবে। আর একবার কোনো এক কবির আসরে জনৈক কবিয়াল তাঁর আসর বন্দনার শেষেই বলে বসলেন—আমরা দেশ হতে দেশে উড়ে বেড়াব নতুনের সন্ধানে, প্রয়োজন বোধে জার্মানিতেও যাব। সেখ গুমানী দেওয়ান এর প্রত্যুত্তরে বললেন, কেন? আমাদের দেশ কি কোনো দেশ অপেক্ষা ছোট নাকি:

বাংলা আমার নয়রে কাঙাল ধনজনে পূর্ণ রয়।
পরের পানে থাকবে চেয়ে সোনার বাংলা সে দেশ নয়॥
বঙ্গ মা তুই বিশ্ব রাণীর আদরের মা দুলালী।
আপন রূপের উজল ছটায় বিশ্বটাকে ভুলালী॥
তোমার বুকের ক্ষীর-পিপাসা জাগছে সবার অন্তরে।
তাই মহাপ্রাণ লক্ষ মানব মরছে রণ-প্রান্তরে।
ভালে তোমার হাজার মানিক বিশ্বপতির বিরাট দান।
বিশ্বখানাই তোমার দেহ সকল দেহের তুমি প্রাণ।
আত্মহারা লাখবাগে তোর আপন মনে ফুট্‌ছে ফুল
দিগন্তেরই বাঁধন টুটে আসছে ছুটে ভ্রমরকুল।
ছুট্‌ছে কোথাও স্রোতস্বিনী আপন বুকের ক্ষীর দানে,
ভাঙছে মাথা জীবন দিতে বঙ্গমা, তোর সন্তানে।
দেবতা দলের রঙ্গ ভূমি শান্তি দানে স্নিগ্ধ নীর
অতুল শোভা দেখবে বলে শৈলরাশি ঊর্ধ্ব শির।
হেম বরণীর শ্যামল প্রভা ছুট্‌ছে স্বরগ বন্দরে
বঙ্গ মা, তুই কি রেখেছিস সবুজ পাতার অন্দরে।
(তোর) এই কুটিরে লিখে গেছে বাল্মিকী আর পরাশর,
ভীষ্ম দ্রোণ আর দাতা কর্ণ কৃষ্ণ পার্থ ধনুর্ধর।
শ্রীরাম সীতা চরণ রেখা রেখে গেছে এই দেশে,
আদিত্যের শ্রেষ্ঠ রাজা নবরতন যার বামে,
তোর কোলেতেই জন্মে ছিল মহাকবি কালিদাস,
চন্ডীদাস আর বিদ্যাপতি গৌর নিতাই শ্রীনিবাস।
স্বর্ণ রাশির উচ্চ চূড়ে অতুল শোভে শাহান শা।
স্বপ্নরাজ্য বঙ্গ-কুমার গৌড় রাজা হুসেন শা,
(আজ) ইব্রাহিমের নাম ডোবালো তোমার হাজি মহসীন

কাইকোবাদ আর মীর মোশারফ তোর কোলেতেই সমাসীন।
মল্লরণে তোমার গামায় বিশ্ব দিল ইস্তাফা
তোমার বুকের রাঙ্গা কবি গোলাম নবী মোস্তাফা।
তোমার আমার পরাণ বাগে বাঁধন হারা সে বুলবুল
আকাশ বাতাস দুলিয়ে তোলে বীর কবি কাজী নজরুল।
বঙ্গমা, তোর বিশ্বমাঝে দৃশ্য অতি চমৎকার,
বিশ্বকবি রবিন ঠাকুর তোর কোলেতেই জন্ম তার।
ভয় কি রে ভাই বঙ্গবাসী থাকতে তোদের এত বল
দ্বার খুলে চল আগল ভেঙে মোছরে মায়ের নয়ন জল।
বাংলা মায়ের লৌহদ্বারে হানছে আঘাত জাপানে,
চলরে তরুণ উড়িয়ে দেব তরুণ উষায় চাপানে।
ক্ষেপলে তোরা বজ্রদাপে কে রুখবে তোদের বল রে বল।
মাখলে মাটি ধরলে লাঠি উঠ্‌বে কেঁপে ধরাতল।
ঝড় তুফানে হালটি ছেড়ে কান্নাকাটি করব না
পল্লীজীবন শক্ত কর ভাই কারো হাতে মরব না।
আসিলে জাপানে জার্মান রুষে অমনি পড়িবে ঝাঁপিয়া।
হিমাচল গিরি পলকে ওড়াবো বিশ্ব উঠিবে কাঁপিয়া।
ছুটির আকার চন্দ্রমার করি বজ্রপাণির দুর্গে,
টুটি ধরে তার ফেলিব ভূতলে আমরা বসিব স্বর্গে।
বাসুকী বাজাবে জয়ের ডংকা ধূমকেতু হবে অনুচর,
গড়িব নূতন সৃষ্টি শান্তিপূর্ণ করিব চরাচর।
একটি ভাইয়ের পদাঘাতে আজ পরাজয় মানে বিশ্ব,
সব ভাই মিলে উড়াবো নিশান ভীষণ হইবে দৃশ্য।
বিশ্বের রাজা প্রকৃতির দানে নহি মোরা কভু কাঙালী
জগত মাঝে দেখাইতে চাই আমরা বিজয়ী বাঙালী॥

উপরের গীতটি লক্ষ্য করলে স্বল্প শিক্ষিত লোক-কবির কবিত্ব শক্তির পরিমাপ করা হয়তো পাঠকের পক্ষে সম্ভব হবে। কিন্তু কবিগানের জমাট আসর সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই আমরা এইবার একটি কবিগানের আসরের একটা মোটামুটি চিত্র আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি কবিগানের নির্দিষ্ট কোনো পালাগান নেই।

আসর বন্দনা কিংবা পালটা গানের মুখে আসর বুঝে প্রথম পক্ষ যে কোনো বিষয়ের উপর প্রশ্ন তুলতে পারেন। এই রকম এক কবির আসরে প্রথম পক্ষের কবিয়ালের নাম শক্তিধর দাস, দ্বিতীয় পক্ষের কবিয়ালের নাম মৃত্যুঞ্জয় বাগ। প্রথম কবিয়াল উঠে যথারীতি সভা বন্দনা, আসর বন্দনা শেষ করে চাপান দিলেন :

পুরাকালে বেদ বেদান্তে জানি দেবতা ছিল ভোলা মহেশ্বর,
ত্রিকালজ্ঞ দেবতা তিনি কালকূট পান করে হলেন মৃত্যুঞ্জয়।
ত্রিকাল যদি জান বাপু বলত সত্বর
নর কিংবা নারী কেবা শ্রেষ্ঠতর।
নর সৃষ্টির আদি জানিহ নিশ্চয়
নারী হয়ে প্রমাণ তুমি দিও বাবু মহাশয়।

কবিয়াল শক্তিধর এই পর্যন্ত বলে থামলেন। বেজে উঠল ঢোল এবং কাঁসি। উপরের চাপানে দেখতে পাচ্ছি কবিয়াল নিজেই পুরুষের পক্ষ সমর্থন করছেন এবং তার প্রতিপক্ষ মৃত্যুঞ্জয় বাগকে নারী হয়ে এর জবাব দিতে বলছেন। আবার শ্লেষ করে বলছেন—আমি যে কথা বললাম তুমি এটাই মেনে লও অর্থাৎ আমার কাছে পরাজয় বরণ কর।

দ্বিতীয় পক্ষের কবিয়াল মতুাঞ্জয়ও কমতি নন। আসর বন্দনা সভা বন্দনার পর এইবার কাটান দিতে উঠলেন বেজে উঠল ঢোল ও কাঁসি। তিনি প্রথমটায় শক্তিধরের নাম নিয়ে বিন্যাস করে পরে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে থাকেন মূল বক্তব্যের দিকে :

শুনেন সব ভদ্র পঞ্চজনা করিব নতুন প্রস্তাবনা।
শক্তিধর নাম ধরেছেন কী কী শক্তি ধরেন তিনি
তার নাই কোন ঠিকানা।
জিজ্ঞাসিছ মোরে নর কিবা নারী কেবা শ্রেষ্ঠতর,
তুমি পুরুষ হয়েছ, আমায় করেছ নারী।
(বাবু গো আমায় নারী করে সাজিয়েছে)
তুমি মৃত্যুঞ্জয়, শুন বটে মহাশয়
সৃষ্টিতত্ত্ব কিছু বলিব নিশ্চয়।
অনাদি অপার, সীমা নাহি তার
ক্ষিতি, স্থিতি, মরুৎ, ব্যোম্

অনন্ত শয়নে আছেন দেব নারায়ণ,
বৃথাই কাটে দিন সঙ্গী বিহন।
হেন কালে মনোমধ্যে বাসনা জাগিল
মুহূর্ত মধ্যে এক কায়া সৃজিল।
নিজের অংশোদ্ভূত নাম নারায়ণী
এক আত্মা দুই দেহ শুনগো আপনি।
নরনারী একই আত্মা বিদিত সংসারে,
সৃষ্টি রক্ষা তরে তারা ভিন্নরূপ ধরে।

পাঠকগণ হয়তো লক্ষ্য করেছেন, শক্তিধর কৌশলে কেবলমাত্র একটি কথায় তাঁর বক্তব্য শেষ করতে চান, প্রকারান্তরে মূল প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চান। তাই দেখে শক্তিধর আবার চাপান দেন :

তুমি মৃত্যুঞ্জয় জানি হে আমরা
তোমার মরণও নাই বুদ্ধিও নাই ঘটে
(তাই) প্রশ্নের জবাব দূরে রেখে কবি গাইছ বটে।
বামা জাতি স্বভাবতঃ বামাবুদ্ধি ধরে
এই সব কথা লিখে গেছে বেদে আর পুরাণে।
সত্যি যদি কবিয়াল হও
আমার কথার জবাব দাও
নর কিবা নারী কেবা শ্রেষ্ঠ হয়।

মৃত্যুঞ্জয় দেখলেন তাঁর চালাকি আর চলছে না, তখন তিনি স্বাভাবিক কবিয়ালদের মতোই উত্তর দিলেন :

নমঃ মাগো কাত্যায়নী, তুমি কৈলাসে ভবানী
অধমেরে কৃপা কর কণ্ঠে দিও মা বাণী।
যার দয়াতে জনম হল, দেখলাম বিশ্বময়
সেই সে আমার মা জননী কথা মিথ্যা নয়।
মায়ের সমান কেবা আছে এ তিন ভুবনে
শক্তিধরের শক্তি এবার দেখবো দু নয়নে।
সহজ কথায় জবাব পায় না, ভাল জলে যার মন ভরে না
তারা নগর থেকে জঙ্গলে কেন রয়না
(এই কথাটাই বুঝি না)।।

নারী জাতি মাতৃ জাতি, সবার উপর স্থান
পুরুষ তো ছায়া মাত্র কর প্রণিধান।
নারীর তেজে ধ্বংস হল, অসুর দানব
নারী সীতার শাপে মোল লঙ্কার রাবণ।
পুরুষতো কামুক জাতি স্বার্থপর হীন
নারীর সমান গুণ পাবে কি কখন।

এইবার শক্তিধরের জবাব দেবার পালা। তিনি এখনও চটে ওঠেননি, কারণ চট্‌বার এখনও ঠিক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। আসরও ঠিক জমছে না, তবু আইন মাফিক তাঁকে উত্তর দিতে হয়। তবে, একটু মিশ্র রসে :

বন্ধু তুমি মৃত্যুঞ্জয় শুন এবে মহাশয়
তোমার নারীর গুণের কথা করিব বর্ণনা।
অহল্যা সতীর কথা বিদিত ভুবনে
স্বামী ছেড়ে প্রেম করে অতি সঙ্গোপনে।
কুমারী সতী নারী কুন্তীর কথা ধর
কর্ণের জন্মের কথা একবার মনে কর।
দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী এতে যদি হয় সতী
অসতীর ফর্দখানা দিও তুমি আনি।
সতী নারীর গুণের কথা আরো কিছু শোনো
ঢাকার সতী নারী বিভাবতীর নাম এর মধ্যে গুণো।
তুমি বল বটে মায়ের সমান তুলনা নাহি হয়
কিন্তু বাপু পিতা না হলে একা মাতার অস্তিত্ব কি রয় ?
পুরুষ ক্ষমার প্রতীক বিদিত ভুবনে
নারী তো আশ্রিতা মাত্র জেনো গো স্মরণে।

মৃত্যুঞ্জয় রেগে গেছেন। কিন্তু কবির নিয়ম হলো যিনি রেগে যাবেন তাঁরই পরাজয় বরণ করতে হয়, কারণ তিনি তখন যুক্তি হারিয়ে ফেলেন। যুক্তি হারালে তাঁকে পরাজয় বরণ করতেই হবে। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তর দেন :

তোদের পুরুষের যাই বলিহারী
মিথ্যা কথার সওদাগরী,
ছলে বলে কল কৌশলে নিজের সাফাই গাইস।

তোরা যদি এতই পারিস,
তবে কেন পায়ে ধরিস,
সাক্ষী আছে ব্রজের সতী রাধা।
সত্যি যদি বড় হতিস
দেশের দুর্দশা নিশ্চয় ঘুচাতিস
করতিস না আর বাধা।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি চটলেই কবির পরাজয় সুনিশ্চিত। শক্তিধর বেশ ঠান্ডা মেজাজে উত্তর দিলেন :

শুন বন্ধু ভাই বলি যে তোমারে
তোমার কথার জবাব দিব এইবারে।
সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা তুমি পূর্বেই করেছ
তাহার ভিতরেই তোমার উত্তরও দিয়েছ।
নারায়ণী যদি নারায়ণের অংশোদ্ভূত হয়
নিজের পা নিজে ধরতে লজ্জা কি বা তায়।
এই তো তোমার কথার জবাব শোন বন্ধু শোন
আসরে নামার আগে নিয়ম কিছু মেনো।

তরজা

তরজা আর কবি অনেকটা এক জাতীয় হলেও ঠিক এক জিনিস যে নয়, এই কথাটি মনে করে নিয়েই আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া সমীচীন। তরজা গাওয়া হয় প্রধানতঃ বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের কাহিনী নিয়ে। কিন্তু কবি গানের তা নয়। তরজায় যেমন প্রশ্ন ও উত্তর সীমাবদ্ধ, কবির কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তর তেমনি সীমাহীন। একটি হলো কোনো গৃহস্থের পানীয় জলের দীঘি, অন্যটি মহাসমুদ্র। তরজায়ও অবশ্য কবির দলের মতো ঢোল এবং কাঁসিই প্রধান বাজনা। এখানেও কবির দলের মতো দুটি পক্ষ থাকে—একজন প্রশ্ন করে, অপরজন তার উত্তর দেয়। এই প্রশ্ন এবং উত্তর দানকেই চলতি কথায় বলে 'চাপান ও উতোরন'। তরজায় কবির দলের মতো অত লোকের দরকার হয় না। তাই বায়নাও কম; সাধারণত দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যেই তরজার একচেটিয়া সাম্রাজ্য। আজকাল অবশ্য এর অনেক সংস্কার সাধন করে শিক্ষিত সমাজের মাঝেও দুচার পালা হয়ে থাকে।

তরজার ইতিহাস যে খুব বেশি দিনের তা নয়। শ খানেক বছর আগে হাওড়ার শালকিয়া অঞ্চলের ৺মধু ঠাকুর ও তারক পাল নামক দুই ব্যক্তিই বাংলায় প্রথম তরজা গানের প্রচলন করেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন পূর্বে কোনো এক যাত্রাদলের দোহার। কাজেই বেদ পুরাণের কাহিনী সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তখন থেকেই ঠিক হলো অল্প খরচায় লোকের আনন্দ অনুষ্ঠানের জন্যই তরজা গানের ব্যবস্থা হবে। হাওড়া থেকেই তরজা গান ক্রমান্বয়ে কলিকাতা, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তরজা যে শুধু পুরুষদের গান তা নয়, বহু নারী তরজাওয়ালীরও সন্ধান পাওয়া যায়। তৎকালীন পুরুষ তরজা ওয়ালাদের মধ্যে হেম সিংহ, নবীন গোস্বামী, কালী ঘোষ, দাশু সর্দার, হাজারীলাল বিশ্বাস প্রভৃতি এবং রমা দেবী ও বিন্দুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। আধুনিক কালে অন্নদা মন্ডল, দশরথ, নন্দরাণী ও আবিরা দাসী বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

তরজায় কবির মতো অতটা সময় লাগে না। এখানে প্রথমে হলো দেবস্তুতি, তারপর সরস্বতী বন্দনা ও সংক্ষিপ্ত সভা বন্দনা। এই সভা বন্দনার সঙ্গে সঙ্গেই এক পক্ষ অপর পক্ষকে (কবির মতো এখানেও একাধিক দলের বায়না না হলে আসর জমাট হয় না) প্রশ্ন করে গীত ও কথার মাধ্যমে, অপর পক্ষকেও ঠিক এই একই ভাবে গীত ও কথার মাধ্যমে জবাব দিতে হয়। এখানেও এইসব তরজা গায়কদের কবিত্ব শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির উৎকর্ষতা অনুযায়ী পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে।

তরজার আসর ছোট। এর সবই সংক্ষিপ্ত। মনে করুন, একটি তরজার আসর বসেছে। ঢোল বাজছে, সঙ্গে তাল ধরেছে কাঁসি, ক্যান্, ক্যান্, কান, ক্রুতাক্, ক্রুতাক্, তাক্ তেরে তা। সভায় উঠে দাঁড়ালেন তরজা গায়ক অন্নদা দাস। তিনি শুরু করলেন প্রস্তাবনা গাইতে। একে অনেক সময় দেব বন্দনাও বলে :

ও আমার অবোধ মোন
মায়ের চরণ নিলে স্মরণ
    কালের ভয় আর রবে না।
অসতী সে হবে সতী
মূর্খ হবে মা সরস্বতী
বেদের ছেলে পেয়ে মতি (মা)

ছুঁড়ে ফেলে ধনুক বান
কোনো ভাবনা রবে না।
হাতীর মাথায় ভেকের লাথি
বলব কথা অতি সম্প্রতি
গাছের ডালে বসে কপোত কপোতী
তারা করছে কত গান দেখ না।
ও আমার অবোধ মোন
ভগবানের চরণ স্মরণ নে না
মায়ের চরণ নিলে স্মরণ
কালের ভয় আর রবে না ॥

এক পক্ষের দেবস্তুতি তথা সভা বন্দনা গাওয়া শেষ হতে না হতেই বেজে উঠল অপর পক্ষীয় ঢোল ও কাঁসি। ঢুলিভায়া এবং কাঁসরদাড় এই অবসরে আসরের মাঝে দেখাতে শুরু করল তাদের কসরত। বাজনা থামতে না থামতেই তরজাওয়ালা বলে উঠলেন :

আজি সবারে জানাই
তরজা শুনবেন যতেক বাবু মহাশয়।
তুমি আমার জোটের জুটি পরিপাটি
একটি কথার জবাব দিয়ে যাও
কোন্ পুরাণে লেখা আছে
জামাই এসে পুরুত সাজে
রাজার দেশে পুরুত নাই।
রাজা কি তবে একঘরে হল
বল না শুনি ভাই।
বেদ পুরাণের কথা যে ভাই
বাজে কথা কিছু বলব না,
কালের ভয় আর রবে না ॥

আবার বেজে ওঠে ঢোল ও কাঁসি। আসর জমে ওঠে। শ্রোতৃবৃন্দ এইবার বেশ আঁটসাঁট করে বসেন জবাব শুনবার আশায়। অন্নদা দাসের দলের বাজনা থামতে না থামতেই আসরে উঠে দাঁড়ান প্রতিপক্ষ তরজাওয়ালা

যোগীন কুণ্ডু মশাই। তিনিও যথারীতি সভা বন্দনা বা দেবস্তুতির পরেই বলতে থাকেন :

আছে কালীঘাটে কালী মাগো
কৈলাসে ভবানী
মায়ের ওই চরণে স্মরণ নিয়ে
ডাকলাম বীণাপাণি।
আজি তরজা গাইতে এসে মাগো
ঘট্‌ল বিষম দায়,
ওমা কোথায় আছ মা শংকরী
ঠেকলাম বিষম দায়।
আমার ওই জোটের জুটি পরিপাটি
অন্নদা বাবু মহাশয়,
(একটা প্রশ্ন করেছেন)
একটা প্রশ্ন করেছেন বলতে হবে
কোন্‌ রাজা পুরুত বিনে
জামাইকে ডেকে যজ্ঞ করায়
শোনেন সব বাবু মহাশয়।
(একটা মজার কথা)
একটা মজার কথা, রং তামাসা
বলব শুনেন সকলে,
বেদ পুরাণে লেখা আছে
সেই সব বৃত্তান্ত সমূলে।

কুণ্ডু মশাই এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে আসর জমাবার চেষ্টা করেন। তারপর বলতে থাকেন :

অযোধ্যাতে ছিল রাজা দশরথ তার নাম,
তিনটি রাণী যে ছিল রাজার পুত্র চারিজন।
(রাজার এক কন্যা ছিল)
রাজার এক কন্যা ছিল শুনেন সব বাবু মহাশয়
আমার ওই জোটের জুটি অন্নদা বাবু
তার নাম জানেন ত নিশ্চয়।

ও সেই দশরথ বুড়ো রাজার যদি কন্যা এক রয়,
সতী শান্তা নাম তার ছিল গো নিশ্চয়।
সেই না কন্যার রাজা বিবাহ যে দিল,
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তবে জামাতা যে হইল।
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ রাজা যদি করিবারে চায়
পুরোহিত নির্বাচনে রাজা কুল নাহি পায়।
ঋষিগণ বলে রাজা একটি কার্য কর,
ঋষ্যশৃঙ্গ সেরা মুনি তারে বরণ কর।
ছলে বলে নানা কলে রাজা তবে কন্যাকে আনিল
জামাতা বাবাজী তবে সঙ্গেতে আসিল।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আসে যজ্ঞ করিবারে
তাঁহার কৃপায় যজ্ঞ সমাধা হইল নির্বিঘ্নে।
এইত তোমার কথার জবাব দিয়ে দিলাম বাবু মহাশয়
রামায়ণে লেখা আছে কথা মিথ্যা নয়।
তুমি আমার বন্ধু বটে দেখে দুঃখ হয়
তোমায় ছেড়ে চলে যাব কাঁচড়াপাড়ায়।

আমরা ইতিপূর্বে নারী তরজা গায়িকাদের কথা উল্লেখ করেছি। এইবার একটি তরজাওয়ালী নন্দরাণীর সঙ্গে তরজাওয়ালা অন্নদা মন্ডলের লড়াইয়ের একটু নমুনা শুনুন।

সেদিন প্রথমেই আসর পেলেন অন্নদা মন্ডল। তিনি এসেই ধুয়া ধরলেন :

একটা গাছের ডালে পাখী ডাকে
বৌ-কথা ক'না—(২)
কাণায় যদি দৃষ্টি পায় মা, মূর্খে পড়ে কাব্যগাথা,
কুঁজোর যদি চিৎ হতে সাধ হয় মা,
এসব শুনে ধরে মাথা।
(একটা গাছের............ক'না) ॥
আজ তরজা গাইতে এসেছে মা,
অন্নদা যে তোরই দাস মা,
(ও) তুই অভয় পদে স্থান দিস্ মা
বেয়াদপি আর কোরব না।

গাছের ডালে............ক'না ॥ (২)
(ওমা) হাতী ঘোড়া তল হল সব
ভেড়ায় বলে কত জল
বামা হয়ে খুন্তী নাড়ে
তরজার কথা বলব কি বল ?
মনের মত সংগী নাই মা
মেয়ে লোকের সাথে তরজা কি মা ?
অল্প কথায় পালা সাংগ করবগো মা
(একটি) গাছের ডালে পাখী ডাকে
বৌ কথা ক'না ।
আমার সাংগাত নন্দরাণী
ছিরিকিষ্টের তিনি হন জননী
বলি মাগো নন্দ বেটা কোথায় গেল
আসন্ন সময় আর বুঝি এলো না ।
গাছের ডালে পাখী ডাকে
বউ কথা ক'না । (২)
লংকাতে রাবণের পুরী কিবা ঝক্‌মক্‌ করে গো
কপি সেনা কদলী বনে ঘোরে নিরন্তর গো ।
এইরূপে এক বৃদ্ধ কপি, বৃক্ষেতে চড়িয়া
চারদিকে চায়ে ঠিক, 'নন্দরাণী' হইয়্যা ।
কপিবর বৃক্ষের ডালে বসে বসে দেখে
দূর হতে আসে এক নারী, এই না বিরিক্ষের কাছে ।
স্ত্রীলোক দেখিয়া কপি চিন্তিত হইল
বৃক্ষমূলে আসিলে তার উপরে
ঝাঁপ দিযা পইল ।
কপি হাতে ধরি কিল দেয় আরো মারে ঘুসি,
পদাঘাতে ফেলে ভেংগে নারী পূর্ণমাসী ।
সেইনা পদাঘাতে কপির এক বিপত্তি ঘটিল,
সেই নারীর উদর হইতে এক শিশু যে জন্মিল ।
সেই না শিশু তবে যুদ্ধ করিতে চায়
ধরিতে না পারে কপি পিছলাইয়া যায় ।

বিষম ধন্দে পড়ে কপি-মতিমান,
নন্দরাণী বল দেখি কে সেই শিশু মতিমান।

আসর জমে উঠেছে। শ্রোতৃবৃন্দ বাহবা দিচ্ছেন। নন্দরাণী বেশ সাজগোজ করেই আসরে নেমেছেন। তিনিও যথারীতি বাগ্দেবী বন্দনা, সভা বন্দনা শেষ করে জবাব দিতে আরম্ভ করলেন :

মোন রে আমার চেনা সুখপাখী,
অকালে পুষিলাম আমি দিয়ে গেলি ফাঁকি
আমার চেনা সুখ পাখী।
একটা মজার বোলব হেথা শুনেন সব বাবু মহাশয়,
(ওই) কাশীতে মরলে লোকে শিব হয়ে যায়
ব্যস কাশীতে মরলে তবে কি বা হয় ?
বলুন'ত বাবু মহাশয় ?
অন্নদাবাবু আমায় একটা প্রশ্ন করেছেন,
গাছের ডালে বসে ছিল এক বানর নন্দন
সেই না বিরিক্ষির তলে এক রমণী আসিল
তাহারে দেখিয়া কপি তার উদরে লাথি যে মারিল
কপির লাথির চোটে রমণীর সন্তান জন্মিল।
জন্মিয়া শিশুপুত্র যুদ্ধ যে করিল
কপিবর তারে বুঝি আঁটিতে নারিল।
এ একটা মজার কথা বলব কি তা বাবু মহাশয়
রামায়ন বেদপুরাণে লেখা আছে
জানেন না মণ্ডল মহাশয়।
এ একটা মজার কথা রং তামাসা
শুনেন যত বাবু মহাশয়।
সেই না কপি কিন্তু হনু ছাড়া কেউ নয়।
বীরের বীর মহাবীর মহীরাবণ যখন যুদ্ধেতে মৈল,
তার না স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র সন্তান ছিল।
লংকা দগ্ধ করি হনু বসিল বৃক্ষ ডালে
দূর হতে মহীরাবণের স্ত্রী আসিতে লাগিল,
তাহারে দেখিয়া হনু লম্ফ একটা দিল।

ঝম্প দিয়া তার উদরে এক লাথি যে কশাইল,
সেই না লাথির চোটে নারীর গর্ভপাত হইল
জন্মিয়া মহীরাবণ পুত্র অহিরাবণ নাম লইল।
জন্মিয়া অহিরাবণ যুদ্ধ করিতে চায়,
যত চেষ্টা করে হনু, শিশু পিছলাইয়া যায়।
কোন মতে না পারিয়া হনু পবনে স্মরিল
মুহূর্তে ধূলি ঝড় আসিয়া পড়িল
এই ফাঁকে হনুমান মারিল আছাড়
নিমেষে হইল শেষ মৃত্তিকায় প্রচার।
এই তো তোমার কথার জবাব শুন শুন মণ্ডল মশাই
একটা কথার জবাব কিন্তু শুনবেন যত বাবু মহাশয়।

নন্দরাণী অন্নদার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারায় শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বাহবা আসে। নন্দরাণীও আসর বুঝে নতুন ধুয়া সহযোগে বলতে থাকেন:

ক্ষম মাগো ত্রিনয়নী তুমি বিপদ তারিনী
কাশীধামে অন্নপূর্ণা মাগো কৈলাসে ভবানী।
তুমি আসামেতে কামাক্ষ্যা মাগো কালীঘাটের কালী,
তুমি বদ্যিনাথের জয় দুর্গা হিংগুলায় ভীমা ভৈরবী।
নমঃ মাগো কাত্যায়নী সন্তান পালনী,
মুখ্যু মেয়েমানুষ আমি সাধন না জানি
ক্ষম মাগো ত্রিনয়নী তুমি বিপদ নাশিনী।
একটা মজার কথা শুনেন যত বাবু মহাশয়
একদিন এক রাজার কুমার নাম কিবা হয়
শুনেন সব বাবু মহাশয়,
হাসিতে খেলিতে বয়স তখন দ্বাদশ বর্ষ হয়,
পাঠশালা ছেড়ে সে যে যুদ্ধ করতে যায়
এখন বলুন তো অন্নদাবাবু মহাশয়,
সেই না পুত্রকে যদি রাজা কেটো ফেলতে চায়
আনন্দ বা হাসিমুখ তার তখন কোন্‌টা এসে যায়?
হাসতে হাসতে রাজা তখন পুত্র বলি দিল
সেই না পুত্রের শেষে কী বা গতি হইল?

অল্প কথায় সাঙ্গ করুন অন্নদা মশাই
আমরা তো মুখ্যু নারী, উত্তর দিবেন ওই পণ্ডিত মশাই।

অন্নদা মণ্ডল নামজাদা তরজাওয়ালা। নীরব আগ্রহে শ্রোতৃবৃন্দ অপেক্ষা করতে থাকেন তার উত্তর শুনবার আশায়। অন্নদা স্বভাব সুলভ রসিকতা সহযোগে উত্তর দিতে আরম্ভ করেন :

বাবু গো আজ নন্দরাণী প্রশ্ন কোরেছে
জবাব দিতে হবে
নইলে আমার তরজা গাওয়া বন্ধ কোরতে হবে।
এ একটা আশ্চর্য কথা,
এ একটা রহস্য কথা শুনেন যত বাবু মহাশয়,
নন্দরাণীর প্রশ্নের কোন আগা মাথা নাই।
তুমি হলে বাস্ত ঘুঘু আমি বিষম বাঁটুল,
তুমি যদি হও বোলতা আমি হব আঠা,
আপনারা বসে বসে শুনুন সবে, সেই আশ্চর্য কথা।
দাতা কর্ণের নাম বাবু গো জানেন তো সকলে
তার যে এক পুত্র ছিল বৃষকেতু বলে।
তার না গুণের কথা কত বা বলিব
মহাভারতের কথা এবে সকলে শুনিব।
একদিন নারায়ণ ছলিতে আসিল রাজায়
বলে ব্রাহ্মণের বেশে আমার ক্ষুধায় প্রাণ যায়।
ওগো দাতা কর্ণ, পদ্মাবতী যদি সেবিল বিস্তর
বলে ও সবে সন্তুষ্ট নয় ব্রাহ্মণ তনয়।
রাজ মাংস মহা মাংস খাইতে ইচ্ছা করি
নতুবা অভুক্ত ব্রাহ্মণ সত্বর প্রস্থান করি।
কাছে ছিল বৃষকেতু মায়ের কাছে কাছে
তারে দেখে ব্রাহ্মণ বলেন ইঙ্গিতে।
এই না নধর শিশুর মাংস যদি পাই,
ক্ষুধাকাতর ব্রাহ্মণ আমি তবেই আহার পাই।
এ একটা মজার কথা কর্ণরাজা সম্মতি যে দিল
রাজারাণী একত্রে সেই পুত্রকে বধিল।

সেই পুত্রের মাংস যদি রন্ধন করিল
ব্রাহ্মণ আহার কালে মন্ত্র বলে সেই শিশু পুনরায় বাঁচাইল।
এই তো তোমার কথার জবাব নন্দরাণী শোন
তরজা পালা সাঙ্গ করে হরি হরি বল।

তরজা পালা সাঙ্গ হয়। উভয় তরজাওয়ালা বা ওয়ালী আসরে এসে প্রণাম জানায় সমবেত জনমণ্ডলীকে। বেজে উঠে ঢোল ও কাঁসি। শ্রোতৃমণ্ডলীও উল্লাসের সঙ্গে আসর ভঙ্গের কথা ঘোষণা করে।

পাঠকগণ আমাদের পূর্বোল্লিখিত কবি ও তরজার উদ্ধৃতি থেকেই কবি এবং তরজার পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন আশা করি।

ঢপ

পূর্ববঙ্গের ঢপ সংগীত অনেকটা বীরভূম, বাঁকুড়ার ঝুমুর পালা গাইয়ে দলের অনুরূপ। পশ্চিমবঙ্গে বলে ঢপ কীর্তন, পূর্ববঙ্গে বলে ঢপ গান। ব্যাপার একই। কতকগুলি মেয়ে গাইয়েদের নিয়ে তৈরি হয় এক একটা দল। এ-সব দলের কর্ত্রীও মেয়েই। তবে সঙ্গে দু একজন যে পুরুষও না থাকে এমন নয়। যদি কোনো আসরে মাত্র এক দলেরই বায়না হয় তখন এরা এদের ইচ্ছে মতো একটা বিশেষ পালা ধরে। যাত্রার মতোই অভিনয় করে—তবে গানের মাধ্যমে; কথা থাকে খুবই কম। অভিনয় করে মেয়ে পুরুষ একত্রেই। তবে এই ঢপের দলের মেয়েরা সাধারণতঃ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে নয়। জাত জিজ্ঞেস করলে বলে বোষ্টম।

দলের বাদক ও অন্যান্য কাজের জন্য পুরুষেরাই থাকে। তবে তারা হলো ঠিকে লোক।

গান জমাট বাঁধলে নিজেরাই দুটো দলে ভাগ হয়ে যায়। এক পক্ষ অপর পক্ষকে জব্দ করবার জন্য কথা কাটাকাটি—বাদ প্রতিবাদ করে গানের মাধ্যমে। একই দোহার দু দলকেই সাহায্য করে। কিন্তু আসরে যখন একাধিক দলের আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা শুরু করে কবিগানের পদ্ধতি।

কবির আসরের মতো এখানে সভা বন্দনা, সখী সংবাদ, গোষ্ঠ পালট তারপরে চাপান দেবার রীতি নেই। আসরে ঢুকেই যে দল বন্দনা গাইবার সুযোগ পায়, সেই দলই গানের শেষ পর্যায়ে প্রশ্ন করে বসে। তবে এদের প্রশ্ন উত্তর বেশির ভাগই শ্রীকৃষ্ণ-জীবনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—বড় জোর শিব-দুর্গার কথাও কিছু

কিছু এসে পড়ে—তার বেশি কিছু নয়। সেদিক থেকে এদের বাদ প্রতিবাদ, প্রশ্ন ও উত্তর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যায়। বাদ-প্রতিবাদের সময় সময় এরা সত্যিকারের কবির দলের মতোই হয়ে উঠে।

ঢপের আসর বসেছে। সভা বন্দনা শেষ করেই কোনো এক ঢপওয়ালী শ্রীরাধিকা সাজে সেজে, সেই ভাবে ভাবিত হয়ে গান ধরে :

প্রাণ সখীরে ওই শোন কদম্ব তলে বংশী বাজায় কে?
বংশী বাজায় কে রে সখী বংশী বাজায় কে?
আমার মাথার বেণী খুইল্যা দিমু (বদল দিমু) তারে আইন্যা দে।
অচলা বাঁশের বাঁশী ছিদ্র গোটা, ছয় বাঁশীতে কতই কথা কয়।
আমার মন চইল্যাছে তারই সুরে ঘরে নাহি রয়,
বাঁশীতে ছিদ্র গোটা ছয়।

এইবার পুরোদস্তুর নাটকীয়ভাবে আসরে এসে দর্শন দেয় অপর পক্ষীয় একজন শ্রীকৃষ্ণ বেশে। সে এসেই বলে বসে :

তুমি তো সুন্দরী কইন্যা, মোরে দিচ্ছ মন
বাঁশীর সুরে তোমার কথা কহিব এখন।

রাধিকা উত্তর দেয় :

ছেড়ে দে কলসী আমার যায় বেলা হে নাগর
ছেড়ে দে কলসী আমার যায় বেলা—।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয় শ্রীরাধিকাকে। সেও বলে চলে :

(হারে) ক্যামন তোমার মাতা পিতা,
ক্যামন তাদের হিয়া,
তোমার মতন যুইগ্যা নারীর
ক্যান না দেয় বিয়া।

অপর পক্ষীয় ঢপওয়ালী একটু দুর্বল প্রকৃতির। তাই সে সহজেই আত্ম-সমর্পণ করে :

ভালো আমার মাতাপিতা
ভাল তাদের হিয়া,

তোমার মত লাগর পাইলে
মোরে দিত বিয়া।
(হে) লাগর, ছেড়ে দে কলসী আমার
যায় বেলা।

কবির লড়াই হলে অবশ্য অত সহজে গোল মিট্‌ত না। কিন্তু কবি আর টপ কোনো মতেই এক জিনিস নয়। একমাত্র বাদ প্রতিবাদের ভঙ্গিটুকু বাদ দিলে একের সঙ্গে অপরের কোনোই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। একজনের প্রশ্ন ও উত্তর অনন্তপ্রসারী, অপরের প্রশ্ন ও উত্তর ক্ষুদ্র সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ।

।য় খণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ড

অন্তর ধর্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাউল

কেউ কেউ বলেন 'বাতুল' শব্দ থেকেই 'বাউল' কথার উৎপত্তি। সত্যিই তাই। এই শ্রেণীর লোকেরা প্রচলিত ধর্ম বা সংস্কারের গন্ডীর মধ্যে বাস করেন না। তাঁরা প্রচলিত দেব দেবীকেও মানেন না। সমাজ সংস্কারের একেবারে বাইরে বাস করেন। তাঁদের মনের প্রসারতাও অনেক গভীর। তাঁরা বলেন—কি হবে মিছে ঐ পুতুল পূজা করে? এই মানুষই তো সব। তাই তাঁরা মানুষের সাধনাই করে গেছেন। বিখ্যাত বাউল লালন তাই এক জায়গায় বলেছেন, আগে নিজেকে জানতে শেখ তা হলেই তুমি সকল জানার শেষ জানায় গিয়ে পেঁছিবে। বাউলের অন্তর দেবতা কোনো মূর্তি বা গন্ডীর মধ্যে ধরা দেন না। তিনি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে, মনের মণি কোঠায় বাস করেন। সারা জীবন ভর বাউল তাঁরই সাধনা করে যান। বাউলের কাছে কোনো ধর্মের গোঁড়ামী নেই, জাতিভেদ তো তুচ্ছ কথা। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বাইরে থাকাতেই সাধারণ লোক এঁদের বলে 'পাগল'। হ্যাঁ, সত্যিই এঁরা প্রেমের পাগল। কিন্তু এ প্রেম তো রাধাকৃষ্ণ, আল্লা, বা অন্য কারও উপর নয়, এ যে মানুষের সাধনা! তাই তাঁদের গানে মানুষের জয়ই ঘোষিত হয়েছে।

এই বাউল সম্প্রদায়ের ভিতর কতকগুলি শাখা আছে, যেমন—সুফী, দরবেশ, সাঁই, বৈষ্ণব, বৈরাগী, সহজিয়া সম্প্রদায়, গুরুবাদী বাউল বা কর্তাভজা সম্প্রদায়, বৈষ্ণব বাউল, অধ্যাত্মবাদী বা দেহতত্ত্ববাদী বাউল ইত্যাদি। আমরা একে একে সকলের সংগেই আপনাদের একটু করে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

গুরুবাদী বাউল গুরুকেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন। তাঁরা বলেন, পরমেশ্বর তো অনেক বড় কথা, কিন্তু তাঁর কাছে পেঁছিতে হলেও একজন পথপ্রদর্শক দরকার। এই গুরুই পথপ্রদর্শকের কাজ করবেন। সুতরাং তাঁকেই ভজনা করলে তিনিই সেই অনন্ত পুরুষের কাছে নিয়ে পেঁছি দেবেন।

তবে এই গুরুবাদী বাউলের ভিতরও অনেক সময় অধ্যাত্মবাদী ভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা যেহেতু গুরুকেই তাঁদের উপাস্য দেবতা বলে ধরে নিয়েছেন সেই হেতু গুরুকেই প্রশ্ন করেন, এই অনন্ত পৃথিবীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য :

গোসাঁইজী কোন্ রঙে বেঁধেছ ঘর,
হাড়ের ঘর খানি, চামের ছাউনী বান্ধে বান্ধে জোড়া,
এই না ঘাটে ময়ূরা ময়ূরী কোন্ দিন হয়ে যাবে সারা ॥
বাল্যকাল গেল খেলিতে খেলিতে
যৌবন গেল রঙ্গ রসে,
বৃদ্ধকাল গেল ডাকিতে ডাকিতে
শ্রীকৃষ্ণ দাসী কবে হবে গোসাঁইজী।
দন্ত পড়িবে, কেশ পাকিবে,
যৌবনে লেগে যাবে ভাটি,
আস্তে আস্তে ধ্বচিয়া (ধ্বসিয়া) পড়িবে
রঙিলা দালানের মাটি ॥

মানব দেহ বড়ই বিচিত্র। এর কোথায় কী আছে, না আছে ভাবাও যায় না। বাউলের মনে প্রশ্ন জাগে, এই দেহইতো সব, এর দ্বারাই তো মানুষ চালিত হয়, এর ভিতরইতো স্থানে স্থানে বসতি রয়েছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য ; অথচ আমার এই দেহ কী সত্যিই অসার ? তাই যদি হবে, তা হলে কেন হবে মানুষে মানুষে এত হানাহানি ? বাউল তাই তার গুরুকেই উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন :

গুরুজী কৃপা করে বল আমায় মূল কথা
মানব দেহে বিরাজ করে,
কোন্ খানে কোন্ দেবতা।
দেহের মধ্যে আঠার মোকাম,
দেহটি চৌদ্দপোয়া হয় কিবা না হয়,
কোথায় মন শুনব সমুদয়,
আমার আঁধার ঘর আলো হবে
শুনলে গুরু সেই কথা।
আর একটি কথা মনেতে জাগে,
কিবা আহার তার কোথায় বিহার,

তারা করে কোন্ যোগ,
আবার কেবা থাকে ঊর্ধ্ব ভাগে
অধঃ মুখে কোন্ দেবতা,
শ্রীরাধাবল্লভ বলে দিবা নিশি ভাবে,
গুরুর চরণ বলে, মন মাতঙ্গ, সদাই খেলে
শুনলে যাবে মন ব্যথা।

কিংবা : হে গুরু দোহাই তোমার মন্কে
আমায় নেওনা সুপথে।
যন্তরে যন্তরে যেমন
হেগুরু যেমত বাজাও বাজে তেমন।
তুমি যন্ত্র না বাজালে
হে গুরু বাজবে কি মতে।
গুরু দোহাই তোমার মনকে
আমায় নেওনা সুপথে।

বৈষ্ণব বাউল আর গুরুবাদী বাউলে (কেউ কেউ বলেন কর্তাভজা সম্প্রদায়। কর্তা=গুরু) পার্থক্য খুবই সামান্য। এই শ্রেণীর সাধকরা রাধা-কৃষ্ণকে অথবা গৌর-নিতাই কিংবা গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়াকেই তাঁদের উপাস্য দেবতা স্থির করে নিয়েই তাঁদের সাধনমার্গে পৌঁছবার যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। তবে বাউলের এই দুই শাখার মধ্যে বৈষ্ণব বাউলের দল সম্ভবতঃ একটু বেশি উচ্চভাবাপন্ন।

জীবনতো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, কাজেই এই শেষ সময় ভব পারাবারের জন্য রাধা-কৃষ্ণের নাম স্মরণ করাই হলো এই শ্রেণীর বাউলদের মূল কথা :

ভাঙলো রে তোর শির খুঁটি
এই বেলা বলে নে রে রাধাকৃষ্ণের নাম দুটি।
ও তোর নেইকো সে কাল,
তুবড়েছে গাল, চুল হয়েছে শোন নুটি,
এই বেলা বলে নে রে রাধা কৃষ্ণের নাম দুটি।
ও তুই যষ্টি ধরে, তুষ্টি করে, ঠিক যেন রামধনুকটি,
এই বেলা বলে নে রে রাধা কৃষ্ণের নাম দুটি।
ও তুমি তিনটি মাথায় বসে আছ,

তালিবংশয়ের মতনটি,

এই বেলা বলে নে রে রাধা কৃষ্ণের নাম দুটি।

ও তোর নেইকো সে কাল,

সবই বিফল, গিয়াছে দাঁত দুই পাটি

এই বেলা বলে নে রে রাধা কৃষ্ণের নাম দুটি।

ও তোর চক্ষু দুটো এমনি ফুটো

ঘুচলো না তোর ভ্রূকুটি,

এই বেলা বলে নে রে রাধা কৃষ্ণের নাম দুটি।

রামচন্দ্র বলে মায়া জালে ঘুরছে সবে দিবা রাতি

এই বেলা বলে নে রে রাধা কৃষ্ণের নাম দুটি।

বাউল বলে, যাদের সাধনার জোর আছে, তারা তো ভবনদী পার হবেই, কিন্তু আমার তো সাধনার জোর নেই, তা হলে কী আমার আর উদ্ধার হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই? তাই যদি তুমি করতে না পারলে তাহলে তুমি কিসের আমার প্রেমের ঠাকুর?

পাঠকগণ এই প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর বাউলদের মুখে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতো দীন ভাব লক্ষ্য করুন:

হরি দিনতো গেল সন্ধে হল পার কর আমারে (হে)।

তুমি পারের কর্তা, জেনে বার্তা, তাই ডাকি তোমারে।।

আমি আগে এসে, ঘাটে রইলেম বসে।

আমায় অধম বলে কী, পার করবে না হে।।

যারা পাছে এলো, আগে গেল আমি রইলেম বসে।

হরি দিনতো গেল সন্ধে হল পার কর আমারে।।

যাদের কত সম্বল, আছে সাধনার ফল,

তারা পারে গেল চলে আপন আপন ফলে

আমি সাধন বিনে, তাই রইলেম বসে।

হরি দিনতো গেল সন্ধ্যে হল পার কর আমারে।

তুমি পথের কাণ্ডারী, কর যারে পার, দয়াময় বলে।

আমি দীন ভিখারী, পারের নেইকো কড়ি, দেখ তুমি বসে।

হরি দিনতো গেল সন্ধে হল পার কর আমারে।।

বাউল গান গাওয়া হয় একতারা, ঘুঙুর আর ডুগডুগি অথবা খঞ্জনীর

সঙ্গে। কিন্তু রংপুরে দো-তরার সঙ্গেও বাউল গান প্রচলিত—এর ভিতর "ভাওয়াইয়া" সুরেরও মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই রকম একটি গুরুবাদী বাউল গানের নমুনা শুনুন :

গোসাঁই এমন দরদী আমার কে আছে
আমার কেউ নাই রে।

ওকি গোসাঁই—একে মায়ের পঞ্চ ভাই
বিধি কইল্লে হামাক ঠাঁই ঠাঁই
আমার কেউ নাই রে ॥

ও কি গোসাঁই—একে আমার কপাল পোড়া
বিধি কইল্লে হামাক ভাই হারা
আমার কেউ নাই রে ॥

ও কি গোসাঁই—বন পোড়া যায় সবে দেখে
মনের আগুন কেউ না জানে
আমার কেউ নাই রে ॥

ঠিক এই জিনিসটি পূর্ববঙ্গের বাউলদের কণ্ঠেও শোনা যায় :

গুরু তোমার চরণ পাব বইল্যারে—
মনে বড় আশা ছিল,
আমি আশা নদীর কূলে বইস্যারে
আমার আশায় জনম গ্যাল।
পার হব, পার হব বইল্যা
আমি বইস্যা রইলাম নদীর কূলে !
পার হব বইল্যা
আবার ছয়জনা বোম্বেটে জুইট্যা
আমায় পাক জলে ঘুরাইলো।
চাতক রইল ম্যাঘের আশে
ম্যাঘ ভাইস্যা যায় অন্য দ্যাশে
চাতকী বাঁচে বা কিসে ?
(আবার) জল বিনে চাতক মইলো গো।
আমার তেমনি দশা হইলো গো ॥

এই ধরনের গান সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও শোনা যায়। জীবনকে তুলনা করা হয়েছে বাঁকা নদীর সঙ্গে। নদীর উত্থান পতন যেমনি বলা দুষ্কর তেমনি জীবনের গতিবিধি সম্পর্কেও কিছু বলা বড় কঠিন :

বাঁকা নদীর গতিক বোঝা ভার
(এ) নদীতে নেমোনা ভাই খবরদার ॥
বাঁকা নদীর গতিক বোঝা ভার।
কালো পাহাড় ভেঙ্গে আসছে জল,
নদীতে নেমোনা ভাই হুঁশিয়ার
বাঁকা নদীর গতিক বোঝা ভার।
এ নদী শুক্‌নো ছিল বন্যা এলো,
আমরা কেমনে হব পার
বাঁকা নদীর গতিক বোঝা ভার।
নদীতে নেমোনা ভাই খবরদার ॥
নদীতে বান এসেছে সামাল, সামাল
ও মাঝি তুমি কষে ধর হাল,
যখন তরী উল্টে যাবে রে
(ও ক্ষেপা মন)
তখন গুরুর নাম কর স্মরণ ॥

বাউল তাই বলছে বুঝেশুঝেই সঙ্গী ঠিক কর। যে প্রেমের প্রেমিক না হবে তার সঙ্গে প্রেম করা কি ঠিক হবে? তাহলে কি আর সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হবে? শুধুমাত্র লাভের অংক দেখতে গেলেই তো যত বিপদ এগিয়ে আসে, কিন্তু যদি সত্যিকারের বন্ধু পাওয়া যায় তা হলে অনেক সময় ক্ষতিও স্বীকার করতে হয় :

প্রেম করে সুখ হলনা প্রেমের প্রেমিক না হলে
আখ বলে চাবালাম বাঁশ,
বাঁশের নাইকো কোন রস,
কেবল শুধু গালের সর্বনাশ ॥
রসগোল্লার স্বাদ কী পাবি চিটাগুড় খেলে।

কিঞ্চিৎ মধু পাবার আশায়,

হাত বাড়ালি বোল্লার চাকেতে

(শুধু বোল্লায় কামড়াইবার আসে) ॥

ও তুই যাইবানা শুধু, পাইবানা মধু

মধু বোল্লায় কামড়াইবে,

গঙ্গা স্নানের ফল কী পাবি খালে ডুব দিলে।

যে জন প্রেমের ভাব জানে না,

তার সনে নাই রে লেনা দেনা ।

কুমারেরা কাটে মাটি,

ছেনে করে পরিপাটি,

কাঁচা সোনা রং ধরে না,

পুড়লে হবে পাকা সোনা।

যে জন প্রেমের ভাব জানে না ॥

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাউল গানের সর্বশ্রেষ্ঠ শাখাই হলো আধ্যাত্মিক বাউল। এই বাউলের গানেই সঞ্চিত রয়েছে বাঙালীর অধ্যাত্ম সাধনার মর্মকথা। একমাত্র বাউল গানের পদ এবং ভাব নিয়ে আলোচনা করলেই নিরক্ষর পল্লীকবিদের সহজাত কবিত্ব শক্তি, তাঁদের ভাবুক মনের খবর পাওয়া যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো সুসংস্কৃত মনও একসময় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল লালন ফকিরের বাউল গানে। লালনের গানের মূল কথাই হলো দুনিয়াকে চিনবার আগে নিজেকে চিনতে শেখ :

মন রে আমার আপন খবর

আপনতো আর হয় না।

আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা ॥

সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখার

যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়, (দেখ্ না) ॥

আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি

কোলের ঘোরতো যায় না ।

আত্মরূপে কর্তা হর

মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তার ঠিকানা ॥

আবার বেদ বেদান্ত পড়বে যত

বেড়বে তঃই লটনা ।

আপন আপন কে বলে মন,
ওরে যে জানে তার চরণ স্মরণ নে না ॥
আমার লালন যোলো মনের গোলে
যেমন চোখ থাকিতে কানা ॥

বাউলেরা পরমাত্মায় বিশ্বাসী, কিন্তু সেই পরমাত্মাকে বিশেষ কোনোরূপে আবদ্ধ রাখতে চায়নি। ফিকিরচাঁদ বাউল বলেন, সেরূপের কী তুলনা আছে ? কী করেই বা বর্ণনা করব তাঁর সেই অপরূপ ছবি ? :

অরূপের রূপের ফাঁদে পড়ে কাঁদে প্রাণ যে
আবার দিবা নিশি,
কাঁদলে নির্জনে বসে
আপনি এসে দেখা দেয় সে রূপ রাশি।
সে যে কী অতুলা, রূপ নয়, অনুরূপ, শত শত সূর্য শশী।
যদি রে চাই আকাশে মেঘের পানে
সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি।
(আবার) সে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায়
ঝলক্ লাগে হৃদে আসি।
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি
বেঁধে রাখি চিরদিন, সেই রূপ শশী।
ওরে থেকে থেকে ফেলে ঢেকে কু-বাসনা মেঘরাশি।
কাঙাল কয়, যে জন মোরে দয়া করে
দেখা দেয় রে ভালবাসি।
আমি যে সংসার মায়ায় ভুলিয়ে তাঁরে
প্রাণ ভরে কই ভালবাসি ॥

পরমাত্মার রূপ বর্ণনাচ্ছলে লালন ফকিরও গেয়েছেন :

স্বরূপ রূপে নয়ন দেরে—
দেখবি সে রূপেরও রূপ।
কেমন সে রূপ ঝলক্ মারে ॥
স্বরূপ বিনে রূপটি দেখা
সেতো কেবল মিছে ধোঁকা

আধেকের লেখা জোখা,

স্বরূপ শক্তি সাধন দ্বারে ॥

অবতার অবতারী,

দুই রূপে যুগল তারি

তাহে রূপ চড়ন দারি

রূপেরও রূপ বলি যারে।

শূন্য ধামের ধ্বজা স্বরূপ

তারে আজি ভাবিয়ে কু-রূপ

সিরাজসাঁই বলে রে রূপ

সাধবি লালন কেমন করে ?

বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার প্রথম সোপানই হলো গুরু গ্রহণ। গুরু না হলে এই সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। লালন বলছেন—পার্থিব সৌন্দর্যে ভুলে থেকে সেই পরম পুরুষের কথা যেন ভুলে যেও না। তোমাকে ভুলাবার জন্য নানা ছল চাতুরীরই আবির্ভাব ঘটবে তোমার কাছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি গুরুর মূর্তি তোমার কাছে থাকে তাহলে তোমার আর কোনো ভয় নেই :

ঐ রূপ তিলে তিলে জপ মন সুতে

ভুলনা রে মন অন্য ভোলেতে,

গুরুরূপ ধিয়ানে রব,

কী করবে তারে শমন রায় ?

সে যে নেচে গেয়ে ভবপারে যায়

যায় সে গুরুর চরণ-তরীতে।

উপর বাড়ি সদর আলা,

স্বরূপ রূপে করছে খেলা,

স্বরূপ গুরুর স্বরূপ চেলা,

কে আছে এই জগতে ?

এমনি তার অংগ ভরি,

গুরু বিনে নেই কাণ্ডারী

(ফকির) লালন বলে ভাসাও তরী রে

যা করেন সাঁই কৃপাতে।

লালন আবার বলতে থাকেন, যিনি হলেন সেই রূপময় রসিক-চূড়ামণি, তাঁর এক বিন্দু করুণা পেলে মানুষ ধন্য হয়ে যায়, সুতরাং সেই অপরূপ রূপময়ের ধ্যান কর, তাঁর ভজনা কর—তবেইতো পার হবে এ ভব বৈতরণী :

কিবা রূপের ঝলক্ দিচ্ছে দ্বিদলে
সে রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে,
ফণী-মণি সৌদামিনী ঘিরি এরূপ উজলে।

অস্থি চর্ম যোম রূপ,
তাহে মহা রসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে,
তার এক বিন্দু অপার সিন্ধু
হয় রে এ ভূ-মন্ডলে।

দেহের ও দল-পদ্মে যার
উপাসনার সীমা তার কোথাও কী মেলে ?
তীর্থব্রত যার জন্যে—এই দেহে তার সব লীলে।
রসিক যারা সচেতন
রসরতি টানে উজান রূপে উদয় পেলে।
লালন গোঁড়া নেংটী এড়া
মিছে বেড়ায় রূপ বলে॥

পূর্বেই উল্লেখ করেছি বাউল সাধনার মূল কথাই হলো 'মানব ধর্ম'। 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাঁহার উপর নাই'! এই মহাবাক্যই হলো বাউল গানের মূল কথা। ভগবান যুগে যুগে মানুষের মাঝেই তাঁর দূত প্রেরণ করেছেন, কিন্তু আমরা অনেক সময়ই তাঁকে চিনতে না পেরে ভুল করে তাড়িয়ে দেই। লালন বলছেন, মানুষ মাত্রই তো সেই ভগবানের দূত। সেই ভগবানের দূতকে না চিনে সাধনা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কারণ, ভগবান তো তাঁর দূতের মাধ্যমেই আমাদের কাছে প্রকাশিত হন :

অপারের কান্ডারী নবীজি আমার
ভজন সাধন বৃথা নবী না চিনে।
নবী আউল আখের জাহের বাতেন
কখন কী রূপ ধারণ করে কোনখানে।

আসমান জমিন জল আদি পবন
যে নারীর নূরে হইল সৃজন,
বল কিসে ছিল নবীর আসন
নবী পুরুষ কী প্রকৃতি তখন ?
আল্লা নবী দুটি অবতার
গাছ বীজ যে রূপ দেখি যে প্রকার,
তোমরা সু-বুদ্ধিতে করহ বিচার
ওর গাছ বড় কী ফলটি বড় নেও জেনে।
আত্ম তত্ত্বে ফাজেল যে জনা
জানতে পায় যে নিগূঢ় কারখানা,
হল রসুল রূপে প্রকাশ রব্বহল
অধীন লালন বলে,
দরবেশ সিরাজ সাঁইর গুণে।

বাউল সম্প্রদায়ে জাতের কোনো বিচার বা গোঁড়ামী নেই। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীস্টান, পারশিক এখানে সবাই এক--সবাই মানুষ—এইটেই বড় কথা। লালন নিজে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও সিরাজসাঁই নামে এক ফকীরের আশ্রয়ে লালিত পালিত হয়েছিলেন, তিনিই ছিলেন তাঁর এ পথের গুরু বা পথ প্রদর্শক। লালন তাই বলছেন, ভগবৎ সাধনায় জাতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষ জন্ম ও মৃত্যুর সময় তো একই জাত হয়,—এই কথাটা মনে রাখতে পারলে জাতের বড়াই আর থাকবে না:

সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে ?
লালন বলে জাতির কী রূপ
দেখলাম না এই নজরে।
কেউ মালা কেউ তসবি গলে
তাইতো বেজাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জাতে চিহ্ন রয় কারে ?
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নবীর তবে কী হয় বিধান,
বামন চিনি পৈতেয় প্রমাণ

বামনী চিনি কিসে রে ?
জগৎ বেড়ে জাতির কথা
লোকে গল্প করে যথা তথা,
লালন বলে জাতির ফাত্না,
ডুবিয়েছে সাধ বাজারে।

বাউলের কাছে জাতের প্রভেদও যেমনি নেই, ধর্মের গোঁড়ামীও তেমনি নেই, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই লালন নবী এবং শ্রীকৃষ্ণকে একই সঙ্গে দেখতে সক্ষম হয়েছেন :

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি
তার কি কভু আছে গোষ্ঠ খেলা ?
ব্রহ্মারূপে সে অতলে বসে,
লীলাকারী হয় তার অংশ কলা।
পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ রসিক শিখরে
শক্তির উদয় যাহার শরীরে,
শক্তিতে সৃজন মহা আকর্ষণ
বেদ আগমে যায় বিষ্ণু বলা।
সত্য শরণ বেদ আগমে গায়
চিদানন্দরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম হয়,
জন্মমৃত্যু যার নাহি ভাবের পর
তবু তো নয় স্বয়ং নন্দলাল।
দরবেশের দেল দরিয়া যেথায়
অজানা খবর সেহি জানে ভাই,
ভজ দরবেশ, পাবে উপদেশ
লালন কয় তার উজ্জ্বল হৃদ কমলা॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনেই মানবের সকল বন্ধন দূর হয়ে যায়। জীবাত্মা আর পরমাত্মা ঠিক যেন একই বাড়ির দুই বাসিন্দা। কিন্তু যদি কোনোক্রমে এই দুই বাসিন্দায় মিলন সম্ভব হয়, তা হলে আর কোনো গণ্ডগোল থাকবে না। উপনিষদের এই মহাসত্যকে লালন রূপ দিয়েছেন তাঁর গানের ভিতর অতি সরল ও সহজ কথার মাধ্যমে :

আমি একদিন না দেখিলাম তারে
বাড়ির কাছে আরসি নগর
এক পড়শী বসত করে।
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
তার নাই কেনারা নাই তরণী পারে,
মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারে
আমি কেমনে সেথায় যাই রে।
আমি কী কব পড়শীর কথা
তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে,
সে ক্ষণেক ভাসে শূন্য ভরে
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে,
সেই পড়শী যদি আমায় ছুঁত
ভবের যম যাতনা সকল যেত দূরে
সে আর লালন একখানে রয়
আবার লক্ষ যোজন ফাঁক রে।

কিন্তু বাউল ফিকিরচাঁদ অতি সহজ ভাবেই বলতে চান, হে জগৎ পিতা, যেদিন আমার পরমায়ু শেষ হয়ে আসবে সেদিন যেন তোমার দেখা পাই, তাই যদি না হলো, তা হলে আর তোমার মহিমাটা কোথায় রইল ? :

যেদিন আমার দিন ফুরাবে ওহে দিন তারণ,
সেদিন আমায় ভুলনা হে দিও শ্রীচরণ।
দিনে দিনে দিন গত ক্রমে সেদিন আগত
যেদিন শমন করবে বন্ধন
সেদিন জানবো তুমি কেমন।

বীরভূম অঞ্চলের বাউলদের গানে অনেক সময় পদাবলী কীর্তনের ছোঁয়াচ মেলে। ভগবানকে পেতে হলে যে একমনে তাঁরই সাধনা করা প্রয়োজন, গৃহে থেকে গৃহীর সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও পার্থিব ভোগ-তৃষ্ণা বিষয় আশয় থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা, পার্থিব সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করবার পরও যে বড় কর্তব্য শ্রীভগবানের আরাধনা, সেই কথাই বড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এই অঞ্চলের বাউলদের কণ্ঠে। বীরভূমের নবনীদাস বাউল রসরাজ গোস্বামীর একটি পদের মাধ্যমে, তাই ভগবানের উপাসনা-পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন :

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না।
(চুল ভিজাব না গো আমি, বেণী ভিজাব না)
জলে নামব, জল ছড়াব তবু জলতো ছোঁব না,
এধারি ওধারি সাঁতার কাটি করি আনাগোনা।
আমি ভোক লাগাব, ভোকে মরব না,
রাঁধিব বাড়িব ব্যঞ্জন বাটিব তবু হাঁড়িতো ছোঁব না।
(আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না)।
গোসাঁই রসরাজে কয়, শোন গো নাগরী,
ও রূপেতে আমি যাই গো মরি।
আমি হব না সতী, না হব অসতী,
তবু আমার পতি ছাড়ব না।
(ঘরে শাশুড়ী ননদের কথা আমি শুনব না)
আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না।

বৈষ্ণব বাউলদের ভিতর কেউ কেউ তাদের তত্ত্ব কথা বলেছেন রাধাকৃষ্ণ কেউ বা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের কথার ভিতর দিয়ে, একথা একটু আগেই বলেছি। উল্লিখিত গানটিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার প্রেম নিবেদনের পথটার সন্ধান দিয়েছে—এখানে শ্রীরাধা প্রতীক মাত্র। বাউলের কথায় জগতের সকলেই তো রাধা—পুরুষতো কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধা আয়ান ঘোষের পত্নী হয়েও শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে ভালবেসেছিলেন জগতের সকলেই ঠিক সেই ভাবে সংসারে সংসারী থেকেও পরমাত্মার উপাসনা করে যাবে। এই সম্প্রদায়ের ভিতর যাঁরা আবার শ্রীচৈতন্যদেবকে ধরে নিয়েছেন ভবপারের কাণ্ডারী তাঁরা আবার বলেন অন্য কথা :

গৌর চাঁদের হাসপাতাল ভাই নদীয়া পুরে।
তবে আর কেন ভাই যাতনা পাস কলি ম্যালেরিয়ার জ্বরে
কখনো এমন ছিল না, দেখে জীবের এ যন্ত্রণা,
খুললেন দাতব্য এক ডাক্তার খানা
দীনহীনের তরে॥
জীব তরাবার সাইনবোর্ড লিখে
রেখেছে জানাইতে লোকে,
তাতে আনছে রোগী ডেকে ডেকে

জ্বর দেখে জয়া থারমেশ্টারে।
নিতাই বাবু সিবিল সারজন
অদ্বৈত হন আর পঞ্চানন ॥
নেটিভ চিনিবাস, আর শ্রীনিবাস
হরিদাস তার কম্পাউণ্ডার।
নিতাই বাবুর সুযশ ভালো
জগাই মাধাই রোগী ছিলো,
তাদের বৈষম জ্বর ছেড়ে গেল
একটি মিক্চারে ॥

ঠিক এই ধরনের গান ঢাকার শরৎ বাউলের কণ্ঠেও শোনা গেছে:

আইলোরে চৈতন্যের গাড়ী সোনার নদীয়ায়।
(আজি) রাই কোম্পানীর জংশন হৈল শ্রীবাস আঙ্গিনায় ॥
জগাই মাধাই হয় প্যাসেঞ্জার
নিত্যানন্দ টিকিট মাস্টার,
আইজ শ্রীগৌরাঙ্গ ড্রাইভার হইয়্যা
সেই গাড়ী চালায়।
আজি গরীব লোকের কি সুবিধা
ধনী বইল্যা নাই তো বাধা,
আজি ভক্তি বিধান দান করিলে
টিকিট পাওয়া যায় ॥
ও দীন শরৎ বলে, যাবো কাছে,
রাধারাণীর চালা আছে,
তারা ফাস্ট কেলাসের টিকিট কাইট্যা
ব্রজধামে যায় ॥

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে কিছু কিছু উল্টা বাউলেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর বাউলদের সাধনার পদ্ধতি একটু অদ্ভুত ধরনের—কেবলমাত্র সেই সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া তাদের সাধন পদ্ধতি বাইরের কারও বুঝবার উপায় থাকে না। এই সব গানের মাধ্যমেই লুকিয়ে থাকে তাদের সাধনার গুহ্যতত্ত্ব কথা। তাদের গানের কথা অনেকটা হেঁয়ালী ধরনের। এই রকম একটি উল্টা বাউলের নমুনা শুনুন:

সাঁই দরবেশের কথা,
(এ কথা) বলব কারে ?
বলব কারে, বলব কারে
কারে বলব কী ?
(ওরে) আপনার মন পরকে দিয়ে
আপনি ঠকেছি।

ডহরেতে ধুলা উড়ে, ডাঙ্গা ভাসে বানে,
এমন সময় গুরু এল, আসন দেই কোন্‌খানে।
(এ কথা বলব কারে)।
উপরে ডুমডুমি বাজে বামনী করে নাচ
(ও রে) দিল্লীতে হয় মেঘ বরিষণ
ঢাকায় রাস্তা পিছল ঘাট।
(এ কথা বলব কারে)।
এক তামাশা দেখে এলাম ত্রিবাণীর (ত্রিপুণীর) ঘাটে,
(একটা) মরা মানুষ আহার করে জ্যান্ত মানুষ পেলে
(এ কথা বলব কারে)।

রাজার বাড়ি চুরি হল পুকুর পাড়ে সিঁদ,
(ওরে) গাছের উপর শয্যা করে জলেতে যায় নিদ
(একথা বলব কারে)।

এই ধরনের হেঁয়ালী গানের সন্ধান মানভূমের সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় :

চাঁদকে সবাই মামা বলে, চাঁদের মামা কে ?
জামাই বলে ই কথাটি, বড় গোল্যে পড়েছে।

মন শিক্ষা বা তুখ্যা

জলপাইগুড়ির কোনো কোনো অঞ্চলে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বাউলের দেহতত্ত্বের মতো এক শ্রেণীর গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এ গানের কথা এবং ভাবের সঙ্গে জলপাইগুড়ির অন্যান্য গীতির বেশ পার্থক্য নজরে পড়ে। অনেকের মতে এ গানগুলি জলপাইগুড়ির নিজস্ব সম্পদ নয়। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কালে

এ গানগুলি হয়তো এদেশের জল, বায়ু ও বাচনভঙ্গির সংমিশ্রণে এই নবগঠিত রূপ পেয়েছে।

মানব জীবন যে দুদিনের সুতরাং তার উপর মায়া করা যে বৃথা, ভাই বন্ধু সবই ফাঁকা—এই তত্ত্বজ্ঞান বাংলার বাউল, উদাসী, বৈরাগী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কণ্ঠেও যেমনি শোনা গেছে বারে বারে, জলপাইগুড়ির এক শ্রেণীর সাধকদের কণ্ঠেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় :

ও মন অসনা
মানব দেহটার গৈরব কইরো না ॥
এ দেহা মাটির ভাণ্ড,
ভাঙ্গলে হবে খাণ্ড খাণ্ড
জোড়া দিলে জোড়া নাইবে না ॥
যেমন আসমানেতে জহল পড়ে
জলের ভুলুকা ধরে,
দেইখ্তে দেইখ্তে যায় মিশাইয়া ॥
একাই এইসেচি ভবে
একাই যাইতে হবে
সঙ্গের সঙ্গী কেউতো হবে না ॥
বৃক্ষের ডালে পাখির বাসা
ডাল ভাঙ্গিলে হবে কিবা দশা
ঐ রকম মানুষের দেহা রে ॥
একদিন আসিবে দুরন্ত শমন
পরিবে কঠিন বন্ধন
মিনতি করিলে ছাড়িয়া যাবে না ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈরাগী ও বৈষ্ণবের গান

বাঙালী সব চাইতে বেশি পরিচিত এই ভিক্ষাবৃত্তিধারী বৈরাগী ও বৈষ্ণব (বোষ্টম) ও বৈষ্ণবী (বোষ্টমী)-দের গানের সঙ্গে। এক কথায় বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সর্বত্রই এদের দেখা মেলে। এদের সাধন পদ্ধতি বাউল, দরবেশ সুফীদের মতো অতটা উচ্চ মার্গের নয় বা বাউলদের মতো নিরীশ্বরবাদীও নয়। তারা সাধারণতঃ রাধাকৃষ্ণের কিংবা গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক। তাই তাদের প্রায় সমস্ত গানই রাধা-কৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার পদে নিবেদিত। অবশ্য এর মধ্যেও একটু আধটু ব্যতিক্রম যে লক্ষ্য করে না যাবে এমন নয়। আমরা ক্রমান্বয়ে সেগুলি দেখাবার চেষ্টা করব।

বৈষ্ণবের প্রধান কথাই হলো ভক্তিবাদ। ভগবানকে পেতে হলে যুক্তি তর্কের ভিতর দিয়ে পাওয়া যাবে না। তাঁর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস রাখতে হবে তবেই তাঁর দেখা মিলবে :

ভক্তি বিনা সে ধন মেলে না
ও জান না ভক্তি বিনা সে ধন মেলে না ॥
আছে ভক্তি রতন অমূল্য ধন
অযতনে পাবে না।
সত্যযুগে প্রহ্লাদ ভক্ত
হিরণ্যকশিপুর পুত্র,
তাঁরে পাষাণে বেঁধে ফেলায় জলে
বিষপানে সে মল না।
ভক্তি বিনা সে ধন মেলে না ॥
ত্রেতা যুগে বীর হনুমান
পেয়েছিল ভক্তির সন্ধান,
হনু বক্ষচিরে দেখায় রাম নাম
এই তো ভক্তের নিশানা।
ভক্তি বিনা সে ধন মেলে না ॥

দ্বাপর যুগে গোপীগণে

পেয়েছিল কৃষ্ণধনে,

তাঁদের অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ

কৃষ্ণ বই আর জানে না,

ভক্তি বিনা সে ধন মেলে না ॥

কলিতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ চৈতন্য গোসাঁই

হরির নামে উদ্ধারিলেন জগাই মাধাই।

পুরীধামে সমুদ্রেতে কৃষ্ণ নামে

ঝাঁপ দিল আর উঠ্‌ল না,

ভক্তি বিনে সে ধন মিলে না ॥

বৈষ্ণব আর বৈরাগী একশ্রেণীর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর মধ্যে বৈষ্ণবরা সা ধারণতঃ বৈরাগী বোষ্টমের মতো বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায় না। তাদের গান প্রায়ই তাদের আখড়ার ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে। এবং এদের গানে কোনো কোনো সময় রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করলেও উদাসী বা বাউলের মতো একটু উচ্চ ভাবাদর্শে রচিত। উদাহরণ স্বরূপ একটি বৈষ্ণবের গীত ধরা যাচ্ছে। হাওড়া জেলার কানাই বৈরাগী মা যশোদাকে সম্বোধন করে গাইছেন :

ওমা দেখলাম তোর কানাই মানুষ নয়।

ওমা বিষ খেয়ে বিষ হজম করে,

এমন কথা কভু শুনি নাই।

(দেখলাম তোর কানাই মানুষ নয়) ॥

কানাই মা তোর কি গুণ জানে,

বাঁচায়ে দিলে যতেক গোপগণে,

আমরা মরি বাঁচি কানাইয়ের গুণে গো,

নাই কো প্রাণে ভয়।

কানাই মা তোর কি গুণ জানে বনে অক্কা পায়,

কালীদহের সাপের মাথায় দু পা তুলে লাথি লাগায়,

দেখে লাগে ভয়।

মা তোর কানাই মানুষ নয় ॥

তিন চোখী এক মেয়ে এলো কুম্ভীরে চড়ে,

পাঁচমুখো এক বুড়ো এলো ষাঁড়ের উপরে।

ও তোর কানাইকে সে মেয়ে নিল কোলে গো,
বুড়ো তার চরণে লুটায়।
দেখলাম তোর কানাই মানুষ নয়॥
তোর গুণের কানাই কি গুণ জানে,
বনে অসুর বধ করে,
দেখলাম তোর কানাই মানুষ নয়॥
পাহাড় খানা তুল্‌লে হাতে,
মাগো একটি আঙ্গুলে,
পাগল গুরু নারদ বলে ও কানাইয়ের মা,
তোর ডানপিটে ছোলটিকে আমি ভেবে পাই না।
সেটা যে কতবড কত ছোট গো,
আদতে তা বলা চলে না।
দেখলাম তোর কানাই মানুষ না॥

বৈষ্ণবদের গানে অনেক সময় বাউল ও সহজিয়াদের মতো কিছু কিছু তত্ত্ব কথাও শোনা যায়। অনেক সময় এইসব বৈষ্ণবদের বলতে শোনা যায়—রসিক ছাড়া এ রসের মর্ম কেউ বুঝতে পারবে না, সুতরাং এ ভবনদী যদি পার হতে চাও তাহলে আগেই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। দেখে শুনেই পথ চলতে হবে। সাধনার পথে অনেক বাধা, একটু বেসামাল হলেই বিপদ:

ও কাম-কুম্ভীর আছে পথেতে
পারবি না তুই সাগর পার হতে।
গঙ্গাসাগর মুখের কথা নয়,
সেই মাটিতে হরিদাস মানুষ জ্যোতির্ময়।
নদীর ভাবনা জেনে সাঁতার দিও না
রসিক বিনে বে-রসিকে ডুবলে
ওঠে নারে মনা ডুবলে ওঠে না।
সেত অনুরাগী,
মনা তুই জেনে জাননা রে
সে তো অনুরাগী দীন ভিখারী
সময় সময় জাল পাতে॥
পারবি না তুই সাগর পার হতে॥

বৈষ্ণবদের অনেক সময় আরও গভীরে প্রবেশ করতে শোনা যায়। এই সময়কার গানগুলিকে পুরোমাত্রায় সহজিয়া সম্প্রদায়ের গানের সঙ্গে তুলনা করা চলে :

আয়না প্রেমের বঁড়শী বাইতে যাই নতুন পুকুরে।
পুস্কর্ণী সাড়ে তিন রতি,
ঘাটলাতে জ্ঞানের বাতি,
নয় সিঁড়ি নয় দ্বার খোলে।
ও ঘাটলাতে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ,
অদ্বৈত ভক্তগণ সময় মত মেলে,
(ও) তারা ধুনুচি জ্বালিয়ে দিল রে।

পূর্ববঙ্গে পাগল চাঁদের গান বলে এক রকমের গানের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি মূলতঃ উদাসীদের গানের অন্য শাখা মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে তেমন ধরনের গানের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। বাউলকে ভাবের পাগল বলা চলে একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই বৈষ্ণবেরাই অনেকটা উচ্চস্তরের হলে তখন তাদের গানের মধ্যে বাউলদের মতোই বিশ্বমৈত্রী ও মানবতাবাদের কথাও শোনা যায় :

এ পাগলের দলে কেউ মিশোনা রে ভাই।
এক পাগল জগন্নাথ গোসাঁই,
(ও সে) চণ্ডালেতে অন্ন দিলে ব্রাহ্মণেতে খায়,
এ পাগলের দলে কেউ মিশোনারে ভাই ॥
(আছেন) আর এক পাগল চৈতন্য গোসাঁই,
(ও সে) রাধা রাধা রাধা বলে ধূলোতে লোটায়,
এ পাগলের দলে কেউ মিশোনা রে ভাই ॥

আমরা এই পরিচ্ছেদে যতগুলি গানের উল্লেখ করেছি এদের সবগুলিই পুরুষের রচিত। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণবীর সংখ্যাও বড় কম নয়। অনেকের মতে বৈষ্ণবীর রচিত গানগুলি অধিকতর শ্রুতিমধুর ও শব্দলালিত্যে সমধিক উৎকৃষ্ট। আমরা এবার বৈষ্ণবী বিরচিত কিছু গান আপনাদের উপহার দিচ্ছি। এইসব বৈষ্ণবীরা কখনও একাকী কখনও বা বোষ্টম সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায়। শান্ত দুপুরে শোনা যায় এইসব বৈষ্ণবীর কণ্ঠস্বর :

কোন্ বনে বাজায় গো বাঁশী বন্ধু শ্যাম রায়,
বাঁশীর সুর মন উদাসী আমার প্রাণ লইয়্যা যায়।
যখন আমি রান্নায় বসি, তখন কালা বাজায় বাঁশী
প্রাণ বিদরে যায়,
কোন্ বনে বাজায় গো বাঁশী, বন্ধু শ্যাম রায়।
কোন্ বনে বাজায় গো বাঁশী, মধুর ধ্বনি শোনা যায়,
বাজায় বাঁশী কালো শশী, কান্দি আমি দিবা নিশি
সময় বুঝে না।
কোন্ বনে বাজায় গো বাঁশী বন্ধু শ্যাম রায়॥
বন্ধু অসময়ে বাজায় বাঁশী মন প্রাণ হইরে নেয়,
কোন্ বনে বাজায় গো বাঁশী, বন্ধু শ্যাম রায়॥

এবং : কোথায় রহিলা বন্ধু দেখা দাও আমায়
কতদিন হইল গত, মরি হে প্রেম জ্বালায়।
বন্ধু হে দেখা দাও আমায়॥
বন্ধু হে মীনের মত ডুবে রইলাম তোমারই আশায়,
আমার সে আশা নৈরাশা হৈল বন্ধু তুমি রহিলে কোথায়।
বন্ধু হে অভাগিনী বলে কি গো মনে নাই তোমার,
আমায় ভাসাইলে ডুব সাগরে এ দুঃখ কি প্রাণে সহ্য হয়,
কোথায় রহিলা বন্ধু দেখা দাও আমায়॥

অথবা : মনের মানুষ নইলে মনের কথা কইও না,
কথা কইও না গো প্রাণ সজনী
মনের মানুষ নইলে মনের কথা কইও না॥
(আবার) অসতেরই এমনি ধারা,
চোরের নাও সাউধের নিশানা,
মুখের কথায় সব সেরে যায় কাছে কিছু না॥
ওগো শিমুল ফুলের রং দেখিয়ে ঝম্প দিও না,
মনের মানুষ নইলে মনের কথা কইও না॥
আমার পূর্বজন্মের কর্মফলে,
যদি মনের মানুষ মিলে,
নাম লিখিতাম দাসী বলে,

হইতাম তার কি না (?)
গোসাঁই ঘরণী রামায় কয়,
তেমন গো নইলে মনের মানুষ মিলে না ॥

কিংবা : তারে ভুলাইয়া রাইখ্যাছে কোন্ প্রাণ সজনী
আইল না শ্যাম গুণমণি।
ও ক্যান আইলা না রাত্র নিশাকালে,
ভ্রমরা গুঞ্জরে ফুলে,
তাতে কুকিল করে কুহুধ্বনি, প্রাণ সজনী
আইল না শ্যাম গুণমণি ॥
কৃষ্ণ ছাড়া রই ক্যামনে, প্রাণে ধৈর্য নাহি মানে
আমি বৃন্দাবনে হইলাম কলঙ্কিনী।
(গো) প্রাণ সজনী আইল না প্রাণ সজনী ॥
আসবে বইলে রসরাজ, পালঙ্কে কইর‍্যাছি সাজ
আমি পূজা দিব এই মন ফুলে,
প্রাণ সজনী, আইল না শ্যাম গুণমণি ॥

বৈষ্ণবীরা যেন অন্তর্যামী! প্রবাসী-স্বামীর চিন্তায় অধীরা নববধূর মনের কথা বুঝে নিয়েই যেন তারা খঞ্জনী বাজিয়ে ঘা দেয় বিরহিনীর মনের কপাটে :

আর কি কুলে রব লো সখি
আর কি কুলে রব,
কালিয়া কালিয়া বিষম কালিয়া
কে বলে কালিয়া ভাল,
কালিয়ার সনে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল (লো সখি)
কাঁদিতে জনম গেল।
এপাড়ে বসিয়া সিনান করিতে
ও পাড়ে লাগিল ঢেউ,
(আর) হাতের ইসারায় কত বা বুঝাব,
আমরা কুলের বউ।
মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি,

জলের উপরে ঢেউ,
ঢেউয়েরই সনে পবনের পিরীতি
নগরে জানে না কেউ (লো সখি)
(নগরে জানে না কেউ)।
(আবার) মৃত্তিকা উপরে ফুলের গাছটি
তাহাতে ধইর‍্যাছে ফুল,
ফুলের উপরে গুঞ্জরে ভ্রমরা
মজাইয়্যা গ্যাল দুই কুল।

কিংবা : গুরুর রূপ দেখিয়া হইয়্যাছি পাগল
ঔষধে আর মানে না,
চল সজনী যাই লো নদীয়ায়।
(আবার) গুরুর কাঁটা বিষম কাঁটা,
ঠেকলে কাঁটা খসান দায়,
চল সজনী যাই লো নদীয়ায় ॥
গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হইয়্যা দংশিয়াছে আমার গায়,
চল সজনী যাই লো নদীয়ায়।
(হারে) প্রেমের বিষে যাামন তাামন
গুরুর বিষে প্রাণ যায়,
চল সজনী যাই লো নদীয়ায় ॥

বৈষ্ণবী চলে যায় তার গান শেষ করে, কিন্তু তার গানের রেশ বাতাসের বুকে ভর করে ধ্বনিত হতে থাকে বহুক্ষণ পর্যন্ত। হয়তো এ-গানেরই উত্তর সে খুঁজে পায় আরেক বৈষ্ণবীর মুখে :

আগে মন না জেনে দিস্‌না গো নয়ন
রাধে করিলাম মানা।
বিরজা কয় আমি জানি,
সে যে মন চুরিরই শিরোমণি,
তারে দেখতে কালো, কথায় ভাল,
স্বভাব কিন্তু ভাল না ॥
আগে মন না জেনে দিস্‌না গো নয়ন,
রাধে করিলাম মানা।

নেবার কাজে যত সন্ধি,
নিয়ে করেন কপাট বন্দী,
শেষে ফিরে চান না ॥
তোমায় ঘরের বাহির টেনে নিয়ে
দিবে লো যন্তরনা।
আগে মন না জেনে দিস্‌না গো নয়ন ॥

এক সময় এ কথারও সান্ত্বনা পায় সে নিজের মনেই:

ও রে আমার পরের মন
পর বিনে জগতে কে আপন।
আমার পর লাগিয়া পরাণ কান্দে
কেউ না বোঝে আমার মন।
পর বিনে জগতে কে আপন ॥
মেয়েরা যায় পরের ঘরে
পরকে লয় আপন করে
শেষে হয় যুগল মিলন,
ওরে আমার পরের মন
পর বিনে জগতে কে আপন ॥

দেহতত্ত্ব

বৈরাগী ও বৈষ্ণবীদের গানের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ শাখাই হলো তাদের দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানগুলি। এদের একটি গানে দেখা যাচ্ছে একটি শবযাত্রাকে কি ভাবে তারা বিবাহের বর ও বরযাত্রীর দলের সঙ্গে তুলনা করেছে:

হারালাম এ কুল, আর ও কুল
কবে ফুট্‌বে আমার বিয়ার ফুল।
যাব চলন করি, বাঁশের দোলায় চড়ি
জাত বেহারার স্কন্ধে চড়ি,
সকল হবে ভুল।
আগে পাছে কাষ্ঠের বোঝা
ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা
শ্বশুর বাড়ি যাব নদীর কূল ॥

গেলে শ্বশুর বাড়ি, সবে ত্বরা করি
স্নান করাবে মোরে, করি গণ্ডগোল।
বরণ কুলাতে দিবে, বর শয্যায় শোয়াইবে
আট কড়া কড়ি দিবে তুলসীর মূল ॥
বরযাত্রীগণ, করাইবে বরণ
জনমের মত দিবে তেনা চারি আঙ্গুল।
উত্তর শিয়রি কৈরে, হাত পা ভাঙ্গিয়া মোরে
অনল জ্বালিয়া শেষে করিবে নির্মূল ॥
হয়ে মর্মাহত জাতিবর্গ যত
যোগ্য পুত্র হবে তার অনুকূল।
ঘৃত চন্দনাদি করিবে আহুতি
আগে পুড়িবে আমার মাথার চুল ॥

ভাই বন্ধু যত, সব দন্তের মত
শোকেতে কাঁদিয়া হইবে আকুল।
অভাগিনী জননী জনম দুঃখিনী
বুকেতে বাঁধিবে দুঃখেরি বাঁটুল ॥

যতেক নায়রী, সবে গড়াগড়ি
ভূমেতে পড়িয়া এলাইবে চুল।
(তখন) স্ত্রী গিয়ে পাছ দুয়ারে
কাঁদিবে বসে উচ্চৈস্বরে
(হায়) কে খাওয়াবে মোরে, গেল জাতিকুল ॥

বঙ্কিম বলে ভাই, সকলকে জানাই,
এ বিয়া ফিরাইতে লাগবে হুলুস্থুল ॥

যখন আসবে নিতে,
ঘটক রবিসুতে,
পারবে না রাখিতে দেখায়ে ত্রিশূল ॥

কিংবা :

অধরাকে ধরতে পায়, কইগো তারে তার।
আত্মা রূপে ঘুরে ফিরে মানুষ ধরার কলের পর।
ঘাট ছাড়া অঘাটে রাজে, যারা পথ ছাড়া অপথে চলে

ক্ষেণে আকারে, ক্ষেণে নৈরাকারে,

ক্ষেণে ধরা থাকে ক্ষেণে অধর।

প্রেম লোভে হেলে হেলে, প্রেম বিষ দিলে,

প্রেম জ্বালাতে অঙ্গ জ্বলে

বিষম বিফল আমার।

এনাত চাঁদের গুপী যন্ত্র, করে যে ফস্‌ ফস্‌,

বাজে না বুঝে না ওরে করে রে ঠস্‌ ঠস্‌।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কীর্তন ও সংকীর্তন

কীর্তনের সঙ্গে বাঙ্গালীর সম্পর্ক অতি নিবিড় যে দেশের মাটিতে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম সেখানে কীর্তনের প্রচলন যে একটু বেশি মাত্রায়ই থাকবে এ অতি স্বাভাবিক কথা। কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কীর্তনের প্রবর্তক নন। চৈতন্য পূর্ববর্তী যে কীর্তনগান ও পদের প্রচলন ছিল সেগুলিই মহাজন পদাবলী রূপে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এ সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা করেছেন বাংলার বিদগ্ধ জনমণ্ডলী, সুতরাং এ সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার অবকাশ এখানে বিশেষ নেই। কারণ, পদাবলী কীর্তন বা মহাজন পদাবলীকে আমরা লোক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না। কিন্তু অন্যদিকে বৈরাগী, উদাসীদের কণ্ঠে রাধাকৃষ্ণের নাম গান ও তাঁদের লীলাখেলা নিয়ে যে সব গীতি ও গাথার সৃষ্টি হয়েছে তাকে নিঃসংশয়ে লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এরও কারণ অতি সুস্পষ্ট,—সংকীর্তন বা নাম কীর্তনের পদকর্তারা সকলেই প্রায় নিরক্ষর—তাঁদের গান ছড়িয়ে রয়েছে একাধারে বাউল বৈরাগীর কণ্ঠ থেকে পুরঙ্গনাদের কণ্ঠে কণ্ঠে। ঝুমুর প্রভৃতির মতো এই নগর সংকীর্তন, নাম কীর্তন ও কালী কীর্তন সবই লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত।

কীর্তন, সংকীর্তন ও নাম কীর্তনের মধ্যে আমরা কীর্তন গানকেই অধিকতর ভক্তিমূলক বলে আখ্যা দিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক এক বৈরাগীর এই কীর্তন গান খানাকে :

হরি হে আমার এই বাসনা
হৃদয় মাঝে দাঁড়াও এসে,
আমার মনে এই বাসনা ॥
ননীচোরা রাখাল বেশে
হৃদয় মাঝে দাঁড়াও এসে,
আমার হৃদয় হবে কদমতলা
অশ্রুধারা হবে যমুনা।

হরিহে আমার এই বাসনা ॥

পায়ে নূপুর হাতে বাঁশী
ব্রজের খেলা খেল আসি,
আমার হৃদয় হবে ব্রজের মাটি
ভক্ত হবে ব্রজাঙ্গনা।
হরি হে আমার এই বাসনা ॥

নাম কীর্তনের ভিতর শুধু নামই সর্বস্ব। এই শ্রেণীর গায়কদের ভাষায় 'কলিতে নামই (হরির নাম) সত্য'। কাজেই তাঁদের গানে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা কিংবা তাঁর সম্পর্কে উচ্চ কোনো ভক্তিভাবের একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের অতি প্রচলিত একটি নাম কীর্তনের উল্লেখ করা চলে :

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর ॥

জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণ ধন মুকুন্দ মুরারী ॥

হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্য জনম যায় দিনে দিনে ॥

দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণার বৃন্দে ॥

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারেতে আইনু।
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হইনু ॥

ফল রূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কাল রূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে ॥

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকী উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করে ॥

বসুদেব রাখি এল নন্দের মন্দিরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥

পশ্চিমবঙ্গে 'শুক-শারীর দ্বন্দ্ব' নামে এক প্রকারের গানের প্রচলন আছে। এ গানগুলি অঞ্চল বিশেষে এক এক সুরে গীত হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ জায়গায়ই এগুলি ঝুমুর অথবা কীর্তনের সুরে গাওয়া হয়। মূলতঃ এগুলিও বৈরাগী ও বোষ্টমদের নাম কীর্তনেরই অংশ বিশেষ :

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের, রাই আমাদের।
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদন মোহন।
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরে ছিল।

শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।

শারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
ঐ যে যায়গো দেখা ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।

শারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে,
চূড়া তাইতো বামে হেলে ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন।

শারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ-চিন্তামণি।
শারী বলে, আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িণী,
সে তোমার কৃষ্ণ জানে ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে, সত্য বটে, বলে রাধার নাম,
নৈলে মিছাই গান ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছা-কল্পতরু,
নৈলে কে কার গুরু ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী,
শারী বলে, আমার রাধা লহরী-লহরী,
প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের কদম তলায় থানা।
শারী বলে, আমার রাধা করে আনা গোনা,
নৈলে যেত জানা ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে, আমার রাধার রূপে জগৎ আলো,
নৈলে আঁধার কালো ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী!
শারী বলে, সত্য বটে, সাক্ষী আছে বাঁশী
নৈলে হতো কাশীবাসী ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ-জীবন।
শারী বলে, আমার রাধা মধুর পবন,
নৈলে কী থাকে জীবন ॥

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গায় প্রেম গান।
শারী বলে, আমার রাধা প্রেম করে দান,
সে যে কৃষ্ণ-জীবন ॥

শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
রাধা কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল,
শ্রীবৃন্দাবনে চল ॥

পূর্ববঙ্গের উদাসী শ্রেণীর মতো পশ্চিমবঙ্গের টহল বাউলের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদেরও কাজ হলো অগ্রহায়ণের পহেলা থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত শেষ রাত্রে গৃহস্থের আঙিনায় ঘুরে নাম গান শোনান। এ গান কখনও রাধা কৃষ্ণের, কখনও বা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে। শ্রেণী হিসাবে এঁরাও বৈরাগী বা বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত। অনেক সময় এঁদের গানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাও ধ্বনিত হয়:

রাই জাগো গো
জাগো শ্যামের মনোমোহিণী বিনোদিনী রাই ॥
জেগে দেখ আর তো নিশি নাই
গো জয় রাধে ॥
শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়া
আছ রাধে ঘুমাইয়া
কুল কলঙ্কের ভয় কি তোমার নাই
গো জয় রাধে ॥

কিংবা : ভোর সময় কালে
শ্রীবাস আঙ্গিনার মাঝে
গহুর চাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে ।
উঠ উঠ শচীমাতা
নিতাই এল প্রেমদাতা
জগৎ মাতাইলো হরি কাঁদিয়া রে ॥

পশ্চিমবঙ্গে 'কালী কীর্তন' নামে এক প্রকারের কীর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়। কালী কীর্তন মূলতঃ শাক্ত পদাবলীরই অন্যরূপ মাত্র। যেমন মহাজন পদাবলীতে শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদই এর উপজীব্য, তেমনি শাক্ত পদাবলীতেও শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই লীলা মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়ে থাকে। মহাজন পদাবলীর বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, লোচনদাস, বলরামদাস, নরোত্তম দাসের মতো শাক্ত পদাবলীর রচয়িতা দ্বিজ রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও নীলকণ্ঠের নাম সর্বজনবিদিত। এঁদের আদৌ লোক-কবি বলা চলে না বা এঁদের পদকেও কেউ কোনোদিন লোকসংগীত আখ্যা দেবেন না এ কথা ঠিক, কিন্তু অনেক সময় বৈষ্ণব ধর্মের বৈরাগী বোষ্টমদের মতো অনেক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বা কালী সাধকের দেখা মেলে। তাঁদের কন্ঠ থেকে অনেক সময় কীর্তনের সুরেই শক্তিমন্ত্র তথা নাম গানও শোনা যায়। এই শ্রেণীর গায়কদের আমরা লোক-কবির দলে ফেলতে পারি। কারণ, এঁরাও সত্যিকারের জনসাধারণের প্রতিনিধি। এঁদের সাধনার পথ মাতৃ আরাধনা। এই তান্ত্রিক বা কালী ভক্তরা নিরক্ষর, কিন্তু এঁদের গানেও অনেক সময় দেহতত্ত্ব 'পদের' সন্ধান পাওয়া যায়—যেটা বাউল শ্রেণীর গানের অন্যতম লক্ষণ :

তাই তো আমি কালোরূপ বড় ভালবাসি
(আমার) হৃদয় মাঝে দাঁড়াও এসে,
ঘুচে যাক অমানিশি।

ও তুই কালের ছেলে কোলে উঠে মার
বেড়াস কত রঙ্গ ভরে,
যে জন তোরে চিনতে নারে
বৃথাই তার জনম ভবে।

তুই মুণ্ড মালিনী, খড়্গ ধারিণী
স্বামী রাখিস পদতলে,
এবার দেখ্ চেয়ে মা অন্নপূর্ণে
সৃষ্টি যাচ্ছে রসাতলে
কে বল তোকে চিনতে পারে ?

অথবা

এবার মায়ের নামে নৌকা খুলে
বসে থাক তরীর মাঝখানেতে,
তরী যদি শক্ত হবে, কী করবে তোর রবিসুতে
শ্যামা মায়ের নাম নিয়ে ভাই,
চালাও তরী নিশি দিনে।
বসে থাক তরীর মাঝখানেতে ॥

ওরে ছয় দুরন্ত আছেরে শমণ,
তাদের কী আছে লজ্জা সরম,
যখন হবে ইতি, দেখা দেখি,
মায়ের নামের দোহাই দিবি।

কালী বল, কালী বল, ছাড়রে মন অন্য সম্বল,
পথের কথা শেষ কর ভাই, নইলে হবে গণ্ডগোল।

কিংবা :

আমার শ্যামা মায়ের এমনি ধারা
না ডাকিলে দেয়না সাড়া,
ডাকার মত ডাকবো বলে,
হৃদ কমলা দিয়েছি খুলে।

এবার মা তোর অভয় বাণী,
বিলিয়ে দে মা জগৎ সভায়
ওমা তোর চরণে বলি দিলাম,
তন্ত্র মন্ত্র যত ছিল
এবার মা তুই কোলে নে
ধূলো ঝেড়ে আদর করে।
অধম চরণদাসে বলে,
মা মা বলে ডাক ভক্তি ভরে ॥

॥ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

চতুর্থ খণ্ড

[সাময়িক গীতি]

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশাত্মবোধক ও স্বদেশী গান

স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা স্বদেশী আন্দোলনেও যে লোক-কবিদের দান কিছুমাত্র কম নয় একথা আমরা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে মালদহের গম্ভীরা গান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই জাতীয় আন্দোলনের গান কোনো নির্দিষ্ট সুর বা বিশেষ কোনো শ্রেণীর ভিতর সীমাবদ্ধ নেই। উত্তর বঙ্গের মালদহ অঞ্চলে গম্ভীরা গায়কদল এই রাজনৈতিক গান পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছে। সেখানকার অধিকাংশ স্বদেশী গানই গম্ভীরার সুরে গাওয়া হয়। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার অঞ্চলে সাধারণ কৃষাণরাই এ গান গায়। পশ্চিমবঙ্গে বৈরাগী, বাউল ভিখারীরাই এর রচয়িতা ও গায়ক। স্থানভেদে আঞ্চলিক প্রধান সুরের মাধ্যমেই এইসব গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনা সে দিক দিয়ে অগ্রসর না হয়ে গানের বাণী নিয়ে আলোচনা করলেই মনে হয় এই জাতীয় গানের প্রতি সুবিচার করা হবে। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গে তথা সমগ্র বাংলায় প্রচারিত অজ্ঞাতনামা এক ভিখারীর রচিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসি নিয়ে রচিত গানটির কথাই ধরা যাক। নিরক্ষর লোক-কবিদের এইসব গানে যেমনি সাময়িক ঘটনার কথা উল্লেখ থাকে তেমনি এর ভিতর ইতিহাসেরও যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান থাকে।

শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময় লোক-কবিরা যেন তারই মুখের কথা পরিবেশনের দায়িত্ব নিল :

একবার (এ বার) বিদায় দাও মা ঘুরে আসি,
হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী।
ওমা কলের বোমা (মাটির বোমা) তৈরি করে,
বসে ছিলাম লাইনের (রাস্তার) ধারে,

ওমা বড়লাটকে মারব বলে

মারলাম ভারতবাসী,

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি ॥

শনিবার দিন বেলা দশটার কালে,

লোক ধরে না হাইকোর্টেতে,

অভিরামের দ্বীপ দ্বীপান্তর মা

ক্ষুদিরামের ফাঁসি।

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি ॥

হাতে যদি থাকত ছোরা,

তোর ক্ষুদি কী পড়ত ধরা,

রক্ত মাংসে এক করিতাম

দেখত জগৎবাসী।

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি ॥

দশমাস দশদিন পরে,

জন্ম নিব মাসীর ঘরে,

চিনতে যদি না পারিস মা,

দেখবি গলায় ফাঁসি।

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি ॥

এই রকম আর একটি অতি প্রচলিত স্বদেশী গানের উল্লেখ করা যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে যশোহর জেলার এক লোক-কবি কর্তৃক রচিত একটি গীত। পরে এই গানটি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সামান্য সামান্য পরিবর্তন করে গীত হয়েছে। এ গানটিকে এক কথায় সমগ্র বাংলা দেশেরই সম্পদ বলে ধরে নেওয়া যায়। এর ভিতর পূর্বোক্ত গানটি অপেক্ষা অধিকতর ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়:

চিত্তরঞ্জন স্বদেশী প্রাণধন

ত্যাজিলেন জীবন দার্জিলিং গিয়ে।

মৃত্যু সমাচার টেলিগেরাপ পেয়ে তার

ভারত সব হাহাকার উঠল কাঁদিয়ে ॥

তেরশ বত্রিশ সালে দোসরা আষাঢ়,

পরলোক গমন করিলেন এবার,

কাঁদে বাসন্তী দেবী সি. আর. দাশের লাগি,
স্বদেশী অনুরাগী গেল ছাড়িয়ে ॥
ত্তেসরা কলিকাতায় পাঠালেন অঙ্গ,
ইঞ্জেকশন করে দিলেন সর্ব অঙ্গ,
সাজিয়ে নানা ফুলে গাড়িতে লয়ে তুলে,
হরিবোল হরিবোল বলে যাচ্ছে চলিয়ে ॥
চৌঠা সাতটায় প্রাতঃকালে,
শিয়ালদা স্টেশনে নামিয়ে দিলে,
লোকেতে লোকারণ্য স্বদেশী যত সৈন্য,
শোকেতে হয়ে মগ্ন রয়েছেন চেয়ে ॥
শ্মশানে লয়ে যায় হ্যারিসন রোড্ দিয়ে,
করপরেশন ইন্স্টিট্যুট্ চৌরুঙ্গি হয়ে।
ঘুরে যায় বহুদূর,
রসা রোড ভবানীপুর,
কালীঘাট কেওড়া তলায়
পৌঁছিল গিয়ে ॥
সৎকার্যের তরে মহাত্মা গান্ধী,
চির শয্যার তরে বাঁধিলেন বেদী,
আনিয়া চন্দন কাষ্ঠ সাজাইয়া নর শ্রেষ্ঠ,
ঢালি উৎকৃষ্ট ঘৃত দিল জ্বালিয়ে ॥
অসার সংসার রামকৃষ্ণ ভাবে
হরি বলিতে প্রাণ কবে এ প্রাণ যাবে,
গোসাঁই গোপালের চরণ,
করি আমি নিবেদন,
দিও ছিচরণ অন্তিম সময়ে ॥

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি জাতীয় আন্দোলন বা স্বদেশী গান গাইবার জন্য নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর লোক নেই, সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায়ের লোকই এগান গাইতে পারে। তবে যে শ্রেণীর গায়করা এ গানগুলি গায় তাদের মুখে এগানের সুর তাদের স্ব স্ব সুরেই গীত হয় মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের 'সুবার বন' ট্রেনের অন্ধ ভিখারীর দল এগানগুলি গায় তাদের একটা নিজস্ব ভঙ্গিতে।

তারা কখনও গায় মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে কখনও বা একতারা সহযোগে। এই হাঁড়ি বাজিয়ে গায়করা এক শ্রেণীর লোক। তাদের গানের সঙ্গে অন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। ডায়মণ্ডহারবার, তারকেশ্বর ও নৈহাটী রাণাঘাট অঞ্চলে এই শ্রেণীর গায়কদের দেখা পাওয়া যায় সব চাইতে বেশি করে। এদের অধিকাংশের পেশা ভিক্ষাবৃত্তি। কেউ কেউ অবশ্য এর মধ্যে ছোটখাট মজুর বা জোগানের কাজও করে। তবে এই হাঁড়ি সেই সঙ্গে সঙ্গে 'আড বাঁশী'-ও বাজায়। রেলের বিভিন্ন কামরায় ঘুরে ঘুরে তারা গান গায়। কখনও কখনও শহরের বুকেও এক কোণায় সাময়িক আস্তানা গাড়ে। এদের দৃষ্টি বড়ই স্বচ্ছ। রাজনৈতিক খবরাখবর এরা সংগ্রহ করে রেলযাত্রীদের মুখ থেকেই, আবার তাদের কাছেই সেই সব শোনা কথাই গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করে।

শহীদ যতীন দাসের মৃত্যু হয়েছে অনেক দিন। নব্য বাংলার অনেকেই হয়তো তাঁকে ভুলতে বসেছেন। কিন্তু এরা—এই ভিখারী গায়কদল এখনও তাঁকে ভুলতে পারেনি, তাই স্বাধীনতার পরেও তারা গান বাঁধে তার উদ্দেশ্যে :

যতীন দাস ত জেলে মোলো
ভারত স্বাধীন দেখলে না,
সোনার ভারত দুখান হল
কারও কথা শুনলে না।
তেষট্টি দিন উপোস করে
বলি হল মায়ের পায়ে,
তেমন নেতা আর কী হবে
রঙ্গ ভরা এই বঙ্গে।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহী সুভাষ আজ দেশান্তরিত। ভারতবাসী জানে না তিনি কোথায়। আস্তে আস্তে তাঁর কথাও হয়তো দেশবাসী ভুলতে বসবে, কিন্তু এই ভিখারী শ্রেণীর গায়কদল কী সহজে ভুলতে দেবে তাঁকে ? :

ভারতের রত্ন নেতাজী সুভাষচন্দ্র
কোথায় রয়েছ তুমি আমাদের ছাড়িয়া।
তোমার আশাতে আজি মোরা বাঙালী
দরশন দাও এসে কোরনা কাঙালী।
শত শহীদের আত্মত্যাগেতে
পাইল ভারত স্বাধীনতা,

বড় দুঃখী মোরা, হয়ে ভাগাহারা,

ঘুচল না তবু পরাধীনতা।

স্বাধীন ভারতে না খেয়ে মরে লোক,

হেন দুঃখের কথা শোনগো বিধাতা,

তুমি পরিত্রাতা, এসে দাও দেখা,

কোরনা কোরনা এ অনাথা ॥

পাঠকগণ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যুগের পরিবর্তনের সংগে সঙ্গে দীন ভিখারী বাউলের দলও আজ আর শুধু মাত্র বড় বড় নেতাদের গুণ কীর্তন করেই ক্ষান্ত হতে চায়নি, তারাও আজ নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলবার চেষ্টা পাচ্ছে। এই ধরনের গান আরও স্পষ্ট, আরও গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে জলপাইগুড়ির লোক-কবিদের কণ্ঠে। এই সব নিরক্ষর লোক-কবিদের রাজনীতি জ্ঞান যে কত গভীর, জলপাইগুড়ির শবনেশ্বরী নাম্নী এক বৃদ্ধার রচিত একটি স্বদেশী গান থেকেই তা প্রমাণ পাওয়া যায়:

স্বদেশীর গান গাম হামেরা শুন তমরা,

স্বদেশীর গান গাম হামেরা ॥

হালুয়া না হাল বয়, করে ধানা পাটা,

কত ধনী না পায় আরো চা-বাগানের টাকা।

শুন তমরা, স্বদেশীর গান গাম হামেরা ॥

জমিনের খাজেনা বিদ্ধি শষ্য হচ্ছে কম,

খাইতে নিতে ধনি গিলার সদায় পরে ফম্।

পাঙ্জালা পরি সে ঢিংগাইত,

গান বাজানাত মন।

শুন তমরা স্বদেশীর গান গাম হামেরা ॥

খাইতে নিতে ধনি গিলার পেটত পড়ে বিষ,

সগায় মিলি দিলেক ভোর শেষ হবে কি।

শুন তমরা স্বদেশীর গান গাম হামেরা ॥

ধনে পাটত নাই দর কিশোত হোবে টাকা,

কত ধনির পায়ে দেখ পিন্দিসে ফাড়া জুতা।

আলু বাইগনত নাই দর টাকা হোবে কিশোত,

ভুঁইকম্পতে মানষি মইল, শুনিলেক গেজেটোত।

শুন তমরা স্বদেশীর গান গাম হামেরা ॥
দালান ভাঙিগল মাটি ফাটিল আরো উঠিল ভুল,
সাইবের গুদামত দেখ ফুটিসে নানান ফুল।
আর একটা কথা মাগো কইতে নাগে ভয়,
অচনা করিয়া গান শবনন আড়ী গায় ॥

উল্লিখিত গানটির সঙ্গে মালদহের গম্ভীরা গানের তুলনা করা চলে। এই প্রসঙ্গে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। বাংলার বাইরে এসম্পর্কে প্রচুর গান ও গাথার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলায় এসম্পর্কে বিশেষ কোনো গান বা গাথা আজ আর পাওয়া যায় না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে কেউ কেউ বলেছেন 'গণ-অভ্যুত্থান', কেউ কেউ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ বলেও বর্ণনা করেছেন, আবার কোনো কোনো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছেন। সে সবই তর্কের কথা, ঐতিহাসিকগণ এসম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে, লোক-গীতি সংগ্রাহক হিসেবে মাত্র একটি অতি প্রাচীন গীতের যা সন্ধান পেয়েছি, আপনাদের কাছে তাই উপস্থিত করছি, আপনারাই এসম্পর্কে রায় দান করবেন, আমরা সংগ্রাহক মাত্র।

চব্বিশ পরগণার মণিরামপুর অঞ্চলে এক প্রাচীন বৈরাগীর মুখ থেকে এসম্পর্কে যে গানটি শুনেছিলাম আপনাদের কাছে তা-ই নিবেদন করছি :

কি সব্বনেশে কথা যাদু বলি গো তোমায়,
কলিযুগের মাহিত্নম দোষ দিওনা আমায়।
নবাব বাদশা গেল তল,
উর্দি পরা চ্যাংড়া বলে কত জল।
হায় হায়রে যাদু বলি গো তোমায়,
ফাঁসি কাষ্ঠে মরণ হইল পাণ্ডা মহাশয় (মঙ্গল পাণ্ডে)।
বেরেলীতে দাঙ্গা হইল ফৈজাবাদে আটক রয়,
যতসব রাজপুরুষ মেম আর সাইব মহাশয়।
দেশে দেশে লাগল ধান্দা
হিন্দু আর মুসলমান
জাতির পতিত অতি গর্হিত
এই দুঃখে সব করে বিহিত।

হিন্দুর অখাদ্য খাদ্য গোমাংস,
মুসলমানের হারাম শুকর মাংস,
দুইয়ে মিলে টোটা বানায়,
সাদা চামড়ায় গুলি চালায়।
আরো আছে মজার কথা কইতে লাগে ডর,
কোম্পানীর ফৌজ আসি কান্ধে করবে ভর।
এই সব হল আত্মগ্লানি বহুদিনের ব্যাধি,
দুই ভায়েতে একসাথেতে উঠল এবার মাতি।
ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তুঙ্গ ঘোড়ায় চড়ে,
বীর দর্পে শস্ত্র চালায় ইংরাজ মাঝারে।
ও তার মূর্তি দেখে ভিরমী নাগে, চোক্ষে ছোটে বজ্রপাত,
শত্রুসেনা কেটো চলে সঙ্গে নিয়ে দশটা হাত।
মাগো তোমায় গড় করি গো সঙ্গে নিও বরাভয়,
শত্রুসেনা ধ্বংস করি এসো তুমি এ বাঙ্গালায়।
হায়গো মোদের আশা ভরসা, সব বুঝি ফুরাল,
কোম্পানীরই জয় হল, আশার প্রদীপ নিভল।
মরল যত গুলি খেয়ে, দেশের বড় নেতা,
তাই না দেখে দেশবাসীর ধরেছে আজ মাথা।
অধম রাধানাথে বলে শেষে ধরি দুটি হাত,
একস্ত্র হইও ভাই না করিও বিসম্বাদ।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বা গণজাগরণে পূর্ববঙ্গের লোক-কবির দানও নগণ্য নয়। বঙ্গ-ভঙ্গের (১৯০৫ খ্রীঃ অঃ) আমল থেকে সর্বশেষ স্বাধীনতা প্রাপ্তি তথা ভারত বিভাগ (১৯৪৭ খ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত দেশের সকল আন্দোলনেই তারা সাড়া দিয়েছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার লোক-কবির দলও গান বাঁধল (১৯৩৯—'৪৫ খ্রীঃ অঃ) :

এবার শ্যাত ইন্দুরে করল সারা,
ভাইরে, ধানের বাজার হইল আক্কারা।
গরু বাছুর, মাইয়্যা মানুষ,
ছাওয়ালপান, যুবা পুরুষ
একই ভাবে হইল হারা (সারা)।

যুদ্ধ লাগছে রাজায় রাজায়,
মধ্য থিকা মইল পেরজায়,
নেতাগো সব ফাঠক দিছে
উচিত কথা কইবে কে ?

কইলে পরে জরিমানা, গারদখানা,
ভাতে মারা, দ্যাশ ছাড়া,
আছে মোগো সগল জানা।

(আবার) এতেও নাকি সোয়াস নাই,
বসাইছে কনট্রোল,
(ও ভাই) চাউল হইয়্যাছে পঞ্চাশ টাহা
চৌদ্দ পুরুষে যা শুনি নাই।

কেরেচ ত্যাল পাওয়া যায় না,
চিনিত চোখেই দেহি না,
গেরামের যত বাবু ভূঁঞা
গুড় দিয়া চা খাইয়্যা,
ফুড কমিটি করছে খাড়া।

যে সময় রাজনৈতিক আলোচনা এমনকি যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করলে যেখানে শাস্তির ব্যবস্থা, সেই পূর্ববাংলার নিভৃত অঞ্চলে আবার জেগে উঠল চারণের দল। তারা পুলিসের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করেই নতুন নতুন গান বাঁধল :

(ও) ভাই দ্যাশের কী দশা হইল,
ভারতবাসীর ঘরে ঘরে চাল নাই যে মেলে,
ভাইরে দ্যাশের কী দশা হইলে।
আলু, পটল, কলা, কচু, বাজারে যে না পাই কিছু
সব খেয়ে গেছে ঐ বানর ছুঁচো, রইতে নাহি দিল
দ্যাশের কী দশা হইল।
ব্রাহ্মণাদি ভদ্র মুচি, সব হইয়্যাছে এবার শুচি
ভেবে দেখুন ভাই মিছামিছি, তারা একই হালে চলে
ভাইরে দ্যাশের কী দশা হইলে।

বাবুলোকের দফা সারা, অন্নাভাবে যায় যে মারা
এখন বলে ও মা তারা, তুমি ক্যানে নিদয় হলে
ভাইরে দ্যাশের কী দশা হইলে।
যদি বলেন ক্যামন কথা রেশন কার্ড যে পিতা মাতা,
কন্ট্রোলের লাইন ধরলে
আর দ্যাশের কী দশা হইলে!
অধম যতীন বলে বিনয় করে, এই ভারতের ঘরে ঘরে,
জেগে উঠুন হুহুংকারে, নেবে আসুন দলে দলে
নইলে দ্যাশের কী দশা হইলে।

এগিয়ে এলো ১৩৫০ বঃ অঃ (১৯৪৩ খ্রীঃ অঃ)-এর কুখ্যাত দুর্ভিক্ষ। অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে ঔষধের অভাবে অসহায়ের মতো মরতে লাগল অসংখ্য নরনারী। দেশের এই দুর্দিনে দেশবাসীর কথা শোনাবার ভার নিল এই নিরক্ষর লোক-কবির দল :

মোদের ধন্য দেশের চাষা
এদের চরণ ধূলি পড়লে মাথায় প্রাণ হয়ে যায় খাসা
তবু এরা আছে ভালো, অন্নের জ্বালায় রাইদি মইল,
বলব কি আর সেসব কথা, একতা হইতে করে নাশা।
সোনা রূপা যত ছিল, ব্রিটিশ গবরমেন্ট সব হইরে নিল,
শ্যাষে কাগজ এসে উদয় হইল, নিল তামা কাঁসা।
মোদের ধন্য দেশের চাষা॥
এক মায়ের সন্তান হয়ে, জাতের গৌরব ছেড়ে দিয়ে,
নচেৎ গেল সময় বয়ে পরে দেখবে কুয়াশা।
যাদের ঘরে ধানের মোড়া, তারা আছে দেশের সেরা
আর দ্যাখেন সব ন্যাড়া মুড়া তারা জাতির নিন্দায় বড়ই খাসা॥
তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী, চিন্তা করেন কেন বসি,
এবার করুন মিশামিশি, নিশ্চয় ভারত হইবে আশা॥
আমরা হইলাম এমনই শিষ্ট, ভাত কাপড়ে পাইলাম কষ্ট,
এমনি মোদের দুরাদৃষ্ট সোনা নিয়ে দিল সীসা,
ধন্য মোদের চাষা।
ভারতবাসীর যত সুখ, প্রাণে বড়ই লাগে দুঃখ,

বজরা খেয়ে হল অসুখ, তারা নদীর জলে ভাসা

মোদের ধন্য দেশের চাষা ॥

অধম যতীন বলে বিনয় করি, ভারতমাতার চরণ ধরি,

তুমি মাগো হয়ে কাণ্ডারী, পার করে দাও এই ভরসা ॥

এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর ডাণ্ডী যাত্রা, ঐতিহাসিক লবণ আন্দোলনের কথা মনে পড়ে নিশ্চয়ই। সারা ভারত জুড়ে জেগে উঠেছিল যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ পূর্ববাংলার নিভৃত কন্দরে গিয়েও সে আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছল। পূর্ববাংলার নিরক্ষর লোক-কবির দল গান বাঁধল :

এবার বন্দেমাতরম্ বল সর্বজন,

শুনহে ভারতবাসীগণ।

এবার মহা উৎসবে ডাক মাকে ভক্তি ভাবে

তবেত সুধিবে জীবে এত কার্য সাধন।

ত্যাজ বিলাতী বসন, বিলাতী ভূষণ, বিলাতী চিনি ও লবণ,

কেহ আর কোর না গ্রহণ।

এ যে সকল জাতির ধর্ম নষ্ট, হতেছে এ কুভোজনে।

এ-সকল অজ্ঞাত পাপ, ধর্ম বই আর কেউ না জানে,

তাই এখনে সবে জেনে শুনে, ঘৃণা উছলিল মনে,

যে কদিন আর প্রাণ বাঁচে কোরনা গ্রহণ,

এবার বন্দেমাতরম্ বল সর্বজন।

আছ যত হিন্দু-মুসলমান—সবে হলে ভাই বুদ্ধিমান,

রক্ষা করতে চাও যদি ভাই স্বধর্ম সম্মান।

এ কাজে যে হয়েছে ব্রতী, ব্রতী হয়ে তার প্রতি

ঘুচাও ভারতের দুর্গতি।

সম্প্রতি হয়ে এ সম্পত্তি জনেতে কোরনা হেলা

দূরে যাবে সকল জ্বালা।

দিওনা প্রাচীন হেলায় সেই পাপ সাগরে বিসর্জন,

এবার বন্দেমাতরম্ বল সর্বজন।

আছ যত জ্ঞানী গুণী,—এবার দেখ মুনি গুণী

আহা মরি, আহা মরি, কী আশ্চর্য মহীয়সী

যে বেটা আনল কাঁচের চুড়ী, বলে দিল্লীর দরবার

কী বাহার বাহার মেরে নিল তুলে স্বর্ণ, রূপা, মণি মুক্তাহার।
মনোরঞ্জন বলে ভাই, এ-সব নেহাৎ একেবারেই কর পরিহার।
মিছরী ও লবণ চিনি, সবই দেও বিসর্জন,
এবার বদন ভরে বলরে সবাই বন্দেমাতরম্ ॥

শুধু বাইরের কথা নয়, দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনার্থে যে-সব সত্যাগ্রহীরা হাসি মুখে বরণ করল কারাগার, তাদের সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কেও তারা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছে। জেলে এই সব রাজবন্দীদের খুনী-আসামী চোর-পকেটমারদের কাছ থেকে কিছুমাত্র পৃথক ব্যবস্থা করেনি। এক কথায় রাজবন্দী আর চোর, চোট্টা, বদমায়েস সবাইকে একই জায়গায় থাকতে দেওয়া হয়েছিল। জেল প্রত্যাগত জনৈক রাজবন্দী তাই তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনাচ্ছলে বলছেন :

মনরে ছোবার দড়ি পাকাও!
আর সকাল বেলা লপসি খাও ॥
দেশের কার্যে এলেম জেলে,
স্নান কর মন ড্রেইনের জলে,
আবার প্রস্রাবে পায়খানায় গেলে,
দুর্গন্ধে নাক টিপিয়ে রও ॥
মধ্যাহ্নে ভাতে তরকারী,
অসিদ্ধ চিবাইয়ে মরি,
এবার ডালেতে তেঁতুল যোগ করি,
চোখ বুজিয়ে মুখেতে দাও ॥
বৈকালে মৎস্যের ঝোল,
মৎস্যহীন কাঁটার গণ্ডগোল,
আবার শয্যার সাজ রয়েছে কম্বল,
তাহাতে শুইয়ে নিদ্রা যাও ॥

এই হলো দেশপ্রেমিকদের জন্য সরকারী সুবন্দোবস্ত !! অবশ্য এ অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তনও যে না হয়েছে পরবর্তীকালে এমন নয়। কিন্তু তা খুবই নগণ্য ধরনের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫ খ্রীঃ অঃ) পরও যখন বিন্দুমাত্র পরিবর্তন

ঘটল না দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার, অন্নবস্ত্রের অভাব তখনও পুরামাত্রায় বিদ্যমান, সবেমাত্র মুক্তি পেয়েছে ভারতের মুক্তি তাপসগণ, তখন দেশের সেই সময়কার অবস্থা নিয়ে অখণ্ড বাংলার পল্লীকবিরা শেষবারের মতো রচনা করল তাদের গান :

মাগো বিশ্বপ্রসবিনী তারা, ঘুরিস বিশ্বময়,
সঙ্ সাজিয়ে রঙ দেখিস মা, কলির জেলখানায়।
আমি তাই ভাবি মনে, দিনে দিনে, দেখে কলির কাল,
মেয়েলোকের তামুক খাওয়া এ আর এক জঞ্জাল।
মাগো মা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর শ্রেষ্ঠ, কলি কিসে হীন ?
অন্নবস্ত্রের অভাব মাগো বাড়ে দিনে দিন।
পুত্র না মানে শাসন, পিতার বচন, ও সে স্বাধীন ভাবে রয়,
কত কুলনারী, ছেড়ে পতি, মা সতীত্ব বাড়ায়।
যে যুগে রবিঠাকুর, প্রফুল্ল রায়, দেশবন্ধু আর সুভাষচন্দ্র বোস,
শ্যামাকান্ত, গোবর গণেশ আর জগদীশ বোস।
স্বামী প্রণবানন্দ, কপাল মন্দ, গিয়াছেন ছাড়িয়া,
সেই হতে ভারতে এলো মাগো দুর্ভিক্ষের ছায়া।
গরীবের পোড়া কপাল, ক্রোশিন তেল না পাওয়া যায়,
কেহ সারারাত্রি হ্যাজাগ জ্বালায়, কেহ আঁধারে ভাত খায়।
মাগো মা, চেতাবাণীর বাণী পেয়েও বাঁচলাম পঞ্চাশ সাল,
বজরা খেয়ে পাঁজরা শুকায়, হায় পোড়া কপাল ।
মাগো মা একান্ন সালে এলো মাগো ফুড কমিটির দল,
তাহা দেখে ভরসা হল. ঘটল তাই কু-ফল।
মাগো উপার থেকে রেশন পাঠায় সরকারে,
পথে পেয়ে একচাটা দেয় শৃগাল কুক্কুরে ।।
মাগো মা আর কতকাল কাঁদাবি, ইন্দ্রজিৎ রাবণ নন্দন
ইন্দ্রজিৎ করিত মাগো রণ মেঘের আড়ালে
এখন কত শত ইন্দ্রজিৎ আকাশেতে চড়ে ।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শুরু হলো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ফলে সমগ্র বাংলা তথা ভারতব্যাপী দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। আর এই দাঙ্গার অজুহাতে শয়তান ইংরেজ সরকার গ্রহণ করাতে বাধ্য করল ভারত বিভাগের প্রস্তাব।

আর এই প্রস্তাবের ফলেই ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদ করে গঠিত হলো সম্পূর্ণ দুটি নূতন রাষ্ট্র, আর তখন থেকেই পূর্ববাংলা থেকে শুরু হলো বাস্তুত্যাগের হিড়িক।

প্রথমে ধনীমানী, ইতর-ভদ্র শেষটায় বাদবাকী প্রায় সকলেই একবস্ত্রে ভিখারীরও অধম হয়ে এসে জুটতে লাগল কলিকাতা ও তার আশে পাশের পল্লী অঞ্চলে।

কিন্তু এই দুর্দিনেও যে সহজ সত্যটা বড় কর্তাদের নজরে পড়েনি, সেই কথাটা গিয়ে দানা বেঁধে উঠল পল্লীকবির কণ্ঠে। তারা দেশ ছেড়ে আসবার আগে আর একবার তাদের দল সাজাল। শেষবারের মতো তারা গান বাঁধল :

আর রইল না মান, গেল মানীর মান
পান যদি ত্রাণ, এখন এক হোন সকলে।
হিন্দু হয়ে হিন্দু জাতির নিন্দা ছাড়ুন সম্প্রতি,
নচেৎ দেখুন হবে ইতি, সব আশা যাবে বিফলে।।
যত ছিল আশা ভরসা, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সবই নৈরাশা
এখন লোকের দিশা বিশা, হারা হৈল ভাই কর্মফলে।
বহুদিনের মাতৃ বলে, ভারতবাসীর চাপা কলে
সাদা ইঁদুর দলে দলে, ঠাণ্ডা হয়ে যান চলে।।
তাদের ছিল চক্ষু হল অন্ধ, শেষে করে চক্রান্ত,
ভাইয়ে ভাইয়ে লাগল দ্বন্দ্ব, সর্বক্ষেত্রে দেখা গেল।
শেষে সোনার ভারত করলে শ্মশান,
হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান,
শেষে করে যায় এই বিধান,
তাও বুঝি আজ যায় বিফলে।
অধম যতীন বলে বিনয় করে, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে
জেগে উঠুন ভাই হুহুঙ্কারে, নেমে আসুন দলে দলে।।

কিন্তু এত যে আন্তরিকতা, এত যে উচ্ছ্বাস সবই গেল বিফলে। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাস থেকেই (দুর্গা পূজার পর) শুরু হলো প্রবল ভাবে বাস্তুত্যাগের হিড়িক এবং তা আজও সমানেই চলছে।

কিন্তু ভিটেমাটি ত্যাগ করে, এত কালের পরিচিত বাসভূমি, জননীর চাইতেও যে বড় মাতৃভূমি তাকে পরিত্যাগ করে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে এসে

এই বাস্তুত্যাগীর দল যখন আশ্রয় নিল উদ্বাস্তু শিবিরে তখন তাদের কিরূপ সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছে, বা এই সব বাস্তুত্যাগী উদ্বাস্তুরা তাদের ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষাকে কতটুকু রূপ দিতে পেরেছিল তার একটি অতি নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের কোন একটি উদ্বাস্তু শিবিরের জনৈক বৈরাগীর গানে :

এ দ্যাশে বসতি নাইরে শোন শোন ভাই,
বিধাতার অভিশাপে (কোপে) হেথায়,
নাহি মোর গো ঠাঁই।

নিজ দ্যাশে আমরা আছি হইলাম পরবাসী,
বুথায় গ্যাল শীতলাক্ষা, গয়া, গঙ্গা, কাশী।
(বিধি কী সুখে বসতি করি)।

বড় আশায় বুক বাঁধিলাম সাগরে ঝম্প দিয়া,
দারুণ বিধির ফ্যারে, বজ্জর পড়ে ভাঙ্গিয়া।
(বিধি কী সুখে বসতি করি)।

বাস্তুত্যাগীর মরম কথা, শোনলে প্রাণে লাগবে ব্যথা
(ও) তারা সোনা ফেইলা পিত্তলঃনিয়া
উজানে দ্যায় সাঁতার।
(বিধি কী সুখে বসতি করি)।

(আবার) রিলিফ মাস্টার অপিচার হয়,
কথায় কথায় মুখ ঝামটা দ্যায়,
কানে ধইর‍্যা করে অপমান
হায় বিধি কী সুখে বসতি করি শোন শোন ভাই।
ছিল দালান কোঠা- ঘর দরজা,
পুকুর, দিঘি, ফুল বাগিচা,
হারে পদ্মা ম্যাঘনা পর হইল
ছাড়লাম জনমভূমি
বিধি কী সুখে বসতি করি।

আজ মনে পড়ে তাদের ছেড়ে আসা গাঁয়ের কথা, সেই কোকিল ডাকা আম বাগান, ঝিঁঝিঁ ডাকা আশ-শেওড়া বনের কথা, সেই সঙ্গে মনে পড়ে তাদের বিদায়ের লগ্নে পূর্ববাংলার মুসলমান জারি গাইয়েদের ব্যাকুল আহ্বান :

স্বাধীন দ্যাশে লোক পালাইল

এমন খবর শোনছ নি ?

বাপ দাদার ওই ভিটা ছাইড়্যা,

চলছে সবে বিদ্যাশে কি ?

হিন্দু-মোছলমান একই জাত ভাই,

একই দ্যাহের দুইডা হাত,

কেউ কারু নয় শত্তুররে ভাই,

দুইয়ে, দুইয়ে মিত্তির হয়।

রোজ সকালে আজান গান,

আর বেরাম্ভনের মোন্তর পাঠ,

সন্ধ্যা কালে নেমাজ পড়ে,

কুলনারী পীদ্দুম দ্যায়,

এক সাথেতে রইছি মোরা,

এক সাথেতে করছি খেলা,

একই সঙ্গে চলছি ফিরছি

এখন ক্যানে ভিন্নভাব ?

(ও ভাই) পরের কথায় পরের ভরসায়

ছাইড়ো না দ্যাশ মাথা খাও।

কিন্তু এই দরদী জারি গাইয়েদের ব্যাকুল আহ্বান বিফলেই গেছে। যারা একবার চলে এসেছে, তারা আর কেউ ফেরেনি সেখানে।

দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে কিছু কিছু গান মুর্শিদাবাদের 'ভারবোল' উৎসবের সময়েও শোনা গেছে :

পঁইতাল্লিশ সাল জীবনের কাল ডুবে গেল ধান।

হল তারপরে ক'বছর অন্তরে হিন্দু-পাকিস্থান ॥

ওগো পশ্চিম হতে এজগতে উঠেছিল ঝড়।

লোকে আস্তাহারা পাগলপারা জীবন শূন্য ধড় ॥

হাঙ্গামা দাঙ্গামা কত মামলা মোকদ্দমা।

(ওগো) তাজা মানুষ হয় বেহুঁশ কোলকাতায় বুমা ॥

লোকে পাগলপারা প্রাণে মরা দেখে গুবার দল।

(ওগো) পাইলে দিশে ভাবে বসে আকাশ আর পাতাল ॥

বড় দুঃখের কথা বলতে ব্যথা লাগে এসে বুকে।
(ওগো) বাস্তুহারা ভিটে ছাড়া হয়্যাছে কত লোকে ॥
(ওগো) কেহ রাজা কেহ প্রজা কেউ পথের কাঙাল।
গাছতলা তিনতলা যার যেমন কপাল ॥
পাগলরে মন কিসের কারণ ভাবছো অনিবার।
একবার দেখ ভেবে কখন হবে দুনিয়া আঁধার ॥
খাঁচা ছেড়ে যাবে উড়ে কখন খাঁচার পাখী।
তাই করবনা দেরী অল্পে সারি অন্য আছে বাকি ॥

কিংবা :

ক্যানে এসেছিল ওগো উনপঞ্চাশ সাল।
সেই থেকে ঘটছে লোকের দুরাঢ় পিণ্ডিহাল ॥
(ওগো) পাই না খেতে পরনেতে মিলে না কাপড়।
উপবাসে থাকে বসে বসে ঠিক যেমন বাঁদর ॥
দুটো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাহা থাকে কি ভাবিতে।
য্যামনি ভাসে কোলমীলতা আকুল পাথারেতে ॥

অথবা :

ধন্য বাহার গরীব প্রজার বিধি হল বাম।
(দেখে) করতে রাস্তা বস্তা বস্তা সস্তা করেন গম ॥
গো-ডাইনে যখন এনে ভর্তি করেন গম।
লোকে ভাবে এল ভবে দুঃখের অষুধ অনুপম ॥
(ওগো) কলে দিয়ে গম পিষিয়ে বের করে আটা
পেটে খেয়ে রুটি ছুটাছুটি রিলিপের মাটিকাটা ॥
যত মজুর মুটে দিন খেটে পাই আড়াই সের গম।
কেহ করে বুদ্ধি জোরে বোঝাই নিজ গুদাম ॥
যাক, যে যা পারে সেই তা করে এ ভব সংসারে।
কবে সুখের স্বপন ভেঙ্গেরে মন যেতে থাকে গরে ॥
শুকবিলাসে ভবে এসে কাটিও না দিন।
কেও মনের ভুলে থেক না ভবে কয়দিনের অধীন ॥

ভারবোলের মতো এই অঞ্চলের আলকাপ গানের ভিতরও অনেক সময় তারা তাদের কথা বলেছে :

দাদা গরিব ভাইদের দুঃখ দেখে বাঁচে না পরাণ
ইহার চেয়েও দুঃখ পায় শিক্ষিত জন গো ॥
চাকরী করবে বলে ছেলে
পিতা তাদের দেয় ইস্কুলে,
ছেলে চাকরী করবে বলে,
তারা ডিগ্রী ধরে নিলে গো।
সরকার একটা চাকরী দিল
মনে ভাবে ভাগ্য ভাল।
উপরে ব্যাকিং যাদের ছিল,
তারা চাকরী কেড়ে নিল গো।

বাংলা ভাগ হলো হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানে। এর ফলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে এসে বাসা বাঁধবার পরেও তাদের কী অবস্থা হয়েছিল আমরা একটু আগেই তা দেখিয়েছি। কিন্তু দলে দলে পলায়নপর হিন্দু উদ্বাস্তুদের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে বাঙালী মুসলমানরাও আক্ষেপ করে গেয়ে উঠেছিল যে গান সীমান্তের পারে বসে, সে গান পৌঁছেছিল কজনের কানে তা জানি না, তবে পশ্চিমবাংলার সীমানায় দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকলে আজও শোনা যাবে সেই সব দরদী উদাসী ফকিরদের কণ্ঠস্বর :

ভাইরে পূর্ববঙ্গ হলরে শ্মশান,
যত ধনী মানী অভিমানে
সকল গেল হিন্দুস্থান।
পূর্ববঙ্গ হলরে শ্মশান ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী গেল চলে
আমরা রইব আর কাদের বলে,
না জানি কি আছে ভালে
নাইকো নিরূপণ।
পূর্ববঙ্গ হলরে শ্মশান ॥
যখন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ জাগবে মনে
কাঁদবে বসে হিন্দুস্থান
পূর্ববঙ্গ হলরে শ্মশান ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[সাম্প্রতিক ঘটনাবলী]

ইভ্যাকুয়েশন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বাংলার বহু শহরে 'ইভ্যাকুয়েশন' শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ শহরকে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ধনপ্রাণ নিয়ে নিরাপদ স্থানে পলায়ন করতে হয়। বাংলার পূর্ব মুলুক চিটাগাং শহর বোধ হয় এ বিষয়ে সর্বাধিক প্রাধান্য দাবি করতে পারে। চিটাগাং-এর মতো জলপাইগুড়ি শহরেও কারফু অর্ডার জারী করা হলো। বোমা পড়বার সম্ভাবনা দেখা দিলে, সরকার থেকে শহরের অধিবাসীদের অন্যত্র যাবার জন্য নোটিশ দিয়ে দিল। সেই সময়কার অবস্থা অবলম্বন করে জলপাইগুড়ির লোক-কবিরা গান বাঁধল :

জলপাইগুড়ির শহরত গাড়ত নামিসে,
মাদার পঞ্জের বালুর চিপোত,
যায়য়া মাড়েছে তোপ,
শুন নগর বাসিও।

মহারাজার হুকুম জারী
না করেন বেলক্,
চট্ করিয়া না পালালে
করিবে জরিমানা
শুন নগর বাসিও,
ঘর বাড়ি গারস্তি সাজ তামানে
ছাড়িনু!
সগায় পালাছে হুতাসে
মাইয়া ধরিয়া।
শুন নগর বাসিও॥

যন্ত্রশিল্প বনাম কুটীর শিল্প

আমরা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জলপাইগুড়ির পল্লী অঞ্চলে 'মেছেনীর গান' যা 'ভেদেই খেলি' গানের কথা উল্লেখ করেছি। মেছেনীর গান মূলত শস্যদেবীর গান ছাড়া আর কিছু নয় এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক সময় এই সব মেছেনীর গানে বহু সাম্প্রতিক ঘটনার কথাও শোনা যায়। উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা গানে, মানভূমের টুসু, ভাদু ও ঝুমুর গানেও অনেক সময় বহু সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ দেখেছি। জলপাইগুড়ি জেলায় সর্বপ্রথম যখন ধানের কল এল তখন বহু চাষী পরিবারই যারা ধান ভেনে খেয়ে বেঁচে থাকে তারা বেকার হয়ে পড়ল। সত্যিকারের কুটীর শিল্পের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হলো যন্ত্র শিল্পের। কুটীর শিল্পের এই দুর্দিনে মেছেনীর গান গাইয়েরা সে বছর নতুন গান বাঁধল তাদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে। জলপাইগুড়ির 'ধুম নাউয়ের বাড়ি'র শবনেশ্বরী নাম্নী জনৈকা বৃদ্ধা সে বছর যে গীতটি রচনা করেছিল আপনাদের কাছে সেটি উপস্থিত করছি। এর মধ্যেই আপনারা দেখতে পাবেন জলপাইগুড়ির নিরক্ষর পল্লীবাসীরা নিজেদের কথা কত সুন্দর ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে তাদের এই গানটির মাধ্যমে :

ভোট পাটিতে বসিসে মিসিন চল দেখিবারে যাই,
শুন মোরে ও হো গে বাই ॥
ইংগিরাজের বুদ্ধি ভারী, আনি যে ধান ভূকা কল,
এক দিয়া উঠেছে ধয়া, এক দিয়া পরেছে জল।
শুন মোরে ও হো গে বাই ॥
ইংগিবাজের বুদ্ধি ভারী, আনি সে ভূকা কল,
এক দিয়া পরেছে তুষি, এক দিয়া পরেছে চাউল ॥
শুন মোরে ও হো গে বাই ॥
খাজনার অলে ধনী গিলা আরো বেচাছে ধান,
আপনারে গাড়ী গরাই মিসিন নিখিয়া দেহে ধান,
শুন মোরে ও হো গে বাই ॥
ধান বেচায়ে ধনী গিলা হইসে মোটক্ টোক্,
কত ধনী চাউল কিনেছে আজার হাটোত।
শুন মোরে ও হো গে বাই ॥
ধানের দন হইল, আট আনা, চাউল চাইর পাইসা,

ওই বাদে ভুকাতি গিলা
হারাই সে দিশা।
শুন মোরে ও হো গে বাই ॥
বড় লোকের বাড়ি যায়য়া দেখ খালি গলায় সার,
ধনে না পায়য়া জাগার আড়ী ধরেছে ভাতার।
শুন মোরে ও হো গে বাই ॥
বড় লোকের বাড়ি যায়য়া
গুয়া পান খাই,
চট্ করিয়া বিদায় কর অন্য বাড়ি যাই।
শুন মোরে ও হো গে বাই ॥
আর একটা কথা মাগো কইতে নাগে ভয়,
অচনা করিয়া গান শবন আড়ী গায় ॥
শুন মোরে ও হো গে বাই ॥

অনাচার

কিছুদিন আগে একবার জলপাইগুড়ির চুর্ণী নদীতে বান ডেকে দেশের প্রভূত ক্ষতি সাধন করল। বহুলোক হলো ঘরবাড়ি হারা। সরকার এই বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য খয়রাতী সাহায্য এবং অন্যান্য সাহায্য দানের ব্যবস্থা করল। কিন্তু দুর্দশা-প্রপীড়িত এইসব জনসাধারণের সাহায্যের ভার নিল যেসব ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও মেম্বারগণ, তারা সে সাহায্যের অতি সামান্য অংশই এইসব অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করে বাদবাকি সবটাই নিজেরা আত্মসাৎ করল, তাছাড়া যারাও বা দু চারজন এই সরকারী সাহায্য লাভ করল তারাও খুব সহজে এই সাহায্য পায়নি—পরিবর্তে তাদের ঘুষ দিতে হয়েছে ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও মেম্বারদের। দেশের এই অবর্ণনীয় দুঃসহ অবস্থার কথা স্মরণ করে জলপাইগুড়ির লোক-কবিরা গান রচনা করল। এই জেলার ছাতুয়া রায় নামে জনৈক কৃষাণ এ সম্পর্কে যে গানটি রচনা করেছিল সেটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখা যাবে দেশের অবস্থা এবং সামাজিক দুর্নীতি সম্পর্কে এইসব নিরক্ষর লোকগুলি কতটা সচেতন:

এই বছর ওগো চুন্নি নদীর উঠিল বান
দে মোক্ দুর্ঘটনা মানুষ গরু

ভজিল কত নোকের অকারণ।

চন্নি লো ওগে চন্নি গভরমেন্টি দিলেক টাকা
বানাভাসার কপাল পোড়া,
কাকতো মারিলেক মজা,
এল ডাঙা ভাসান।
চন্নিগে টাকা দিলেক মেম্বারগণ
ঘুষত নিলেক অকারণ
ঘুষত লিয়া বাড়িত বাজেছে
রেডিও গ্রামোফোন।
চন্নিগে পার্টির যেমন আন্দোলন,
মেম্বারগণের দুঃখ মন
এর আগে কান্নাকাটা করে মেম্বরগণ।
ওরে বাঁচাইও তুমি জান
না বাঁচালে গেলে মান,
জনগণ ক্ষেপিয়া আছে বাঁচিব কেমন,
এইবার বুঝি শাস্তি হবে বোডের মেম্বরগণ॥

অনেক সময় 'চক চন্নী' নামক পালা গানেও এ গানটি ব্যবহৃত হয়েছে, চোর যেন চন্নীর (চোরণী—চোরের স্ত্রী) কাছে বলছে, দেখ আমরা তো চোর, আমাদের তো পুলিসে ধরে নিয়ে সাজা দিচ্ছে কিন্তু যে-সব ভদ্রলোক এই ভাবে জনগণকে ফাঁকি দিচ্ছে তার কি প্রতিকার?

শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভিতর দিয়ে এইভাবে দেশের নেতাদের প্রতি কটূক্তি করা কম সাহসের ও বুদ্ধির পরিচয় নয় নিশ্চয়ই।

প্রতিবাদ

লোক-কবিরা একদিকে যেমনি স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে দেশের কর্তাব্যক্তিদের অপর দিকে নিরক্ষর জনসাধারণের মুখপাত্র রূপে দেশের অমঙ্গলজনিত কাজেরও প্রতিবাদ জানিয়েছে তাদেরই ভাষায়, তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে। এর উদাহরণ স্বরূপ আমরা মালদহের গম্ভীরা, মানভূমের টুসু নদীয়ার ময়ূরপংখী গানের উল্লেখ করিতে পারি। জলপাইগুড়ির অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'অং পাঁচালী' (রং-পাঁচালী) নামে এক প্রকারের গানের সন্ধান মেলে। সুর—চটকা

(কভাওয়াইয়া), ভাষা—খাস 'বাহে'। এ গানের উদ্দেশ্য হলো দেশের সাম্প্রতি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দেশ বিভাগের সময় পূর্ববঙ্গের চারণদল (উদাসী বাউলের দল) যেমনি প্রতিবাদ জানিয়েছিল দেশ বিভাগের বিরুদ্ধাচরণ করে, তেমনি সাম্প্রতিককালে (১৯৬০) ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত জহরলাল নেহরু এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের চুক্তির ফলে নেহেরুজী ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গ—জলপাইগুড়ি জেলার 'বেরুবাড়ী' নামক অঞ্চল পাকিস্তানকে দান করবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্থানীয় নিরক্ষর কৃষাণ সম্প্রদায় এই 'রং-পাঁচালী'র মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাল ভারত সরকারের কার্যের বিরুদ্ধে।

'রং-পাঁচালী'-তে অন্যান্য পাঁচালী গানের মতোই প্রথমে আসর বন্দনা গাওয়া হয় সমস্বরে। তারপরে মূল গায়ক ও দোহারবৃন্দ মিলে সেই দিনের গানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে 'পালা' শুরু করে। 'পালা' আর কিছুই নয়। 'বেরুবাড়ি' পাকিস্তানে চলে গেলে তাদের (স্থানীয় অধিবাসীদের) কী রকম অসুবিধা হবে সে সম্পর্কেই গল্পাকারে আলোচনা।

মনে করা যাক পাঁচালীর আসর বসেছে। বাজছে দো-তরা, জুরি আর বাঁশী। এই সময়ে আসরে উঠে দাঁড়াল মূল গায়েন, হাতে চামর, সংগে রয়েছে দোহার বৃন্দ। তারা শুরু করল পাঁচালী গাইতে :

বন্দনা : আসরেতে খাড়্যা হয়্যা বন্দিম এ লোক কাক ?
দেশের হালৎ দেখ্যা হইচুরে অবাক্।
মরি হায়রে কলিকাল,
বেরুবাড়ি দিবা নাগে নাগ্যাছে কাচাল।

যুক্তভাবে : বেরুবাড়ি দিম্না
(মুই) বেরুবাড়ি দিম্না

মূল গায়েন : বেরু দিম্, বাড়ি দিম্
বেরুবাড়ি দিম্না।

দোহার : বেরুবাড়ি দিম্না।

মূল গায়েন : জান দিম, 'পান' দিম
বেরুবাড়ি দিম্না।

এইবার শুরু হলো পালা। কৃষক ও কৃষাণীর কথোপকথন। কৃষাণী বায়না ধরেছে, নতুন ধান হয়েছে ক্ষেতে, এইবার পিঠে খাবে। কৃষাণ বলছে—কৃষাণী তুই তো পিঠে খেতে চাচ্ছিস্ কিন্তু গুড় কোথায় পাব, বেরুবাড়ি যে চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে :

গিরি (কৃষক) : খাজালা খাবা চাছিস্ গিরথানী (চাষী বৌ)
মুই কেমনে পামু গুড়,
বেরুবাড়ি যায় পাকিস্তানৎ
মুই কী হচ্ছু চুর।

এরপর কৃষাণী বলছে, আমায় একখানা 'পাটানী' এনে দাও (পাটানী জলপাইগুড়ি অঞ্চলে মেয়েদের পরবার এক প্রকার তাঁতের কাপড়)। কৃষক উত্তর দিচ্ছে, পাটানী কোথায় পাব, বেরুবাড়ি চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে এমন অবস্থায় আমি কি চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারি ?

গিরি (কৃষক) : পাটানী পিন্ধার চাছিস্ গিরথানী পাটানী পামু কই,
বেরুবাড়ি যায় পাকিস্থানৎ
হামি কি চুপ করিয়া রই।

গিরি (কৃষক) যখন কিছুতেই তার (কৃষাণীর) ইচ্ছা পূরণ করল না তখন তার মনে দুঃখ এবং বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। কাকেই বা আর সে তার মনোবেদনা জানায়। গাছের ডালে ছিল কালো কোকিল, গিরথানী (কৃষাণী) তাকেই সম্বোধন করে বলছে—ওগো কোকিল, তুমি আমার বাবার দেশে গিয়ে বল, তোমার মেয়েকে এমন বিয়েই দিয়েছ যে, সে মনের দুঃখে নদীতে ডুবে মারা যাচ্ছে।

গিরথানী (কৃষাণী) : যাওরে কুংকিল উড়্যা হামার বাবাক্ গিয়া কভা,
তোমার বেটি ছেয়া মরছুরে
হায় নদীৎ গিয়া ডুব্যা।

কোকিলকে ডেকে পুনরায় সে বলে—বাবাকে বোলো, যুবতী মেয়েকে বিয়ে দিতে হলে সঙ্গে বেরুবাড়িও থাকা চাই (স্থানীয় অধিবাসীরা জানেনা এ কেমন অসম্ভব ব্যাপার—বিনা কারণে আজ তাদের অন্যদেশের বাসিন্দা হতে হচ্ছে)।

গিরথানী (কৃষাণী) : ডাংগর মেইয়্যারে বেহা দিতে
বেরুবাড়ি নাগে।

পালা প্রায় শেষ হয়ে আসে। এইবার গিরি (কৃষাণ) বলে ভগবানের উদ্দেশ্যে—হে ভগবান বেরুবাড়ি যেন পাকিস্তানে না যায়, পাকিস্তানে গেলে আমার ঘরইতো অন্ধকার হয়ে যাবে।

গিরি (কৃষক): হায়রে হায়, হায়রে দারুণ বিধি
বেরুবাড়িটার কাচল ছাড়্যাক
বিধিরে—
হামার ঘর না করিস আন্ধা।

দরিদ্রের চিকিৎসার জন্যই সৃষ্টি হয় 'দাতব্য-চিকিৎসালয়'। সরকার থেকে খোলা হয় 'হস্পিটাল'। কিন্তু অব্যবস্থার গুণে এইসব হাসপাতালে বিশেষ করে সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে যে চিকিৎসা কতটা হয়, বা রোগীরা ওষুধপত্র কতটা পায়, তা হয়তো অনেকেরই জানা আছে, কিন্তু সে বিষয়ে কাউকে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেখা গেছে বলেতো মনে হয় না সংবাদপত্রগুলি এ বিষয়ে ক্বচিৎ-কখনও কিছু কিছু লিখলেও জনসাধারণের মধ্যে এখনও তেমন কোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলন হয়েছে বলেতো মনে হয় না—না সাহিত্যে, না বক্তৃতায়। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের শেষ কয় বছরে দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন চরমে উঠল, তখন পূর্ব বাংলার নিরক্ষর কৃষাণ সম্প্রদায় হাটে মাঠে গেয়ে বেড়াতে লাগল মাদারীপুর সরকারী হাসপাতালের দুর্নীতির কথা :

শুকায় পদ্মা মধুমতী, জলশূন্য ওই কুমার নদী
গাড়ি, ঘোড়া কত চইল্যা যায়।
ঔষধ নাই রুগীর ঘরে, বহু লোক হস্পিটালে রয়॥

হাসপাতালের কর্মচারী, তারা দেয় মাথায় বারি
ক্ষুধা পাইলে পথ্য নাহি দেয়।

হাসপাতালের ডাক্তার যারা, ঔষধের মাত্রা কমায় তারা
শ্যাষে ক্যাবল রুগীরে ভোগায়॥

রাজা হইল ধর্ম পুরুষ কলিজীব হইয়াছে বেহুঁশ
চেনেনা সেই ধর্ম নিরঞ্জন।

চাল তেঁতুলে মেশে যেমন, দুধে লবণ খাইলে হয় যেমন
বিষের তুল্য হয় ভোজন।

১৯৪৫ (ইং) সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে, বরিশালের কোনো এক গ্রামে গ্রামবাসী কৃষাণ-মজুররা ক্ষেপে গিয়ে তাদের দুর্নীতিপরায়ণ ফুড কমিটির চেয়ারম্যান-প্রেসিডেন্টকে কী ভাবে উচিত সাজা দিয়েছিল এর একটা কাহিনী (হয়তো খবরের কাগজেও দেখে থাকবেন) শোনা যায় এই জেলারই চাষাভূষাদের মুখে :

শোনরে বলি কাইলা চাচা বরিশালের খবর খাশা
ফুড কমিটির প্রিসিডিংরে জোতার মালা গলায় দিয়া
ঝুলাইছে রাস্তায়।
(আবার) নূতান খবর পাওয়া গ্যাছে
(ও তার) রেশান কার্ড গলায় বাইন্ধ্যা,
চেনি এট্টু হাতে দিয়া কেরাশিন দ্যায় মাথায় ॥
(আবার) নূতান কাপড় দিয়া গলায়,
টাইন্যা বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়,
বলি, উচিত সাজা অইল এতকাল, চাচা উচিত সাজা।

এক সময় বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থান সমূহে পর্তুগীজ জলদস্যুদের বড়ই অত্যাচার ছিল। কত সুখের সংসার যে ভেঙে গেছে ঐ সব পর্তুগীজ বোম্বেটেদের দৌরাত্ম্যে তার আর ইয়ত্তা নেই। বেশির ভাগ সময়েই দেখা যেত এই সব বোম্বেটেরা নদীর ঘাটে স্নানরতা সুন্দরী নারীদের অপহরণ করে নিয়ে যেত। শুধু কি তাই, অনেক সময় নদীতে যে সব জেলেরা মাছ ধরতে যেত, এই বোম্বেটেরা এসে তাদের মাছ তো নিয়ে যেতই উপরন্ত তাদের ভিতর দু একজনকে ধরে নিয়ে বিদেশের বাজারে দাস হিসেবেও বিক্রি করে দিত। এই রকম এক সময় একদল জেলে কি ভাবে একদল পর্তুগীজ জল দস্যুদের আচ্ছা জব্দ করেছিল তার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় নিচের এই গানটি থেকে :

শুনেন সগলে বলি এই সভাস্থলে
কয়েকজন জাইল্যা তথায় সাইগরে মাছ ধরে।
জাইল্যার লুকায় ডাকুরা সব উড়িল দলে দলে ॥
কেহ লৈল পালের বাঁশ, কেহ লৈল পই।
কেহ কেহ উজাইল ধামা দাও লই ॥
দাঙ্গা শুরু হৈলরে সেই ধূ ধূ বালুর চরে।

কারো মাথা ফাড়ি গেল গে কেহ গেল মরে
জাইল্যার মধ্যে একজন বয়সে সেই বুড়া।
তাড়াতাড়ি আইল্ লগই মরিচের গুড়া ॥
মরিচের গুড়া আনি কী কাম করিল।
মুট করি ডাকাইতের চোগে মেলা দিল ॥
ভোম খাইয়া পড়ে ডাকাইত বালুর উপর।
পিটাইয়া ফেলি দিল জলের ভিতার ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবিধ

দেশে অনেক সময় এমন কতকগুলি গানের সন্ধান মেলে যেগুলিকে শুধুমাত্র 'পল্লীগীতি' বা 'লোক সংগীত' আখ্যা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এর কারণ আর কিছুই নয়, এমন কতকগুলি গান আছে যেগুলি যে কোনো সুরেই গাওয়া হয়ে থাকে। কাজেই যখন যে সুরে গাওয়া হয় তখন গানটিকেও সেই পর্যায়ভুক্ত করা চলে। আমাদের এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য লোকগীতি সংগ্রহ সেই সংগে তাদের পরিচয় প্রদান করা। উদাহরণস্বরূপ জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত একটি লোকগীতির কথা উল্লেখ করছি। চলতি কথায় এগুলিকে বলে 'ঠাট্'। কিন্তু গাওয়া হয় অনেকটা ভাওয়াইয়া সুরে, কখনও বা গম্ভীরার সুরে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, জলপাইগুড়ির এইসব লোকগীতির গায়কদল অধিকাংশই হলো গাঁয়ের চাষীবাসী মানুষ, চলতি কথায় কোনো কোনো অঞ্চলে এদের বলে 'বাহে'। এ অঞ্চলে প্রায় সব গানই গীত হয় দো-তরার সংগে। আমাদের পরবর্তী গীতটিও দো-তরার সংগেই গীত হয়ে থাকে। লোক-কবি বলছে, যার টাকা পয়সা নেই সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু এর চাইতেও দুঃখের কথা যাদের পিতা পুত্রের ভিতর সদ্ভাবের অভাব। যে ব্যক্তি বালিতে চাষ করে তার আর দুঃখের অভাব কি, কিন্তু এ দুঃখের চাইতেও বড় দুঃখ যে অন্য লোকের উপর ভরসা করে। যার দৃষ্টি নিম্নগামী সে বড়ই দুঃখী, কিন্তু এর চাইতেও বড় দুঃখী হলো সে, যে অন্যের বাড়িতে কাজ করে থাকে। যে ব্যক্তির রাত্রে চোখে ঘুম না আসে সে বড়ই দুঃখী, কিন্তু এর চাইতেও বড় দুঃখী ব্যক্তি হলো সে, যে প্রাণ-খুলে হাসতে জানে না। চিন্তা রোগ বড় রোগ, যে এই চিন্তা রোগের আওতায় পড়েছে সেও বড় দুঃখী, কিন্তু তার চাইতেও বড় দুঃখী হলো যার পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা অধিক। যার প্রবাসে ভাতের হাঁড়ি ভেংগে যায় সে মহাদুঃখী সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চাইতেও বড় দুঃখী হলো যে অল্প বয়সের বিধবা। দুঃখীর দুঃখের কথা আর কত বলা যায় তার কি আর সংখ্যা আছে? যার পুত্র হওয়া মাত্রই সে পুত্র মরে যায় এ হেন দুঃখী

ব্যক্তির দুঃখ আর কি ভাবে বর্ণনা করা যায়, এ হেন মৃত পুত্রের বাপ মায়ের নেহাতই কপাল খারাপ :

নিকড়িয়ার কড়ি নাইরে পন্থে বাজায় বেনা,
তার চাইতেও দুঃখ ও যার বাপে বেটায় চেনা ॥
একেতো দুঃখীর দুঃখ ও যার বালুত করে চাষ
তার চাইতেও দুঃখ ও যার পরার করে আশ ॥
একেতো দুঃখীর দুঃখ ও যার অধঃ মুখে হাটে,
তার চাইতেও দুঃখ ও যার পরার বাড়ি খাটে ॥
একে তো দুঃখীর দুঃখ যার আতিত সিন না আসে,
তার চাইতেও দুঃখ যার হাসিয়া না হাসে ॥
একে তো দুঃখীর দুঃখ অধিক চিন্তা যার,
তার চাইতেও দুঃখ হচ্ছে যের বেশি মাইয়া যার ॥
একে তো দুঃখীর দুঃখ যার পরবাসে ভাঙে হাঁড়ি,
তার চাইতেও দুঃখ হচ্ছে চিতন বয়সের আড়ী ॥
মরি হায়রে একে তো দুঃখীর দুঃখ কভু না নেয় জোড়া,
হয়া পুত্র মরিয়া যায় বাপ মার কপাল পোড়া ॥

জলপাইগুড়িতে 'জিতুয়া' বা 'রং-পিরিত' নামে এক প্রকার গানের প্রচলন আছে, নরনারীর ভালবাসার কথাই এ গানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ গানও গাওয়া হয়ে থাকে দো-তরার সংগেই। যে কেউই এ গান গাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ একটি গানের কথা ধরা যাক : কোনো একটি যুবক একটি যুবতীর কাছে প্রেম নিবেদন করতে এসেছে। যুবতীটি উত্তর দিচ্ছে, তোমার লজ্জা সরম বলে তো কিছুই নেই, কেন আমার পিছু পিছু ঘুরছ। তোমার হাল গরু তো সবই গেছে খোঁয়াড়ে, এখন আমাকে বিয়ে করলে খাওয়াবে কি :

নদারীর বেটাটা কেনে ডাকালু মোক
লইজ্যা সরম নাই কি তোর
ঘরোত আছে বাপ মাও মোর !
শুনিয়া ফেলাবে ওরে
ঘরোত তোর নাইরে কিছুই
কি বুঝিব নেড়ের বেটা,

কলেক আধেক ফাল্গু গেলে
হাল গরু তো খোঁয়াড়
কি মোক বিয়া করেক।

এ শ্রেণীর গানে অনেক সময় দ্বৈত সংগীতও লক্ষ্য করা যায়। পুরুষটি বলছে, আমি অতি অভাজন, আমার মতো লোকের কাছে কি তোমাকে বিয়ে দেবে? নারীটি বলছে, তার জন্য চিন্তা কী? সে একটা বুদ্ধি আমি ঠিক করে ফেলেছি, সত্যিই তুমি আমার চিকন কালা, আমি তোমার পায়ের শিকল, তোমাকে ছাড়া তো আমি থাকতে পারব না :

আজি চালত কইলসে চলে কুমড়া গে
ও মাই জাংগিত ফলেছে ধুমা
দেখা দেখি মানসি হল মাই
সালাছিস ছাড়িয়া (মাইগে)
তুইও মোর চিকন কালারে
মোর কালা,
তুই মোর ভাবিস নারে
মুই একটা বুদ্ধি ফান্দাইসু
(কালা) তোরে না বাদে ॥
কি বুদ্ধি ছান্দিস ফান্দাসে মাইগে
বাপ যে হইল তোর ভারি
কান্দিতে কান্দিতে বুঝি (মাইগে)
(ও মোর) জীবন যাবে চলি (মাইগে)।
যে লা মোক দেখিবার আসিবে
ও বাউ বুদ্ধি করিম গেলা,
যুত করিয়া দিমার বাউ
(ও) মুই শাড়ীত অড়ন দিয়া ॥

এ বাটে কোলে করবে যুত মাই অন্যঠে দেখিবে দিয়ে,
মোর মত অভাগার হাতত তোক কি মাই দিবে ॥
শেষের বুদ্ধি আছে কালারে ও মুই হোই মার পাগলী
সত্যি করে কনু (কালা) ও মুই (তোর) পায়ের শিকলী ॥

'জিতুয়া' বা 'রং পিরিত' শ্রেণীর দুটি গানের উল্লেখ করেছি। এ গুলিতে নায়ক বা নায়িকার কথা, তৃতীয় ব্যক্তির কথাও শোনা যায় কখনও কখনও। গায়ক এ স্থলে নিরপেক্ষের ভূমিকা অবলম্বন করে বলছে, যত সব অল্পবয়সী মেয়েরা সব রং-এর খেলা খেলতে বসেছে, তারা প্রেমের ফাঁদ পেতেছে। এই ফাঁদে পড়ে কত পুরুষ যে নাজেহাল হচ্ছে তার ঠিক নেই :

যত চেংড়িলা বালাবাড়ী পাতিসেগে ওংগের খেলা,
ওকি ও মরি কেনে বা ওঝা
কাম করিয়া ফেলেয়া গেছে সে চাল্লি কুথা।
ওইয়া আনলেক জড়েয়া
বাশের বিকিনা আনিয়া
ওইনা গাট্টেক মারেয়া
বাতি দিনেক ধরেয়া
কামটা নিলেক সারিয়া
জিরয়া মারেছে গো আই ও নদীর বালুকা।
সাড়ি করি বসাইবাবো কই নাগেরয়
কাল চেংচী মাইটা ধরিলেক নিস্তর ॥
একটা চেংড়াক আনিয়া ওইটা সাজাইল দুলুয়া
ধোলি মাইয়াটা সাজিল কইন্যা।

গাজীর গান

হিন্দুসমাজের ভিতর যেমন বাউল ও বৈরাগী, মুসলমান সমাজের ভিতর তেমনি সাঁই, সুফী, দরবেশ, গাজী ও ফকির। সাঁই বা দরবেশ শ্রেণীর গায়করা স্বভাবতঃই একটু উচ্চ স্তরের, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে ধর্মবোধ, মৈত্রী ও সম্প্রীতি স্থাপনের কাজে মুসলমান সমাজের গাজী পীরদের দান নেহাৎ অল্প নয়। তাদের গানের মূল কথা হল ঈশ্বর ভক্তি। পূর্ববঙ্গে এই গাজীর দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে, গানের মাধ্যমে তত্ত্ব কথা শুনিয়ে ঝাড় ফুঁক, জল পড়া, তেল পড়া দিয়ে, গরুর রোগ হলে ঔষধ বাতলিয়ে দিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তারা সমান আদরণীয়। মাথার পরে কাপড়ের টুপি, গলায় কাঁচ বা স্ফটিকের মালা, এক হাতে চামর, অপর হাতে

'তসবী' (লাঠির মাথায় পিতলের সূর্যমূর্তির অনুরূপ মূর্তি) নিয়ে গৃহস্থ বাড়িতে গিয়ে প্রথমেই ছড়া বলতে শুরু করে :

দম দামইয়্যা হাঁটে নারী চউখ্ পাকাইয়্যা চায়।
সেই না নারী অভাগিনী আরো পতি খায়॥

রাইন্ধ্যা বাইড়্যা যে বা নারী পুষ্যের আগে খায়।
তার ভরনা কলসীর জল তরাসে শুকায়॥

আউলাইয়্যা মাথার ক্যাশ ঘোরে পাড়া পাড়া।
নিশ্চয় জানিবা তোমরা স্যাওত লক্ষ্মীছাড়া॥

নাইয়্যা ধুইয়্যা যে বা নারী উল্টা বাঁধে ক্যাশ।
তার ঘরে লাথি মাইর্যা লক্ষ্মী ছাড়ে দ্যাশ॥

ভাত খাইয়্যা যে বা নারী মুখে দ্যায় পান।
লক্ষ্মী বলে সেই না নারী আমার সমান॥

সতী নারীর পতি যেন পর্বতেরি চূড়া।
অসতীর পতি যেন ভাঙা নায়ের গুড়া॥

সকাল বেলা গোবর ছড়ায় সন্ধ্যাকালে বাতি।
লক্ষ্মী বলে সেই না নারী আমার মত সতী॥

অনেক সময় তারা গৃহস্থের উৎসাহে কখনও একা কখনও বা দোহার সহযোগেও গান গায় :

মুসলমানে বলে গো আল্লা, হিঁদু বলে হরি,
নিদাকালে যাবেরে ভাই একই পথে চলি (রে)
দোয়া-নি করিবা আল্লারে।
গোয়ালে যাইগো বন্দেক দিয়া
গোয়ালিনী রয় চাইয়্যা (হায়রে):
গোয়ালে পড়িয়া বাছুর হাম্বা হাম্বা
ডাকিতে লাগিল রে
দোয়া-নি করিবা আল্লারে।
বড়গো মাঝি, ছোটগো মাঝি
আইলা আর গেলা (হায়রে)

মধ্যম মাঝি আইবার কালে আল্লা
চিপা মাইর‍্যা ধইরলা রে।

এই ধরনের গান মুসলমান সমাজের ফকির সম্প্রদায়ের ভিতরও প্রচলিত দেখা যায়:

আমি তোমার কাঙালী গো সুন্দরী রাধা
আমি তোমার কাঙালী গো
তোমার লইগ্যা কাইন্দা ফিরে
হাছন রাজা বাঙালী গো।
হিন্দুরা বলে তোমায় রাধা,
আমি বলি খোদা,
রাধা নামে ডাকলে
মুল্লা মুন্সীরে দেয় বাধা।
হাছন রাজা বলে আমি না রাখিব জুদা,
মুল্লা মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা।

বয়াতীর গান

পূর্ববঙ্গে 'বয়াতীর গান' বলে এক শ্রেণীর গানের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা তাদের গানের মাধ্যমে বর্ণনা করে দেশের বহু ঘটনা, কখনও কিংবদন্তী, ইতিহাস ইত্যাদি। বয়াতী কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক নয়। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো জেলায় বয়াতী বলতে বোঝায় এক শ্রেণীর গায়ক, যারা মাথায় বাবড়ি চুল রাখে, ডুগডুগি বাজিয়ে গানের মাধ্যমে বর্ণনা করে কোনো ঘটনা—সাধারণতঃ নমশূদ্র শ্রেণীর লোকের ভিতরই এদের দেখা যায়। কিন্তু বরিশাল, ঢাকা জেলায় এরা হলো মুসলমান সমাজেরই লোক। তারাও ঠিক একই ভাবে, মাথায় রুমাল বা গামছা বেঁধে, হাটে বা মেলায় বসে গানের মাধ্যমে বর্ণনা করে কোনো কাহিনী। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য একটি হিন্দু সমাজের অপরটি মুসলমান সমাজের বয়াতীর গান আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

বাংলা ১৩৩০ সালে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমায় গেরী মোল্লা নামে এক সৎ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান কিভাবে তার খুড়তুতো ভাইয়ের হাতে প্রাণ হারায় সেই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে স্থানীয় বয়াতীর দল যে গান বেঁধেছিল পাকিস্তান হবার পরও বহুদিন পর্যন্ত সে গান শোনা গিয়েছিল:

সন তেরশ তিরিশ সালে,　　　　গেরী মোল্লা রাস্তায় চলে
দুষ্টেরা সব দাঁড়িয়ে দেখতে পায়।
ওরা সব দুষ্ট এক সাথ হইয়ে　　　　পরামর্শ করে এক জায়গায়
চটী জুতা, ছাতি হাতে মোল্লাজী গোপালগঞ্জ যায় ॥
রাত্রি যখন হল ভোর,　　　　কাক কোকিলায় করে সোর
কাছারির হইল সময়।
ওরা দাও কাটারী হাতে লইয়্যা,　　　　গুপ্ত ব্যাশে হাইট্যা যায়
লুকাইয়্যা রইল গিয়া পাঁচুরিয়ার ঠোটায় (বাঁক)।
বেলা যখন বইল পাটে,　　　　গেরী মোল্লা রাস্তায় হাঁটে
প্রিয় বাবু ডাক দিয়া কয়।
মোল্লা তোমার পাছে রিপু আছে,　　　　পথে যেন রাত না হয়
(ও) প্রাণে চেয়ে আছে, তোমার দুঃখিনী সেই মা ॥
গেরী মোল্লা বলে ভাই,　　　　আমার পিছে রিপু নাই
রাস্তা দিয়া হাঁটতে সন্দ কী।
আমার আগে পাছে লোক আছে,　　　　এখন আমি হাঁইট্যা যাই
আগে পাছে লোক থাকতে দুষ্টেরা দেইখ্যা করবে কী ?
হায়রে হাঁটিতে হাঁটিতে গেল,　　　　দুষ্টেরা সেখানে ছিল
সেই স্থানে হল উপস্থিত।
ওরে পাছের থিকা জোনাবালী,　　　　ফাঁস দিয়া ফ্যালে গামছা খানি
আজ তোমার যম এসেছে, টান দিয়া জমিনে ফেলায়।
গেরী মোল্লা বলে ভাই,　　　　ধরি তোমার হাতে পায়
জীবনেতে না কর বধি।
আমার চাচাত ভাই হইয়্যা,　　　　ক্যামনে গলায় দ্যাও ছুরি
আহারে দারুণ বিধি ক্যামনে ভাই হল জীবনে বধি ॥
হায়রে আমি চল্লাম নিজ দ্যাশে,　　　　মা বেড়াবে পাগল ব্যাশে
জন্মের মত দুনিয়া ছাইড়্যা যাই।
ওরে আমার শোকে পাগল হবে,　　　　আমার দুইটা জোরের ভাই
ঘরে আছে পরের মাইয়্যা দুনিয়ায় তার কোন লক্ষ্য নাই ॥
হায়রে আমি চল্লাম নিজ দ্যাশে,　　　　মা বেড়াবে পাগল ব্যাশে
জন্মের মত দুনিয়া ছাইড়্যা যাই।

হায়রে মেঞার ছিল শত গুণ মঙ্গলবারে হইল খুন
খবর গ্যাল শোনাকুলী গাঁয়।
ওরে ভাই বেরাদার প্রিতিবাসী, সবে কান্দে হায়রে হায়
ওর মা কান্দে বাবা তুই উঠে কোলে আয় ॥
খবর গেল থানার উপর, ডিপুটি কান্দে বারে বারে
আর কান্দে সব আমলা মুহুরী।
থানার দারোগা বাবু এল চলি, ডিপুটি ছাড়ে কাছারি
ভদ্র লোকের মেয়ে ছেলে রাস্তায় যায় হাত ধরে।
আরে হিন্দু আর মোসলমান, সবে দেখে অজ্ঞান
একী বে হায় দারুণ ডাকাতি।
ও যার দেহের মধ্যে বাইশটা কোপ, দেখে ফ্যাইটা যায় ছাতী ॥
আউরৎ, মাউরৎ, রোজেক, দৌলাৎ চার চীজের মালিক আল্লায়।
যেমন লংকাতে রাবণের পুরী, তেমনি দ্যাখতে মেঞার বাড়ি
আহারে কী দ্যাখতে চমৎকার ॥
মেঞার ঘর দরজার অতি ঠমক, বাইর বাড়িতে গোলা ঘর
সোনার পুরী হইল আঁধার।
ভাই বন্ধু সব কেঁদে জড় জড়, কাঁদে মেঞার পরিবার ॥
মেরেছিস দেবের বাহার, একিরে হায় দারুণ ডাকাতি ॥
যেমন রোশনালাতে হোচেন মইল ছাকীন না হইলে রাঁড়ী
সেই রকম এ দারুণ বিধি হরে নাও আমার প্রাণ প্রতীক।
মেঞার আঁখি নয়ন যায় দেখা, কী বা রূপের বাহার
আর মুখের ঠোঁট পুষ্পেরই মতন ॥
উহার দন্তগুলি আনা দানা, নাসিকা নদীর মোহনা
পতির মুখের মিষ্ট কথা শুনিলে ঠাণ্ডা হয় জীবন ॥
হায়রে মোনাযুদ্দিন ভেবে কয়, খুন করলে কি খুন এড়ান যায়
দুই বাপ বেটার দিল দীপান্তর।
ওরে রতন মানিক, আর পবন ফকির
এই দুই জন কেঁদে মর মর ॥
হায়রে কান্দেরে রতনের মায়, এ কলংক মিটাবে নয়
তুই রে রতন অমলের নিধি।

ওরে খুন করতে গেলি বাবা, আর ত ফিরে এলি না
জাহাজ ভরে নিয়ে গেল তোরে আর চক্ষে দ্যাখলাম না ॥

বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার কথা আশা করি এখনও অনেকের মনে আছে। এক সময় এই মামলাকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র দেশে এটা একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু বয়াতীরা এই মামলাকে কেন্দ্র করে রচনা করেছিল যে গান তাও বহুদিন পর্যন্ত শোনা গেছে পূব বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে :

বয়াতী : এই সভা কইর্যা বইছেন যত হিন্দু মুসলমান,
ভাওয়াল সন্ন্যাসীর পরস্তাব করেন প্রণিধান।

ধন্য ধন্য বাজন বিষে পেলে জীবন,
দুষ্টা নারী নষ্ট করল সোনার সিংহাসন।

ছিল ঢাকা জেলায় জয়দেবপুরে, মেজকুমার রাজ ভাণ্ডারে
নামটি হল রমেন্দ্র নারায়ণ।

বিবাহ করিয়া তিনি, ঘরে আনলো কালসাপিনী
এতদিনে রাজধানী হইল শ্মশান।

ছিল রাণী এম্নি কঠিন হিয়া, বলে আশু ডাক্তারকে ডাকিয়া
তুমি কি করিতে পার রাজারে নিধন ?

ডাক্তার বলে পারি আমি, আমার যদি হও তুমি
রাণী বলে এখনি মিলিব দুজন।

ডাক্তার ভাবে মনে মনে, রাজাকে মারবো কোন্ সন্ধানে
বিষ দিয়া বধিব জীবনে যা করেন ভগবান ॥

ডাক্তার এই কথা বলিল, ভাওয়ালেরে কালে ঘিরিল
এদিকে শোনেন কিছু রাজার বিবরণ।

বিধির কি লীলা হল, মহারাজের অসুখ হল
মহারাজ বলে এ ব্যারামে যাইবে জীবন ॥

শুন বন্ধু আশু ডাক্তার এ ব্যারামের কর প্রতিকার
ডাক্তার বলে এখনি চল দার্জিলিং।

দার্জিলিং-এর হাওয়া ভাল, যাবে ব্যারাম রবে ভাল
থাকবে এ-দেহ শীতল হবে না মরণ।

মহারাজ বলে যাব আমি সংগে যাবে রাজরাণী
শালা বাবু যাবে আর মুকুন্দগণ।
রাজার ছিল জ্বরের ব্যারাম, দার্জিলিং যায় হতে আরাম
বন্ধু আশু ডাক্তার সংগে গেল ব্যবস্থার কারণ।
দার্জিলিং গেল পরে, রাণী বলে ডাক্তারেরে
ঔষধে বিষ মিশায়ে দাও না এখন।
ঔষধে বিষ মিশালো, মহারাজকে খেতে দিল
খেয়ে রাজা অস্থির হলো ঘোর হল নয়ন।
মহারাজ বলে আর বাঁচলাম না, এ-সময়কালে কোথায় রল মা
আর বুঝি দেখলাম না বন্ধু বান্ধবগণ।
থর থর কাঁপে অংগ, রাজার ভবের খেলা হল সাংগ
কোথা রলে ত্রিভংগ দাও হে দরশন ॥
তুমি হও অগতির গতি, তুমি হও মোর সাথের সাথী
এই বলিয়া রাজা মুদিল নয়ন।
রাণীর স্বার্থের বন্ধু যারা, তারা বলে গেল মারা
রাণী বলে সবে কর সৎকারের আয়োজন ॥
বলি আমি সবাকারে আস সবে সৎকার করে
পুরস্কার দিব আমি খুশি করে মন।
রাজার অন্নে বাঁচত যারা, লাকড়ি কাষ্ঠ আনে তারা
রাজাকে শ্মশানে দিয়ে জ্বালিল আগুন ॥
বিধির কি লীলা হল, ঝড় বৃষ্টি এসে পড়ল
রাজাকে শ্মশানে রেখে করে পলায়ন।
ঐ জংগলে ছিল সাধু, মুখের বাক্য ছিল মধু
নাগা বাবা ধর্মদাস ছিল তার নাম।
ধ্যানে পেল সমাচার, এ ভাওয়াল মধ্যম রাজকুমার
দার্জিলিং পাহাড়ে এসে হয়েছে মরণ ॥
সাধু দেখে করে ধ্যান, মরে নাই রাজা অজ্ঞান
ঔষধ দিয়া রাজার পাইল জীবন।
মহারাজ বলে সাধুরে, এখনি বলি তোমারে
কোথায় আমার রাজরাণী বন্ধুবান্ধবগণ।

সাধু বলে শুন রাজন, বুঝাইবেন সব বিবরণ
এক্ষণে রাজা তোমার হয়েছিল মরণ ॥
মহারাজ বলে সাধুরে, আর যাব না জয়দেবপুরে
কার বা রাণী কার বা পুরী কিসের সিংহাসন।
সাধু বলে থাক তুমি, ভেবে সেই জগৎস্বামী
কিবা করবেন রাজরাণী আর দুষ্টগণ।
বলরাম দাস পড়ে ফাঁদে, দিবা-নিশি কাঁদে
আনন্দে রেখো মোরে ওহে ভক্তগণ ॥

দোহার : কোথায় উজির নাজির হওনা হাজির পাত্রমিত্রগণ
এ সময়ে কোথায় রইলে ওহে প্রজাগণ!
সবাই দেখ এসে,
সবাই দেখ এসে বিষের তেজে এ জীবনে মরি,
বিপদকালে কোথায় রইলে দীনবন্ধু হরি।
আমায় রক্ষা কর,
আমায় রক্ষা কর দয়াল হরি দেব নারায়ণ,
কৃপা গুণে এ বিপদে দেও শ্রীচরণ।
ফুরাল ভবের খেলা,
ফুরাল ভবের খেলা ডুবলো বেলা ভাবিলাম এখন,
শত্রুগণের হাতে পড়ে গেল এ জীবন।
এসে শত্রুদলে,
এসে শত্রুদলে কৌতুহলে সবে মিলে জুটে,
মরা দেহ নিয়ে গেল শ্মশানেরই ঘাটে।
হয়ে শ্মাশান বন্ধু,
হয়ে শ্মশান বন্ধু ভয়ে কিন্তু অঙ্গ থর থর,
হরি বোলে মরা তোলে শ্মশানের উপর।
আচম্বিতে ঝড় তুফানে,
আচম্বিতে ঝড় তুফানে এক সমানে বহু বজ্রাঘাতে
মড়া ফেলে চলে গেল আপনার বাসাতে।
দুরন্ত অন্ধকারে,
দুরন্ত অন্ধকারে প্রাণের ডরে মনে পেয়ে ত্রাস,
ধ্বনি শুনিয়া এল নাগা ধর্মদাস।

করিতে শ্মশান পূজা,

করিতে শ্মশান পূজা কীর্তিধ্বজা রাখলেন এ জগতে,
মরা দেহে পুনঃজীবন দিল তান্ত্রিক মতে।

নিল আশ্রমেতে,

নিল আশ্রমেতে কোন মতে বারটি বৎসর,
সেবা কার্যে রত থাকে ভাওয়ালের ঈশ্বর।

তারা কেউ পায়না দিশে,

তারা কেউ পায়না দিশে লোকের কাছে বলে ঘরে ঘর,
মধ্যম কুমার মারা গেল দার্জিলিং শহর।

হল শ্রাদ্ধ শান্তি,

হল শ্রাদ্ধ শান্তি মনের ভ্রান্তি অশান্তি অপার,
ডাক্তার বাবুর, রাণী বাবুর শান্তি চমৎকার।

আনন্দের সীমা নাই,

আনন্দের সীমা নাই বলব কি ভাই গেল বার বৎসর
ইহার পরে উদয় হইল ঢাকারই শহর।

থাকে সদর ঘাটে,

থাকে সদর ঘাটে নিষ্কণ্টকে চিনিতে না পারে
কতক দিন পরে তিনি যান কাশীমপুরে।

থাকেন বন্ধুর বাড়ি,

থাকেন বন্ধুর বাড়ি দিন দুই চারি ব্যাপ্ত চরাচরে
তারপর যান তিনি সূক্ষ্ম জয়দেবপুরে।

প্রথম মাধব বাড়ি,

প্রথম মাধব বাড়ি সারি সারি করে নমস্কার
তা দেখে সব পাড়ার লোকে হলেন চমৎকার।

গিয়ে শ্মশানঘাটে,

গিয়ে শ্মশানঘাটে বসে এঁটে নবীন যোগীবর
জ্যোতির্ময়ী জিজ্ঞাসা করে কোথায় তোমার ঘর।

তখন মধ্যম কুমার,

তখন মধ্যম কুমার কয় সমাচার কী জানি আর
মাতা পিতা ভাই বন্ধু কেহ নাই আমার।

তখন সর্বলোকে,
তখন সর্বলোকে মনের সুখে বলে বার বার
বর্তমানে চিহ্ন আছে মধ্যম কুমার।
উঠ্‌ল রব চতুঃপার্শ্বে,
উঠ্‌ল রব চতুঃপার্শ্বে দেশ বিদেশে বল্‌ছে সমাচার
মধ্যম কুমার দেশে এল জগতে প্রচার।
তখন বহুলোকে,
তখন বহুলোকে মনের সুখে এলেন জয়দেবপুর
এক টাকা সের চিড়া খায় দশ আনা সের গুড়।

তখন আশু বলে,
তখন আশু বলে কৌতূহলে ভাই মুকুন্দ গুণ
এতদিনে জ্বলে উঠ্‌ল পাপেরই আগুন।

মুকুন্দের জীবনহারা,
মুকুন্দের জীবন হারা গেল মারা মণীন্দ্রেরই হাতে
আশুবাবুর বাত ব্যাধি পিত্তশূল তাহাতে।

এসব কালের চক্রে,
এসব কালের চক্রে হল বক্র বলরামে কয়
শালার ভাগ্যে রাণীর ভাগ্যে কি জানি কী হয়।

মনে এত বিষাদ,
মনে এত বিষাদ তাই ধন্যবাদ তবু তোমায় দেই
তোমার মত এমন খেলা খেলতে অন্য নাই।

থাকিত বনমাঝে
থাকিত বনমাঝে গুরুর কাছে গুরুর সত্য নাম
গুরুপদে প্রাণ সঁপিয়ে পূর্ণ মনস্কাম।
এখন আর নাইক শংকা,
এখন আর নাইক শংকা নামের ডংকা বেজে উঠ্‌ল ভাই
জয়দেবপুরে উদয় হইল ভাওয়ালের গোসাঁই।
আসিয়া প্রজালোকে,
আসিয়া প্রজালোকে মনের সুখে পেল দরশন
মরা দেহে জীবন পেল ভাওয়ালবাসীগণ।

বলে মেঝ কুমার,

বলে মেঝ কুমার আন আমার নিকাশেরই জমা
ত্বরায় করে করে দিল সত্যের মোকদ্দমা।

একখানা রূপার গাড়ি,

একখানা রূপার গাড়ি মরি মরি অতি চমৎকার
হাতি ঘোড়া কত ছিল সংখ্যা নাইক তার।

বাড়িতে চিড়িয়াখানা,

বাড়িতে চিড়িয়াখানা গেল জানা পশুপক্ষীগণ
বাঘের সনে প্রতি দিনে খেলিতাম যখন।

করিতাম কুস্তি খেলা,

করিতাম কুস্তি খেলা সকাল বেলা বিধি বাদী হল
লোহাগারা বাঘে যখন খাম্‌চে মেরে ছিল।

তাহার চিহ্ন আছে,

তাহার চিহ্ন আছে হাতের কাছে অনেক চিহ্ন গায়
গাড়ির চাক্কায় পায়ে চিহ্ন আর দন্ত ভাঙ্গা যায়।

কুমারের হাতের লেখা,

কুমারের হাতের লেখা স্পষ্ট দেখা পেল পরিচয়
রাণীর অঙ্গের চিহ্ন কিছু মেঝ কুমারে কয়।

আছে তার চোখের কোঠায়,

আছে তার চোখর কোঠায় গোটা গোটা অল্প ডাবায়
পায়ে একটি আঙ্গুল খাট দেখিবেন নিশ্চয়ই।

একটি গুপ্ত চিহ্ন,

একটি গুপ্ত চিহ্ন লজ্জা শূন্য বলে কী আর কাজ
সবার নিকট বলতে আমার বড় লাগে লাজ।

শুনিয়া পতির বাণী,

শুনিয়া পতির বাণী সতীরাণী (!) জবানবন্দী করে
চিহ্ন তালাস্‌ করবে বলে সদাই কাঁপে ডরে।

হুজুর কয় কোঠায় নিয়া,

হুজুর কয় কোঠায় নিয়া দেখ গিয়া করিয়া বিস্তার
গুপ্ত চিহ্ন আছে নাকি বল সমাচার।

হুজুর কয় শোন রাণী,

হুজুর কয় শোন রাণী আমার বাণী চিনিতে পার কি
রাণী কয় আছে জানা চিনাশুনা আর জানিব কী।

যখন চন্দন কাঠে,

যখন চন্দন কাঠে চিতা সাজায় ঘৃত মেখে গায়
শ্মশানে তুলিয়া যখন আগুনে পোড়ায়।

আমি সেই গাছের তলে,

আমি সেই গাছের তলে চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যাই
মধ্যম কুমার পুড়ে যখন হয়ে গেল ছাই।

হুজুর কয় সাক্ষী মান,

হুজুর কয় সাক্ষী মান শীঘ্র আন বুঝি না মহিমা
আসামী ফরিয়াদীর কথায় হয় না মোকদ্দমা।

রাণী কয় বিপদ ভারী,

রাণী কয় বিপদ ভারী মরি মরি করি কী উপায়
জাজ্বল্যমান মিথ্যাসাক্ষী কোথায় গ্যালে পাই।

আশু কয় ভাবছ ক্যান,

আশু কয় ভাবছ ক্যান কথা মান আমার কথা লও
মিথ্যাবাদী মানুষ যারা তাদের এনে দাও।

খুঁজিয়া ঘরে ঘরে,

খুঁজিয়া ঘরে ঘরে টাকার জোরে আনল কয়েকজন
না জানিয়া কী বলিবে ভাবিছে তখন।

দাঁড়িয়ে টিকটিকিতে,

দাঁড়িয়ে টিকটিকিতে সাক্ষী দিতে ভয়ে কাঁপে প্রাণ
মিথ্যা প্রমাণ দিতে কত হল অপমান।

হুজুর কয় বিচার হল,

হুজুর কয় বিচার হল রাণী পেল ভাতা দেড়শ টাকা
রাজায় সম্পত্তি পেল আর সকলে ফাঁকা।

কবিতা সাঙ্গ হল,

কবিতা সাঙ্গ হল বল নমস্কার জানাই
শেষের দিনে হরি বিনে বন্ধু কেহ নাই॥

বয়াতীর গানে অনেক সময় ছোটখাট ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যায়। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা চলে ১৩২৬ (বঃ অঃ) সনে পূর্ববংগে যে ভীষণ ভয়াবহ ঝড় ও বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে তাতে কতলোক যে সর্বস্বান্ত হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। পূর্ববংগের বয়াতীদের কণ্ঠে, বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে প্রচুর গান রচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি মাত্র গানের উল্লেখ করা চলে :

তেরশ ছাব্বিশ সালে সাতৈ আশ্বিন বৈহালে
চিরস্মরণীয় তুফান ভুলিবেনা কেহ ভুলে।

বাজারে দুর্মূল্য তাঁতী, কারও নাই ঘর দরজা
খাজনা আনা দায় হল, অন্নাভাবে মরে প্রজা ॥

তাদের কথা য্যামন ত্যামন, নিশ্চয়ই এবার মোদের মরণ,
এইবারের এই অভাব পূরণ হবে কি কোন কালে ॥

প্রতিমা নাই মণ্ডপ ঘরে, ঘর গিয়াছে বিষম ঝড়ে
কত লোক দেশান্তরে, গিয়েছিল বাণিজ্যের তরে
মহাজনের নৌকা সহ ডুবি হল অতল জলে ॥

তাদের পিতামাতার রোদনধ্বনি, সদাই চতুর্দিকে শুনি
আসবে কি আর যাদুমণি অভাগিনী মায়ের কোলে ॥

বাংলাদেশ চিরদিনই শান্তিপ্রিয়। ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ, মুক্ত আলোহাওয়ার সাথেই সে পরিচিত ; নেহাৎ হতভাগ্য কেউ না হলে আর সে তার জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করে বিদেশে, বিশেষতঃ যুদ্ধের কাজে নাম লেখাতে যায় না। বিশ্বব্যাপী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যখন বিপর্যস্ত—সেই সময় এল যুদ্ধে লোক ভর্তি করবার পালা। কতই না প্রলোভন দেখাল এইসব যুদ্ধে ভর্তি করাবার ঠিকাদারেরা। সেই লোভে পড়ে বাংলার অনেক সরল বিশ্বাসী চাষীবাসী মানুষও তাতে যোগ দিল। কিন্তু হায়, সেই যাওয়াই যে তাদের শেষ যাওয়া হবে তা আগে কে জানত ?

যুদ্ধে চলে গেছে এক নারীর স্বামী। তার কাছে চিঠি দিয়েও কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। বিরহিণী নারী তার ননদের কাছে বলতে আরম্ভ করেছে তার মনোবেদনা। সামান্য এই গানেই বোঝা যাবে কি ভাবেই না প্রতারিত হয়েছিল সেদিন বাংলার সরল বিশ্বাসী জনসাধারণ :

মোর খসম গেছে যুদ্ধে চলিয়া
ওগো ননদী, আমারে একলা ঘরে থুইয়া।
ও ননদী গো উড়ুয়া জাজে যুদ্ধ করে
জাপানে আসিয়া।
উপরতনে পড়ল বোমা দুরুমদারাম করিয়া
আমারে একেলা ঘরে থুইয়া।

ননদী গো ঘরের পিছে সিন্নাৎ বাইগুন
জ্বইলা উঠে চিত্তের আগুন
বুঝাইলে মন বুঝ মানে না
ও মনে বুঝাই আমি কি দিয়া।
আমারে একেলা ঘরে থুইয়া॥

অথবা : বসরার পোস্ট অফিস অইল ছারা।
খসম আমার গেলগৈ ছাড়ি
লড়াইয়ের ডাক পাই ত্বরা।
দিন গেল, মাসরে গেল, গেলরে বছর,
আইল নারে খসমের মোর চিডির উত্তর।
অকালে পড়িল ঠাডার কান্দের ভাইবোন দেশপারা।
হায়-হায়রে—মাতা কান্দের পিতারে কান্দের,
কান্দের সোদর ভাই,
বসরার কোনরে সম্বাদ নাই!

মাইজ্যা ভাইয়ের বৌ-এ কান্দে
খুইল্যা ভাইয়ের বৌ-এ কান্দে
সোয়ামী আমার গেল মারা
পোয়া কান্দের মাইয়্যা কান্দের
বাপজান তারার গেল মারা।

কিংবা : ননদগো তোর ভাই গেল বৈদেশে
আর এলো না দেশে।
চাটিগাঁয়ের রাঙ্গাগো মাটি,
তোর ভাইয়ের কাছে লেখছি চিঠি
গুণের ননদ গো।

মেলেটারীতে যেজন চাকরী গো করে,
সেজন কেনে বিয়া করে
গুণের ননদ গো।

বাংলার লোক-সংগীতের ভিতর অনেক সময় অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও লুকিয়ে থাকে একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দেশে যখন রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন তার ভাবাদর্শে পশ্চিমবঙ্গের গাঁয়ে গাঁয়ে রচিত হয়ে উঠ্‌ল গান—এগানের ভিতর এই নবধর্মকে সাদর আহ্বান জানিয়ে দিল :

ডোম মুচি বাগ্‌দীরা
আর হয়োনাকো খেস্তান,
নতুন ধর্ম নিয়ে এসেচেন
যোদের রামমোহন।
দেশের যত গেয়ানী লোকেরা
নতুন ধর্মে সবাই মিলে যোগ দিয়েচেন,
গোঁড়ামীর ভাই ঠাঁই নাই এতে,
জেতের বিচার নাইও তাতে,
ছোট বড় ভাই সকলেই মানুষ,
অধিকার ভাই সকলের আচে,
আর দেরী নয়, নতুন ধর্মে দীক্ষে নি ॥

শুধু এখানেই শেষ নয়। সতীদাহ প্রথা রদ করবার জন্য যখন রাজা রামমোহন রায় উঠে পড়ে লাগলেন, লোক-কবির দল তখনও তাকে সমর্থন জানায় :

শোন শোন শোন সবে নর নারীগণ,
সহমরণ পেরথা নারী বধেরই কারণ।
নারী হত্যে মহাপাপ, শাস্তের বচন,
নারী রক্ষে মহাকর্ম মহৎ কারণ।
ওগো সতী, স্বামী মল্লে তোমাদেরও
চিতে যেতে হয়,

তোমরা মল্লে পুরুষত কেউ
সঙ্গেতে না যায়।
সতী গভ্ভে রেকে সন্তান যদি স্বামী চলে যায়,
বল কোন্ দোষে নরশিশু যাবে যমালয়।
খুন করলে খুনী শুনি ফাঁসিতে লুটায়,
জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মাল্লে
জেনো নরকগামী হয়।
তাই কলির রাম রামমোহন দিয়েচেন ডাক,
নারী বধ রোধ তরে বাজাও সবাই ঢাক॥

পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মশাই যখন বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করলেন তখন একদিকে যেমনি পেলেন নিন্দাবাদ, অপরদিকে তেমনি পেলেন জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন :

ওরে বিদ্যেসাগর দিবে বিয়ে
বিধবাদের ধরে,
তারা আর ফেলবে না চুল,
বাঁধবে বেণী গুঁজবে রে ফুল
শাঁখা শাড়ী পরবে নতুন করে।
হায়রে ঐ বেজো মণ্ডল,
বেটা বনবে তবে নেহাৎ গাঁড়ল,
শয়তানি সব যাবে চুলোর দোরে।
বেটা বলে কিনা বিদ্যেসাগর নিরেট বোকা,
একেবারেই মাথা মোটা,
নইলে বিধবাদের এমনি করে,
বসাতে চায় আদর করে॥
দেখরে বেটা চেয়ে এবার,
নতুন কনে চলল সেজে নতুন বরের ঘরে,
উলু দেওগো জননীরা বধু নেওগে ঘরে,
ঘষা সিঁথে নতুন করে সিঁদুর দেওগে ভরে॥

শুধু রাজা রামমোহন রায় বা বিদ্যাসাগর মশাই-ই নন, শোনা যায় স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব যখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করলেন, তখন তাঁকে সমর্থন করবারও লোকের অভাব ঘটে নি :

ও ভজহরি মধুসূদন মাহাতো
ছোট জেতে জন্মেছি বলে,
আর দুঃক্ক কোরো নাকো ॥
গৌর নেতাই দুভাই এসে,
হরিনাম বিলুচ্চে দেশে দেশে,
জেতের বিচার নাই তার কাছে
সকলকেই দিচ্ছে কোল,
যে জোন বলচে হরিবোল ॥

একদিকে প্রতিবাদ অন্যদিকে সমর্থন। লোক-কবিরা তাদের অন্তর দিয়ে যে জিনিসটাকে শ্রেয় বলে মনে করেছে, সানন্দে তাকেই বরণ করে নিয়েছে, কিন্তু যেখানে বুঝেছে দেশের পক্ষে দশের মধ্যে অহিত তখনই তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে বর্তমান প্রচলিত আইনকানুন-এর বিপক্ষে। এমন কি দেশে যখন নয়া পয়সা (১৫৫৭ খ্রী: অ:) এবং নয়া ওজন (মণ, সের, ছটাক-এর পরিবর্তে কিলোগ্রাম প্রভৃতি) চালু হলো তখনও ওরা এর বিপক্ষে গান রচনা করে গাইতে আরম্ভ করল :

স্বাধীন ভারতে নূতন পয়সা হবে গুণিতে।
যত আছে মূর্খ লোক, তাদের হইল দুঃখ!
এইবার হাট বাজার পারিবে না করিতে ॥
ষোল আনা ছিল জানা, সেটা করিল মানা।
একশ পয়সাই একি টাকা, পারিবে কি গুণিতে
লেখাপড়া কর সবাই চিনিবে গো একেলাই।
এই ভারতে লেখাপড়া হবে এবার শিখিতে॥
এক দু আনা ভাঙ্গিলে, টাকাই আনা যায় চলে।
ঐ রাগে যাও স্কুলে বলিছে জগন্নাথে।

অথবা : ভাইরে নয়া পয়সা হইল চালু
এই না সোনার দেশে,
টাকা ভাঙ্গালে পনের আনা
সকল লোকই জানে।
নয়া পয়সার দৌলতে ভাই
নব ধারাপাত মেলে,

বিনা হিসাবে ট্যাক্‌সো যায়
সরকারের গ্যাঁড়াকলে।
স্বাধীন দ্যাশের আজব কথা
কইতে লাগে ভয়,
এক আনায় ছয় হইলে
তিন আনায় উনিশ ক্যানে হয় ?
এ-সব ভেল্কীবাজী, রাহাজানি
দুপুরে ডাকাতি,
সরকার বাহাদুর পয়দা করছে
নূতন বেশাতী।

কিংবা : আজি এই আসরে স্মরণ করি প্রভু নিরঞ্জন,
এই যুগের কথা কিছু করিব বর্ণন ॥
শোনেন বন্ধুগণে (২) বর্তমানে শোনেন দিয়া মন
কী ভাবেতে এই যুগটি চলেছে এখন !
বাঙ্গালীর কণ্ঠে অনেক (২)
বলছি কতেক স্বাধীনতার ফল,
কেমনে চিনিব এদের আসল কি নকল ॥
ছিল ব্রিটিশ আইন (২) পাশ করিয়া নূতন আইন হল
দেখনা কি হাল পয়দা সরকারও করিল।
নয়া পয়সা এল চালু হল (২) হিসাব কেমনে হয় ॥
গোলমাল বাধায়া দিল সরকার মহাশয়।
আবার দাঁড়িপাল্লা (২) নূতন হল কিলোগ্রাম নাম ॥
ইহা শুনে দোকানদারের উড়ে যায় পরাণ।
যারা বুঝতে পারে (২) তারা করে দোকানদারী কত।
কিলোগ্রামের হিসাব তারা বুঝায় অবিরত ;
শুনে এই বাণী (২) কয় দোকানী,
দোকানদারী ছেড়ে।
কিলোগ্রামের হিসাব তারা বাড়িই বসে করে ॥
আবার এই যুগেতে (২) কত মেয়ে হল দোকানী,
বিনা পুঁজিতে চলছে ব্যবসা দাঁড়িপাল্লা নি ॥

দেখি এই কলিতে (২)
কেবল আছে ঘুষেরি কারবার
ঘুষ ছাড়া স্বাধীনতার কিছু নাই আর ॥

এইখানেই শেষ নয়। ভারত সরকার ইং ১৯৬৩ সালে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করলে দেশে বেকার হয়ে পড়ল লক্ষ লক্ষ সোনার কারিগর। তাদের অসহনীয় দুঃখের কথা স্মরণ করে এরা গান রচনা করল :

ও আমার দ্যাশের কথা বলব কি তা শোনরে সাধু ভাই,
ও হেথায় বুদ্ধিমানের রাজত্বেতে বলার কিছু নাই।

ও ছিল সোনার অলংকার, ও তায় পিতল দিয়ে দেয়,
সোনারুপো কেড়ে নিয়ে শেষে পিতলে চোখ ধাঁধায়।
(বলব কি আর ভাই)
কত লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিল সোনার কারিগর,
নয়া আইনে কাবু হইয়া হইল দিগাম্বর।

বেকার হইল কর্মকার,
হইল শরীর চর্মসার,
ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়্যা আর্সেনিকে দেয় চুমুক,
অধম নিবারণ কয় বিনয় করি সরকার মশাইর চোখ খুলুক।

আনুষ্ঠানিক গান

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর মেয়েলী ছড়া-গানের রেওয়াজ রয়েছে, এ বিষয়ে স্থানান্তরে আলোচনা করেছি। বাংলার শেষ সীমা শ্রীহট্ট বা সিলেটের বাঙালী সমাজে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার মতোই স্ত্রী-আচার প্রভৃতি পালিত হয়। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে অর্থাৎ যেদিন বরপক্ষের অভিভাবক স্থানীয় কেউ কনেবাড়িতে এসে কনেকে আশীর্বাদ করে যায়—আঞ্চলিক ভাষায় একে বলে 'দিন-সুস্থির', কনে পক্ষীয় অভিভাবক স্থানীয়েরা তখন পাড়ার সব এয়োতীদের নিমন্ত্রণ জানায় পান ও সুপারী পাঠিয়ে। পাড়ার মেয়েরাও সেই পান সুপারীর যোগ্য মর্যাদা রক্ষা করে অর্থাৎ তারাও তাড়াতাড়ি কনের বাড়িতে এসে পাঁচ বাড়ির এয়োতীতে মিলে সমস্বরে জুড়ে দেয় গান :

কই গেলা গো রামের মা,
পণ্ডিত ক্যান পাঠাও না,
পাঠাও পণ্ডিত মিথিলানগর।
হস্তে লইয়া পঞ্জীপুঁথি,
হরিধনের মুগার ধুতি,
যাইলা পণ্ডিত মিথিলানগর।
কই গেলা গো সীতার মা,
পণ্ডিত ক্যান বসাও না,
বসাও পণ্ডিত রত্ন সিংহাসনে।
বসিবার সিংহাসন আর ডাব নারিকল,
ডাকি আন নারীগণ বাটাভরা তাম্বুল কর্পূর।
ওগো সীতার মা বসিবার কার্য নাই
সীতা বিয়ার বাক্য দ্যাও আমারে।
সীতার ভাগ্যের ফলে
দশরথ শ্বশুর মিলে
আর মিলে কৌশল্যা শাশুড়ী।
সীতার তপস্যার ফলে
রামচন্দ্র পতি মিলে
আর মিলে অযোধ্যানগরী।

পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে আবার এইদিন চিড়ে কুট্‌তে হয়—এই চিড়ে কুট্‌বার সময়ও দেখা যায় মেয়েরা সমস্বরে গীত গায়:

চিড়াকুটি, চিড়াকুটি, বৌলগাছের (বকুল গাছের) তলেতে
ও দিদি কুটুম আইস্যাছে বাড়িতে॥
বড় বইনে চিড়া কুটে, মাইঝম বইনে ঝাড়ে,
ছোট বইনে নদীর ঘাটে দেইখ্যা আইল কারে।
(দিদি কুটুম আইস্যাছে বাড়িতে)॥
আগদুয়ারে কুটুম আইস্যা পানের বাটা চায়,
পিছদুয়ায়ে বড় বইনে ঘোমটা দ্যায় মাথায়।
(দিদি কুটুম আইস্যাছে বাড়িতে)॥
সন্ধ্যাকালে কুটুম আইল বইসতে দিলাম পিঁড়া,

জলপান করিতে দিলাম শাইলধানের চিঁড়া
(দিদি কুটুম আইস্যাছে বাড়িতে)॥

চিড়ে কোটার গানের মতো উত্তর বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে ধান ভানার গানও শোনা যায়:

নারদ মুনির বাহন রে
ধান ভানিস তিন কাহন রে
ও তুই সঙ্গে যাবি নাকি ?
(ও তুই) সঙ্গে গ্যালেও ধান ভানবি
বে-রস কাষ্ঠের ঢেঁকী।
(ও দিদি) ঢেঁকী কী যে কয়—
দে আলায়, আলায় দে—
বুকে বুকে বুকে হুস্
ভুষি ওড়ে ওড়ে তুষ্
ঐ বাওয়া আইলো হুস্।
মুড়ির লইগ্যা চাল কুটলাম
আউস ধানের চিড়া কুটলাম,
অতিথ্ আইছে ঘরে।
(ও দিদি) ঢেঁকী আমার মাথা কুইট্যা
ঝুকুর ঝুকুর করে॥
ঢেঁকীর আগায় দীঘ্‌লা চুরুন
মাটীর তলায় কাষ্ঠের পারুন।
ডাইনা হাতে আইল্যা দিলাম,
বাইয়া হাতে ঝাবণ।
হাতী কাইন্যা কুলাখান,
ঝাড়ে ধুলা ঝাড়ে ধান,
চালেনে খুদ ঝরে।
(ও দিদি) ঢেঁকী আমার খুশি হইয়া
ঝুকুর ঝুকুর করে
ক্যাঁচর ঝুকুর করে,
ঝুকুর ক্যাঁচর করে॥

হোলির গান

দোলযাত্রা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পর্ব হলেও এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট গান বাংলা দেশে খুব বেশি পরিমাণে শোনা যায় না। হোলি বা দোলযাত্রা উপলক্ষে বাঙালী-সমাজের ভিতর কীর্তন-সংকীর্তনের মাধ্যমে যে গান গাওয়া হয় তা শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গানই। তবে এর ব্যতিক্রমও যে একেবারে না আছে তা নয়। বিশেষ করে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এ সম্পর্কে পৃথক ভাবে রচিত কিছু কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায়। এগানের সঙ্গে ঢোলক এবং মন্দিরাই প্রধান বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে :

রঙিনী রাই তোরে রং দিল কে ?
মাথাতে আবির মাখা মুখে আঁচল দে।
(রাধা মুখে আঁচল দে ॥)
অ গ সপ্ত সখি রং আনিল ভৃঙ্গার ভরিয়া,
রাধিকা রূপসী আইসে হস্তে আবির নিয়া।
অ গ দুই হস্তে তুলিয়া আবির রাধারে মাখাইল,
অভিমন্যু বধের মত কিষ্টোরে ধরিল।
অ গ চুয়া চন্দন ছিটায় কেহ শ্রীকৃষ্ণের গায়,
মুখ মোড়াইয়া রাধা মিটির মিটির চায়।
অ গ কেহ নাচে হস্তে ধরি কেহ করে গান,
শিঙা বাজাইয়া গোপী রসের গীত গান।

অনেক সময় এর ভিতর শ্রীকৃষ্ণ জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর খবরও শুনতে পাওয়া যায় :

ও সই যাবি নি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে,
কী রূপ দেখিয়া আইলাম কদম্বেরি মূলে।
ও সই যাবি নি গো যমুনায় জল আনিবার ছলে ॥
একদিন রাধে স্নানের বেলায় কী না কাম করিল,
দেখ সোনার কলসী কাঁকে লইয়া যমুনাতে গেল।
কাহার পিন্ধন লাল নীল, কাহার পিন্ধন সাদা,
সুন্দর রাধিকার পিন্ধন কৃষ্ণ নামটি লেখা।
সখিগণ সঙ্গে রাধা জলকেলী করে,

কলসী গেল স্রোতে ভাইস্যা বসন নিল চোরে।
গলা পানিত থাইক্যা রাধা বসনখানি চায়,
কালা বলে এইরূপে কি বসন দেওয়া যায়।
কোমর পানিত থাইক্যা রাধা চাহিল বসন,
শ্যাম বলে রাধে তোমার নাই কি সরম ?
তখন হাঁটু জলে থাইক্যা রাধা চাইল বসনখানি,
কৃষ্ণ বলে, দেখি তোমায় তীরে আইস ধনি !
তীরে উইঠ্যা রাধা বলে বসন দাও হে শ্যাম,
কৃষ্ণ বলে আগে রাধা যৌবন কর দান ॥

রাখালিয়া গান

মহিষ চরাতে চরাতে উত্তরবঙ্গের কৃষাণরা যে গান গায় তাকেই বলা হয়েছে 'মৈষাল গান'। পূর্ববঙ্গে মহিষের চাইতে গরুই প্রাধান্য লাভ করেছে, তাই এখানেও গরু চরাতে চরাতে রাখালরা যে গান গেয়ে থাকে তাকেই বলা হয়েছে রাখালিয়া গান। উত্তরবঙ্গের গাড়োয়াল আর পূর্ববঙ্গের রাখালিয়া গানের ভিতর ভাবগত ঐক্য লক্ষ্যণীয় :

গরু লইয়া যাওরে রাখাল ছুঁয়োনারে ফুল
ফুটা ফুলের গন্ধ ভালো ছিঁড়োনা মুকুল (রে)
প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধু রে—।
আমি যে গরুর রাখাল, মাঠে মাঠে থাকি,
বাঁশরী বাজাইয়্যা পালের গরু বাছুর রাখি (রে)।
কান্দে বাঁশী কার লাইগ্যা রে ॥
নিতি আইস নিতিরে যাও এই না বসত দিয়া,
বনের কুসুম পাগল কর বাঁশরী বাজাইয়া।
পুবালী বাতাসে বাঁশী বাজাও ধীরে ধীরে,
ফুল ছাড়িয়া ফুলের ভ্রমর উইড়্যা উইড়্যা ফিরে (রে)—।
কি বুঝি ফুলেরই গন্ধ কি বুঝি মুকুল,
বারণ করলে তুলিব না এই বাগানের ফুল।
এই না পথে যাইতে কইন্যা বারণ কর যদি,
তেপান্তরের পথে যাইমু সান্তারিয়া নদী (রে) ॥

মাঠে থাক গরু রাখ—কথার না পাও দিস্,
বাড়ি গিয়া ভাওজের সনে কইও পরামিশ।
কাল দুপারে গরু লইয়্যা এইনা পথ দিয়া।
বাবলা বনে যাইও আবার বাঁশরী বাজাইয়্যা (রে)।
প্রাণ কান্দে রাখাল বন্ধু রে— ।।

কিংবা ––—পরদেশীয়া রাখালিয়া বন্ধু রে,
আড় বাঁশী বাজাইয়ে যাও শুনি — '
বন্ধু কার বা বাড়ির দুগ্ধ পান্তা মনের সুখে খাও,
কার বা বাড়ির ধেনুরে লইয়ে নিত্য গোঠে যাও।
বন্ধু কোন রমণীর সোহাগ ঢালা গলে ফুল বনমালা,
ভুবনও দেখাওরে চাঁদ চূড়ার গাঁথনী রে
আড় বাঁশী বাজায়ে যাও শুনি।

এর সংগে দিনাজপুরে প্রচলিত একটি মৈষাল গানের তুলনা করলে দেখা যাবে, এই অঞ্চলের গায়করা অনেক বেশি বাস্তববাদী :

ওকি ধিক্ ধিক্ মইষাল লো
ও মইষাল ধিক্ তোমার হিয়া
কুন পরাণে যাইবেন মইষাল
হামাগে ছাড়িয়া মইষাল লো।
মইষাল গো—হাট বা যাইছেন
বাজার যাইছেন—কিনিয়া আনবেন কি ?
ছাওয়াল বাপের লাল হাতুয়া
হামার দাঁতের মিশি—মইষাল গো
ও মইষাল গো—
হায়রে, তোমারানি যাইমেন চাকরীতে মইষাল
মোর ঝরিছে হিয়া—মৈষাল গো।

উদাসীর গান

পূর্ববংগে 'উদাসী' নামে একটি সম্প্রদায় আছে। তারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই আর একটি শাখা মাত্র। এদের গান বৈরাগী বৈষ্ণবের মতোই বটে তবে একটু তত্ত্বকথার আমেজ আছে :

কাল কাটালেম রঙ্গ রসে
হলনা মোর সাধন করা,
আমি গুরুবাক্য লঙ্ঘন করে
হইয়ে রলেম জীয়ন্তে মরা।
হলনা মোর সাধন করা ॥
সুমতি আর কুমতি এই দেহের
দুই যুবতী এই দেহের
পরম রূপসী তারা,
হলনা মোর সাধন করা ॥
সুমতি কয় সৎপথে থাক
কুমতি দেয় পথে বেড়া,
হলনা মোর সাধন করা ॥
কুমতির মন্ত্র নিয়ে,
আমি ধনে প্রাণে হলেম সারা
হলনা মোর সাধন করা ॥

কিংবা :

এমন সোনার দেহ কাষ্ঠ করলি
কার বা লাগি বল্
যার চরণে প্রাণ সঁপিলি,
যা ছিল সর্বস্ব দিলি,
সে যে কুব্জারাণীর ফাঁদে পইড়্যা

ভুইল্যা গ্যাছে বৃন্দাবন,
কার বা লাগি বল।
ভাবিয়া কয় দয়াল চাঁদ
চিনলি না, কালার ফাঁদ,
ও তার নাম কালা মন কালা
(অ তুই) বুঝলি না কালার গোমর
কার বা লাগি বল।
তুর লাগি মথুরার যাই
দাসখৎ মেলিয়া দেখাই

সে যে মথুরাতে রাজা হইয়্যা

ভুইল্যা গ্যাছে বৃন্দাবন

কার বা লাগি বল।

অথবা : পার কর রে দয়াল কালাচাঁদ

নইলে ডুইবা ত্যাজিব পরাণ।

উপার যাব বইল্যা রইলাম কূলেরে

তবু আমায় না করলি রে পার।

পার কর রে দয়াল কালাচাঁদ

ঘাটে আছে পারের তরী

তাতে নাই রে মাঝি নাই কাণ্ডারী

কেমনে হব পার,

দয়াল কালাচাঁদ।

এই যে অকূল পাথার চিনি না

সাঁতার না ধরতে জানি, না জানি হাল

পার কর রে দয়াল কালাচাঁদ।

জাগের গান

মালদহ জেলায় কিছু কিছু পাঁচমিশালী গানেরও সন্ধান মেলে, তার মধ্যে জাগের গান অন্যতম :

তুমি জানিতে বাঁধিতে কেশ যার হাজার টাকার মূল,

তুমি জানিতে বাঁধিতে বেণী বিন্ধা সোনার ফুল।

জল ফেলিয়া জল আনিতে শুনলে শ্যামের বাঁশী

পথ রুধিয়া দাঁড়াতো শ্যাম কুঞ্জবনে আসি।

বৃন্দাবনে নিন্দা শুনে কানুর উপর রোষে

তুমি কাঁদতে জানতে ভিজা কাঠে

আগুন দিয়া বসে।

শুধু জানিতে না রাধা তুমি হায়,

কালিন্দীতে হৃদয় দিলে আর না ফিরান যায়।

বাইদ্যানীর গান

পূর্ববঙ্গের বেদে বেদেনীদের সম্পর্কে আগেই বলেছি। তাদের ভিতরকার অধিকাংশ গানই বেউলা-লক্ষীন্দর নিয়ে হলেও, অনেক সময় তাদের ভিতর নিজেদের জীবনের কথাও শোনা যায় :

বাইদ্যানী আমার লগে যাইবা নি
চলো আমার সাধের বাইদ্যানী।
বাইদ্যা তোমার লগে যামু না
তোমার লগে সুখ মোর হইল না।
বাইদ্যানীলো যদি যাবি আমার বাড়ি
কিন্যা দিমু জর্জেট শাড়ি।
আর দিমু জলে ভাসা সাবান লো
ও তোর নাকে দিমু নড়বড়ি।
বাইদ্যারে বাবুর লগে চইল্যা যামু
ট্যাঁহা পামু গয়না পামু।
আর পামু সোনা পুঁথির মালা রে
আমি চড়ব হাওয়ার গাড়ী রে।
বাইদ্যানী লো তোর লইগ্যা মোর
অন্তর কান্দে চৌখের জলে।
আসমান কান্দে আর কান্দে
সুবুদ্ধি আয় বলিয়া লো—
ও তোর পাও ধইর‍্যা কই
ওলো আমার হৃদয় কাটা সই।

রঙ্গ রসিকতা বা মেঠোগান

পূর্ববঙ্গে এমন কতকগুলি গানের প্রচলন আছে যেগুলিকে বিশেষ কোনো শ্রেণীভুক্ত গান বলে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এগুলির প্রচলন হাটে, মাঠে, যেখানে সেখানে। তবে এসব গানের অধিকাংশই হলো রঙ্গ রসিকতার গান। মনে করুন, যেন কোনো কৃষাণ ঘরের বউ তার ভাসুরের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছে :

রঙিলা ভাশুর গো, তুমি ক্যানে দ্যাওর হইলা না।
তুমি যদি হইতারে দ্যাওর,
খাইতা বাটার পান,
(আর) রংগ রসে কইতাম কথা,
জুড়াইত পরাণ।
(আর) হাটে যাও বাজারে যাও
আমার একটি কথা,
(ঐ) দিদির লইগ্যা পানসুপারী,
আমার আলাপাতা (দোক্তাপাতা)।

কিংবা মনে করুন কোনো অবাস্তব পরিকল্পনা :

হায়রে মুনিয়া মাঝি, তোর গাঁজার নৌকা
পাহাড় দিয়া যায়।
গাঁজা খাইয়্যা শুইয়্যা থাহি
সিথানে পুষ্কনী দেহি,
আবার বাজার দেহি
তাল গাছের আগায় (রে)।
(আবার) ভ্যাদা মাছে ক্যাদা খায়,
পুঁটি মাছে পান চিবায়,
(আর) পোটকা শালা গাল ফুলাইয়া রয়।

ভাশুরের প্রতি অনুরক্ত হবার কথা যদি কল্পনা করা যায়, তা হলে কোনো নারীর পক্ষে তার দেবরের প্রতিও অনুরক্ত হবার কথা কল্পনা করা খুবই সম্ভব :

ছোট দেওরা তোর আওড়া কথা
প্রাণে সহে না (রে ছোট দেওরা)
ভাতার গেল ধান দাইতে
বাঘে ধইরা খাউক,
(মোর) সোনার দেওরা বাঁইচা থাউক।।
দেওরা মোরে করল পাগল
প্রাণে সহে না (রে),
ছোট দেওরা তোর আওড়া কথা প্রাণে সহে না।।
পান ত চিলি চিলি সুপারীর বাহাদুরী,

সোনা মুখে পানের খিলি,
দিলেও ত খায় না।
(লো ছোট দেওরা তোর আওড়া কথা প্রাণে সহে না।)

গাঁয়ের ভণ্ড বৈরাগী বোষ্টমদের নিয়ে গান বাঁধতে এইসব নিরক্ষর চাষাভূষার দল কিন্তু খুবই ওস্তাদ। মনে করুন কোনো বোষ্টম বাবাজীর বোষ্টমী পালাবার পর সে যেন আক্ষেপ করে বলছে :

কালা কেষ্ট কয় মোরে,
লাউর বয়সে করল রে বৈরাগী।
(ও আমি) কাশী গেলাম, গয়া গেলাম
সঙ্গে নাই লো বোষ্টমী,
কালা কেষ্ট কয় মোরে
লাউর বয়সে করল রে বৈরাগী।
লাউর আগা খাইলাম, ডগা খাইলাম
খাইলাম লাউয়ের তরকারী।
(কালা...............বৈরাগী)
টাকা আছে, পয়সা আছে,
আছে দুই গাছ চাপদাড়ি,
কালা কেষ্ট কয় মোরে,
লাউর বয়সে করল রে বৈরাগী।

হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজেও মোল্লা-মুন্সীদের নিয়ে গান রচনা করেছে গাঁয়ের কৃষাণ মজুররা :

মরি হায়, হায়রে মোল্লা হায়, এখন কী করি উপায় ?
ওই মুরগীর গর্জনে আমার পরাণ উইড়্যা যায়।
উস্তা বেচতে গেলাম চাচা খলিফার বাজারে—
(আর) ময়দান পাথারে পাইয়্যা কিলাইলাম চাচারে।
এক পয়সার মিঠাই কিন্যা পথে যাইলাম খাইয়্যা
বাড়ি আইলে পরে বউয়্যা কিলায় গায়ের গন্ধ পাইয়্যা।

এই সব মেঠো গানের ভিতর অনেক সময় বেশ নীতি কথারও সন্ধান মেলে :

কাল রে ঘোর কলি কাল
যা দেখি সব উল্টা কল।

মায় করছে দাসীপানা
গিন্নী ওঠে মাথার পর,
কাল রে ঘোর কলিকাল
যা দেখি সব উল্টা কল।
গন্ধে ভরা বাগান ঝরা
ফুটছে কত রংয়ের ফুল ॥
কলিতে কলের গাড়ি
চড়ছে কত নরনারী ;
তাদের হাওয়াই চটি পায়
কাল রে ঘোর কলিকাল
যা দেখি সব উল্টা কল ॥

কুচবিহারে 'ঠেকা গান' নামে এক প্রকার গানের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকেও আমরা এই রঙ্গ রসিকতা বা ব্যঙ্গ গীতির মধ্যেই স্থান দিলুম। অবসর সময় কৃষাণ সম্প্রদায়ের ভিতর দো-তরা সহযোগে তারা গাইতে থাকে :

ঘোঘার মাথায় টেরী-সিঁথি
ঘেঘীর মাথায় চাপ কাঠি,
উচা দাঁতে লাগাইছে মিশি,
ও-হো ও হায়রে হায়।
আবার যেমুন ছুঁড়া বাবরিওয়ালা
তেমনি ছুঁড়ি রসিয়া
ও হো হায়রে হায় হায়
উঁচা দাঁতে লাগাইছে মিশি।
বুড়া কয় বুড়িরে
ছোট্ট বৌযের মুখোত হাসি।
ও হো কপালে ও হায়রে হায়রে
কপালে সিন্দুরের ফোঁটা
বোচা নাক নোলক পরা
ও হো ও হায়রে হায়—
উঁচা দাঁতে লাগাইছে মিশি।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চম খণ্ড

[ছড়া ও প্রবচন]

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

ছড়া

বাংলার প্রচলিত ছড়া সম্পর্কে ইতিপূর্বে কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তি তাঁদের গ্রন্থে একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে এই কয়টি প্রধান যথা : (১) ছেলে ভুলান ছড়া। (২) ছেলে খেলা ছড়া ও (৩) মেয়েলী ছড়া। আমরা একে সাতটি ভাগে ভাগ করছি এবং সংক্ষেপে এই বিভাগগুলি সম্পর্কে যতটা সম্ভব আলোকপাত করবার চেষ্টা করব। তবে তার আগে বাংলায় প্রচলিত ছড়া-গান সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

'ছড়া-গান' কথাটা একটু গোলমেলে সন্দেহ নেই, তবে বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে না যে, যে-সব ছড়া বিশেষ করে ঘুম পাড়ানী ছড়া যেগুলি সংগীতের আকারে পরিবেশন করা যায় বা এই ধরনের কতকগুলি ছড়া আছে যে-গুলিতে সংগীতের রূপারোপ করা যায় আমরা এ স্থলে তাদেরই ছড়া-গান আখ্যা দিয়েছি।

ঘুম পাড়ানী ছড়া ও গান

চোত-বোশেখের দিনে সূর্যকিরণে উত্তপ্ত ধরিত্রী। মানুষ গরু সবাই গরমে হাঁসফাঁস করছে। গরমে ঘুম আসতে চায় না শিশুদের। জননীরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন তাদের শিশুদের ঘুম পাড়াবার জন্য। এক হাতে পাখা চলে অন্য হাত দিয়ে খোকা বা খুকুকে খুব মৃদু চাপড় দিতে দিতে মা গুন্ গুন্ সুরে গান ধরেন :

ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি
মোদের বাড়ি যেও,

খাট নেই পালঙ্ক নেই
খোকার চক্ষু পেতে বোসো।
এই গালে দিনু চুমো দে রে ঐ গাল,
ঘুমে ঘোর খোকা মোর চুমোর মাতাল ॥

এ ছড়াটির মূল যে কোথায় আজও তা স্থির হয়নি, কারণ এই ছড়া শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সমগ্র বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যায়। সত্যিকারের লোকসংগীত বিশেষ করে ছড়ার বৈশিষ্ট্য যে এখানেই—দেশ কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে সার্বজনীনতার দাবি রাখে। তবে এটিকে সত্যিকারের ছড়াই বলা চলে; সংগীতের রস এতে কতটা আছে সে বিষয়ে সঙ্গীতজ্ঞগণ চিন্তা করবেন। কিন্তু সত্যিকারের ঘুম পাড়ানী গানও বাংলায় যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ঘুম পাড়ানী গান সম্পর্কে 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। এইবার পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত একটি ঘুম পাড়ানী গানের নমুনা শুনুন।

সন্ধে হয়ে গেছে, পল্লীবাংলার বুকে জোছনা নেমেছে। আঙিনায় বসে অশান্ত দুরন্ত খোকা-খুকুকে চাঁদ দেখিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেও যখন খোকা-খুকুকে শান্ত করা যায় না তখন পূর্বপ্রথা মতো আস্তে আস্তে গায় চাপড় দিতে দিতে গান শুরু করেন বঙ্গজননীর দল:

ঘুম আয় ঘুম,
নিশিথ নিঝুম,
এই বেলা ছেড়ে খেলা দিয়ে যা রে চুমু।
খোকন আমার যুদ্ধে যাবে
লাল ঘোড়াতে চড়ে
আনবে কত টাকা মোহর
দেশ বিদেশে ঘুরে।
ঘুমের পরী আসে যায়
আঁধার ঘরের আঙিনায়
চুপি চুপি আয় রে ঘুমের পরী
খোকা খুকুর চোখে ঘুম নাই।
খুকুন আমার আজকে যাবে
নতুন শ্বশুর বাড়ি

পরবে কত সোনা দানা
রং-বেরং এর শাড়ী।
পরীর পাখার হাওয়া লেগে
ঘরে যারা ছিল জেগে
ঢুলে ঢুলে মায়ের কোলে
ঘুম যায় ঘুম ॥

ঠিক এই ধরনের গান উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি অঞ্চলেও শোনা যায়। মা বলছেন, ওগো ঘুম তুমি এসো, আমার যাদুমনি ঘুম যাচ্ছে। বাঁশ গাছের পাতা নড়ছে, আমার বাপজান (খোকা) তাই দেখে হাসছে। চৌকীর তলায় চিড়া রেখে দিয়েছি, (দই চিড়া খুব প্রিয় খাদ্য এ অঞ্চলে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে) রেখে দিয়েছি নাড়ু। আর রেখে দিয়েছি দুধের বাটি। আমার যাদুমনি উঠে তাই খাবে:

নিন আয়রে নিন আয়
মোর বাপোইটা নিন যায় ॥
ওরে বাঁশের পিতারী নাড়ছে
চান্দ বাপোই দেখি হাসেছে,
মোর বাপোই মোর
কনাত নিন যায় ॥
বাপোই চুড়া থুইসু
চকির তলত নিন আয়
বাপোই নাড়ু থুইসু
চকির তলত নিন আয় ॥
বাপোই দুধের একটা
চুগী থুইসু নিন আয়।

ছেলে ভুলান ছড়া

যে সব ছড়া বলে বা আবৃত্তি করে ছেলে বা মেয়েদের ভুলিয়ে রাখা হয় তাদেরই আমরা আখ্যা দেব 'ছেলে ভুলান ছড়া' বলে। এ সব ছড়ার রচয়িতা হলেন বয়স্করা। কিন্তু 'ছেলে-খেলার' যে সব ছড়া সেগুলির রচয়িতা কিশোর বালক-বালিকারা। এইবার 'ছেলে ভুলান ছড়া' সম্পর্কে এগুনো যাক।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের 'ছেলে ভুলান ছড়া'র সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এই লোকসংগীত বা ছড়া কোনো দিনই 'শেষ সংগ্রহ' হতে পারে না। গাঁয়ের ঘরে ঘরে ঐ জাতীয় কত ছড়া যে আজও ছড়িয়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমরা এইবার এই ধরনের কিছু 'ছেলে ভুলান ছড়া' আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি।

খোকনকে দুধ খাওয়াতে বসেছেন মা, খোকা বায়না ধরেছে, 'দুধ খাবেনা'। মা অনেক বোঝালেন:

এ দুধ খায় কে রে
সোনা মুখ যার রে।

এত সহজে কি আর খোকন শান্ত হয়? মা তখন বলতে থাকেন:

ঘন দুধের ছানা,
সবাই বলে দে না দে না,
দিলে যে মোর ঘর চলে না
সেই কথাটি কেউ বোঝে না।

দুধ খাওয়ানতো সাঙ্গ হলো। এবার তো ঘুমোবার পালা। ঘুম পাড়ানী ছড়া-গান গেয়েতো (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) ঘুম পাড়ান হলো। বিকেলে এ-কাজ সে-কাজ শেষ করে খোকনকে সাজান হলো। সে সময় যদি খোকন আবার বায়না ধরে, তখন চলতি মুখে বলতেই হয়:

অ মাইনকা আয়
আর যাবি নি তুই
রাম ঠাকুরের নায় (নৌকো)।
ইলের কচু বিলের শাক
রাইন্ধ্যা থুইছি ঘরে,
এমন সময় খবর আইল
মাইন্‌কারে নিছে বাঘে।

ছড়ার বৈশিষ্ট্যই এই। এর ছন্দে ভুল নেই; কথাগুলিও পৃথক পৃথক ভাবে ধরলে প্রত্যেকটিরই হয়তো অর্থও আছে, সুর সংগতিও হয়তো আছে, কিন্তু একটা আগাগোড়া মানে খুঁজে পাওয়া যায় না—সবই অসংলগ্ন ব্যাপার। মানে খুঁজবার চেষ্টা করা অধিকাংশ সময়ই বিড়ম্বনা মাত্র।

কখনও কখনও বয়ীয়সী মহিলারা বাচ্চাদের এ-ভাবেও বলে থাকেন :

নিত্যানন্দ ধূপের গন্ধ
খাওন পাইলেই মহানন্দ।

কিংবা :

সোনা সোনা ডাক ছাড়ি,
সোনা নেইকো বাড়ি,
মনা মনা ডাক ছাড়ি
মনা আছে বাড়ি।
আয়রে মনা আয়,
দুধ মাখা ভাত কাগে খায়।

কিন্তু ছড়া বলার সব চাইতে বড় সুযোগ হলো খোকনের যখন কান্না শুরু হয় তখনই। ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না শুরু করে খোকন—একটু বে মতলব হলেই। কাজেই খোকনের কান্না থামাবার জন্য অনেকটা যেন তাকেই উদ্দেশ্য করে বলতে হয় :

আশী কান্দে পড়শী কান্দে,
কান্দে রইয়া রইয়া,
(আর) অভাগিনীর মায় কান্দে
শানে পাছাড় খাইয়া।

কিন্তু খোকনের যদি তাতেও কান্না না থামে তখন তাকে হাসাতে হয়, কখনও শুড়-শুড়ি দিয়ে কখনও বা পেটে টোকা দিয়ে বলতেই হয় :

(ও) তাল নাইরে, না আছে গলুই,
(ওই) জরুয়া রুগীর পথ্য হইছে,
আমলকী আর দই।

এ সবতো তবু এক রকম, কিন্তু খোকন যদি দেখ্না-দেখ্ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে তা হলে কী হবে? তার দাদা দিদিরা নিশ্চয়ই বলবে :

ছেলে ধরার ভয় হয়েছে
খোকন কোথাও যেওনা,

হাবা দিয়ে থাবা দেবে,

বাবা বলতে দেবেনা।

এই ধরনের কিছু কিছু ছড়া মেদিনীপুর জেলার পল্লী অঞ্চলেও শোনা যায় :

১। কচিয়া কেনি কাঁহুরে শুন্‌রা ঘরকে যাইতে।
আম ডুব কাঁঠাল ডুব কনে বুস্যাখাইতে॥
হাল করতে হালিয়্যা ডুব ডুধ খাইতে গাই।
রাখাল রাখিতে ডুব শ্যামের ছোট ভাই॥
ঘেঁচি ঘেঁচি কৌড় ডুব পাশা খেলিতে।
ছিট কাপড়ের ছাতা ডুব মাথায় দিতে॥

২। আয় আয় রে টাকামনে মাছ ধরতে যাব।
মাছের কাঁটা পায় পশনে দলায় উঠ্যা রইব॥
লড়া গাছে ঝাড়া দিনে বত্রিশ টাকা ঝড়ে॥
বত্রিশ টাকার ঘি কলসি গো সরু চাউলের ভাত।
রাম যাইছন ব্যা হইতে ষোল পোর বাপ॥
এ্যাত টাকা লিচ্ছ বাফু দিলু বুড়া বরে।
আর যদি লিতু ডু টাকা দিতু ভাল ঘরে॥
খাইত চিরকাল॥

৩। সনা বায়ানি সনা বায়ানি গাই চরিতে জীবা
মা বাপো যে গাল দিব সন্ন্যাসী হবা॥
ভোগ লাগিবে কী খাইবু কাশিয়াড়ির ফল।
ধুম ধরিলে কাই শুইবু গাইর গোড় তল॥

ছেলে-খেলা ছড়া

'ছেলে-খেলা ছড়া' অর্থে যে সব ছড়া ছোট ছোট ছেলে বা মেয়েরাই শুধু আবৃত্তি করে তাদের নিজেদের ভিতর। এসব ছড়ার মধ্যে ছেলে ভুলান ছড়ার মতো অতটা চাকচিক্য নেই, পরিবর্তে আরও অধিক পরিমাণে আজগুবি কথা থাকে। কিন্তু অপূর্ব এদের ছন্দ বোধ। মনে করুন একটি অতি পরিচিত কিশোরদের ছড়া :

বিলের মইধ্যে চিলের বাসা কুত্তা বিয়ায় গাছে,
সেই চিল ধরিয়া খাইল রাম দাড়িকা মাছে।

'বিলের ভিতর চিলের বাসা' না হয় বুঝলাম, কিন্তু এই 'রাম দাড়িকা মাছ' যে কী তা রচয়িতা নিজেই বলতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু শব্দের পর শব্দ গেঁথে এই ভাবেই তারা ছড়া রচনা করে :

রাম লক্ষ্মণ দুই বাই (ভাই)
পথে পাইল মরা গাই (গরু),
রাম বলে খাইয়্যা যাই,
লক্ষ্মণ বলে নিয়া যাই।

এই কিশোরদের ভিতর যারা আবার একটু সেয়ানা ধরনের তারা আবার সময় বুঝেও ছড়া বলতে পারে। যেমন ধরুন গ্রীষ্ম অন্তে বর্ষার শুভাগমনে যখন তারা নিজেরাই বলাবলি শুরু করে :

ঠাকুরদাদার বাঙা গর (ভাঙা ঘর)
বিষ্টি নামে আড়াইফর (প্রহর)।
ঠাকুরদাদারে বাই (ভাই)
ছিটি ছিটি জল দে
জাম্পরি খেলাই ॥
চিনা খ্যাতে (ক্ষেতে) চিনাপিণ
দান (ধান) খ্যাতে আঠু পাণি।
ঠাকুরদাদারে বাই,
ছিটি ছিটি জল দে,
জাম্পরি খেলাই ॥
আড়াই ফুটি জল দে
নাইয়া দুইয়া (ধুইয়া) যাই ॥

কিংবা :

বিষ্টি পড়ে ফোঁটা ফোঁটা
ঠাকুরদাদার প্যাট্টা মোটা।

বাড়িতে যদি 'বৌদি' স্থানীয় কেউ থাকে তা হলে তো আর কথাই নেই। তা হলে এই ছড়া বলার সময় বৌদিকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলে বসে :

বিষ্টি আইলোরে
কাউয়ায় (কাকে) খাইলো দান (ধান)।
বড় বউর চুলে দইর‍্যা (ধরে) টান ॥

এ-সব অবশ্য একটু সেয়ানা গোছের ছেলেদেরই ছড়া। তবে কিশোর যারা তারা এখনও পুরাতন ছড়াই আবৃত্তি করে :

আইগণ বাইগণ তাড়াতুড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ি,
রেল (রেন) কাম, ঝমা ঝম্,
পা পিছ্‌লা আলুর দম্।
ইষ্টিশানে মিষ্টি গুড়
সখের বাদাম গোলাপ ফুল।

শ্বশুর বাড়িতে ছোট ছোট শালী-শালা থাকলে জামাইবাবুকে অনেক সময়ই শুনতে হয় :

জামাই বাবু কমলা লেবু একা খেয়ো না,
দিদি মোদের ছোট্ট মেয়ে চাইতে জানে না ॥

এই সব ছেলে মেয়েরা অনেক সময় গাঁয়ের ডাক্তার বাবুকেও লক্ষ্য করে ছড়া কাটতে থাকে :

ডাক্তার বাবু জলসাবু
পাতি নেবু।

কিংবা :

ডাক্তার বাবু আর খাবনা জলসাবু
আইন্যো দাও কমলা লেবু।

ছোট খোকাদের সব চাইতে আব্দার হলো ঠাকুমা, দিদিমার কাছে। ঠাকুমা যখন কিছুতেই গল্প বলতে চায় না এ-অসময়ে, তখন ঠাকুমার কাছ থেকেই শেখা ছড়া দিয়ে তাকেই জব্দ করতে চায় এই ছোটর দল :

ভাউয়া (ভাংগা) ডিঙ্গি নাও,
পান খাইয়্যা যাও
রাঙাদিদি ভোকা (উঁকি) দিছে,
তারে লইয়্যা যাও।

ভয় সহজাত। অন্ধকার পথ দিয়ে যেতে যেতে এক বন্ধু স্মরণ করিয়ে দেয় গত দিনের শোনা ভূতের গল্পের কথা। অমনি আঁতকে উঠল আর এক বন্ধু। কিন্তু এই সব আশু বিপদ থেকে রক্ষা পাবার মন্ত্রও তাদের জানা আছে। তারা এবার মনে সাহস এনে বলতে থাকে :

ভূত আমার পুত, শাক্‌-চুন্নি আমার ঝি,
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, করবি আমার কি ?

খেলতে খেলতে যখন দুই বন্ধু বা বান্ধবীর ভিতর মতান্তর ঘটে, তখন তারা একে অপরের সঙ্গে আড়ি দেয় :

আড়ি আড়ি আড়ি
কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর
কি করবি কর
হনুমানের ল্যাজ ধরে
টানাটানি কর।

এই বলে হাতের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে নিজের থুত্‌নীর উপর তিনবার করে আঘাত করে।

অনেক সময় দেব-দেবীদের নিয়েও ছড়া বাঁধে।

কার্তিক ঠাকুর ছোটদের বড়ই প্রিয়। তাই তাঁকে নিয়েও তারা ছড়া বাঁধতে কসুর করে না :

কার্তিক ঠাকুর, কার্তিক ঠাকুর
তুমি বড় হ্যাংলা,
একবার আস মায়ের সাথে
আর বার আস একলা।

মেয়েলী ছড়া

বাংলার ছড়া পর্যায় আলোচনা করলে মনে হয় মেয়েলী ছড়াই এর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। মেয়েদের খেলা থেকে ব্রত কথা সব কিছুতেই ছড়ার অনুকরণে এই আসরে বসে বসে নতুন ছড়া বানিয়ে বলতে থাকে। ছেলেদের ছড়া আর

মেয়েদের ছড়ার মধ্যে পার্থক্যই এই। মেয়েদের অধিকাংশ ছড়ার ভিতরই বিবাহ, রাজা, রাণী এই সব কথাগুলির আধিক্য বড় বেশি মাত্রায় পাওয়া যায়। মনে করুন একটি মেয়ের নাম যেন আশালতা, একটি হঠাৎ বানান ছড়ার মধ্যে মেয়েরা তাই নিয়ে ছড়া বাঁধল :

আশালতা পালং পাতা
তোমার নাকি বিয়ে,
হাওড়া থেকে বর এসেছে
টোপর মাথায় দিয়ে।
বর দেখে যাও, বর দেখে যাও
রান্না ঘরের ঝুল,
কনে দেখে যাও, কনে দেখে যাও
কনক চাঁপার ফুল।

এ ছড়াটি পশ্চিম বাংলার বহুস্থানেই প্রচলিত, কে যে এর প্রথম রচয়িতা সে সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এমন অনেক সময় হয় একজন হয়তো ছোট করে একটি ছড়া বাঁধল, পরে অন্যের দরবারে গিয়ে সেই ছড়াটিই ডাল পালা গজিয়ে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হলো।

দুপুর রোদে উঠানের কোণে একটু ছায়ায় মেয়েদের কয়েকজন মিলে খড়ি দিয়ে কোট কেটে ছড়া বলতে বলতে এক পায়ে ঐ কোটের এক ঘর থেকে আরেক কোটে যেতে দেখেছেন নিশ্চয়ই। ওরা বলে :

এক লাঠি চন্দন কাঠি
চন্দন বলে কা কা
ইজির বিজির সরে যা
প্রজাপতি উড়ে যা।

কিংবা :

আপন বাপন চৌকি চাপন,
ওল ঢোল, মামার কোল,
ওই মেয়েটি খাটিয়া চোর।

কখনও বা নিজেরা বসে বসেই 'চোর-পালান্তি' (চোর ও পালান), 'বৌ-বসান্তি' খেলে এই খেলার আরম্ভ বা শেষে কখনও কখনও বলে :

এলাডিং বেলাডিং সইলো,
একটি খবর আইলো।
কী খবর আইলো,
রাজা একটি বালিকা চাইলো।
কোন্‌ বালিকা চাইলো,
আরতি বালিকা চাইলো,
নিয়ে যাও, নিয়ে যাও,
দিয়ে যাও দিয়ে যাও বালিকাকে—।

কোনো কোনো সময় এরূপও বলতে শোনা যায়:

দশ কুড়ি, নাড়ি ভুড়ি,
চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি।
ওই আসছে খেঁদীর বর
গামছা মাথায় দিয়ে।
ও গামছা নেবনা,
খেঁদীর বিয়ে দেব না।
খেঁদীকে দেব সাজিয়ে,
টাকা নেব বাজিয়ে॥

কিংবা:

আম পাতা জোড়া জোড়া,
মারবো চাবুক চড়ব ঘোড়া।
ওরে বিবি সরে দাঁড়া,
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া খেপেছে,
বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে।

অথবা:

উপেনটি বাইস্কোপ,
টান টুন ঠাইস্কোপ,
চুলটানা বেবী আনা,
সাহেব বাবুর বৈঠক খানা।

কাল বলেছে যেতে,
পান সুপারী খেতে।
পানের ভিতর মৌরী বাটা,
ইস্কাবনের ছবি আঁটা।
কার নাম রেণুবালা,
গলায় দিলাম জহর মালা।

যখন কোনো একটি মেয়েকে জব্দ করবার দরকার মনে করে, তখন দলের বাকি সবকয়টি মেয়ে সেই মেয়েটির সুমুখে কিছু খাবার কিনে খেতে খেতে বলে :

এই মেয়েটা (ছেলেটা) ভেল্ ভেলেটা
মোদের (আমাদের) পাড়ায় যাবি,
মুড়ি মুড়্কী কিনে দেব,
কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাবি।

মেয়েদের সতীনে বড়ই ভয়। এই ভয় তারা পেয়ে আসছে শৈশব থেকেই। কাজেই সতীনকে কেটে নির্মূল করবার মতো ছড়া তারা ছেলেবেলা থেকেই শিখতে আরম্ভ করে। বোশেখ মাসে 'বট অশ্বত্থের' বিয়ে দেওয়ার একটা প্রথা বাংলার পল্লী অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু নজর পড়ে। বিবাহিতা মেয়েরাই এ ব্রত করে থাকে। বোশেখ মাসে মেয়েরা নদীর ঘাটে গিয়ে স্নান সেরে উঠে বলতে থাকে :

পাখি পাখি পাখি,
সাত সতীনকে গঙ্গায় নিয়ে যাক,
আমি ঘাটে-এ বসে দেখি।

এরপর বলতে থাকে :

উদ্ বিড়ালী উদ্ যা,
স্বামী রেখে সতীন খা,
অশথ তলায় বাস করি,
সতীন কেটো নির্মূল করি।
সাত সতীনের সাত কোঠা

তার মাঝে অভ্যন্তরের কোটা,
অভ্যন্তরের কোটা লড়ে চড়ে
সাত সতীনরে পুড়িয়া মারে ॥

মেয়ে বড় হলে বিয়ে একদিন তার হবেই—বাঙালী ঘরের মেয়েরা জন্ম থেকেই এ কথা শুনে আসছে, চোখের উপর দেখেও আসছে। তাই ছোট থেকেই তারা মা, দিদিমা, কাকীমাদের দেখাদেখি বড়দের কাপড়, অভাবে গামছাকে কাপড় বানিয়ে ঘোমটা দিয়ে বৌ সেজে রান্নাবাড়ি খেলতে বসে, কাঠের বা রবারের পুতুলকে জলের দুধ খাওয়ায়, ন্যাকড়ার তৈরি বিছানায় ঘুম পাড়ায়। নিজের খেয়ালেই যেন কান্না অনুভব করে। কান্না শান্ত করে। এই সব মেয়েদের কৈশোর থেকেই শ্বশুর বাড়ি এবং শাশুড়ীর গঞ্জনা সম্পর্কে একটা ভীতি লেগেই থাকবে এ আর একটা বেশি কথা কি ? :

শাশুড়ীর জ্বালাতে মইলাম
(ঘরে) নন্দাই ঠোক্না মারে,
নন্দাইর জ্বালায় গেলাম কাঞ্ছি
মশা ভিন্ ভিন্ করে।
মশার জ্বালায় গেলাম গোহালে
গরুতে চাট্ মারে,
গরুর জ্বালায় গেলাম জলে
কুমীরে দাঁত কাঁরে
(নন্দাই ঠোক্না মারে)।

অনেক সময় মেয়েলী এই সব ছড়ার ভিতর ছোটখাট গাণিতিক প্রশ্নও একটু আধটু থাকে। মনে করা যাক এক কৃষক যেন চব্বিশটা মাছ কিনে এনেছে। কৃষকের স্ত্রী সেই মাছগুলিতো রান্না করল। বেচারী ছিল একটু লোভী প্রকৃতির। সে ভাবল এমন টাট্কা মাছগুলি রান্না করলাম, না জানি কেমন হয়েছে এর আস্বাদ। একটা চেখেই দেখা যাক না কেন। এই ভেবে একটা মাছ চাখ্তে গিয়ে খেতে খেতে তেইশটা মাছই সে সাবাড় করে দিল। তখন হুঁশ হলো, তাইতো এখন উপায় ? স্বামী এসেতো মহা গণ্ডগোল বাধাবে। তক্ষুনি চট্ করে মনে মনে একটা হিসেব ঠিক করে নিয়ে বসে রইল। এদিকে দুপুরে খেতে এল তার স্বামী। বেচারী এত আনন্দ করে অত ভাল ভাল চব্বিশটা মাছ নিয়ে এসেছে, এখন দেখে কিনা তার পাতের কিনারে রয়েছে

মাত্র একটা মাছ! কৃষকতো রেগেই অস্থির। প্রশ্ন করে বসল—আর মাছ কোথায় গেল? মেয়েটি তখন উত্তর দিচ্ছে :

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা,
চিলে নিল দুই গণ্ডা।
বাকী রইল ষোল
হাত ধুইবার কালে, আটটা তাহার
জলে পলাইল।
বাকী রইল আট,
দুইটায় কিনিলাম আমি
দুই আঁটি কাঠ।
বাকী রইল ছয়,
খেন্তীর মাসীকে তাহার
চারটা দিতে হয়।
বাকী রইল দুই,
তাহার একটি চাখিয়া
দেখিলাম মুই।
বাকী রইল এক,
চোখের মাথা খেয়ে মিন্‌সে
পাতের কোলে দেখ্‌।
এখন হোস যদি মানুষের পো
(তবে) কাঁটাখানা খেয়ে রে তুই
মাছখানা থো॥

পূর্ববঙ্গে 'এক তারা' দেখার দোষ খণ্ডানোর জন্যও মেয়েদের ভিতর ছড়ার প্রচলন রয়েছে :

এক তারা ন্যাড়া বেড়া,
দুই তারা ভাইয়ের দোষ,
তিন তারা কাঁঠালের কোষ,
চার তারায় ঘরে ওঠ্‌।

অর্থাৎ চার তারা আকাশে না দেখা পর্যন্ত ঘরে ওঠা চলবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত

না এক, দুই, করে চারটে তারা অন্ততঃ পক্ষে দেখতে পায় ততক্ষণ বাইরে বসে তারা গোনার জন্য অপেক্ষা করবে এই মেয়ের দল।

সাধারণ ছড়া

ছেলে ভুলান ছড়া, মেয়েলী ছড়া ছাড়াও বাংলায় চলতি ছড়ার সংখ্যাও নেহাৎ কিছু কম নেই, বাংলার নারীকুলই বোধহয় এ বিষয়ে অগ্রগণ্যতা দাবি করতে পারেন। অবশ্য পুরুষের রচিত ছড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। ছড়াগুলি শুনলেই বোঝা যাবে কোন্‌টা কাদের দ্বারা রচিত।

খোকাখুকুদের গল্পের খনি হলো তাদের দিদিমা বা ঠাকুরমাশ্রেণীর বৃদ্ধারা। সময় পেলেই তারা ছুটে আসে তাদের দিদিমা-ঠাকুরমাদের কাছে। ক্রমেই বায়না ধরে, গল্প বল।

গল্পতো আর যখন তখন বলা সম্ভব নয়। কাজেই দিদিমা বলেন—কি আর বলবো ভাই:

কবিরাজের ভাই,
আলা তামাক খাই,
দাড়িতে মোচড় দিয়া,
কল গাড়ীতে যাই।

শয়তান লোকের ধরনই আলাদা। তারা মুখে বলে এক, কাজ করে আর। সে সব জায়গায় এইসব লোকদের নিশ্চয় বলা উচিত:

মুখে কয় থাকো থাকো
পায়ে ঠ্যালে নাও;
চোরা কুটুমের বাও।

কথায় বলে 'নাচতে না জানলে উঠানের দোষ' অর্থাৎ নিজের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য মিথ্যা ছলের অভাব হয় না কোনোদিনই। এই শ্রেণীর মেয়েদের উদ্দেশ্য করেই সম্ভবতঃ বাংলার পুরাঙ্গনাগণ বলে থাকেন:

শীতকালে শীত কাঁটা গ্রীষ্মকালে ঘামাচি,
কোন্ কালে ছিলে বউ, তুমি রূপসী?

অনেক সময় সমবেত ভাবে কোনো ভারী কাজ করবার সময় বুড়োদের ভিতরও

ছড়া বলার রেওয়াজ আছে। এর বৈশিষ্ট্য হলো, একজন (সর্দার) প্রথম কথাটি বলে, বাকি সবাই সমস্বরে 'হেঁই-ও' বলে টান দেয়। এই রকম একটি ছড়া :

গরম মুড়ি—হেঁই হো
নরম শশা—হেঁই হো—
যাউ টপাটপ—হেঁই হো—
ঘট্‌কী মারো—হেঁই হো—ইত্যাদি।

নতুন কোনো লোক খেতে বসে জিনিসপত্রের আধিক্য দেখে স্বভাবতঃ বলে থাকেন অত দিচ্ছেন কেন, এত কী খাওয়া যায়? ইত্যাদি। কিন্তু সত্যি করে এটা কি তার মনের কথা? এটাতো মাত্র লোক-দেখানো ভদ্রতা মাত্র। এইসব লোকদের দেখেই বোধহয় রচিত হয়েছে :

খাবনা খাবনা তেলের পিঠে,
সাত মণ (?) পিঠে গেল উঠে।

বাঙলার গৃহ আঙিনায় গৃহস্থালীর ছোট-খাট সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্নাকে অবলম্বন করেও ছড়া কিছু কম রচিত হয় নি।

অল্প জিনিসে অনেক লোককে সন্তুষ্ট করা চলে না। অবশ্য কথায় বলে, 'যদি হয় সৎ জন, তেঁতুল পাতায় সাতজন'। কিন্তু কার্যক্ষেত্রেতো আর তা সম্ভব হয় না,—এই ধরনের ছোটখাট ঘটনা ও কথাকে আশ্রয় করেও অনেক চল্‌তি ছড়া রচিত হয়েছে। এই রকম একটি চল্‌তি ছড়ার উল্লেখ করা চলে :

এক পয়সার তৈল,
কিসে খরচ হৈল,
তোর দাড়ি মোর পায়,
আরও দিয়েছি ছেলের গায়,
প্যাঁচা পেঁচীর বিয়ে হল,
সাত রাত গান হল,
কোন্ অভাগী ঘরে এসে,
বাকী তেলটুকু ঢেলে নিল।

কিংবা :

একদিন রাঁধে বুড়ি সাতদিন খায়।
আরও তার পান্থা চোরে নিয়া যায়॥

এই ধরনের আর একটি পুরাতন ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায় :

এক পোয়া দুধের ছানা
কে বা কত খায়।
কত বা নর্দমা গলে যায়।
উপীন, বিপিন খাবে,
গোষ্ঠ আমার কোলের ছেলে
তাকেও একটু দিতে হবে।

কামিনী আমার রাঁড় মেয়ে
তাকেও একটু দিতে হবে।

বড় বৌ পরের মেয়ে
তাকেও একটু দিতে হবে।

কর্তা বুড়ো মানুষ,
তাকেও একটু দিতে হবে।

আমি পোড়া গিন্নী মানুষ,
দই না হলে ভাত রোচে না॥

এই সব শাশুড়ীদের উদ্দেশ্য করেই বোধহয় সেকেলে গৃহিণীরা ছড়া বেঁধেছিল :

শাউড়ী এমন দুতের দুত কাঠি মেপে খোয় দুধ,
বউ এমন দুতের দুত জল মিশিয়ে খায় দুধ।

বাঙালী গৃহিণীরা এককালে সু-রাঁধুনী ছিলেন। তাই কনে দেখতে গেলে আজকাল যেমন প্রথমেই প্রশ্ন করা হয় কতটুকু লেখাপড়া করেছ, গান বাজনা জান কিনা ইত্যাদি, তখনকার দিনে মেয়ে দেখতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করা হতো কি কি রান্না করতে জান ? রান্নাবান্না বাঙালী মেয়েরা জন্ম থেকেই শিখে আসছে মা, দিদি, মাসী, পিসির কাছ থেকেই। তাই এইসব মেয়েলী ছড়ার ভিতর অনেক সময় ভোজনের সংবাদও কিছু কিছু পাওয়া যায়। তবে এসব আহার্য বস্তু নিমন্ত্রণ বাড়ির পোলাউ, মাংস, কালিয়া কোপ্তা নয়। নেহাৎই সাদামাঠা কৃষাণ-ঘরের, শাক, চচ্চড়ি আর ডাল ভাতের কথা। এই রকম একটি ছড়ার নমুনা শুনুন :

কে যায়রে, কে যায়রে ছোল্লা বাড়ি দিয়ে ?
ছোল্লার শাখ রেঁধেছি রে—হিং মৌরী দিয়ে।
হিং মৌরীর বাসে,
জামাই পালায় ত্রাসে,
কাল জামাই আনবো গো
ঢাক ঢোল বাজিয়ে।

যাকে আমরা সব সময়ই দেখতে পাই, যে আমাদের সকল কাজেরই সাথী, তাকে আমরা সমাদর করি না। 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' গোছের ব্যবস্থা। এই নিয়েও বেশ সরস ছড়া শোনা যায় মহিলা মহলে :

দূরের জামাই মধুসূদন, কাছের জামাই মোধো,
ভাত খেয়ে যাও বাবা মধুসূদন, ভাত খেয়ে যাও মোধো।

এর থেকেই প্রমাণ হয় এক জায়গায় বেশি যাতায়াত করলে আর আদর থাকে না। রোজ রোজ শালগ্রাম শীলাকে দেখতে দেখতে, শেষটায় তাঁকেও মনে হবে একখণ্ড নুড়ি পাথর বলে। একথা আমাদের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই সব প্রচলিত ছড়ার ভিতর অনেক রঙ্গরসের কথাও শোনা যায়। মনে করুন, কোন ভদ্রলোক একজন বাচাল শ্রেণীর লোককে জিজ্ঞেস করলেন :

'এই গপ্পের ব্যাটা মহা গপ্পে, তোর বাবা গেছে কোথায় রে ?'

সেতো উত্তর দিল, 'রাজাদের উঠোন সেলাই করতে।' ভদ্রলোক দেখলেন, এ তো বড় বেয়াড়া লোক, তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁরে তোদের গরুতে দুধ দেয় কতটা রে ?'

লোকটি উত্তর দেয়, 'তা জানি না, তবে ঘি হয় দৈনিক ষাট মণ।'
বুঝুন তা হলে একেই বলে 'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।'

আনুষ্ঠানিক ছড়া

বাংলায় এমন কতকগুলি ছড়া আছে যেগুলি নর-নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে আবৃত্তি করে থাকে। এর মধ্যে পৌষ পার্বণ উপলক্ষে মাগনের ছড়া অন্যতম। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের পল্লীঅঞ্চলের কোথাও কোথাও এখনও গোটা পৌষমাসভর মেয়েদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাগন আনতে গিয়ে গাইতে শোনা যায় :

আইলাম লো অরণে
লক্ষ্মীমায়ের স্মরণে,
লক্ষ্মীমায়ে দিলেন বর
ধান চাল বাহির কর।
ধান দিমু না দিমু কড়ি
তাইতে এত লড়ির দড়ি,
লড়ির দড়ি শ্যাম রে।
বাইনা বাড়ির কাম রে
বাইনা বাড়ি ঘুঘুর বাসা
বাবুগণের রং তামাসা,
নানা মাসে নানা ভাষা
বাবুরা দেন এক টাকা।

পাঁচ মেশালী ছড়া

কতকগুলি ছড়া আছে যেগুলিতে রসিকতা সহযোগে কিছু কিছু নীতি কথাও বলা হয়ে থাকে। যেমন ধরুন, কেউ কেউ অনেকবার খেয়েও বলে সে যেন কিছুই খায়নি, বা অনেক পেয়েও যার পাবার আকাঙ্ক্ষা আর কিছুতেই যেতে চায় না। তেমনি ধরনের ব্যাপারে নিশ্চয় বলা চলে :

সাত বার খাইয়্যা রইছে শুইয়্যা,
তার চাউল নেও আগে ধুইয়্যা।

কিংবা :

বেয়ানে (সকাল) খাইছি বেয়াস্তা (সকাল বেলার ভাত)
তারপর খাইছি পান্তা,
তারপর খাইছি ফ্যানে ভাতে,
হেরপর খাইছি ভাশ্ ঠাকুরের পাতে।
দেইখ্যা গ্যাছ হেই
আর লইয়্যা বইছি এই
কয় বার অইল অ্যাঁ— ?

'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি' বলে একটা কথা আছে। এই রকম একটা

ছড়ার খবর পাওয়া যায় দিনাজপুর জেলায়। একজন ধূর্ত লোক তার ছেলেকে বিয়ে দিল একটি মেয়ের সংগে। এই ছেলেটির গলায় ছিল গলগণ্ড, আর মেয়েটির ছিল দুই চক্ষুই অন্ধ। এ-পক্ষ ছেলের বাপ ভাবে সে জিতেছে, অপর পক্ষ মেয়ের বাপ ভাবে, তারই জিৎ—এই নিয়েই হলো ছড়াটি। এর পিছনে কোনো ঘটনা না থাকলেও এটিকে ঐ 'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি'-র অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে :

ছেলের বাপ : কাম বাগাইছি বারে
আর কার বাপোকে ডর ?
ঘ্যাগার (গলগণ্ড) কাপড় খুইল্যা বেটা,
ক্ষীর কবুল (খা) কর।

মেয়ের বাপ : যে কথাটা কহিলেন বিহাই
সে কথাটা মানি,
মোর বেটিরে যে বিয়া দিলাম
দুই চোখ তার কানি।
আজ বুঝবেনা না বিহাই।
বুঝবেন কাল,
হাত ধইর‍্যা পার করতে হবে যখন
বড় বড় আল।

ছড়া যে সব সময় কার্যকারণ সম্বন্ধ নিয়েই রচিত হয় তা নয়। অনেক সময় দূরপ্রবাসী কন্যার জন্য মায়েদের আক্ষেপ করেও বলতে শোনা যায়—'এমন জামাইর কাছেই মেয়ে বিয়ে দিলাম যে এতদিনের মধ্যে (কত দিন কে জানে !) একবারের জন্যও মেয়েটাকে দেখতে দিল না' :

ঢাকীরা ঢাক বাজায় খালে বিলে
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাইতের ম্যালে।
আবাগী লো মা,
ভাত কাপড় দিয়া ঢাইক্যা নিল
আর চৌক্ষে দ্যাখলাম না।

বাংলার লোক-কবিরা সব সময় যে নিজেদের কথাই বলেছে তা নয়, অনেক সময় পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ ও বনস্পতির মুখ দিয়েও কথা বলিয়েছে। ঢাকা জেলার বৃষ্টি নামার একটি ছড়ার ভিতর দেখা যাচ্ছে পদ্মলতা, কলমীলতা,

কচুরিপানা শুকনোর দিনে নির্জীব হয়ে থাকে। প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে থাকে —তাদের অস্তিত্বও টের পাওয়া যায় না, কিন্তু বর্ষা সমাগমে এরাই আবার নব জীবন লাভ করে জলের উপর ভেসে উঠে। তাই যেন এইসব পদ্মলতা, কলমীলতা, কচুরীপানা বলছে—আজ আমাদের অস্তিত্ব তোমরা টের পাচ্ছ না বটে, কিন্তু বর্ষা এলেই আমরা আবার বেঁচে উঠবো আমাদের স্বকীয় মূর্তি নিয়ে, তখন দেখবে ভ্রমর আসবে আমাদের ফুলের মধু খেতে :

থাকুম্ থাকুম্ প্যাঁকের তলে
বাইস্যা (ভেসে) উঠুম বাইষ্যা (বর্ষা) কালে,
দেইখ্যো তোমরা,
আবার বোম্‌রা (ভ্রমরা)
গুন গুনাইয়্যা আইব মধু খাইতে,
আর ত দেরী নাই বাইষ্যা আইতে।

নতুন বর্ষার সময় প্রকৃতির মতো কিশোরও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, এ কথা ঠিক, কিন্তু আষাঢ় মাসে যখন শুধুই বৃষ্টি আর বৃষ্টি, চারিদিকেই জলে জলময়, তখন বৃষ্টির পরিবর্তে রোদ কামনা করা শিশুদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, তাই তারা বৃষ্টি নামার ছড়ার মতোই রোদ ওঠার ছড়াও বানিয়েছে :

এক পয়সার অলদি (হলুদ)
বৃষ্টি নাম জলদি।
অলদি দিমু বাইট্যা
রৌদ ওঠ ফাইট্যা।
আগ্রা গাছের ব্যাগ্রা ফুল
চম্ চমাইয়া রৌদ ওঠ্।
বুডি লো বুড়ি বকুল তলায় যাবি ?
সাতখান কাপড় পাবি,
সাত বৌ-রে দিবি,
নিজে পিন্‌বি ত্যানার খোট
চম্ চমাইয়া রৌ-দ ওঠ ॥

আর হয়তো এ কারণেই বড়রা বলেছে :

কাঁচা মরিচ (লংকা) কাসন্দ,
পোলাপানের (বাচ্চা) আনন্দ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবচন বা লোক-প্রবাদ

বাংলার ঘাটে মাঠে, আকাশে বাতাসে যেমনি ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য গান আর গাথা, সুর আর ছন্দ, ছড়া আর রূপকথা তেমনি প্রবাদ বাক্য বা লোক প্রবাদও বড় কম নেই। এ গ্রন্থে আমরা মাত্র বাংলায় বহুল প্রচলিত কতকগুলি প্রবাদ বাক্যের সংগে আপনাদের কিছু পরিচয় করিয়ে দিতে চেষ্টা করব। আশা করি এর মাধ্যমেই আপনারা নিরক্ষর জনসাধারণের স্থির বুদ্ধি ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পারবেন।

ছড়া আর প্রবাদ বাক্য প্রায় সমগোত্রীয়, কিন্তু এর মধ্যেও সামান্য কিছু পার্থক্য থেকেই যায়। ছড়া কথাটির মধ্যে কবিত্ব শক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু তার ভিতর চিরন্তনী ভাব যে সব সময় একটা থাকবেই তা বলা চলে না, পক্ষান্তরে প্রবচন বা প্রবাদ বাক্য এমনই একটি বস্তু যার স্থায়িত্ব দূর-প্রসারী। তা ছাড়া ছড়াগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্যমূলক। সাময়িক কাজ মিটবার পরই এর অধিকাংশ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রবাদ বাক্য তো তা নয়। এ যেন জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণের (axiomatic truth) মতোই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি জিনিস যে কোনো দিনই লোকের মন থেকে মুছেও যায় না বা বহুবার প্রয়োগ করবার পরও এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না।

ছড়া এবং লোক-গীতি হয়তো সমপর্যায়ভুক্ত লোকেরই সৃষ্টি, কিন্তু প্রবচনের জন্মদাতৃগণ যে শুধু কবিত্ব শক্তিরই অধিকারী তা নয়, যারা এর রচয়িতা তারা যে বিচক্ষণ দূরদর্শী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবী একথা অস্বীকার করা চলে না—নতুবা এগুলি টিঁকে থাকতেও পারত না।

আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ বাক্যগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করছি। যেমন, যে-সব প্রবাদ বাক্য শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত সকল সমাজেই প্রচলিত সেগুলিকে আখ্যা দেব 'আটপৌরে' এবং যে-সব প্রবাদ বাক্য একটু সভ্য ও শিক্ষিত তথা ভদ্রশ্রেণীর মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ সে গুলিকে বলব 'পোশাকী'। অবশ্য এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ কোথাও নেই—আমরা কাজের সুবিধার জন্যই এই ভাবে আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি মাত্র।

আটপৌরে প্রবচন

অ

১। অল্প জলের তিৎপুঁটি ফটাং ফটাং করে।

২। অসৎকর্মের বিপরীত ফল
মশা মারতে গালে চড়।

৩। অযোগ্য দান আর অপমান সমান।

আ

১। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

২। আলো চাল আর কাঁচা তেঁতুল।

৩। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।

৪। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের দরকার কি?

৫। আর একবার সাধিলেই খাইব।

৬। আপনা হাগুড়ী সেলাম পায়না, খুড়তা হাগুড়ী পাও বাড়ায়।

৭। আপোলার পোলা হইছে
চুমা দিতে পোলা মরছে।

উ

১। উপর দিকে তাকিয়ে থুতু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে।

২। উচিৎ কথা কব লো মাসি,
এতে তোমার বাড়িতে আসি আর নাই আসি।

এ

১। এক মাঘে শীত যায় না।

২। এক কলসী দুধের ভিতর এক ফোঁটা গো-চোনা।

৩। এই বর্তের এই কথা, ঘটে দিলাম ফুল ব্যাল পাতা।

ও

১। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।

২। ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে।

ক

১। কার বা গোয়াল কে বা দেয় ধোঁয়া।

২। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়।

৩। কাজের সময় কাজী,
কাজ ফুরোলেই পাজী।

৪। কষ্ট করলেই কেষ্ট মেলে।

৫। কপাল ছাড়া পথ নেই।

৬। কপালে নেইকো ঘি
ঠক্ ঠকালে হবে কী!

৭। কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে।

৮। কপালে আছে ঘি
না খেয়ে করি কী!

৯। কারও পৌষমাস,
কারও সর্বনাশ।

১০। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরল।

১১। কত গেল রথা রথী
শ্যাওড়া তলায় চক্কোত্তি।

১২। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন!

১৩। কোলে নাই কাচা,
ঢেঁকী তুইল্যা নাচা।

১৪। কত সখ যায় লো চিতে
গোদা পায় আলতা দিতে।

খ

১। খাওয়ার সময় যমেও ছোঁয়না।

গ

১। গরজ বড় বালাই।

২। গরু মেরে জুতো দান।

৩। গরীবের কথা বাসী হলেই মিষ্টি লাগে।

৪। গাঁয় মানেনা আপনি মোড়ল।

৫। গরীবের দুয়ারে হাতীর পাড়া।

চ

১। চোরকে বলে চুরি করতে
গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।

২। চোরে চোরে মাসতুত ভাই।

৩। চোরের সংগে রাগ করে
ভুঁইয়ে ভাত খাওয়া যায়না।

৪। চোরে চোরে হালী—
এক চোরে বিয়া করে
আরেক চোরের শালী।

৫। চালাকে চালাকে কাড়াল খায়,
বব্বরের মুখে আঠা দেয়।

ছ

১। ছাই ফেলতে ভাংগা কুলোর আদর।

জ

১। জাতও গেল পেটও ভরল না।

২। জুতো মেরে গরু দান।

ঝ

১। ঝড়ে বগ মরে ফকিরের কেরামতী বাড়ে।

ট

১। টাকা হলে বাঘের দুধও মেলে।

ড

১। ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাপেও জানবে না।

ঢ

১। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার।

ত

১। তোবড়া গালে বুড়ো ময়না
মুখে মাখে রং।

থ

১। থাকতে দেয়নি দানা পানি
মরলে দেবে ছানা চিনি।

২। থাকে লক্ষ্মী, যায় বালাই।

৩। থাকতে দেয় না ভাত কাপড়
মরলে করবে দান সাগর।

দ

১। দেখ্‌লে আট্‌কা আট্‌কি
না দেখলে প্রাণে মরি।

২। দা-কুমড়োর সম্পর্ক।

৩। দশে মিলি করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।

৪। দাউদ্যা জামাই ছৌউদ্যা ঝি
কম্মের ল্যাহা করমু কি ?

ন

১। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।

২। নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল।

৩। না খাওয়ার চেয়ে চিড়ে খাওয়াও ভাল।

৪। নাক দিয়ে দুধ গলে।

৫। নেই কাজ তো খই বাছ।

৬। নিজের চরকায় তেল দেও।

৭। নুন আনতে পান্তা ফুরোবার যো।

৮। নাইয়ার এক নাও, নি-নাইয়ার শতেক নাও।

প

১। পড়েছি গোলামের হাতে
খানা খেতে কয় সাথে।

২। পয়সা নেই, কড়ি নেই, রাধামণি দরজা খোল।

৩। পণ্ডিতের স্ত্রী মূর্খের মা,
গন্তব্যটি ব্যাখ্যা করে—
আস্তে আস্তে যা।

ফ

১। ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর ?

ব

১। বামুন করে মানের ভয়
চাঁড়াল বলে আমাকে ডরায়।

২। বসে থাকার চাইতে বেগার খাটাও ভাল।

৩। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল।

৪। বাঘে মোষে এক ঘাটে জল খায়।

৫। বসতে পেলেই শুতে চায়।

৬। বরের ঘরের পিসি
কনের ঘরের মাসী।

৭। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।

৮। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

৯। বোঝার উপর শাকের আঁটি।

ভ

১। ভাল ভাল করে গেলুম কেলোর মার কাছে,
কেলোর মা বলে, আমার ছেলের সংগে আছে।

২। ভাত জোটেনা মুড়কী জলপান।

৩। ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

৪। ভাত দেয় কি ভাতারে ?
ভাত দেয় গতরে।

৫। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি ?

৬। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

ম

১। মার পোড়ে না পোড়ে মাসীর
ঝাল খেয়ে মরে পাড়া পড়শী।

২। মার কাছে মামা বাড়ির খবর।

৩। মারলি মারলি ভালই করলি
হাতের ভাঙ্গলি চুড়ি
ভেবে গিয়ে দেখরে মিনসে
অপচয় হল তোরই।

৪। মোগল পাঠান হদ্দ হল
ফার্শী পড়ায় তাঁতী।

য

১। যত ছিল নলবনে সব হল কীর্ত্তনে।
কাস্তে ভেঙ্গে গড়াইল করতাল।

২। যেমন কর্ম তেমন ফল
মশা মারতে গালে চড়।

৩। যার কাজ তারে সাজে
অন্যের কাজে লাঠি বাজে।

৪। যেমনি কুকুর, তেমনি মুগুর।

৫। যত দোষ নন্দ ঘোষ।

৬। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

৭। যার সঙ্গে যার মজে মন
কিবা হাড়ি, কিবা ডোম।

৮। যার নাম ভাজা চাল, তার নামই মুড়ি।

৯। যায় শত্রু পরে পরে।

১০। যার না হয় নয়তে, তার হয় না নব্বুইতে।

১১। যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামশর্মা।

১২। যে না বিয়া তার আবার চিৎ বাইদ্য।

র

১। রাম না হতেই রামায়ন রচনা।

২। রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে?

৩। রথ দেখা আর কলা বেচা দুই হল।

ল

১। লাখ টাকায় বামুন ভিখারী
এক পয়সায় চাঁড়াল চদ্রী (চৌধুরী)।

২। লাথির ঢেঁকী কি আর চড়ে ওঠে?

ষ

১। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে।

স

১। সাধে কি আর বাবা বলে।
গুঁতোর চোটে বাবা বলে।

২। সেই ত মল খসালি,
তবে কেন লোক হাসালি?

৩। স্বাদ পেয়েছে বুড়ো ভিটের আলু খেয়ে,
রোজ সকালে ধায় বুড়ো খোন্তা কোদাল নিয়ে।

৪। সেজে গুজে রইলেন বসে,
বর এলোনা চোপার দোষে।

৫। সব শেয়ালেরই এক রা।

৬। সুখের থেকে সোয়াস্তি ভাল।

৭। সারাদিন গ্যাল হ্যালে ফ্যালে
রাত্রি হইলে বুড়ি কাপাস ডলে।

৮। সাত বৌর এক শাড়ি,
পইরা বেড়ায় বাড়ি বাড়ি।

৯। সতীনের ভাই কেরাণী খাটে,
তাই দেইখ্যা মাগী চিৎ হইয়্যা হাঁটে।

১০। সাপ হইয়া দংশন করে,
ওঝা হইয়া ঝাড়ে।

হ

১। হাতী ঘোড়া গেল তল,
গাধা বলে কত জল।

২। হিন্দু যদি মুসলমান হয়,
মুরগী খাবার যম হয়।

৩। হরি বাসর বা হরি মটর।

৪। হাতের পাঁচ।

৫। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান হয় না।

৬। হুন্দ করছে রামনারাইন্যা,
বাড়ির মইধ্যে পেয়াদা আইন্যা!

গোশাকী প্রবচন

অ

১। অরণ্যে রোদন।

২। অতি বড় হোয়ো নাকো ঝড়ে ভেঙে পড়বে,
অতি ছোট হোয়ো নাকো ছাগলে মুড়োবে।

৩। অপচয় কোরো না অভাব হবে না।

৪। অন্ধের কিবা দিন, কিবা রাত।

আ

১। আর একবার সাধিলেই খাইব।

২। আদায় কাঁচকলা।

৩। আপ রুচি খানা,
পর রুচি পরনা!

৪। আপনি ভালতো জগৎ ভালো,
আপনি মন্দতো জগৎ মন্দ।

৫। আয় বুঝে ব্যয় কোরো।

৬। আবাহনও নেই বিসর্জনও নেই।

৭। আপনি থাকতে নেই ঠাঁই শংকরাকে ডাক্।

৮। আ-দেইখলায় দ্যাখছে, পুঁটি মাছে ল্যাখছে।

৯। আসবেন জামাই নেবেন ঝি,
এর বেশি আর করবেন কি?

১০। আলোর নীচেই আঁধার।

১১। আ-দেইখলার ঘটি অইছে,
ঢোকে ঢোকে জল খাইছে।

ই

১। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

উ

১। ঊচিত কথায় মানুষ হয় রুষ্ট,
দেবতা হয় সন্তুষ্ট।

এ

১। একেতো উমা তাতে তুষের ধুঁয়া।
২। এক কাঠি কখনও বাজে না।
৩। এক গুলিতে দুই বাঘ।

ক

১। কংসের রাজ্যে হরিনাম নিষিদ্ধ।
২। কালনেমীর লঙ্কা ভাগ।
৩। কামাইতে পারে না নাপিত, ধামা ভরা ক্ষুর,
কামাইতে কামাইতে যান রঘুনাথপুর।
৪। কাজীর কাছে দুর্গোৎসব মানা।
৫। কচুগাছ কাটতে কাটতেই ডাকাত হয়।
৬। কেহ মরে বিল ছেঁচে,
কেউ খায় কৈ।
৭। কোন্ জন্মে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছে,
তার গন্ধ কি এখনও হাতে আছে ?
৮। কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোয়ার সখ।

খ

১। খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে,
কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে।

গ

১। গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল।
২। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।
৩। গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।
৪। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

ঘ

১। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান।

২। ঘরের ইঁদুরে বাঁধ কাটলে তা সামলান যায় না।

চ

১। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

২। চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না।

৩। চোরের রাত্রিবাসও লাভ।

৪। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

৫। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

৬। চোরের বাড়ি দালান হয় না।

৭। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।

৮। চোরের উপর বাটপাড়ী।

ছ

১। ছোট মুখে বড কথা,
শুনলে করে মাথা ব্যথা।

২। ছাগল দিয়ে কি আর ধান মাড়ান যায়?

৩। ছোট সরাটি ভেঙ্গে গেছে
বড় সরাটি আছে,
নাচ কোঁদ ক্যান বউ
হাতের ওজন আছে।

জ

১। জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।

২। জোর যার মুল্লুক তার।

৩। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ।

৪। জহুরী না হলে জহর চেনে না।

ঢ

১। ঢেঁকীরে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে,
অবুঝরে বুঝাব কত, বুঝ নাহি মানে।

২। ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে হয়।

৩। ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়।

ত

১। তোমারে বধিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।

দ

১। দশের লাঠি একের বোঝা।

২। দশ দিন চোরের, একদিন সাউধের।

৩। দু নৌকায় পা দেওয়া ঠিক নয়।

৪। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝবে না।

৫। দাসীর কথা বাসী হলে কাজে লাগে।

৬। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা, ঘনাইয়া বসে কাছে,
কথা দিয়া কথা নেয়, প্রাণে মারে শ্যাষে।

ধ

১। ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।

ন

১। ন্যাড়া বেল তলায় যায় ক বার ?

২। নাচতে না জানলেই উঠোনের দোষ হয়।

৩। নিজের আয়ু আর পরের ধন কেউ কোনোদিন কম দেখে না।

৪। নদী মরলেও তার রেখাটা থাকে।

৫। নিজে থাকতে নেই ঠাঁই,
বৌর সাথে সতের ঠাঁই।

৬। নাপিতের কাজ কি ঢোল বাজান ?

প

১। পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।

২। পান না তাই খান না।

৩। পান থেকে চুন খসবার উপায় নেই।

৪। পাপী যাবে গঙ্গাস্নানে,
ঘুঁটে কুড়োবে কে ?

৫। পাপ করলে তবে তো যমের ভয়।

৬। পারে না কামাইতে, উইঠ্যা বসে রাইত থাকতে।

ফ

১। ফুলের ঘায়ে মুর্ছা যায়।

ব

১। বেল পাকলে কাগের কী ?

২। বামন হয়ে চাঁদে হাত।

৩। বল বল বাহু বল।

৪। বারে বারে যাদু তুমি ধান খেয়ে যাও
এইবার যাদু তোমার বধিব পরাণ।

৫। বাঁশের চাইতে কঞ্চি দড়।

৬। বাবারও বাবা আছে।

৭। বিষে বিষ ক্ষয়।

৮। বোবার শত্রু নেই।

৯। বোনাই আবার দাদার বাবা !

১০। বিন্যে তোলো তোলো বান।

১১। বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

১২। বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।

১৩। বাপ রাজা রাজার ঝি
ভাই রাজা তো আমার কি ?

১৪। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

১৫। বেদে চেনে সাপের হাঁ।

১৬। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

ভ

১। ভাঙ্গবে তবু মচ্‌কাবে না।

২। ভাজি ঝিঙ্গে, বলি পটল।

৩। ভাঁড়ারে মা ভবানী।

৪। ভাত খায়না মেঞায় বিটি খাট্টার জন্য কান্দন।

ম

১। মুখ সর্বস্য কোঠা বাড়ি।

২। মাছ যেটা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় সেইটেই বড় হয়।

৩। মুখে সরল মনে গরল।

৪। মুখে মধু অন্তরে বিষ।

৫। মিছরীর ছুরি।

৬। মরার উপর খাঁড়ার ঘা।

৭। মেরেছ কলসীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দেব না?

৮। মামা বাড়ির আব্দার।

৯। মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।

১০। মশা মারতে কামান দাগা।

১১। মুর্খস্য লাঠ্যোষধি।

১২। মুখেন মারিতং জগত।

১৩। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

য

১। যেমনি বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

২। যম জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা।

৩। যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।

৪। যত্ন করলে রত্ন মেলে।

৫। যাক প্রাণ থাক মান।

৬। যার ধন তার ধন নয়
নেপোয় মারে দৈ।

৭। যা রটে তার কিছু সত্য বটে।

৮। যখন যেমন তখন তেমন।

৯। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

১০। যা শত্রু পরে পরে।

১১। যার খাবে তারই দাঁড়ি ওপড়াবে।

১২। যার শীল তারই নোড়া,
তারই ভাঙে দাঁতের গোড়া।

১৩। যে রাঁধে সে আর কি চুল বাঁধে না ?

১৪। যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন।

১৫। যাহা মুশকিল তাহা আসান।

১৬। যদি হয় সৎজন,
তেঁতুল পাতায় সাতজন।

১৭। যে না বিয়ে তার আবার দুই পায়ে আলতা।

১৮। যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।

১৯। যেমনি নিতাই কামার,
তেমনি ভাশুর আমার।

র

১। রতনেই রতন চেনে।

২। রূপে গুণে অনুপাম,
শ্রীমতী রাধিকা নাম।

ল

১। লাখ টাকা, লাখ টাকা,
দু কুড়ি দশ টাকা।

২। লাগে লাখ টাকা, দেবে গৌরী সেন।

৩। লেজ নেই কুকুরের বাঘা নাম।

শ

১। শরীরের নাম মহাশয়
যা সওয়াবে তাই সয়।

২। শাঁখের করাত আসিতে যাইতে কাটে।

৩। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।

৪। শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।

স

১। সমুদ্রে শয়ন যার,
শিশিরে আর ভয় কি ?

২। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

৩। সবুরে মেওয়া ফলে।

৪। স্বভাব যায়না মরলে,
ইল্লদ যায় না ধুলে।

৫। সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়।

৬। স্বভাব সুন্দর তো সব সুন্দর।

৭। সাত রাজার ধন, এক মাণিক।

৮। সুদের চাইতে আসল ভারী।

৯। স্ত্রীর ভাগ্যে ধন আর পুরুষের ভাগ্যে জন।

১০। স্নানের সাক্ষী ফোঁটা।

১১। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

১২। সর্ষের ভিতর ভূত।

১৩। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সীতা কার ভার্যে ?

১৪। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো।

১৫। সাত মন তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

১৬। সাপের চোখে সাগর পানি।

১৭। সাধ করে মোর বিয়ে বসতে,
জান ফাটে মোর মোচ্ছব দিতে।

১৮। সাত বার খাইয়্যা রইছে শুইয়্যা,
তার চাউল ন্যাও আগে ধুইয়্যা।

১৯। সেকরার ঠুক্ ঠাক্,
কামারের এক ঘা।

হ

১। হাটের দিনেই হাট মেলে।

২। হয় এস্পার না হয় ওস্পার।

৩। হাতী কাদায় পড়লে, চামচিকেও লাথি মারে।

৪। হাতের ফাঁক দিয়ে জল পড়ে না।

৫। হরি ঘোষের গোয়াল।

৬। হিসেবের কড়ি যমেও ছোঁয় না।

৭। হাঁটতে পারে না লাঙল কাঁধে।

ক্ষ

১। ক্ষিধের সময় শুধু নুন দিয়েও ভাত খাওয়া যায়

২। ক্ষেত্রে কর্ম বিধিয়তে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধাঁধা

বাংলায় ছড়া, গান, গীতিকা ও প্রবচনের মতো ধাঁধাঁর প্রচলনও কিছু কম নেই। এই সব প্রচলিত ধাঁধাঁর ভিতর একাধারে যেমনি পাওয়া যায় লোক-কবিদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় অন্যদিকে তাদের বুদ্ধিমত্তার।

অলস এবং অবসর সময় যাদের হাতে থাকে প্রচুর, ধাঁধাঁও মনে হয় তাদের এই অবসর সময়েরই ফসল। কারণ, ধাঁধাঁ প্রস্তুতকারকগণ যদি স্থির ভাবে ভাবতে না পারে, তাহলে তাদের ধাঁধাঁ রচনা করা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে পূর্ববঙ্গবাসীরা মনে হয় অধিকতর দক্ষ। কিন্তু তা হলেও উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গেও যে পরিমাণ ছড়া, ধাঁধাঁ বা হেঁয়ালীর প্রচলন রয়েছে তাও নগণ্য নয়। আমরা এ পরিচ্ছেদে সে সম্পর্কেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

সাধারণতঃ এ সব ধাঁধাঁগুলো ছেলেরা বা মেয়েরা একত্র হয়েই পরস্পর পরস্পরের ভিতরই প্রশ্ন ও উত্তরের কার্য সমাধা করে। কোনো কোনো সময় গল্প-পিপাসু নাতি নাতনীদের জব্দ করার জন্যও দাদু বা দিদিমার দল প্রশ্ন করে বসেন :

'বলতো তোমরা' এক হাত গাছটি
ফল ধরে পাঁচটি।

এর অর্থ কী?

বালক বালিকারা কেউ কেউ উত্তর দিতে পারে, কেউ বা পারে না। শেষটায় দাদু বা দিদিমাই হয়তো উত্তর বলে দেন, হাত, হাতের পাঞ্জা।

এইভাবে বলে চলেন :

(১) মাঠ ঘাট শুকিয়ে গেল
গাছের আগে জল রইল। =নারকেল

(২) ওপার থেকে এলো টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে
যদি টিয়ে মন করে
মাঠের মাটি চূর করে। =লাঙল

(৩) এক গাছি দড়ি
গুটাইতে না পারি। =পথ

(৪) একটুখানি গাছে
কৃষ্ট ঠাকুর নাচে। =কালো লংকা বা বেগুন

(৫) একটুখানি জলে
মাছ কিলবিল করে। =লেবুর কোয়া

(৬) আমার ভাই নিতাই যায়,
একশ একটা জামা গায়। =কলার মোচা

(৭) এ পাড় থেকে দিনু সাড়া
সাড়া গেল সেই বামুন পাড়া। =শংখ ধ্বনি

(৮) ছোট ছোট শিশুর দল দুধ ভাত খায়,
বড় বড় গাছের সংগে যুদ্ধ করতে যায়। =কুড়ুল

(৯) একটুখানি ঘরে চুণকাম করে। =ডিম

(১০) রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা
এক কথায় যে বলতে পারে,
সে মজুমদারের বেটা। =কুঁচ

(১১) বন থেকে বেরুল টিয়ে,
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। =আনারস

(১২) বন থেকে বেরুল টিয়ে,
লাল গামছা গায়ে দিয়ে। =পিঁয়াজ

(১৩) পাতাটি ঢোলা ফলটি কুঁজো,
তাতে হয় দেবতা পুজো =কলাগাছ

(১৪) খড়িতে জড়াজড়ি ফলে অধিবাস,
ফুল নাই, ফল নাই, ধরে বার মাস =পান

(১৫) এক গাছে তিন তরকারী,
দাঁড়িয়ে আছে লাল বিহারী। =সজনে

(১৬) কাঁচাতে মাণিকের ফল সর্বলোকে খায়,
পাকলে মাণিকের ফল গড়াগড়ি যায়। =ডুমুর

(১৭) মামারাই রাঁধে, মামারাই খায়,
আমরা গেলে পরে দুয়ার দেয়। =শামুক

(১৮) ভোন্ ভোন্ করে ভোম্‌রাও না
গলায় পৈতা বামুনও না। =চরকা

(১৯) লতা লতিয়ে যায়,
লতা চোখের মাথা খায়। =ধোঁয়া

(২০) ও পাড়েতে বুড়ি মরেছে,
এ পাড়ে তার গন্ধ ছেড়েছে। =পচান পাট

শিশুর দল যখন কৈশোরে উপনীত হয় তখন আর তাদের দাদু বা দিদিমার কাছে ছড়া বা ধাঁধাঁ শুনতে হয় না। অবসর সময় হাটে মাঠে যখন যে অবস্থায়ই থাক্ পরস্পর পরস্পরের ভিতর এই ভাবেই ধাঁধার আদান প্রদান করে থাকে। সাধারণতঃ এই সব ধাঁধা শিশুদের ধাঁধার মতো অত সরল সহজ নয়, একটু কঠিন প্রকৃতির। এই সব ধাঁধার মধ্যে যেমনি রয়েছে অক্ষরের খেলা অন্যদিকে রয়েছে একটু গভীর চিন্তার ব্যাপার :

(১) জল মধ্যে আছেন তিনি ত্রি-কোনা শরীর,
মাছ নয়, কুম্ভীর নয়, সে কোন্ জীব ? ="র" (য.র.ল.)

(২) তিনটি হরফে নাম শক্ত জবাব।
চিনতো তোদের বাদশা, নবাব ॥
গোড়ার অক্ষরটাকে দাও যদি ছুটি,
হতে পারে তাতে বেশ লুচি আর রুটি ॥ =বেগম

(৩) মসুর ছড়িয়ে চাষা করে অনুমান,
বেরল বিরির গাছ দেখ বিদ্যমান ॥
ফুলটি ধরে কাঞ্চন, ফলটি ধরে বেল
বড় বড় পণ্ডিতের লেগ গেল ভেল ॥ =বেগুন-বীজ

(৪) তিনটি অক্ষরে নামটি যার সর্ব ঘরে আছে,
পাছের অক্ষর ছাড়ি দিলে কেহ না যায় কাছে ॥
আগের অক্ষর ছাড়ি দিলে সর্ব লোকে খায়,
মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে রাম গুণাগুণ গায় ॥ =বিছানা

(৫) কাননেতে জন্ম তার কর্ণমূলে বাসা,
হাত, পা কাটিয়া তার করিলাম দুর্দশা,
জিহ্বা কাটিয়া তার করিলাম খান্ খান্,
তবু তার মুখে ফোটে ভাগবত পুরাণ। =খাগের কলম

এ ছাড়া বয়স্ক পুরুষ অথবা নারীদের ভিতরও অনেক সময় ধাঁধাঁর প্রশ্ন-উত্তর হয়ে থাকে। এক সময় বরযাত্রীদের এই সব উদ্ভট প্রশ্ন করা হতো, বর যাত্রীগণও ধাঁধার জবাব দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করত। এ রেওয়াজ পশ্চিমবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে একরকম নেই বললেই চলে বিশেষতঃ কলকাতা শহরেতো নয়ই! কিন্তু পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কচিৎ এই সব প্রথার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এইসব ধাঁধাঁর ভিতর কবিত্বশক্তি ছাড়াও বুদ্ধিমত্তারও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়:

(১) সরোবরে যোগাসনে বসে আছেন এক আনন্দময়,
জীবন শূন্য, সভায় মান্য, স্বয়ং ব্রহ্মা তার মাথায় ॥
=হুকা এবং কল্‌কী

(২) এক সন্ন্যাসীর একশ মাথা
গলায় তার গঙ্গা গাঁথা,
আসমান তার মাথায় ছাতা
সে অতিথি থাকেন কোথা? =পদ্ম এবং সরোবর

(৩) ত্রিশূলের মাথায় চন্দ্র তার ভিতর লক্ষ্মী নারায়ণ,
হুতাশন আসিয়া তারে করিছে তাড়ন,
হুতাশনের তাড়না সহিতে না পেরে,
পতি এসে প্রবেশিল ভার্যার উদরে ॥ =চুল্লী এবং হাঁড়ি

(৪) কোথায় যাচ্ছিস্ রে খর্ খরানী।
চুপ কর রে ঢুল্ ঢুলানী ॥
এখুনি গেরস্থরা শুন্তে পেলে,
তোকেও খাবে আমাকেও খাবে ॥ =বেগুন ও কৈমাছ

(৫) চারটি ঘড়া রসে ভরা,
আ-ঢাকা আর উপুড় করা ॥ =গরুর বাঁট

(৬) ওরে ও মালীর বেটা, এ ফুল তুই পেলি কোথা,
যে গাছে নাই পাতা, সে ফুল এনেছি হেথা। =বন মনসার ফুল।

ঠারের কথা

ঠারের কথা ধাঁধার একটি অংশ বিশেষ, তবে উদ্দেশ্যপূর্ণ। অনেক সময় এমন অনেক কথা থাকে সর্বসাধারণের সুমুখে তা প্রকাশ করা চলে না—কেবল মাত্র একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিই সেই অর্থটি বুঝবে, তখন তারই জন্যে এই রকম সাঙ্কেতিক কথা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর ফলে এক দল লোকের মাঝে মাত্র একটি বা কয়েকটি লোক মাত্র সেই কথাটি বুঝবে খাঁটি অর্থ, অন্য লোক এর মানে করবে অন্য রূপ, সহজিয়া সম্প্রদায়ের উল্টো বাউলের কথার মতো। একেই বলা হয়েছে "ঠারের কথা।" "ঠার" কথার অর্থ এখানে "সংকেত"।

একটা চল্তি প্রবাদ "সেক্রা তার মায়ের কানের সোনাও চুরি করে থাকে"—এ কথার আদত অর্থ হলো সেক্রার দোকানে সোনা গেলেই একটু না একটু ক্ষয় হবেই। এর উপর যদি একটু বোকা ধরনের লোক তাদের খপ্পরে পড়ে তা হলেতো আর কথাই নেই। মনে করুন, কলকাতার মতো কোনো বড় শহরের কোনো এক সেক্রার দোকানে হঠাৎ প্রবেশ করল গাঁয়ের একটি সাদাসিধে লোক—হয়তো বা কিছু কিনতেই। সে দোকানে ঢোকা মাত্রই দোকানের কোনো এক কর্মচারী কর্মরত অবস্থায়ই বলে উঠ্ল, "কেশব, কেশব"। অর্থাৎ কে রে? (এরা কারা)?

বাইরের লোক এ কথা শুনে মনে করল, দোকানদার বুঝি খুবই ভক্তিমান লোক। এদিকে দোকানদারও ঠিক ঐভাবেই উত্তর দেয়, "গোপাল, গোপাল" অর্থাৎ "গো-পাল" (গরুর পাল=বোকা)। কর্মচারী একথা শুনে আবার ঠারে প্রশ্ন করে, "হরি, হরি, হরি।"

দোকানদার উত্তর দেয়, "হর, হর, হর।"

এর আদত অর্থ হলো সেক্‌রার কর্মচারী জিজ্ঞেস করছে:

'তাহলে একে ঠকাতে (হরি=হরণ করা) পারি কি?'

দোকানদার উত্তর দেয় 'হর, হর, হর'। অর্থাৎ নির্ভয়ে হরণ করে যেতে পার।

একেই বলে 'সেক্‌রার ঠার'। দোকানে উপস্থিত অন্য লোকেরা বা আগন্তুক মনে করল এরা সবাই বোধ হয় ভগবৎ মহিমাই কীর্তন করে চলেছে।

এই রকম 'ঠারের কথা' আমাদের গার্হস্থ্য জীবনেও শোনা যেত এক সময়। কোনো এক শাশুড়ী তার পুত্রবধূকে উদ্দেশ করে বলছেন, "বউমা, ক্ষীর রইল খাবে।"

উপস্থিত লোকেরা ভাবল আহা, শাশুড়ীর তার পুত্রবধূর উপর না জানি কী টান! কিন্তু আদত অর্থ হলো শাশুড়ী প্রকারান্তরে তাঁর পুত্রবধূকে সাবধান করে দিচ্ছেন,—"যদি খাবে (ক্ষীর) তো যমের বাড়ি যাবে।"

শুধু ছড়া বা কথার মধ্যেই 'ঠার' জিনিসটা সীমাবদ্ধ নয়। এক সময় যখন ডাক বিভাগের এতটা উন্নতি হয়নি, লোক মারফতই খবরাখবর আদান প্রদান হতো তখন অনেক গোপন সংবাদও এই ঠারের কথায়'ই লিখিত হতো। আমরা একখানা পুরোন চিঠির নমুনা তুলে ধরছি, এর মারফতই বোঝা যাবে বাংলার নিরক্ষর জনসাধারণ কতখানি বুদ্ধিমান ছিলেন।

চিঠিখানা লিখেছিল তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ ডাকাত তার কোনো এক সহকর্মীর কাছে:

"দুইটি অঙ্গুরী খোয়া গিয়াছে। খুচরা টাকা-কড়ি যে কী পরিমাণ নষ্ট হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। খোদ মহাজন মাত্র কয়েক গণ্ডা পয়সা সম্বল করিয়া নূতন বাজারে গিয়াছেন। মাল গস্ত করা হইলেই এখানে ফিরিয়া আসিবেন। ইতিমধ্যে যদি পার কয়েকটি টাকা অবশ্যই পাঠাইবা, নতুবা সংসার চালান দায় হইবে। পাওনাদারগণ বড়ই তাগাদা করিতেছে। হয়তো শীঘ্রই মাল ক্রোক আনিয়া ফেলিবে, তখন আর মান ইজ্জত বাঁচান যাইবে না।"

চিঠিটি হঠাৎ কারও হাতে পড়লে মনে হবে যেন কোনো ব্যবসায়ীর কর্মচারী

তাদের অন্যত্র কর্মকেন্দ্র তাদের গদির সাম্প্রতিক চুরির বিষয় জানাইয়া অবিলম্বে কিছু অর্থ সাহায্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এখানে অংগুরী অর্থে দুইজন বড় সাকরেদ, খুচরো টাকা কড়ি অর্থে সাধারণ অনুচরবৃন্দ। খোদ মহাজন অর্থে ডাকাত দলপতি, কয়েক গন্ডা পয়সা=কয়েকজন মাত্র সংগী, নূতন বাজার=নতুন কোনো স্থানে ডাকাতি, কয়েকটি টাকা=কয়েকজন সংগী। সংসার=ডাকাতের দল, পাওনাদারগণ=পুলিশ।

সম্পূর্ণ চিঠিখানার অর্থ হলো: তাদের দলের দুজন প্রধান ডাকাত সাকরেদ মারা গেছে, সংগের সাধারণ ডাকাত যে কত মারা গেছে তার আর লেখাজোখা নেই। ডাকাত সর্দার ভয়ানক বিব্রত হয়ে অন্যত্র ডাকাতি করতে রওনা দিয়েছে। কাজ সমাধা হলেই সে ফিরে আসবে। যদি সম্ভব হয় তবে যেন কয়েকজন জাঁদরেল ডাকাতকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়, নতুবা খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে। এদিকে পুলিশ পিছু নিয়েছে। হয়তো খুব শীঘ্রই এসে পড়বে তাদের গ্রেপ্তার করতে।

এই ধরনের 'ঠারের কথা' বা ইসারার কথা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে আমরা মাত্র পশ্চিমবংগে প্রচলিত 'ঠারের কথা' বা ইসারার কথাই আপনাদের কাছে উপস্থিত করলুম।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

বাংলার লোক-বাদ্য

পরিশিষ্ট (ক)
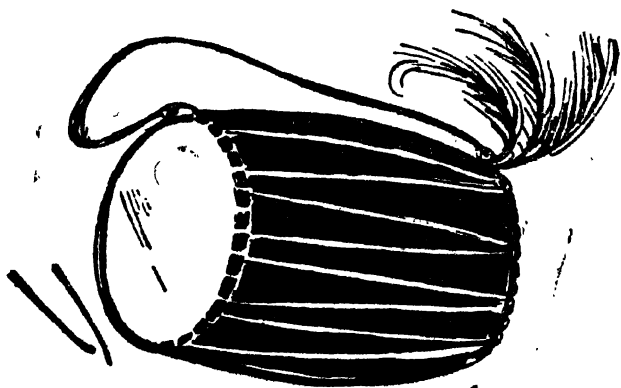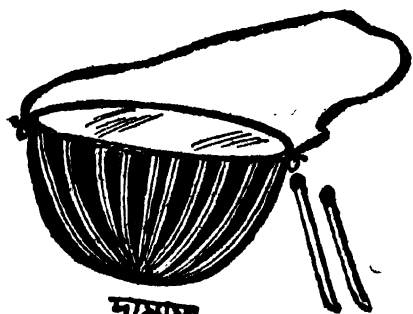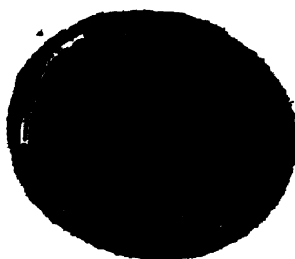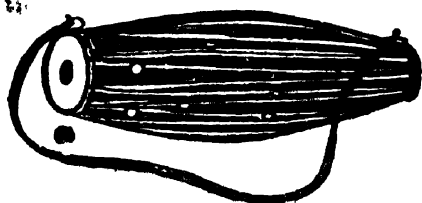
মন্দিরা বা জুড়ি

করতাল

কাঁসর

কাঁসি

টিকারা

ঘুঙ্গুর

চাসনে ও ত্রিকাঠি

মঞ্জিরা

ডুগডুগি

সারিন্দা

শ্রীখোল বা মৃদঙ্গ

একতারা

শিঙ্গা
রামশিঙ্গা
দো তারা

আনন্দলহরী বা খমক

শঙ্খ

ঘন্টা

সানাই

তুবড়ী বাঁশী

মুখাবাঁশী

খঞ্জনী

[illegible] বাঁশী

আড় বাঁশী
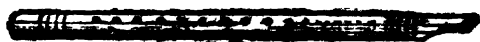
পরিশিষ্ট (ক)

বাংলার লোক-বাদ্য

বাংলার লোক-সংগীত যেমনি তার প্রাণের ধন, তেমনি এই গান সজীব ও রসমণ্ডিত করবার জন্য যে সব বাজনা বাদ্যির প্রয়োজন সেগুলিও তাদের কাছে সমান আদরণীয়। বাংলার লোক-সংগীতের সংগে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোক-সংগীতের যেমনি কতকগুলি পার্থক্য রয়েছে, তেমনি এর বাদ্যযন্ত্রের সংগেও বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের লোক-সংগীত বিদ্যমান থাকায় অঞ্চল ভেদে যন্ত্রও বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি হয়েছে। এই সব বাজনা বাদ্যির কোনটি শুধু গানের সংগেই ব্যবহৃত হয়, কোনোটি বা প্রয়োজন বোধে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে—সে সব ক্ষেত্রে এই সব বাজনা অপরিহার্য বলেই বিবেচিত হয়। এই বাদ্যযন্ত্রগুলি চারভাগে বিভক্ত—আনদ্ধ, ঘন, শুষির ও তত।

॥ ঢাক ॥ (আনদ্ধ)

ঢাকের প্রচলন বাংলার সর্বত্র, অবশ্য বাজনার রীতি অঞ্চল ভেদে একটু আধটু এদিক ওদিক হয় বৈকি। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের ঢাকীরাই বোধহয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে।

চৈত্র মাসে পূর্ববঙ্গে নীলপূজা ও চড়ক পর্ব, পশ্চিমবঙ্গে গাজন উৎসব কিংবা মালদহের গম্ভীরা ও জলপাইগুড়ির গমীরা গান ও অনুষ্ঠানেও ঢাক বাজনাই প্রধান বাজনা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ধর্মঠাকুরের পূজা ও দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণরায়ের পূজাতেও ঢাক বাদ্য প্রচলিত আছে। তা ছাড়া শক্তিপূজা মাত্রই ঢাকের বাজনা আবশ্যক, সেই হেতু দুর্গাপূজা, কালীপূজা সব পূজাতেই ঢাকের বাজনা অপরিহার্য।

।। ঢোল ।। (আনদ্ধ)

ঢাকের পরই ঢোলের স্থান। ঢোলটি গলায় ঝুলিয়ে দু হাত দিয়ে এক যোগেই বাজাতে হয়। সঙ্গে তাল রাখবার জন্য ঢাকের মতো এবারও কাঁসিই প্রধান।

ঢোল বাজায় ঢুলী। মাত্র একটি কাঠি ও হাতের সাহায্যেই সে ঢোলের উপর বিচিত্র বোল তুলতে থাকে।

শ্রীহট্ট জেলায় বিহারী ঢোলকের অনুরূপ "ঢোলক" নামক এক প্রকারের বাজনা আছে। দেখতে ঢোলের মতো, তবে খুব লম্বা অনেকটা পাশ বালিশের মতো দেখতে, দুহাত দুদিকে দিয়ে বাজাতে হয়। হোলী, ধামাইল গানের সঙ্গে এ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঢোল বাদ্য যন্ত্রটি বাংলার জিনিস নয়, কী ভাবে যে বিহারী ঢোলক বাংলার সীমান্তে এসে মিশে গেছে সে বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা সাপেক্ষ।

।। কাঁসি ।। (ঘন)

কাঁসি নিজে একা কখনও বাজে না। ঢাক বা ঢোল বাজনা হলে সেইখানেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁসিও বাজাতে হবে, তা না হলে অমন ঢাকের বাজনা বা ঢোলের কেরামতি সবই বৃথায় যাবে।

কাঁসি হলো কাঁসার তৈরি ছোট্ট রেকাবীর আকার। একটি ঈষৎ মোটা কাঠি দিয়ে বাজাতে হয়।

।। কাঁসর ।। (ঘন)

আকারে এটি কাঁসির চাইতে সাধারণতঃ দ্বিগুণতো বটেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চাইতেও বড় হয়ে থাকে। তা ছাড়া এটি হবে পিতলের তৈরি। বাজাতে হয় একটা মোটা লাঠি বা কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে, ব্যবহার করেন গৃহস্থেরা বা পূজা মন্দিরের সেবাইতেরা। কিন্তু কাঁসি কেবলমাত্র বাদ্যকারগণই ব্যবহার করে থাকে, তা ছাড়া বাজনার ধ্বনিও সম্পূর্ণভাবে পৃথক।

।। ঘণ্টা ।। (ঘন)

ঘণ্টা কখনও কোনো সংগীতের সঙ্গে বাজে না, কিন্তু পূজার একান্ত প্রয়োজনীয় বাজনা। পিতলের তৈরি এই ঘণ্টা। এরই বৃহদাকারগুলিই টানান থাকে মন্দিরের দরজায় দরজায়।

॥ শঙ্খ ॥ (শুষির)

শঙ্খধ্বনি অতি পবিত্র ধ্বনি। এর বোধহয় একটা সম্মোহনী শক্তিও আছে, তবে কোনো লোক-সংগীতের সঙ্গে একে ব্যবহার করা হয় না। শুধুমাত্র পুজো পার্বনেই এবং মঙ্গলিক ক্রিয়া কার্যেই এর আবির্ভাব।

॥ সানাই ॥ (শুষির)

লোক-বাদ্যের ভিতর সানাই অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। বিবাহাদি ব্যাপার সানাইয়ের আবির্ভাব অনেকটা যেন অত্যাবশ্যকীয়। পূর্ববঙ্গে বিয়ের আগের দিন মেয়েদের জল ভরতে যাওয়ার সময়, বিবাহ বাসরে কিংবা বরকনে বিদায় নেবার সময় সানাইয়ের বাজনা অতি সুমিষ্ট সুরে বাজতে থাকে। শুধু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই নয়, দুর্গাপুজার নহবৎখানায়, বিকল্পে নাটমন্দিরে সানাই আর এরই সঙ্গে আগমনীর ঢাকের আওয়াজ মিশ্রিত হয়ে সৃষ্টি করে এক সুরের মায়াজাল। এই জন্য পূর্ববঙ্গে "সাঁনদার" নামে একটি সম্প্রদায়ই আছে, তাদের কাজই হলো বিবাহাদি পাল-পার্বণে সানাই বাজানো।

এই সানাইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করবাঁর জন্য বাদ্যযন্ত্র কাড়া ও নাকাড়া অথবা ঢোল এবং কাঁসির প্রয়োজন হয়।

॥ বাঁশী ॥ (শুষির)

লোক-সংগীতের অন্যতম প্রধান বাদ্যযন্ত্র হলো এই বাঁশী। এই বাঁশী হলো বাঁশের তৈরি ; এর ভিতর দু-রকমের বাঁশীর সাধারণত সন্ধান পাওয়া যায়, (১) মোহন বাঁশী, (২) আড় বাঁশী। লোক-সংগীতে বাঁশীর কদর বড় বেশি রকমের।

॥ দো-তরা ॥ (তত)

লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ভিতর দো-তরার আধিপত্য বোধ হয় সব চাইতে বেশি। খুব কম লোক-সংগীতই আছে যার সঙ্গে দো-তারার (দো-তরা) ব্যবহার চলে না। এক কথায় উত্তরবঙ্গের প্রায় সব গানই (গম্ভীরা বাদে) দো-তরার সঙ্গে গীত হয়ে থাকে। দো-তরা অবশ্য পূর্ববঙ্গেও বহুল প্রচলিত। তবে উত্তরবঙ্গের দো-তরার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের দো-তরার গঠনগত পার্থক্যও যেমনি রয়েছে তেমনি রয়েছে বাদন পদ্ধতিরও।

॥ একতারা ॥ (তত)

একতারায় মাত্র একটি তার। এর তৈরির প্রধান উপকরণ হলো একটি শুকনো লাউয়ের খোলা, তার দুপাশে থাকে বাঁশের ধরনী। এই একতারার মাথার সংগে আর লাউয়ের বসের (খোলা) মাঝখানটায় সংযোগ হয় তার দিয়ে। বাউল হাতে তারের আংটি পরে সেই বাঁশের একটি ধরনী ধরে আংগুলের আংটি (সেতারের মেজরাপের মতো) দিয়ে ঘা মারে আর তারে ফুটে উঠে সুরের লহরী। বাউল, বৈরাগী, বৈষ্ণবদের গানের প্রধান সম্বলই এই একতারা। এর সংগে সহযোগিতা করে খঞ্জনী।

॥ আনন্দ লহরী বা খমক ॥ (তত)

একটা বড় কৌটার মতো কাঠের খোলসের দু-মুখই খোলা। এক দিকটার চামড়ার ছাউনীর ভিতর দিকে বেরিয়ে গেছে একটি তার, তারের প্রান্তভাগ রয়েছে অপর একটি ছোট কৌটার মতো বা বলের মতো কাষ্ঠ গোলকের সংগে। একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে ঐ তারের উপর ঘা মেরে সুর তুলতে হয়। বাউল ও বৈরাগা সম্প্রদায়ই এগুলি ব্যবহার করে থাকে।

॥ সারিন্দা ॥ (তত)

দেখতে অনেকটা বেহালার মতো। সুর যেমনি তীক্ষ্ণ তেমনি মিশ্টি। সারি, জারি প্রভৃতি গানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাজনা। বাজাতে হয় ছড় দিয়ে। উদাসী বা বৈষ্ণব বাউলদের দলেও এগুলি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

॥ শ্রীখোল বা মৃদঙ্গ ॥ (আনদ্ধ)

সাধক বা বৈষ্ণবের সংগীতের প্রধানতম যন্ত্রই হলো শ্রীখোল বা মৃদঙ্গ। হাত দুই পরিমাণের দৈর্ঘ্যের একটি মাটির খোলস, দু-মুখ ঢাকা থাকে চামড়ায়। গলায় ঝুলিয়ে দুই হাত দিয়েই বাজাতে হয়। এর দু-ভাগের বাজনা দু-রকমের। কীর্তন গান শ্রীখোল বা মৃদঙ্গ ছাড়া হবারই উপায় নেই। আর এর সংগে সহযোগিতা করবার মতো যন্ত্র একমাত্র রসমন্দিরা বা জুড়ি। দেবমন্দিরে এর স্থান বড়ই উচ্চে, বিশেষত বৈষ্ণবের আখড়ার তো কথাই নেই।

॥ মঞ্জিরা ॥ (আনদ্ধ)

বৈরাগী ও বৈষ্ণবদের ভিতর মঞ্জিরা নামে এক প্রকারের বাদ্য যন্ত্রের দেখা পাওয়া যায়। দেখতে একটা বাটির মতো, কাঠের তৈরি, চামড়ার ছাউনী দেওয়া। উদাসী বা বৈরাগীরা এই মঞ্জিরা বাজিয়ে গান গেয়ে থাকে।

॥ মন্দিরা বা জুড়ি ॥ (ঘন)

মন্দিরাকে কেউ কেউ বলেন রসমন্দিরা, চলতি কথায় বলে জুড়ি। ছোট বাটির মতো কাঁসার তৈরি এই ছোট যন্ত্রটি কিন্তু লোক-সংগীতের বহু শাখায়ই প্রয়োজনীয়।

॥ করতাল ॥ (ঘন)

করতাল হলো পিতলের তৈরি। নাম কীর্তনের সঙ্গেই এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

॥ খঞ্জনী ॥ (ঘন)

খঞ্জনী বৈরাগী ও বৈষ্ণবীদের গানের সঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়। কোনো যন্ত্র ছাড়াই শুধু খঞ্জনী বাজিয়েই বৈরাগী ও বৈষ্ণবীরা গান গাইতে পারে। "ক্ষেপী" সম্প্রদায়ের মধ্যে এই খঞ্জনী আর একতারাই হলো প্রধান বাজনা।

॥ ঘুঙুর ॥ (ঘন)

ঘুঙুর হলো ছোট পিতলের কতকগুলি ফাঁপা গুলি. তার ভিতর পাথর কুচি ভর্তি থাকে। নাচের সময় সেগুলি মালার আকারে গেঁথে পায়ে পরে নাচতে ও গাইতে হয়, এক কথায় ঘুঙুর বিহনে নাচ একেবারেই অচল। এরই ভিন্ন রূপ হ'ল নূপুর।

॥ ডুগ্‌ডুগি ॥ (আনদ্ধ)

ডুগ্‌ডুগি অনেকটা বাঁয়ার মতো, তবে আকারে ছোট আর এগুলি সাধারণতঃ তৈরি হয় তামার বা দস্তার পাতে, সানাইয়ের সঙ্গে কিংবা বাউলের একতারার সঙ্গে এর ব্যবহার দেখা যায়। বাম হস্তে বাদিত হয়ে থাকে।

॥ শিঙা ॥ (শুষির)

সাধারণতঃ মহিষের শিং দিয়ে তৈরি হয় এই শিঙা বা রামশিঙা। এর আওয়াজ অনেকটা শঙ্খের মতো, তবে অতটা মিষ্টি নয়। কিছুটা চড়া ধরনের। শিঙা বা রামশিঙা সাধারণত ব্যবহৃত হয় নগর কীর্তন বা সংকীর্তনের সঙ্গে। সাধু সন্ন্যাসীরা অনেক সময় এই শিঙা বাজান বটে, তবে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

॥ মুখাবাঁশী ॥ (শুষির)

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় বিষহরি পালা গানের সঙ্গে এই মুখা বাঁশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জলপাইগুড়ি ছাড়া আর কোথাও এ বাঁশীর নাম বা প্রচলন নেই।

॥ টিকারা ॥ (আনদ্ধ)

এক সময় বড় বড় ডাকাত দলে এই বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহৃত হতো। দেখতে একটা বিশালাকার হাঁড়ির মতো। ফাঁকা জায়গাটায় চামড়ার ছাউনী দেওয়া। দুটি মোটা কাঠি নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গেই বাজাতে হয়। অনেক দূর থেকেই এর বাজনা শোনা যায়। কোনো কোনো জায়গায় কালীমন্দিরে আরতির সময় এগুলি বাজান হয়। পূর্ববঙ্গে গয়নার নৌকার সঙ্গে এই টিকারা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও একে বলে "নাগেরা"। মানভূমের ছৌনাচ, ঢালী নাচ প্রভৃতির সঙ্গে টিকারা বাজনার প্রচলন বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

॥ তুবড়ী বাঁশী ॥ (শুষির)

তুবড়ী বাঁশী সম্পূর্ণভাবেই আদিবাসী সমাজের বাজনা। পশ্চিমবঙ্গের সাপুড়িয়ারা ঐ বাঁশীর সাহায্যে সাপ খেলা দেখায়।

॥ বিষম ঢাকী ॥ (আনদ্ধ)

পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে বেদে-বেদেনীরা ঢাকার মতো একটি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। ঐ ঢাকাটি হলো চামড়া দিয়ে ছাওয়া। বেদেনীরা হাতের চেটো দিয়ে ঐ চামড়ার উপর ঘা মারে আর এরই সুরে সুর মিলিয়ে গানও গায়। কখনও এর সুরের সাথে তাল রেখে সাপ খেলা দেখায়।

॥ চাঙল ॥ (আনদ্ধ)

মেদিনীপুরে লোধা নামে একটি উপজাতির বাস আছে। তাদের ভিতর যে সব লোক-সংগীতের সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে এদের বন্দনাগীতিই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। তারাও অনেকটা পূর্বোক্ত বিষম ঢাকীর মতোই দেখতে চাঙল নামক একপ্রকারের যন্ত্রের সাহায্যে গান গায়। চাঙলের সঙ্গে সহযোগিতা করবার মতো যন্ত্র বলতে বিশেষ কিছুই নেই। তবে কোনো কোনো দলে তারা চাঙলের সাথে লোহার শিক দিয়ে গঠিত "ত্রিফলা" বা "ত্রিকাঠি" বাজিয়ে থাকে।

এই লোধা জাতির মধ্যে চাঙলই হলো উল্লেখযোগ্য বাদ্যযন্ত্র।

॥ মাদল ॥ (আনদ্ধ)

মাদল হলো আদিবাসী সমাজের শ্রেষ্ঠতম বাজনা! মেদিনীপুরের সাঁওতাল, মানভূমের ঘেড়িয়া, মাঝি, মাহাতো প্রভৃতি আদিবাসী সমাজের ভিতরই এর বহুল প্রচলন। এই মাদলের সাথে চলে আড়বাঁশী আর ঘুঙুর। সাঁওতাল নরনারী তাদের উৎসবের দিনে পায়ে ঘুঙুর পরে গলায় মাদল ঝুলিয়ে নাচতে থাকে ভাবে বিভোর হয়ে। এর সঙ্গে বেজে ওঠে বাঁশীর সুর, আর গান গায় সাঁওতাল যুবক যুবতী, কখনও বা শিকারের গান কখনও বা প্রেম ভালবাসার গান।

পরিশিষ্ট (খ)

বাংলার লোকনৃত্য

বাঙালীর জীবনের সাথে সংগীত যেমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে রয়েছে তেমনি নৃত্যও। এর ভিতর কতকগুলি হলো মেয়েলী আর কতকগুলি পুরুষালী। গম্ভীরা, গাজন, নীল, রায় বেঁশে, ঢালী নাচ, কালী কাচ, গমীরা, মুখোস নৃত্য, ছৌ নৃত্য, বাউল, জারি, সারি প্রভৃতি হলো পুরুষালী আর ভাদু, ভেদেই খেলী বা মেছেনীর গান, টুসু, হুত্মা, নৈলা বা মেঘারাণীর গান, বৌ-নাচ প্রভৃতি হলো মেয়েলী নাচ। এ ছাড়া কতকগুলি নাচ আছে যেগুলিতে মেয়ে ও পুরুষ একত্রেই নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। এর ভিতর আদিবাসীদের সাঁওতালী নাচ ও ঝুমুর নাচই প্রাধান্য লাভ করেছে।

মেয়েলী এবং পুরুষালী নাচের ভিতর কতকগুলি হলো একক নৃত্য। কতকগুলি দ্বৈত। বাদবাকি সবই সমবেত নৃত্য। উদাহরণ স্বরূপ, পুরুষালী নাচের ভিতর কালী কাচ, মুখোস নৃত্য বাউল প্রভৃতি একক নৃত্য, বাদবাকি সবই দ্বৈত অথবা সমবেত নৃত্য। মেয়েলী নাচের ভিতর বৌ-নাচ একক নৃত্য। বাদবাকি সবই সমবেত নৃত্য। ধরতে গেলে লোকনৃত্যের প্রায় সবই সমবেত নৃত্য।

পুরুষালী নাচ

পুরুষালী নাচের ভিতর প্রথমেই উল্লেখ করা চলে মালদহের গম্ভীরা আর পশ্চিমবঙ্গের গাজনের নাচের কথা। গম্ভীরা এবং গাজন উভয়ই শৈবানুষ্ঠান। শিব হলেন রুদ্র বা প্রলয়ের দেবতা। কাজেই তাঁর নৃত্য যে তাণ্ডব হবে এ আর বেশি কথা কী? মাথায় বেঁধে গৈরিক পাগড়ী, গলায় ঝুলিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে নিয়ে ত্রিশূল, গাজন সন্ন্যাসীরা নেচে বেড়ায় গাজনতলায়। গম্ভীরা নাচ অবশ্য একটু অন্য ধরনের। এখানে একজন সেজে আসে শিব হয়ে, আর একজন আসে ছেঁড়া কাপড় চোপড় পরে পাগল সাজে। পাগলবেশী মানুষটি হলো জনগণের প্রতিনিধি। গানের সঙ্গে সঙ্গে সে মহাদেবের কাছে বর্ণনা করে চলে

জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, প্রতিকার চায় দেশ জোড়া অভাব অভিযোগ ও অনাচারের। পায়ে ঘুঙুর তো আছেই। ঢাকের ঐ কড়া বাজনার তালে তালে নেচে চলে মহাদেব এবং পাগলবেশী কৃষাণ।

এই গম্ভীরা নাচের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশ হলো মুখোস নৃত্য। এর ভিতর নরসিংহ, পৈরী, চামুণ্ডা প্রভৃতি নাচগুলিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সবগুলিতেই পুরুষেরা মুখে মুখোশ পরে ঢাকের বাজনার তালে তালে নেচে চলে। এ-নাচে সূক্ষ্মমুদ্রার খুবই অভাব লক্ষ্য করা যায়। লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্যই এই। এখানে নাচ হলো গানের জীবন্ত রূপ মাত্র। গীত ছাড়া নাচের বড়ই অভাব। অবশ্য পূর্বর্ণিত মুখোশ নৃত্যগুলি বা ঢাকার কালীকাচের কথা স্বতন্ত্র। এ-নাচগুলি প্রায়ই এত উগ্র যে শিল্পীরা অনেক সময় উন্মত্ত হয়ে উঠে, তখন তাদের থামাতে বেশ কষ্ট পেতে হয়।

পুরুষালী নাচের ভিতর 'বাউলনৃত্য' একক নৃত্য। দীর্ঘ আলখাল্লা পরে হাতে নিয়ে 'একতারা', পায়ে দিয়ে ঘুঙুর, নৃত্যের তালে তালে পরমাত্মার প্রতি নিবেদন করে সাধক তার মনের কথা। বাউলের উদাত্ত সংগীত-লহরীর সাথে তার নাচের সামঞ্জস্যও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

রায়বেঁশে ও ঢালীনাচ মুখ্যতঃ যুদ্ধের নাচ। কাজেই এর ভিতর উগ্রতাই প্রধান। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন ছিল তখন যুদ্ধ যাত্রার কালে বাঙালী সৈন্যেরা যে ভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করত এ নাচে যেন তারই ছায়া পড়ে। এক হাতে ঢাল, অপর হাতে অসি নিয়ে এরা পরস্পরের প্রতি আক্রমণ চালায়। নৃত্যের ছন্দের সাথে সাথে চলে তাদের অভিনয় কৌশল। রায়বেঁশেও ঠিক একই রকমের। তফাত ঢাল এবং অসির পরিবর্তে সেখানে দেখা দেয় লাঠি।

জারি এবং সারি উভয়েই সমবেত নৃত্য। জারি হলো ক্রন্দন করা। পূর্ববঙ্গে মহরম পর্ব উপলক্ষ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নাচের খুবই প্রচলন দেখা যায়। জারি নাচের সময় সাধারণতঃ কয়েকজন পুরুষ লুঙ্গি পরে মাথায় দিয়ে কাপড়ের টুপি অথবা রুমাল, হাতে রুমাল বা গামছা, সারিবদ্ধ-ভাবে মূল গায়েনের বা বয়াতীর গানের ছন্দের সাথে সাথে ঘুঙুর পায়ে নাচতে নাচতে একবার এগুতে থাকে আর একবার পেছুতে থাকে। গানের সুর ক্রন্দনের সুর। কাজেই তাদের নাচের ভিতর কোথাও উগ্রতা নেই, উপরন্তু এই নাচে একটা বিষাদময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সারিও সমবেত কণ্ঠের নৃত্য-গীত। নৌকার মাঝিরা নৌকায় বাইচ দেয়।

গায়ক দল গান গেয়ে তাদের উৎসাহ দেয়। বাইছারা (যারা নৌকায় বাইচ দেয়) গানের ছন্দের সাথে সাথে একযোগে বৈঠা ওঠায় ও নামায়, নৌকাও পবন গতিতে চলতে থাকে। অনেক সময় পাশাপাশি নৌকার সংগে আগে যাবার পাল্লা শুরু হয়ে যায়, তখন এগুলি আরও দ্রুত তালে চলতে থাকে, গান আরও জলদ তালে গাওয়া হয়।

পুরুষালী নাচের ভিতর মানভূমের ছৌ-নাচ অন্যতম। ছৌ-নাচও মুখোশ নৃত্য ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এই মুখোশগুলির গঠন নৈপুণ্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এই মুখোসগুলির মধ্যে দুর্গা, শিব, গণেশ, কালী, রাবণ প্রভৃতি প্রধান। শিল্পীরা মুখোশ মুখে দিয়ে প্রয়োজনীয় অংগসজ্জা করে বাজনার তালে তালে নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। তবে এর অধিকাংশই যুদ্ধ নৃত্য, তাই এর সংগে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলিও একটু স্বতন্ত্র। টিকারা, ঢোল, সানাই, শিঙা, মদনভেরী, মন্দিরা, মৃদংগ ও করতালই প্রধান। এর সংগে দক্ষিণ ভারতের কথাকলি ও দার্জিলিং এর প্রেত-নৃত্যের তুলনা চলে।

মেয়েলী নাচ

মেয়েলী নাচের ভিতর জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত মেছেনীর গান ও নাচ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এ অঞ্চলের মেয়েরা তিস্তাবুড়ি ও লক্ষ্মীর পূজা করে থাকে। তারা দল বেঁধে এই মূর্তি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাচ গান করে। যে বাড়িতে তিস্তাবুড়ির দল যায় সে বাড়ির বধূরা মহাভক্তি-সহকারে উঠানের মাঝে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে বসবার আসন পিঁড়ি পেতে দেয়। তারপর একটি ছাতা খুলে ধরে মূর্তিটির উপর, আর দু-ঘটি জল ঢেলে দেওয়া হয় ছাতার উপর। এইবার এই দলের মেয়েদের নাচ দেখাবার পালা। অতি অপূর্ব এইসব নাচিয়ে মেয়েদের পায়ের তাল। উঠানটি জলে ভেজা। কাদা থক্ থক্ করছে, আর মেয়েরা সেই ভিজে মাটির উপর থেকে পা না তুলেই বরফের উপর 'স্কেটিং' করার মতো একতালে দুটি পা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। এই নাচে সাঁওতালী, বিশেষ করে তিব্বতের অধিবাসীদের নাচের কিছুটা ছাপ লক্ষ্য করা যায়। মেয়েরা কাপড়ের কোঁচাটা (শাড়ীর এক অংশ) ধরে কুলোয় ধান ঝাড়ার ভংগিতে নাচতে নাচতে ঘুরতে থাকে। প্রায় পনেরো কুড়িজন মেয়ে এ-নাচে অংশগ্রহণ করে থাকে অথচ সকলের পায়ের ছন্দ যেন এক সুতোয় বাঁধা।

এই প্রসংগে পূর্ববংগের মেয়েদের মেঘারাণীর ব্রত ও নৈলা গানের ও নাচের উল্লেখ করা চলে। অনাবৃষ্টির সময় জলপাইগুড়ির পল্লী-অঞ্চলে মেয়েদের

গভীর নিশিথে এলোচুলে হুতুমা বা বরুণ দেবের উদ্দেশ্যেও নৃত্য প্রদর্শন করতে দেখা যায়।

টুসু এবং ভাদু মূলতঃ মেয়েদের ব্রত। মেয়েরা টুসু কিংবা ভাদু ঠাকুরাণী (পুতুল)-কে কোলে নিয়ে তার সুমুখে নাচ দেখায় ও গান গায়। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কোনো কোনো জায়গায় অবশ্য পুরুষেও মেয়ে সেজে নাচ দেখিয়ে বেড়ায়।

সম্মিলিত নৃত্য

আদিবাসী সমাজে প্রচলিত সব নাচই মেয়ে পুরুষ একত্রেই করে থাকে। এই প্রসঙ্গে সাঁওতালদের শিকার নৃত্য, আদিবাসীদের করম নৃত্যের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণতঃ পুরুষের দল মাদল বাজায়, আর বাজনার তালে তালে গান গায়। আর এদিকে মেয়েরা সব হাত ধরাধরি করে গায়ে গায়ে মিশে মাদলের তালে তালে একযোগে নাচতে নাচতে একবার এগিয়ে যায় আর একবার পিছিয়ে আসে। কখনও বা মাঝখানে বসে বাঁশী বাজায় কিংবা মাদল বাজায় কোনো 'রসিক্যা', আর সাঁওতাল কুমারীরা তাকে ঘিরে নাচতে থাকে।

মেয়ে পুরুষ উভয়েই একত্র নৃত্যের অন্যতম উদাহরণ হলো 'ঝুমুর' নৃত্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিরহই হলো বাংলা ঝুমুরের মূল কথা। কোনো কোনো পণ্ডিতব্যক্তির মতে সাঁওতালী ঝুমুর গান ও নাচই বাংলা ঝুমুর গান ও নাচের মূল উৎস। বাংলা ঝুমুর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক হলেও সাঁওতালী ঝুমুর গান ও নাচ কিন্তু প্রেম-ভালবাসার গান বলেই পরিচিত। এ ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে সাঁওতালি ঝুমুরের প্রেমিক-প্রেমিকাই বাংলার ভক্তিবাদের প্রলেপে রাধাকৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়েছে। এর সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের 'রাসলীলার' খুবই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

পরিশিষ্ট (গ)

।। পরিভাষা ।।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাকম্—সঙ্
মদুলুকাসানে—পৃথিবীশ্বর
কপ্নি—কৌপিন
কুচনি পাডায—কোচ পাড়ায়
জুজা—পায়ের উপরিভাগ, পাছা
চটানে—খালি মাটিতে
আলাদ, গহমা, ভাপটা—মালদহ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকারের সাপের নাম
গণশার বাপটা—মহাদেব
ফিচ্ট—ঠাট্টা, বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য
হালা কান—শীর্ণ
পুয়াল—খড
বাজী—বাবাজী (পিতা)
ডাণ্টা—ডাঁটা, শাখা প্রশাখা
খাড়ু—শুক্না
পলু-পুশা—ধানের পোকা
পরদা—মান সম্ভ্রম
ঠাটকুহারা—উলঙ্গ
ন্যাংটা—উলঙ্গ
প্যাংটো—শুক্না
সল্লা—পরামর্শ
কাঁকই—চিরুণী
অ্যালম্যালামের—এলুমিনিয়ামের
মাকই—ভুট্টা
শিকরা—এক জাতীয় শশা, ফল
লাকড়ি—জ্বালানী কাঠ
বগা—কলার পাতা
ঠাটের কথা—রসের কথা
গোলাপী তৈল—গন্ধ তেল
সাহান—সাবান
গড়তে—পরিধান করিতে
ধোকরা—বক্ষ-বন্ধনী
মেখলী—ঘাঘরা
অং বি অংয়ের—রং-বেরংএর
গরমুনা—পরিধান করব না
হাউসের—আহ্লাদের
দহি চুড়া—দৈ চিড়ে
চেংগেরা—অবিবাহিত যুবক
যেলায়—যখনি
কুনদিন—কোনো দিন
মোক—আমাকে
বাধিনি—ঝারি
ডাংগাও—ঝাঁটা
বেসালেন—খারাপ (বুড়ো)
জায়োই—জামাই

আই—মা
মুলকত—স্থানে
সেগে—বলে
কছে—কহিতেছে
বুড়ি আই—বুড়ো মা
নদারী—নববধূ, নতুন বৌ
গুয়া—সুপারী
ডুমাইতে—কাটিতে
পাথারে—বনে, দুঃখে
ভদি—বৌদিদি
খট্টা—খাট, সিংহাসন
পেইকি—ব্লাউজ
বোগে—বৌকে
নানা—পূর্ব পুরুষ (ঠাকুর্দা)
আবাগে—দিদিমা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

করলা—উচ্ছে
গাড়িনু—রোপন করলাম
সারিগে সারি—পরপর, এক পংক্তিতে
ছেকে পানি —জল সিঞ্চন করল
ঝিকোর ঝাটালি—বেড়া বেঁধে দিলেন
ঝাংগতে—মাচায়
ঢাকিরে—ধামা
শিরের—মাথার, প্রাণের
পাইলা—হাঁড়ি
মরুচের—মরিচ, লংকার
থাগড়া থুগড়ী—ঝাপসা, ঠাসা
পুরস্তির পাত—কলার পাতা বা ভূর্জপত্র
সগার—সকলের

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিল হিলাছে—কট্‌কট্‌ করছে
কোণ্ঠে—কোথায়
পাটানি—পরিধেয় বস্ত্রখানি
ডিংসালি ডিংসালি—কট্‌কট্‌ করছে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তড়পে—ছট্‌ফট্‌ করছে
কুঁকড়ী—মোরগ
বাটে—আস্তানা
চুটিয়া—পাতার তৈরি বিড়ি
ফুঁকিয়া—টানিয়া
কটা—"কোটা", বরাদ্দ
ভখে—ক্ষুধায়
সাগসিঝা—শাকপাতা
মণ্ড—ক্ষুদ সিদ্ধ
দহের—জলের
ডাঙ্গালে—মাটিতে
ঘুন-জালে—ঘুর্ণি জলে
হাফিং—আফিং

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঞ্ছা—ইচ্ছা
খঞ্জরী—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
দস্তি—বন্ধুত্ব
আকিঞ্চন—ইচ্ছা, বাসনা
বিষের চিত—বিষ মাখান তীর

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নোহার—লোহার
দাপট—প্রতাপ, বড়াই

পাঁচীর—প্রাচীর
আঁচীর—আস্তরণ
চিক্‌রাইয়া—ভয়ে চিৎকার করিয়া

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কুথাকে—কোথায়
ইন্দর লোকের—ইন্দ্রলোক, স্বর্গ
ধন্দ—সন্দেহ, বিস্ময়
ফি-সন—প্রতি বছর
তড়াক—তাড়াতাড়ি
চেঁচা—চিৎকার
কন্‌ডোলেতে—কণ্ট্রোল

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাঁক পরা—মল পরা
ডেগিসনা—নাচানাচি করিস না
ঠহর ঠিকানা—রকম সকম
আড়-বাজু—উপর হাতের অলংকার
গাংগুনা—গেল না

নবম পরিচ্ছেদ

রাংগিগাই—লাল রং-এর গরু
পাতোলে—পাতাল
কাড়া—খাড়া

দশম পরিচ্ছেদ

রা কারব না—কথা বলব না
সরপে সরপে—দ্রুত গতিতে
নয়ে নয়ে—নুয়ে পড়ে
পিরথিম—পৃথিবী
দিগার গারদ—জেল
এড়েং ব্যাড়ে—আজে বাজে
ডাঙ—ডাণ্ডা (লাঠি)
পাটা—দলিল
সাঙপাঙ—সাঙ্গোপাঙ্গ, লোক-লস্কর

একাদশ পরিচ্ছেদ

ছাটা—ছটা
উপার—রূপার
মাইটা—মেয়ে বা কনেটি
আগ—রাগ
উঠেছে—হচ্ছে
মুঠা খান—মুখ খানা
ভোটরা—গোল
চোখাটাক—চক্ষুটাকে
পিঠিখান—পিঠখানা
ছ্যাকা—কাপড়ে আছাড় দেওয়া
মনাছে—মনে হচ্ছে

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ফটিক—খাঁটি
হাবড়—জঞ্জাল
থোড়া—অল্প
রাঁড়—বিধবা

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কেউটে—কে বটে
বহু—বউ
লহু—রক্ত
নাক-ঠাশা—নাকের গহনা

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বাজু—উপর হাতের গহনা (আর্মলেট)
নলোক—নাকের গহনা
ফোট—ফোঁড়া

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধল্লা—ধলা, সাদা
গাবুর পুরুষ—জোয়ান পুরুষ
মোক—আমাকে
অসিক—রসিক
ধর্মভারি—দাঁড়িপাল্লা
ঘোপা—নদী পাড়ের ঘর
কোছার কড়ি—মূলধন
সাধু—সওদাগর
নিষত—নিষেধ
গোনা—রাগ
চ্যাংড়া—যুবক
হাউসের—সাধের
অংপুরের—রংপুরের
আউলাইল—উতলা করিল
ঝামালে—রৌদ্রে
বিনাথ—অভাগা
সামলাই—নীল রং-এর সুন্দর
হিদ্দের—হৃদয়ের
নোটা—ঘটি
খই সাপ—কেউটে সাপ
ভারী—যেসব লোক একস্থান হইতে
অন্য স্থানে খবরা-খবর আনা
নেওয়া করে
সারি সারি—পর পর
কোনঠে—কোথায়
দুরাচার—দুর্বৃত্ত
দুরন্তর—দূরদেশে
রুদ্রমালা—রুদ্রাক্ষের মালা
কুড়ার সুতা—শনের সুতা
গুণা—লোহার খুব সরু তার
আন্ধিবার—রান্না করবার
বিটি—মেয়ে
ডিবো ডিবো—আরক্তিম
সতের—শীষার
কুরুয়া—পক্ষী বিশেষ
মিছায় ছাচায়—মিথ্যে কথায়
গালাৎ—কণ্ঠে
কণ্ঠি—গলার হার দেখা দিবে
ওসন—ডিমে তা' দেওয়া
পাটা বাড়ি—পাটক্ষেত
কৈতর—পায়রা
ঠারে—ইসারায়
মোথাত—ঝোঁপ
ভাটী—নষ্ট
আগুম নিগুমটা—অগ্রপশ্চাত
তাতের উতালটা—ভাতের ফ্যান
কুটি—বর্ণ আরও উজ্জ্বল
ফোসা—ফোস্কা
ভুকাও—ক্ষুধা তৃষ্ণা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাউরী বাতাস—ঝোড়ো হাওয়া
নেখিয়া—নিরীক্ষণ করে
চক্‌মকিবার—ঝক্‌ঝক্‌ করবার
বাস—গন্ধ
নাইওর—নাইওর, বিবাহ বা কোনো
অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মেয়ে-
দের কোনো আত্মীয়ের
বাড়ি বেড়াতে যাবার নাম
আনতে—রান্না করতে

আলগা মানুষ—অচেনা লোক
লহর—উত্তাল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরবাসী—প্রবাসী, দূরদেশ বাসিন্দা
ত্যাজ্য—ত্যাগ
ভ্রান্ত—সন্দেহ
খসম—স্বামী
ছানুন—রান্না তরকারী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কতিশাল—কার্তিক মাস
বহাল—উপস্থিত
হামাক্—আমাকে
জারাতে—শীতে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কতিক্ষণে—কতক্ষণে
হরদোই—হৃদয়
ভিনিসরে—ভোরের সময়
নাতাল—নাতালফুল
দলপ্ দলপ্—ঢুলঢুল করে ঢুলছে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হালি—সারিবদ্ধ ভাবে
পাকোয়ানী ঝাংগর—জেলের ধাংগর
কাথা—কথা
বাউড়্যা—পাগল
হরোৎ ফরোৎ—ছট্‌ফট্ করছে

আহায়া—এসো
কৈলা—করিলা
দুক্ক—দুঃখ
বিধুয়া—বিধবা
একত্তর—একযোগে, একত্রে
হিন্দে—হৃদয়ে, মনে
চাটু—বড় হাতা (যা দিয়ে ভোজ বাড়িতে রান্না করা হয়)
দমকায়রে—ঝলমল করে

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লাড়িদড়ি—ঝঞ্ঝাট, বিশৃংখল
জোকার—উলুধ্বনি
জীয়াও—বাঁচাও

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ধন্দে—মুশ্‌কিলে
যুইগ্যা—যুবতী

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধ্বচিয়া—খসিয়া
হাম্নাক—আমাকে
ডহর—হ্রদ
ডাংগা—জমিন
অসনা—রসনা
নাইবেনা—লাগবেনা
জহল—জল
ভুলুকা—বুদবুদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিশানা—প্রমাণ
তিন চোখী—ত্রিনয়নী, গঙ্গাদেবী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আইনু—আসলাম

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গাম—গাহব
হামেরা—আমরা
তমরা—তোমরা
ফম্—কম
সগায়—সকলে
ফাড়া—ছেঁড়া
বাইগনত—বেগুন
হারাম—নিষিদ্ধ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গাড়ত—অন্ধকার
বেলেক—ব্ল্যাকমার্কেটের অপভ্রংশ
ভুকা—ভানা (ধান)
মোটক্ টোক— মোটাসোটা
দন—দর
দে মোক—সেই কারণে
বানা ভাসা—বন্যাপীড়িত
কাকতো—কেহ কেহ
খাড়্যা—দাঁড়াইয়া
এলোক কাক—এই সকল লোক দিগকে
হালৎ—অবস্থা
হইচুরে—হয়েছি
কাচাল—মতলব, শলাপরামর্শ
পাণ—প্রাণ
পিদ্ধার—পরিবার
গিরি—কৃষক
গিরখানী—কৃষাণী
ডাংগর—যুবতী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিকড়িয়ার—দরিদ্র
পন্থে—পথে
বেনা—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ
ঢেনা—অসদ্ভাব
চিতন বয়সের—অল্প বয়সের
আড়ী—বিধবা
ফান্দাইসু—স্থির করেছি
অংগের—রং-এর
নিদান কালে—অন্তিম সময়ে
দোয়া—করুণা, কৃপা
রিপু—শত্রু
আওড়া কথা—বাজে কথা
সিন্নাৎ—পুরুষ্টু
ঠাডা—বজ্র, বাজ
পোয়া—ছেলে

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিন—নিদ, নিদ্রা, ঘুম
বাপোইটা—বাছা, খোকা

পিতারী—পাতা

কণাত—শুয়ে

চূড়া—চিড়ে

ঢুগী—হাঁড়ি জাতীয় পাত্র

আলাতামাক—দোক্তাপাতা

কলগাড়ী—রেলগাড়ী

রাঁড়মেয়ে—বালবিধবা

অরণে—বনে

লড়ির দড়ি—বিলম্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিৎপুঁটি—ছোট ছোট পুঁটিমাছ

ফটাং ফটাং—ছট্‌ফট্‌

নি-নাইয়া—যার নৌকো নেই

দড়—শক্ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আসমান—আকাশ

সংযোজন

বইটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন স্থানাভাবে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গান, ছড়া প্রভৃতি রেখে দিতে হয়েছিল। গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর করার তাগিদে আজ সেইসব অগ্রন্থিত গান, ছড়া প্রভৃতি থেকে কয়েকটি এই সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। আশা করি লোক-সংগীত ও লোক সাহিত্য-প্রেমিকদের এতে বিশেষ সহায়ক হবে।

গীতি

বারমাস্যা বা বারানি গান

ইহত' ফাগুন মাস সখি ফাগুয়ার খেলা,
মোন করে আনচান সখি মোনে একি জ্বালা।
রাই কপালে তিলক ফোঁটা চোখে কাজল রেখা,
এমন দিনে বন্ধুর আমার নাই পাই দেখা।
(লে ফুল্লরা বন্ধু পরবাসী রে)॥
ইহত' চৈত্রমাস সখি বাজ পড়লো সুখে,
চত্রি মন্দা বাও হইল সুন্দরী কইন্যার মুখে।
নাইওকো রাও মুখে সখি বাও নাইকো চৌক্ষে,
অনল যেমন দইংধা মারে জ্বলে পরাণ দুঃখে।
এমন দিনে বন্ধুর আমার নাহি দরশন,
চত্রি মন্দা বাও হইল অনল পরাণ।
(লে ফুল্লরা বন্ধু পরবাসী রে)॥
ইহত' বৈশাখ মাস হে কিষাণ মারে হালি,
লাফ্ দিয়া ধরে কইন্যা লাউ কুমাড়ের জালি।
লাউ কুমাড়ের জালি নয়রে ফল বানাইয়্যা থোব,
আমার বন্ধু দ্যাশে আইলে দুঃখের কথা কব।
(লে ফুল্লরা বন্ধু পরবাসী রে)॥

ইহত' জ্যৈষ্ঠ মাস সখি গাছে পাকা আম,
আর আছে বৃক্ষ ভইর‍্যা কালা কালা জাম।
আম খাব, জাম খাব, খাব গাইয়ের দুধ,
ঘরের বন্ধু দূরে আছে খাবার কি-বা সুখ?
(লে ফুলরা বন্ধু পরবাসী রে)॥
ইহত' আষাঢ় মাস হে গাছে পাকা লেওয়া,
হারা কোণে ম্যাঘ লাগল গর্জি আসে দেওয়া।
বর্ষুক বর্ষুক দেওয়া বর্ষুক, বর্ষুক পঞ্চ ধারে,
অবশ্যি আসিবে পতি আসিবে এই বারে।
(লে ফুলরা বন্ধু পরবাসী রে)॥
ইহত' শাওন মাস সখি নদী নালায় পানি,
হাতের কল নাহি সরে কাটে দিন রজনী।
ভাদ্দর মাসে ভাদ্দর-বউ নাহি যায় ঘরে,
দুরন্ত বাদলে কইন্যার চৌক্ষে বারি ঝরে।
(লে ফুলরা বন্ধু পরবাসী রে)॥
আশ্বিন মাসে মানত করে পূজে ভগবতী,
আবাগীর কপালে নাহি আইসে প্রাণপতি।
(লে ফুলরা বন্ধু পরবাসী রে)॥
কার্তিক গ্যাল আঘণ আইলো মরায় উঠলো ধান,
অন্নবিনা শুকনা হইল সাধের দেহখান।
(লে ফুলরা বন্ধু পরবাসী রে)॥
পৌষ পাবনের পিঠাপুলি মাঘে হিমের বাও,
সর্বঅঙ্গে কাঁটা লাগে দুঃখে জীবন যায়।
লে ফুলরা বন্ধু পরবাসী রে)॥

বিচ্ছেদী গান

(১) পরাণ বন্ধুরে তোঁয়ার বিচ্ছেদে জ্বলে আঁর প্রাণ।
হয় আঁরেদ্যা দেখা, নয় মোরে দ্যা কোরবান।
প্রেমের মায়া দিলা মোরে মন করছা উতালা।
কার কাছে বুঝাইরুম্ দুঃখ কষ্টে বুঝিবে সেই জ্বালা,

প্রেমের রশি গলায় কসি কোমর ভুন মার টান,
তুঁই ধনী আঁই কাঙাল,
ও পরাণের বন্ধুজন অবলারে না ভুলি
ও চরণ ধূলায় তৃষামন, চরণ আশা,
ভালবাসায় ছাড়ি দিলায় কুল মান।
এ সংসারের ভালবাসা যত রকম মমতা,
হগ্‌গল আমার বিষ লাগে,
বন্ধু মিষ্ট লাগে তোঁয়ার কতা,
হৃদয়পুরে গুন গুন স্বরে গাইয়ম
বন্ধু তোঁয়ার গান।

(২) সরল প্রেমে তুই এত দুঃখ দিলি
তোর লাগি বুক ভাসি যায় চোকের জলে।
আর সয়না সয়না জ্বালা
দু'চোখের দুই নালা,
সরল প্রেমে তুই এত দুঃখ দিলি।

বাউল

(১) পাখি কখন উড়ে যায়,
(ওরে) বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়।
খাঁচার আড়া প'ল খসে,
পাখি আর দাঁড়াবে কিসে
(ওরে) এখন আমি ভাবি বসে
(সদা) চমক জরা বইছে গায়।
কার বা খাঁচায় কার বা পাখি,
কার জন্যে বা ঝুরে আঁখি
(পাখি) আমারি আঙিনায় থাকি
আমারে মজাতে চায়।
(যেদিন) সাধের পাখি যাবে উড়ে
খালি খাঁচা রইবে পড়ে,

(সেদিন) সঙ্গের সাথী কেউ রবে না
লালন ফকির কেঁদে কয়।

(২) এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই।
দেব দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম দিতে মানবে।
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মনরে পেয়েছ এ মানব তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা না ডোবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন,
তাই তো মানুষরূপ গড়লেন নিরঞ্জন
এবার সকলে আর না দেখি কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে।

(৩) মন না হলে সোজা, ফকির সাজা
কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
ফকিরের সজ্জা ধরে নৃত্য করে
করছ ধর্ম আলোচনা॥
তুমি যে আপনি কাজে, বেঠিক নিজে
পরকে কী বোঝাও বল না।
তুমি যে কত গান গাও, পরকে বোঝাও
নিজে ক্যান তা' বোঝনা।
নিজে না বুঝলে পরে, অন্য পরে
বুঝবে ক্যান তা' ভাবনা।
কাঙাল কয়, যুক্তি ধর ভাল কর
ভাল হওরে সর্বজন,
নিজে না হলে ভাল, পরকে ভাল
করবে ভাল—তা' হবে না।

ক্ষেপী সম্প্রদায়ের গান

(দেখেছি) রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা,
(তারে) ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে ধরা দেয়না।

(সে মানুষ) চেয়ে চেয়ে ঘুরিছে পাগল হয়ে,
(মরমে) জ্বলছে আগুন আর নিভেনা,
(এখন) বলে বলুক লোকে মত্ত,
বিরহে তার প্রাণ বাঁচেনা।

(পথিক) আর ভেবোনা রে
ডুবে যাও রূপ সাগরে
(নিরলে) বসে কর যোগ-সাধন,
(এবার) ধরতে পেলে মনের মানুষ
চলে যেতে আর দিওনা।

ধামাইল

আমি কী হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া
(লো নাগরী জলের ঘাটে গিয়া)।

দেখিলাম কালো রূপ লাগিল নয়নে
আমি কু-ক্ষণে চাহিয়াছিলাম গো
গৌরচন্দ্রের পানে।

কলসীতে নাইরে পানি
আমি গিয়াছিলাম সুরধনী
কানেতে বা শুনি শ্রবণে।
একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে মজেছি পরাণে।

কাইলা থাকে রাজপথে,
তোমরা কেউ যাইওনা জল আনিতে গো
দেখলে তারে মরিবে পরাণে,
শেষে আমার মত ঠেকবি তোরা
এই আছে কপালে।

বৌ নাচ

সুয়াগ চান্দ বদনি দনি নাচত দেকি
বালা নাচত দেকি, ভালা নাচত দেকি ॥
(এলে) যেমনি নাচইন নাগর কানাই
তেমনি নাচইন রায়
একবার বলাও চাইন দেকি নাগর কানাই,
রাই নাগর কানাই ॥
(এলে) নাচিতে আতের বাশি রাখইন শাম রায়
(এলে) চাইর দিকে চাইয়া রাই এ বাশিটি লুকাইন,
রাই বাশিটি লুকাইন ॥
(এলে) নাচন বালা সুন্দরীরে পিংগইন বালার নেত
(যেন) এলিয়া ঢুলিয়া পরে সুদিজালির বেত,
বালা নাচত দেকি ॥

ছড়া

ছেলে ভুলানো ছড়া

১। আয়রে কাউয়া কা কা
মণির দুধ খাইয়্যা যা।
মণি খায় দুধ ভাত,
তুই বইয়া পাতা চাট্।

২। নিদ্রালী মাউরে আমার বাড়িত আইও।
খাট নাই, পালংক নাই পিঁড়ি দিতাম জাগা নাই,
আমার মণির চউক্ষের উপর বইস।

৩। ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদু মণি।
ঘুমের থুন উঠিলে যাদু কত খাইবা ফেনি ॥
ঘুম যারে ঘুম যারে ঘুমের যাদুমণি।
ঘুম গেলে করাইয়া দিমু সোনার যাদুমণি ॥
ঘুম যারে চাতকীর বাছা ঘুম যারে তুই।
ঘুমের থুন উঠিলে বাছা ননি দিমু মুই ॥

৪। বাবু কেনে কাঁদেরে শাশু ঘর যাইতে
লাল ঝুমকা পিতাম ঝারি, নেপুর দিব সাথে।
হাঁসা ঘোড়ায় পলক দিব বাটচরা যাইতে,
পেড়ি দিব খঁচ খঁচ বাঘ নখ খেলিতে।
উড়কি ধানের মুড়কি দিব ঘাটে বসি খাইতে,
সুরু ধানের চিড়া দিব শাশুরে ভুলাইতে।

মেয়েলি ছড়া

১। আইজ চুপীর অধিবাস কাইল চুপীর বিয়া।
চুপীরে যে নিতে আইছে সোনার পালকি নিয়া।
সোনার পালকি ভাইংগা পড়ল খেওয়া ঘাটে গিয়া ॥
পালকীর তলে ঢোরা সাপ
ফাল্ (লাফ্) দিয়া ওঠে বউয়ের বাপ।
বউয়ের বাপে তামুক খায়,
নাক বরাবর ধোঁয়া যায়।
সেই ধোঁয়া কালা
বউয়ের বাপ শালা।

২। ঢোল বাজে গামুর গুমুর সানাই বাজে রইয়্যা,
পরার পুতে নিতে আইছে ঢোল বাড়ি দিয়া।
আয়লো খেলার সই, খেলার সাজু লইয়্যা
আরতো খেলুম না পরার ঘরে গিয়া।

আনুষ্ঠানিক ছড়া

নবান্নের মাগনের ছড়া

মুল গায়েন—হেগো বুড়ি হেগো
সমবেত কণ্ঠে—ভাল্লে।
মুঃ গাঃ—(তোর) পিছা করে কেগো
সঃ কঃ—ভাল্লে।

মূঃ গাঃ—তোর পিছা করে কোলা ব্যাং
লাফিয়া ধরে বুড়ির ঠ্যাং

সঃ কঃ—ভাল্লেল।

মূঃ গাঃ—বুড়ি বলে বাপ্‌রে—
ক্যাঁথা দিয়া চাপরে।

সঃ কঃ—ভাল্লেল।

মূঃ গাঃ—ক্যাঁথা গ্যাল হোস্‌কা
বুড়ি গ্যাল ফোইস্‌কা।

সঃ কঃ—ভাল ভুল্লেল।

পাঁচ মিশেলি ছড়া

১। এই বেটা বেহায়া (বেহারা)
বৌ নিয়া যা দেখাইয়্যা,
ভেন্না গাছে দিলাম বাড়ি
বৌ থুইয়্যা যা আমার বাড়ি।

২। যৈবনে ছিলাম আমি চম্পা ফুলের সাঁঝি,
ভালবাসত, আমায় বড় নৌকার মাঝি।
এখন আমার বয়স হইয়্যাছে বছর চাইর কুড়ি,
এখন আমায় গাইল পাড়ে বুড়া মাথরি।

৩। চড় চাপড় গায়ের কাপড় তাকে কী বলে মার,
জল বিছুটি খেজুর দড়ি তাকে বলি মার।

৪। দাঁড় কাউয়্যা, দাঁড় কাউয়্যা
মোরগো বাড়ি আইও,
নবান্নের চাউল মাখা
প্যাট্‌টা ভইরা খাইও।